আল মুরাজায়াত

(পত্রালাপ)

অনুবাদ

আবুল কাসেম

আল্লামাহ্ সাইয়্যেদ আবদুল হুসাইন শারাফুদ্দীন আল মুসাভী

আল মুরাজায়াত

গ্রন্থকার : আল্লামাহ্ সাইয়্যেদ আবদুল হুসাইন শারাফুদ্দীন আল মুসাভী

অনুবাদ : আবুল কাসেম

প্রকাশকাল :

শাওয়াল ১৪২৩ হিজরী

পৌষ ১৪০৯ বাংলা

ডিসেম্বর ২০০২ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক : এস. এম. আলীম রেজা

৯৩, আরামবাগ, ঢাকা।

(প্রকাশক কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রচ্ছদ

রফিকুল্লাহ গাযালী

মুদ্রণে

চৌকস প্রিন্টার্স লিমিটেড

১৩১ ডিআইটি এক্সটেনসন রোড, ঢাকা- ১০০০

Al Muraja'at,Written by Allamah Sayyed Abdul Hussain Sharafuddin Al Musavi (R.),Translated by Abul Quasem,Published by S.M. Alim Reya,Published on Shawal 1423,Poush 1409,December 2002.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

জ্ঞানের চেয়ে বড় আর কোন সম্পদ এই পৃথিবীতে নেই। এটি এমন এক মূল্যবান ও স্থায়ী সম্পদ যা প্রচুর পরিমাণ দান করলেও বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না। জ্ঞান হলো নূর বা আলো যা পৃথিবীর মানুষকে পথ দেখায়। মহান আল্লাহ্ বলেছেন যে, সে- ই বেশি তাকওয়া সম্পন্ন যে বেশী জ্ঞানী। মহান আল্লাহ্ আরো বলেছেন, যে জানে আর যে জানে না তারা দু'জন সমান নয়। এই জ্ঞান অর্জনের পথে কারো মৃত্যু হলে তাকে শহীদের মৃত্যুসম বলা হয়েছে। তাই এই জ্ঞান অর্জনে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করা- একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করা উভয়ই কল্যাণকর ও আনন্দদায়ক। জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য হলো অন্ধকার ও অজ্ঞতা দূর করা। অনৈক্য ও বিভেদ মুছে ফেলা। আর সত্যের চূড়ায় আরোহণ করা। যুগে যুগে যেসব সাধক মনীষী এ অনুভূতি নিয়ে কাজ করেছেন, পরস্পর বন্ধুত্ব করেছেন, কথা বলেছেন আল্লামাহ্ শারাফুদ্দীন (রহ.) ও মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শেখ সালিম আল বিশরী (রহ.) তাঁদেরই অন্যতম পুরোধা। মুসলমানদের মাঝের বিতর্কিত বিষয়গুলো পরিহার করা ও সর্বজনস্বীকৃত বিষয়গুলোর দিকে সবারই ফিরে আসা এই ছিল তাঁদের পত্রালাপের মূল প্রতিপাদ্য। সর্বজনস্বীকৃত হাদীস, তাফসির, রেওয়ায়েতসমূহ তাঁদের পরিচয়, বন্ধুত্ব ও পত্রালাপকে পূর্ণতা দিয়েছিল। নিগুঢ় ভালবাসা ও   ায় আব   হয়েছিলেন তাঁরা। পরস্পরের অমিল, অনৈক্য ও বিভেদসূচক বিষয়াদি নিয়ে যখন মুসলিম বিশ্ব চিন্তা ও দলগত শত শত ফিরকায় বিচ্ছিন্ন তখন এই দুই ে ষ্ঠ আলেম খুঁজেছিলেন মিল ও ঐক্যের সূত্রসমূহ। তাঁদের যুগের সীমা পেরিয়ে এ ঐক্য আমাদেরও উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে।

আল্লামাহ্ শারাফুদ্দীন ও আল্লামাহ্ শেখ সালিম- এর পত্রালাপই আরবী ভাষায় ‘আল মুরাজায়াত’ নামে সংকলিত হয়। ‘মুরাজায়াত’ অর্থ পরস্পর রুজু হওয়া বা পরস্পরের দিকে মুখাপেক্ষী হওয়া।

এ মহামূল্যবান গ্রন্থটি ইতোমধ্যে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই বইটি অনুবাদ করতে জনাব আবুল কাসেম যে অক্লান্ত পরি ম করেছেন তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে বড় পুরস্কার আশা করছি। এই বইটি প্রকাশের জন্য যাঁরা এগিয়ে এসেছেন বিশেষ করে জনাব মোঃ নাঈম (Md.Nayeem),জনাব সালমান খান (Mr.Salman Khan) এর কথা স   চিত্তে স্মরণ করছি। অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রকাশনার প্রতিটি পর্যায়ে যাঁরা কষ্ট করেছেন, উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বইটি আজকের বাংলা ভাষী সত্যান্বেষী মানুষকে উপকৃত করলে ও মুসলমানদের ঐক্যের পথে এগিয়ে নিলেই আমাদের এ   ম সার্থক হবে। মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি।

লেখক পরিচিতি

সাইয়্যেদ আবদুল হুসাইন শারাফুদ্দীন ১২৯০ হিজরীতে ইরাকের কাযেমাইন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এমন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে জ্ঞানের পূর্ণ পরিবেশ ছিল। তিনি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিজেকে ইসলামের একজন পরিপূর্ণ আলেম হিসেবে প্রস্তুত করতে তৎপর হন। তিনি হযরত আলী (আ.)- এর সমাধিস্থলের নিকটে প্রতিষ্ঠিত নাজাফের মাদ্রাসায় বিশিষ্ট আলেমদের নিকট উসূল, ফিকাহ্ ও ইসলামী জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে সাইয়্যেদ কাযেম তাবাতাবায়ী, আখুন্দ খোরাসানী, ফাতহুল্লাহ ইস্ফাহানী, শেখ মুহাম্মদ ত্বাহা নাজাফ এবং হাসান কারবালাই প্রসি ।

এই বিশিষ্ট আলেমের বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি অধিকাংশ দীনী ছাত্রের ন্যায় শুধু ধর্মীয় পড়াশুনায়ই সময় কাটাতেন না, বরং ইসলামী সমাজের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন ও সমাজের সমস্যাসমূহের সমাধানের পথ খুঁজতেন। বিশেষত এ গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর নিম্নোক্ত মন্তব্য থেকে তা বোঝা যায়। তিনি বলেছেন, “তরুণ বয়স থেকেই শিয়া ও সুন্নী এ দু’মাজহাবের মধ্যে অনৈক্যের বিষয়টি আমাকে কষ্ট দিত ও আমি এ অবস্থা হতে মুক্তির পথ খুঁজতাম।”

তিনি ৩২ বছর বয়সে লেবাননের ‘জাবালুল আমেল’- এ হিজরত করেন। আমেলের অধিবাসী ও আলেমগণ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ঐশী নির্দেশ বাস্তবায়নে স্বৈরাচারী শাসকদের বিরু মজলুমদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। এক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাণী ও বক্তব্য লেবাননের আলেমদের ধমনীতে রক্ত সঞ্চালন করত।

তিনি শুধু স্থানীয় শাসকদের বিরু ই নয়, বরং তৎকালীন উপনিবেশবাদী ফরাসীদের বিরু সোচ্চার হন। ফরাসীদের তৎপরতায় তিনি বাধ্য হয়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন। ফরাসী সৈন্যরা লেবাননের শাখুরে তাঁর গৃহে ও সোউরে তাঁর গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগ করে। এ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত

তাঁর লিখিত উনিশটি গ্রন্থ এতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ কর্মে ফরাসীদের সভ্যতার রূপ উন্মোচিত হয়।

সিরিয়াতেও তিনি আলেম ও সাধারণ মানুষদের সঙ্গে নিয়ে ফরাসী উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এতে ফরাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকেসহ এ আন্দোলনের অসংখ্য নেতাকে ফিলিস্তিনে নির্বাসিত করে। কয়েক মাস সেখানে অবস্থানের পর ১৩৩৮ হিজরীতে তিনি স্বেচ্ছায় মিশর গমন করেন এবং বিশিষ্ট ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে পরিচিত হন ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। যেহেতু তিনি ১৩২৯ ও ১৩৩০ হিজরীতে দু'বার মিশর এসেছিলেন সেহেতু মিশরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও আলেমগণ তাঁকে চিনতেন। এখানেই তাঁর সাথে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শেখ সালিমের সাথে কয়েকটি বৈঠক হয়। এই সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় তাঁদের মধ্যে প্রচুর পত্র বিনিময় হয় যা গ্রন্থাকারে 'আল মুরাজায়াত' নামে পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়।

লেখকের কথা

কেন ও কিভাবে এ গ্রন্থ রচিত হলো?

এ গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলো আজ লেখা হয় নি আর এটি রচনার পেছনে যে চিন্তা কার্যকর ছিল তাও সাম্প্রতিক নয়, বরং এ গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলো পঁচিশ বছর পূর্বেই সংকলিত হয়েছিল। তখনই এর উচিত ছিল পত্রিকার পাতায় আলো বিকিরণ করার। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এর গতিকে স্তব্ধ করে দেয়ায় এতদিন দৃশ্যমান হতে পারে নি। তবে এ দিনগুলো এর বিক্ষিপ্ততা ও ত্রুটি দূর করে পূর্ণতা দানের সুযোগ এনে দিয়েছিল। কারণ ইতোপূর্বে মুদ্রণের বিলম্বে এর পাতাগুলো অগোছালো ও বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

এ গ্রন্থ সংকলনের চিন্তা এটি রচনার অনেক পূর্বেই জন্মলাভ করেছিল। এ চিন্তা তরুণ বয়সেই আমার মাথায় উঁকি দিচ্ছিল ও বিদ্যুতের ন্যায় তা আমার ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছিল। এ বিষয়টি আমার চিন্তাকে সব সময় সঠিক পথে পরিচালিত করত যেন মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান অকল্যাণের মূলোৎপাটন ও তাদের চোখের সামনে থেকে পর্দা অপসারণের মাধ্যমে বাস্তব দৃষ্টিতে জীবনকে অবলোকনে সক্ষম হই। ব কপাট উন্মোচনের মাধ্যমে তাদের সামনে সেই প্রকৃত দীন- যার অনুসরণ সকলের ওপর অপরিহার্য তা তুলে ধরতে পারি। ফলশ্রুতিতে সকলে একযোগে ঐশী রজ্জু ধারণ, জ্ঞান ও কর্মের অনুসন্ধান ও সত্যের পতাকার নীচে সমবেত হতে পারি যা আমাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও আদর্শের জন্ম দেবে এবং একে অপরের পৃষ্ঠপোষকে পরিণত করবে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, মুসলিম ভ্রাতৃগণ যারা একই উৎস থেকে উৎসারিত ও অভিন্ন বিশ্বাস পোষণ করে তারা পরস্পর শত্রুতে পরিণত হয়েছে। আলোচনার ক্ষেত্রে তারা মূর্খের ন্যায় এতটা সীমা লঙ্ঘন করছে যে, আলোচনা ও বির্তকের সীমা পেরিয়ে তা অস্ত্র ধারণ ও একে অপরকে আক্রমণে পর্যবসিত হচ্ছে। এ অবস্থাটি অন্তরের বিদ্বেষ হতে সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থা একদিকে

আমাদের চিন্তার দিকে আহ্বান করছে অন্যদিকে আমাদের অন্তরকে দুঃখভারাক্রান্ত করছে। এ অবস্থায় কি করা উচিত?

এসব আমাকে প্রচণ্ড কষ্ট দিত; আমার কাঁধে যেন দুঃখের বোঝা চেপে বসেছিল। এ অবস্থা থেকে মুক্তির আশায় ১৩২৯ হিজরীতে আমি মিশরে গমন করি। মুসলমানদের মাঝে ঐক্যের লক্ষ্যে কলমসমূহকে এ পথে আনার প্রচেষ্টা শুরু করি। পূর্বেই আমার মধ্যে এ অনুভূতি দৃঢ়তা লাভ করেছিল যে, এমন ব্যক্তির সন্ধান লাভ করবো যার কাছে আমার অনুভূতি আন্তরিকভাবে ব্যক্ত করতে পারব ও ঐক্যের সে লক্ষ্যে পৌঁছার সঠিক পথ নির্বাচনে সক্ষম হব। হয়তো আল্লাহ্ আমাদের মধ্য থেকে এমন এক তীর ছোঁড়াবেন যা ছিন্ন ভিন্ন মুসলিম জাতিকে ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত করবে ও নিজেদের বিপদাপদকে দূরীভূত করবে।

আলহামদুলিল্লাহ্, অবশেষে যখন মিশরে এলাম তখন আমার সে লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হলাম। কারণ সে সময় মিশর এমন এক কেন্দ্র ছিল যেখান থেকে জ্ঞান অঙ্কুরিত এবং প্রমাণের ওপর নির্ভর করে তা সত্যের দিকে পরিচালিত ও অবনমিত হত। এছাড়াও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতির বৈশিষ্ট্যও সমন্বিত হয়েছিল মিশরে। অবশেষে এখানেই সৌভাগ্যক্রমে এমন একজন বড় আলেমের সন্ধান পাই যাঁর সাক্ষাৎ আমার আনন্দকে পূর্ণতা, হৃদয়কে প্রফুল্ল ও মস্তিষ্ককে নিশ্চিন্ততা দান করে। তিনি সুন্দর চরিত্র, গভীর চিন্তাশক্তি, সজীব হৃদয় ও সমুদ্রের ন্যায় প্রসারিত জ্ঞানের অধিকারী মিশরের এক সম্মানিত ও কৃতি সন্তান। তিনি সেখানকার ধর্মীয় নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন এবং প্রকৃতই এ পদের উপযুক্ত ছিলেন।

এ বিষয়টি কতই না সুন্দর আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা পরস্পরের মিলনে পবিত্র হৃদয়, হাসিমুখ ও নবী (সা.)- এর ন্যায় ব্যবহার ও আচরণ প্রদর্শন করবে! কোন আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি এমন চমৎকার পোষাক তাঁর দেহ ও মনে পরিধান করে নিজে যেমন প্রফুল্ল থাকবেন তেমনি মানুষরাও নিরাপত্তা ও প্রশান্তি সহকারে তাঁর নিকট মনের কথা বলবে, এ বিষয়ে কোন সংকোচ অনুভব করবে না ও নির্দ্বিধায় তাদের গোপন কথাগুলো বলতে পারবে।

মিশরের এ বিশিষ্ট ব্যক্তিটি এমনই এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নাজাফের বৈঠকগুলো এত আকর্ষণীয় ছিল, আশা করতাম যেন তার সমাপ্তি না ঘটে। আমি আমার অসন্তোষ ও মনোকষ্টগুলো তাঁর নিকট বলতাম এবং তিনিও তাঁর বিভিন্ন অভিযোগ- অনুযোগ আমাকে বলতেন। যে বিষয়ে আমাদের দু'জনের মধ্যে ঐকমত্য ছিল তা হলো শিয়া ও সুন্নী উভয়ই মুসলমান ও নিঃসন্দেহে সত্য দীন- ইসলামের অনুসারী। তাই নবী (সা.) তাদের জন্য যা এনেছেন সে বিষয়ে তারা একমত পোষণ করে। ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহে তাদের মাঝে কোন অনৈক্য নেই। যে অনৈক্য রয়েছে তা কোরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও আকল হতে দীনের আহকাম উদঘাটনে মুজতাহিদদের মধ্যকার পার্থক্যের ন্যায়। তাই এ ক্ষুদ্র বিভেদ উম্মতের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার কারণ হতে পারে না। কি কারণে এ দু'সম্প্রদায়ের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হলো ও তারা পরস্পরকে সহ্য করতে পারছে না তার রহস্য উদঘাটন করা প্রয়োজন।

আমরা যদি ইসলামের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, এ বিভেদের কারণ একটি বিশ্বাসগত মৌল বিষয়ের মধ্যে নিহিত, আর তা হলো ইমামত। কারণ ইসলামের অন্য কোন মৌল বিষয়ের জন্য কেউ অস্ত্র ধারণ করে নি। সুতরাং ইমামত এ অনৈক্যের সর্ববৃহৎ কারণ। যুগ যুগ ধরে ইমামতের বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা হয় নি, বরং দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখা হয়েছে। যদি উভয় পক্ষ বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে (শত্রুতার দৃষ্টিতে নয়) পরস্পরের উপস্থাপিত দলিল- প্রমাণগুলোকে দেখতেন তবে সত্য প্রকাশিত এবং সত্যাকাঙ্ক্ষীদের সামনে সত্যের সূর্য উদিত হত।

আমরা উভয় পক্ষের দলিল- প্রমাণ যথার্থরূপে পর্যালোচনার মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানের ব্রত নিয়েছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এমনভাবে বিষয়টিকে অনুভব করবো যাতে পরিবেশে অন্ধ অনুকরণ ও আবেগের কোন স্থান না থাকে। নিজেদের সকল প্রকার গোঁড়ামী ও অন্ধত্ব হতে মুক্ত করে সত্যের পথে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সংকল্প নিয়েছিলাম যাতে করে সর্বসম্মত সঠিক পথকে অনুভবের মাধ্যমে মুসলমানদের হৃদয়ে প্রশান্তি দান ও আমাদের নিকট সত্য প্রমাণিত বিষয়ের

প্রতি মুসলমানদের চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করা যায়। আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহে এ সীমার মধ্যেই আমাদের আলোচনার সমাপ্তি ঘটানো।

তাই আমরা চুক্তিব   হলাম তিনি যে কোন প্রশ্ন লিখিতরূপে উপস্থাপন করবেন এবং আমি স্বহস্তে সঠিকতার ভিত্তিতে তার উত্তর দান করবো যা উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য সূত্র যথা কোরআন, সুন্নাহ্ ও বু বৃত্তিক দৃষ্টিকোণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহর ইচ্ছায় 'আল মুরাজায়াত' গ্রন্থটি এভাবেই প্রস্তুত হয়েছিল। যদিও আমাদের সি ান্ত ছিল সে সময়েই আমাদের সম্পাদিত কর্মকাণ্ড গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবো কিন্তু ভাগ্য ও কালের হস্তক্ষেপে তা সম্ভব হয় নি। হয়তো এর মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত ছিল যা আমরা অবগত ছিলাম না।

আমি দাবি করছি না এ পৃষ্ঠাসমূহ সে সময়ে আমাদের মাঝে যে পত্রসমূহ বিনিময় হয়েছে হুবহু সেগুলোই বা তাঁর বর্ণিত শব্দগুলোই এনেছি। কারণ ছাপার বিলম্বের কারণে পৃষ্ঠাসমূহ অবিন্যস্ত হয়ে পড়ায় অনুক্রম রক্ষা করা যায় নি। তাই বাধ্য হয়ে নতুন করে পৃষ্ঠাগুলো বিন্যস্ত করেছি। তবে এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, আমাদের মাঝে যা কিছু আলোচিত হয়েছে তা পুরোপুরিই এ গ্রন্থে এসেছে।

আমি প্রথম দিন যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতাম এখনো একই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। আর তা হলো এ গ্রন্থ যেন ইসলামী উম্মতের সংস্কার ও কল্যাণ সাধন করতে পারে। তাই যদি মুসলমানরা এ গ্রন্থের প্রতি আগ্রহ পোষণ করে তবে তা আল্লাহর অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়। এটিই হবে আমার কর্মের সর্বোত্তম প্রাপ্তি। কারণ আমার যোগ্যতা ও ক্ষমতার সীমায় সংস্কার মহান প্রতিপালকের বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই তাঁর প্রতি নির্ভর ও প্রত্যাবর্তন করছি-

انْ أُرِيدُ الاّ الإِصلاحَ ما استطَعْتُ و ما توفِيقي اِلاّ بالله عليه توكلتُ و اليه أُنيبُ

আমি এ গ্রন্থটি সেই সকল জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি যাঁরা সত্যকে অনুধাবনের জন্য যথার্থ পর্যালোচনা করেন। সেই সকল হাফিয ও মুহাদ্দিসের উদ্দেশ্যে আমার এ নিবেদন যাঁরা হাদীস গবেষণার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দলিলের ওপর নির্ভর করেন। আমার এ নিবেদন অভিজ্ঞ দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদদের এবং অন্ধত্ব ও গোঁড়ামীর শিকল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা সেই

সকল স্বাধীন ও মুক্তমনা শিক্ষার্থী যুবকের উদ্দেশ্যে যারা আমাদের নবীন ও মুক্ত জীবনের আশার আলো। তারা এ গ্রন্থ হতে লাভবান হলেই আমার সফলতা।

আমি এ গ্রন্থের বিন্যাস, সংস্কার ও পর্যাপ্ত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর দানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি যাতে ন্যায়পরায়ণ ও সঠিক যুক্তিপ্রত্যাশী পাঠকরা কোন সন্দেহ ব্যতীত এর প্রতি সম্পৃক্ত হতে পারেন। আমি এ গ্রন্থে সুস্পষ্ট, সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস ও রেওয়ায়েতগুলোই শুধু এনেছি যাতে করে পাঠকদের ইতিহাস, হাদীস ও কালামশাস্ত্রের উ ৃত গ্রন্থগুলোর প্রতি রুজু করার তেমন কোন প্রয়োজন না হয়। যুক্তি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আমি ভারসাম্য ও সত্যপরায়ণতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছি। এতে পাঠকরা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থটি অধ্যয়নে উক্ত লক্ষ্যে অগ্রসর হবেন। আমার এ গ্রন্থ সত্যাকাঙ্ক্ষী ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির হাতে সমর্পিত হোক আল্লাহর নিকট এ আশা করছি।

আলহামদুলিল্লাহ্, এ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি। এজন্য আমি আমার নিজ জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট। কারণ এ কর্মের মাধ্যমে আমার সারা জীবনে যে কষ্ট করেছি, যে দুঃখভার সহ্য করেছি তা ভুলে গিয়েছি বলে আমার বিশ্বাস। শত্রুদের ষড়যন্ত্র, অপচেষ্টার অভিযোগ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট উপস্থাপন করবো না। তিনি বিচারক হিসেবে যথেষ্ট। সর্বোপরি দোয়া করছি মহান আল্লাহ্ বিপদাপদের সকল পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ ও আমার অন্তর হতে সকল অন্ধকার দূরীভূত করুন, এই গ্রন্থকে দুনিয়া ও আখেরাতে আমার মুক্তির মাধ্যম (উসিলা) করে দিন, আমার ভুল- ত্রুটি ক্ষমা করুন ও আমার অন্তরে প্রশান্তি দিন। তাঁর নিকট আশা করছি আমার কর্মকাণ্ডকে কবুল করুন ও একে মুমিনদের হেদায়েতের উপকরণ বানিয়ে দিন।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

নিবেদক

সাইয়্যেদ আবদুল হুসাইন শারাফুদ্দীন আল মুসাভী

প্রথম আলোচনা

দীনি নেতৃত্ব

মাজহাবে ইমামত

প্রথম পত্র

৬ জিলক্বদ ১৩২৯ হিঃ

১। সালাম ও অভিনন্দন!

২। আলোচনার অনুমতি!

১। বিশিষ্ট আলেম আল্লামাহ্ আবদুল হুসাইন শারাফুদ্দীন মুসাভীর প্রতি সালাম। আল্লাহর রহমত ও বরকত আপনার ওপর অবতীর্ণ হোক।

আমি আমার সমগ্র জীবনে শিয়াদের অবস্থার স্বরূপ, অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা ও চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলাম এবং কখনো তা জানার জন্য প্রচেষ্টাও চালাই নি। এটি এ কারণে যে, তাদের সঙ্গে আমার কোন ওঠাবসা ছিল না এবং আমি শিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রেও কখনো বসবাস করি নি। কিন্তু তাদের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ ও আলেম সমাজের সঙ্গে আলোচনার জন্য সব সময়ই খুবই আগ্রহী ছিলাম। সেই সাথে ইচ্ছা ছিল তাদের সাধারণ মানুষের মাঝে গিয়ে তাদের ইচ্ছা ও প্রবণতা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা লাভ ও কৌতুহল নিবারণ করবো। এ কারণেই হয়তো স্বর্গীয় বিধি আপনার জ্ঞান মহাসাগরের তীরভূমি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছে যাতে আমার এ তৃষ্ণার্ত ওষ্ঠ আপনার জ্ঞানের সুপেয় পানি পানে সিক্ত হয়। মহান আল্লাহ্ আপনার জ্ঞানের সুপেয়তায় আমার ব্যাধির উপশম করেছেন এবং আমার তৃষ্ণা নিবারিত হয়েছে। আপনার প্রপিতা জ্ঞানের শহর মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এবং তাঁর দ্বারা আপনার পিতা আলী মুর্তাযার নামের শপথ করে বলতে পারি তৃষ্ণা নিবারিত করার এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন স্বর্গীয় ঝরনার সন্ধান এ পর্যন্ত আমি পাই নি।

আমি শিয়াদের সম্পর্কে যা শুনেছিলাম তা হলো আপনারা (শিয়ারা) স্বীয় সুন্নী ভ্রাতৃবৃন্দ হতে দূরে থাকেন, একাকী থাকতে পছন্দ করেন, ঘরের কোণে আ য় গ্রহণ করেন ইত্যাদি। কিন্তু আমি আপনাকে সুন্দর আচরণের মানুষ, সেই সাথে আলোচনায় অত্যন্ত আগ্রহী, সংলাপে দক্ষ ও যথার্থ, বিতর্কে পারদর্শী, বক্তব্যে সূক্ষ্মদর্শী ও সহিষ্ণু, বাকযু ভদ্র ও মার্জিত, ওঠাবসায়

কৃতজ্ঞতার ছাপ এবং আত্মমর্যাদাবোধে সৎ হিসেবে পেয়েছি। সুতরাং যে ব্যক্তি শিয়া মাজহাবকে গ্রহণ করেছে সে বন্ধুসুলভ এবং তার সঙ্গে বসার আকাঙ্ক্ষা সকল সাহিত্যিকেরই আছে।

২। আমি এখন আপনার জ্ঞানের অসীম দরিয়ার তীরে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাচ্ছি এর স্রোতে অবগাহন করতে এবং এর গভীরে প্রবেশ করে মণিমুক্তা আহরণ করতে। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে যে সমস্যা ও অস্পষ্টতা দীর্ঘকাল আমার হৃদয়কে তোলপাড় করছে তা আপনার সমীপে পেশ করবো। আমি আপনার আলোচনার ভুল- ত্রুটি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করবো না, কারো ত্রুটি অন্বেষণ বা সমালোচনাও আমার লক্ষ্য নয়, এগুলোর মাধ্যমে মানুষের মাঝে গুজব ছড়ানোও আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং আমি হারানো বস্তু ও সত্যের সন্ধানে রত। যদি সত্য প্রকাশিত হয় তবে অবশ্যই তার অনুসরণ করতে হবে নতুবা কবির ভাষায় বলতে হয়- ‘আমার যা রয়েছে তাতে আমি সন্তুষ্ট আর তোমার যা রয়েছে তাতে তুমি’। যদি অনুমতি দেন তাহলে দু’টি শিরোনামে আমাদের আলোচনা চলবে :

১। ইমামত : মাজহাবের মূল ও শাখাগত পর্যায়ে (অর্থাৎ দীনি বিষয়ে) কার প্রতি রুজু করবো।

২। মুসলমানদের সার্বিক নেতৃত্ব অর্থাৎ রাসূল (সা.)- এর খেলাফত। আমি আমার পত্রের শেষে স্বাক্ষরের পরিবর্তে ‘স’ ব্যবহার করছি। আপনাকেও ‘শ’ ব্যবহারের জন্য আহবান জানাচ্ছি। পত্রের যে কোন ত্রুটির জন্য আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

ওয়াসসালাম

স

দ্বিতীয় পত্র

৬ জিলক্বদ ১৩২৯ হিঃ

১। সালাম ও অভিনন্দনের উত্তর।

২। আলোচনা শুরু করার অনুমতি প্রদান!

১। শাইখুল ইসলাম সালিমের ওপর সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

আপনার ভালবাসাপূর্ণ পত্রটি আমার হাতে পৌঁছেছে। আপনি যেভাবে আপনার স্বভাবগত কোমলতা ও বিশেষ দৃষ্টিতে আমাকে রেখেছেন এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনে আমার বাচনশক্তি অক্ষম অর্থাৎ দীর্ঘসময়েও এর সঠিক ও উপযোগী হক্ব আদায় করা সম্ভব নয়।

আপনি আপনার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাগুলোকে আমার নিকট উপস্থাপন করেছেন অথচ আপনি স্বয়ং আশাবাদীদের কেন্দ্র ও আ য় প্রার্থনাকারীদের মুক্তিদাতা।

আমি সিরিয়া থেকে আকাঙ্ক্ষার বাহনে আরোহণ করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আপনার দ্বারে উপনীত হয়েছি যাতে আপনার জ্ঞান থেকে কিছু আহরণ করতে পারি। আপনার গুণের বারিধারা থেকে কিছু অর্জন করে খুব শীঘ্রই আল্লাহর ইচ্ছায় প্রাণবন্ত আশা ও অবিচলিত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ফিরে যাব।

২। আপনি আমার নিকট আলোচনার জন্য অনুমতি চেয়েছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদেশ- নিষেধ তো আপনার পক্ষ থেকেই। আমি পূর্বেই আপনাকে গ্রহণ করেছি। আপনার যা ইচ্ছা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, যা ইচ্ছা বলতে পারেন। ন্যায়, ে ষ্ঠত্ব ও সঠিকতা (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) যাচাইয়ের দায়িত্ব আপনার।

ওয়া আলাইকাসসালাম

শ

তৃতীয় পত্র

৭ জিলক্বদ ১৩২৯ হিঃ

১। কেন শিয়ারা অধিকাংশ মুসলমানের মতাদর্শের অনুসরণ করে না?

২। অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অধিক।

৩। পরস্পর বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণের একমাত্র পথ হলো অধিকাংশের মতাদর্শকে গ্রহণ।

১। আমার প্রথম প্রশ্ন হলো কেন আপনারা অধিকাংশ মুসলমানের মতাদর্শের অনুসরণ করেন না? অধিকাংশ মুসলমানের মতাদর্শ বলতে আমি আকীদার ক্ষেত্রে আশা'আরী মতবাদ (১*) ও ফিকাহর ক্ষেত্রে চার মাজহাবকে (২*) বুঝিয়েছি। কারণ পূর্ববর্তী সত্যপন্থীরা এ বিশ্বাসের অনুবর্তী ছিলেন এবং এই মাজহাবগুলোকে ন্যায়পন্থী ও ে ষ্ঠতর মনে করতেন। সকল যুগের সকল আলেম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, এ মাজহাবগুলোর প্রধানগণ ন্যায়পরায়ণতা, ইজতিহাদ, আমানতদারী, তাকওয়া, পরহেজগারী, আত্মিক পবিত্রতা, সুন্দর চরিত্র ও মর্যাদার ক্ষেত্রে অনন্য ছিলেন, তাই জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে এদের অনুসরণ করা উচিত।

২। আপনি ভালভাবেই জানেন, বর্তমানে সমঝোতা ও ঐক্যের কতটা প্রয়োজন। মুসলিম সমাজে ঐক্য ও শৃঙ্খলার জন্য আপনাদের অধিকাংশ মুসলমান জনগোষ্ঠীর মতের অনুসরণ অপরিহার্য। বর্তমানে আমরা যে অবস্থায় রয়েছি তাতে লক্ষ্য করছি দীনের শত্রুরা আমাদের বিরু অন্যদের মনে ঘৃণা ও প্রতিশোধ স্পৃহা সৃষ্টি করছে এবং আমাদের ধ্বংস করার সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করছে। তারা এজন্য সকল নক্সা ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করে রেখেছে এবং চিন্তা ও অন্তঃকরণকে যে কোন রকম অসচেতনতা থেকে দূরে রেখেছে। অথচ আমরা মুসলমানরা পূর্বের মতই অসচেতন হয়ে আছি। আমরা যেন অজ্ঞতা ও অশিক্ষার সমুদ্রে বাঁচার জন্য হাত- পা ছুঁড়ছি। এ বিষয়গুলো আমাদের শত্রুদের সহায়তা করছে। এ অবস্থা আমাদের জাতিগুলোকে দ্বিধাবিভক্ত করছে, বিভিন্ন

দল ও গ্রুপের সৃষ্টি করছে, দলীয় সংকীর্ণতা ও অন্ধবিশ্বাস ঐক্যকে বিনষ্ট করছে, দলগুলো একে অপরকে বিচ্যুত ও বিপথগামী মনে করছে এবং একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এখন নেকড়েরা আমাদের শিকার করছে আর কুকুরেরা আমাদের দিকে লোভের জিহ্বা প্রসারিত করছে।

৩। আমি যা বলেছি আপনি পরিস্থিতিকে এর চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু মনে করেছেন কি? মহান আল্লাহ্ আপনাকে ঐক্য ও সমঝোতার পথে হেদায়েত দান করুন। সুতরাং বলুন এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন আপনার কথা মনোযোগসহ শোনা হবে। আপনার নির্দেশ মত চলার জন্য আমাকে নির্দেশ দান করুন।

ওয়াসসালাম

স

চতুর্থ পত্র

৮ জিলক্বদ ১৩২৯ হিঃ

১। শরীয়তি দলিল- প্রমাণ আহলে বাইতের মতাদর্শের অনুসরণকে ওয়াজিব ও অপরিহার্য মনে করে।

২। অধিকাংশের মতাদর্শকে (আহলে সুন্নাতের) অনুসরণের পক্ষে কোন দলিল নেই।

৩। প্রথম তিন শতাব্দীতে মুসলমানরা সুন্নী মাজহাবকে (চার ইমামের মাজহাব) চিনতেন না।

৪। সকল যুগেই ইজতিহাদ সম্ভব।

৫। বিভেদ দূরীকরণ আহলে বাইতের মতাদর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমেই সম্ভব।

১। দীনের মৌল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অ- আশা'আরী এবং ফিকাহর ক্ষেত্রে চার মাজহাবের বাইরের একটি মতাদর্শকে গ্রহণ কোন দলবাজী, অন্ধবিশ্বাস বা দলীয় সংকীর্ণতার কারণে নয়। চার মাজহাবের ইমামগণের ইজতিহাদের বিষয়ে সন্দেহ বা তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারী, জ্ঞানগত যোগ্যতা ও আত্মিক পবিত্রতার প্রতি অবিশ্বাসের কারণেও ভিন্ন মতাদর্শ শিয়ারা গ্রহণ করে নি, বরং শরীয়তসম্মত দলিল- প্রমাণই নবী (সা.)- এর আহলে বাইতের অনুসরণের প্রতি আমাদের অপরিহার্যতা দান করেছে। যেহেতু তাঁরা নবুওয়াতের ছায়ায় প্রশিক্ষিত হয়েছেন, তাঁদের ঘরে ফেরেশতাদের আসা যাওয়া ছিল, সেখানে আল্লাহ্ ওহী ও কোরআন অবতীর্ণ করেছেন তাই আমরা আকীদা- বিশ্বাস, ফিকাহ্ ও শরীয়তের আহকাম কোরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান, চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে তাঁদের অনুবর্তী হয়েছি।

এটি কেবল যুক্তি প্রমাণের প্রতি আত্মসমর্পণের কারণে। আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহর প্রতি বিশ্বাসের কারণেই এ পথকে আমরা বেছে নিয়েছি। যদি যুক্তি আমাদের নবীর আহলে বাইতের বিরোধিতার অনুমতি দিত অথবা অন্য মাজহাবের অনুসরণের মাধ্যমে নৈকট্য ও দায়িত্ব পালনের সুযোগ

থাকত তবে অধিকাংশ মুসলমানের অনুসরণ করতাম, তাদের পথে চলতাম তাতে করে বন্ধুত্বের বন্ধনও সুদৃঢ় হত এবং একে অপরকেও অধিকতর আস্থার সাথে গ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু অকাট্য যুক্তি ও দলিল মুমিনের এ পথে যাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তার ও এ চাওয়ার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে।

২। তদুপরি সুন্নী মাজহাব অন্য মাজহাবের ওপর ৎ ষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য কোন যুক্তি উপস্থাপনে সক্ষম নয়। সেখানে কিরূপে এর অনুসরণ অপরিহার্য হতে পারে। আমরা মুসলমানদের প্রদর্শিত যুক্তিসমূহে পূর্ণ ও যথার্থ দৃষ্টি দান করেছি এবং পর্যালোচনা ও গবেষণা চালিয়েছি কিন্তু আহলে সুন্নাহর অনুসরণের পক্ষে উপযুক্ত কোন দলিল পাই নি। আপনি তাঁদের অনুসরণের সপক্ষে যুক্তি হিসেবে যে বিষয়গুলো বলেছেন যেমন আমানতদারী, ন্যায়পরায়ণতা, ইজতিহাদের ক্ষমতা, মর্যাদা প্রভৃতি, আপনি ভালভাবেই জানেন এ বিষয়গুলি শুধু তাঁদের মধ্যেই ছিল না, অন্যরাও এর অধিকারী ছিলেন। সুতরাং শুধু তাঁদের মাজহাবের অনুসরণ কিরূপে ওয়াজিব বলে গণ্য হবে।

আমি কখনোই এ ধারণা করি না যে, কেউ বলবে জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিবর্গ আমাদের ইমামগণ থেকেও উত্তম অর্থাৎ নবী (সা.)- এর পবিত্র বংশধর যাঁরা উম্মতের মুক্তির তরণী, ক্ষমার দ্বার(৩*), ধর্মীয় বিভক্তির ফেতনা হতে রক্ষার কেন্দ্র, হেদায়েতের পতাকাবাহী, রাসূলের রেখে যাওয়া সম্পদ এবং ইসলামী উম্মতের মাঝে রাসূলের স্মৃতিচিহ্ন তাঁরা অবশ্যই সর্বোত্তম। কারণ তাঁদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, “তাদের থেকে তোমরা অগ্রগামী হয়ো না তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে, তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হবার ক্ষেত্রে অবজ্ঞার পথ বেছে নিও না তাহলেও তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে, তাদেরকে কোন কিছু শিক্ষা দিতে যেও না কারণ তারা তোমাদের হতে অধিক জ্ঞানী।”

কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কারণে অন্যরা তাঁদের অগ্রগামী হয়েছে। আপনি কি জানেন ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাজনীতির কি প্রয়োজন ছিল ও পরবর্তীতে তা কি হয়েছে? আপনার

থেকে এ কথাটি শোনা আশ্চর্যজনক, আপনি বলেছেন, "পূর্ববর্তী সৎ কর্মশীলগণ এসব মাজহাবের অনুসারী ছিলেন আর এসব মাজহাবকে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে ন্যায়ভিত্তিক বলে বিবেচনা করার কারণেই সকল যুগে সর্বজনীনভাবে এগুলোর অনুসরণে আমল করা হত।" সম্ভবত আপনি এ বিষয়ে অবহিত নন যে, পূর্ববর্তী সৎ কর্মশীলগণ ও পরবর্তীতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাসূলের বংশধরদের অনুসারীগণ প্রকৃতপক্ষে মুসলিম উম্মাহর অর্ধেক ছিলেন এবং আহলে বাইতের ইমামগণ ও রাসূলুল্লাহর রেখে যাওয়া দ্বিতীয় ثقل বা ভারী বস্তুর প্রতি ঈমান রাখতেন। এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি দেখা যায় নি এবং তাঁরা হযরত আলী (আ.) ও ফাতিমা (আ.)- এর সময়কাল হতে এখন পর্যন্ত এ প্রথানুযায়ী আমল করেছেন। সে সময়ে আশা'আরী, চার মাজহাবের ইমামগণ বা তাঁদের পিতৃকূলেরও কেউ ছিলেন না। এ বিষয়টি আপনার অজানা নয়।

৩। তদুপরি প্রথম তিন শতাব্দীতে মুসলমানগণ এ মাজহাবগুলোর কোনটিরই অনুসারী ছিলেন না। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর মুসলমানদের অবস্থান কোথায় আর এ মাজহাবগুলোরই বা অবস্থান কোথায়? অথচ সে সময়কাল ইসলামের জন্য আপনার ভাষায় ৫ ষ্ঠ সময় ছিল। আপনি লক্ষ্য করুন, আশা'আরী ২৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও ৩৩৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল ১৩৪ হিজরীতে জন্ম ও ২৪১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। শাফেয়ী ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ ও ২০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মালিক ৯৫ হিজরীতে জন্ম ও ১৭৯ হিজরীতে ওফাত প্রাপ্ত হন। আবু হানীফা ৮০ হিজরীতে জন্ম ও ১৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু শিয়ারা ইসলামের প্রাথমিক যুগ হতে নবী (সা.)- এর আহলে বাইতের প্রতি অনুগত ছিলেন কারণ আহলে বাইত নবুওয়াতের গৃহের বিষয়ে অধিকতর অবহিত ছিলেন অথচ অন্যরা তখন সাহাবী ও তাবেয়ীদের অনুসরণ করতেন।(৪*)

সুতরাং কোন্ যুক্তিতে সকল মুসলমানকে তিন শতাব্দী পর(৫*) যেসব মাজহাবের উৎপত্তি হয়েছে সেগুলোর প্রতি আনুগত্যের শপথ দেয়া হয় অথচ প্রথম তিন শতাব্দীর অনুসৃত পথের কথা বলা

হয় না? কি কারণে তাঁরা মহান আল্লাহর গ্রন্থ কোরআনের সমকক্ষ অপর ভারী বস্তু মহানবীর রক্তজ বংশধর, তাঁর জ্ঞানের দ্বার, মুক্তি- তরণী, পথ- প্রদর্শক, উম্মতের রক্ষা পাবার পথ হতে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন?

৪। কেন ইজতিহাদের যে পথটি তিন শতাব্দী ধরে মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত ছিল হঠাৎ করে তা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হলো? এটি অক্ষমতার আ য় গ্রহণ, আস্থা হতে অনাস্থা ও অলসতার দিকে প্রত্যাবর্তন বৈ কিছু নয়। এটি কি অজ্ঞতায় সন্তুষ্টি ও বঞ্চনায় তুষ্টতার নামান্তর নয়?

কোন্ ব্যক্তি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজেকে এ বাস্তবতার প্রতি সন্তুষ্ট মনে করতে পারে এবং বলতে পারে?

মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত নবী ও রাসূলদের সর্বশেষ এবং সর্ব ষ্ঠ ব্যক্তিকে সর্বোত্তম গ্রন্থ যা চূড়ান্ত জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আইনের সমষ্টি তা দিয়ে প্রেরণ করেছেন যাতে করে তাঁর দীন পূর্ণাঙ্গ ও নিয়ামত সম্পূর্ণ হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত সব কিছুর সমাধান তা থেকে পাওয়া যায়। অথচ তা চার মাজহাবের ইমামের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং তাঁরা সকল জ্ঞানকে সমবেত করবেন এমনরূপে যে অন্যদের অর্জন করার মত কিছু অবশিষ্ট থাকবে না যেন কোরআন, সুন্নাহ্ ও ইসলামের বিধি- বিধান এবং অন্যান্য দলিল- প্রমাণ কেবল তাঁদেরই মালিকানা ও সত্তায় দেয়া হয়েছে অন্যরা এ সকল বিষয়ে মত প্রকাশের কোন অধিকার রাখেন না। তবে কি তাঁরাই নবীগণের উত্তরাধিকারী ছিলেন? কিংবা এমন যে মহান আল্লাহ্ তাঁর নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্বের সিলসিলা তাঁদের মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন, এমন কি ভূত ও ভবি তের জ্ঞানও তাঁদের দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের এমন কিছু দেয়া হয়েছে যা বিশ্বজগতের কাউকে দেয়া হয় নি। কখনোই নয়, বরং তাঁরাও অন্য জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মত ইসলামের খেদমতকারী ও ইসলামের প্রতি আহবানকারী ছিলেন এবং দীনের আহবানকারীগণ জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বারকে কখনো বন্ধ করেন না, তার পথকেও কখনো রু করেন না। তাঁদেরকে কখনো এজন্য সৃষ্টি করা হয় নি যে, বু ও চিন্তাশক্তিকে অবরু করবেন বা মানব জাতির চক্ষুকে বেঁধে রাখবেন। তাঁরা মানুষের হৃদয়কে

তালাব , কর্ণকে বধীর, চক্ষুকে পর্দাবৃত ও মুখকে তালাব   করতে আসেন নি। তাঁরা হাত, পা বা গর্দানেও কখনো শেকল পরাতে চান না। মিথ্যাবাদী ছাড়া কেউই তাঁদের প্রতি এরূপ অপবাদ আরোপ করতে পারে না। তাঁদের নিজেদের কথাই এর সর্বোত্তম প্রমাণ।(৬*)

৫। এখন আমি মুসলমানদের মুক্তি ও ঐক্যের প্রসঙ্গে আসছি। আমার দৃষ্টিতে মুসলমানদের ঐক্যের বিষয়টি সুন্নী হয়ে যাওয়া বা সুন্নী সম্প্রদায়ের শিয়া হবার ওপর নির্ভরশীল নয়, এজন্যই শিয়াদের ওপরও যেমন কোন দায়িত্ব বর্তায় না যে, নিজের মাজহাব থেকে সরে আসবে যেহেতু এটি যুক্তিহীন তেমনি বাস্তবে এটি সম্ভবও নয় যা পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে মোটামুটি বোঝা যায়। তাই মুসলমানদের ঐক্য যেখানে সম্ভব তা হলো আপনারা আহলে বাইতের পথকে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মাজহাব বলে স্বীকৃতি দান করুন এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত মাজহাবগুলো একে অপরকে যে দৃষ্টিতে দেখে ত প আহলে বাইতের অনুসারী মাজহাবকেও দেখুন। যে কোন মুসলমানই যেরূপ স্বাধীনভাবে হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বলী মাজহাবের অনুসরণ করতে পারে সেরূপ যেন আহলে বাইতের মতানুসারেও আমল করতে পারে।

এ প তিতে মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ একাত্মতায় পরিণত হবে এবং এ ঐক্য সুশৃঙ্খল ও সংহতও হবে।

এটি আমাদের অজানা নয় যে, চার মাজহাবের মধ্যে বিদ্যমান অনৈক্য শিয়া ও সুন্নীর মধ্যকার বিদ্যমান অনৈক্য হতে কম নয়। এই মাজহাবগুলোর (ধর্মীয় মৌল ও শাখাগত বিষয়ে) প্রকাশিত হাজারো গ্রন্থ এর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে রয়েছে। সুতরাং কেন আপনাদের মধ্যের অনেকেই এ গুজব ছড়ান শিয়ারা আহলে সুন্নাহর বিরোধী কিন্তু এ কথা বলেন না আহলে সুন্নাহ্ শিয়া বিরোধী? কেন তাঁরা বলেন না আহলে সুন্নাতের এক দল অন্যদলের বিরোধী? যদি চারটি মাজহাব থাকা জায়েয হয় তবে কেন পঞ্চম মাজহাব জায়েয হবে না? যদি চার মাজহাব ঐক্য ও সমঝোতার কারণ হয় কেন পাঁচ মাজহাবে পৌঁছলে তা বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার কারণ হবে? প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের প্রত্যেকের এক এক পথে গমন করা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবার কারণ নয় কি?

উত্তম হত আপনি যেমনভাবে আমাদের ঐক্যের দিকে ডাক দিচ্ছেন তেমনিভাবে চার মাজহাবের অনুসারীদেরও সেই দিকে ডাক দিতেন। আপনাদের জন্য চার মাজহাবের মধ্যে ঐক্য স্থাপন অধিকতর সহজ নয় কি? কেন ঐক্যের বিষয়টিতে আমাদের প্রতি বিশেষভাবে আহবান রাখছেন?

কেন আপনারা একজন লোকের আহলে বাইতের অনুসারী হওয়াকে ইসলামী সমাজের ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী মনে করছেন, অথচ দৃষ্টিভঙ্গি, পথ ও চাওয়া- পাওয়ার হাজারো পার্থক্য সত্ত্বেও তাকে চার মাজহাবের ঐক্যের জন্য অন্তরায় মনে করছেন না। নবীর বংশধরগণের প্রতি আপনার ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্কের যে পূর্ব পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে আমি এরূপ আশা করি নি।

ওয়াসসালাম

শ

পঞ্চম পত্র

৯ জিলক্বদ ১৩২৯ হিঃ

১। আমাদের বক্তব্যসমূহের সত্যায়ন।

২। বিস্তারিত দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করার আহবান।

১। আপনার মূল্যবান পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। আপনার চিঠিটি বেশ বিস্তারিত, আলোচনার অধ্যায়গুলি পূর্ণাঙ্গ, বোধগম্য এবং লেখাও প্রা ল। উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ শক্তিশালী ও দৃঢ় এবং বর্ণনায় অধিকাংশের অনুসৃত মাজহাব অনুসরণের (মৌল ও অমৌল বিষয়ে) অপ্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সুন্দরভাবে এসেছে, কোন বিষয়ই বাদ রাখেন নি, ইজতিহাদের পথকে উন্মুক্ত রাখার যুক্তিটি অন্যান্য দলিল- প্রমাণের মতই শক্তিশালী ছিল।

সুতরাং চার মাজহাবের অনুসরণ করা বা অপরিহার্য না হওয়া এবং ইজতিহাদের পথ উন্মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে আপনার লিখিত যুক্তি খুবই মজবুত ও সঠিক এবং তা আমার বোধগম্য হয়েছে। যদিও আমরা সরাসরি এ বিষয়টির উল্লেখ করি নি তদুপরি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণীয়।

২। কিন্তু আমি আপনার নিকট আহলে সুন্নাহ্ হতে আপনাদের বিচ্ছিন্নতার কারণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম ও এজন্য প্রয়োজনীয় শরীয়তসম্মত দলিল- প্রমাণ চেয়েছিলাম। আপনি বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করবেন সে আহবান রইলো।

অতএব, কোরআন ও সুন্নাহ্ থেকে অখণ্ডনীয় কোন যুক্তি বা দলিল যা আপনার ভাষায় শিয়া মাজহাব ত্যাগ করে অন্য মাজহাব গ্রহণের পথকে মুমিনের জন্য বন্ধ করে দেয় এবং তার ও তার চাওয়া- পাওয়ার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা বিস্তারিত আলোচনা করুন।

ধন্যবাদ ও সালাম

স

ষষ্ঠ পত্র

১২ জিলক্বদ ১৩২৯ হিঃ

১। আহলে বাইতের অনুসরণ ফরয হবার সপক্ষে কিছু প্রমাণ!

২। হযরত আলী (আ.) মানুষকে আহলে বাইতের অনুসরণ করার জন্য আহবান জানিয়েছেন!

৩। ইমাম যয়নুল আবেদীন (আ.)- এর এ সম্পর্কিত কিছু কথা!

মহান আল্লাহর প্রশংসা এজন্য যে, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা ইশারা থেকেই অনেক কিছু পরিষ্কার বুঝতে পারেন, তাই কোন ব্যাখ্যা ছাড়া শুধু ইশারা প্রদান করেছি। আল্লাহ্ না করুন আপনার অন্তরে (আহলে বাইতের) ইমামগণের সম্পর্কে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে থাকে যা অন্যদের ওপর তাঁদের প্রাধান্য দানের পথে বাধার সৃষ্টি করছে। অথচ এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, তাঁরা অন্যদের থেকে উচ্চ পর্যায়ের এবং একক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিলেন। কারণ পূর্ববর্তী নবীগণের জ্ঞান তাঁরা রাসূল (সা.)- এর মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন এবং দীন ও দুনিয়ার বিধি-বিধান ও আহকামসমূহ তাঁর থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন।

১। এ কারণেই রাসূল (সা.) আল্লাহর মহান গ্রন্থের পাশাপাশি তাঁদের স্থান দিয়েছেন এবং জ্ঞানবানদের পথপ্রদর্শক বলে তাঁদের পরিচিত করিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নিফাক ও দ্বিমুখিতার সময় তাঁদেরকে মুক্তির তরণী হিসেবে এবং বিভেদ- বিচ্ছিন্নতার প্রতিকূল বায়ুপ্রবাহে নিরাপদ আ য় বলেছেন। আরো বলেছেন তাঁরা ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা প্রাপ্তির পথ এবং এমন এক শক্তিশালী রজ্জু যা ছিন্ন হবার নয়।

২। আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বলেছেন, “তোমরা কোথায় চলেছো, কোনদিকে যাত্রা করছ অথচ সত্যের ধ্বজা উত্তোলিত হয়েছে, তার চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হয়েছে, হেদায়েতের আলো প্র লিত হয়েছে, এমতাবস্থায় অজ্ঞতার সাথে কোনদিকে যাত্রা করছ? কিরূপে ভ্রান্তিতে ঘুরপাক

খাচ্ছ? অথচ নবীর আহলে বাইত তোমাদের সাথে রয়েছে, যারা সত্যের লাগাম, ধর্মের ধ্বজাধারী এবং সত্যের মুখপাত্র, তাই তাদের সেখানে স্থান দাও যেখানে কোরআনকে সংরক্ষণ কর (অর্থাৎ তোমাদের হৃদয় ও অন্তঃকরণ) ও তৃষ্ণার্তগণ যেরূপ পিপাসা নিবারণের জন্য উদগ্রীব তেমনি তাদের জ্ঞানের সুপেয় ঝরনার পানি পানে তৃষ্ণা নিবারণের উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি ধাবমান হও।

হে লোকসকল! রাসূল (সা.) থেকে এ সত্যকে শিক্ষালাভ কর। তিনি বলেছেন : আমাদের মধ্য হতে কেউ মৃত্যুবরণ করলে প্রকৃতই সে মৃত্যুবরণ করে না এবং আমাদের কেউই পুরাতন ও পশ্চাৎপদ হতে পারে না, সুতরাং যা জানো না তা বলো না। অসংখ্য সত্য সেখানেই লুকিয়ে রয়েছে যাকে তোমরা অস্বীকার কর। ঐ ব্যক্তি যার বিপক্ষে তোমাদের নিকট কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আমি তাদেরই (আহলে বাইতের) অন্তর্ভুক্ত। আমি কি তোমাদের মাঝে কোরআন (প্রথম ভারী বস্তু) অনুযায়ী আমল করি নি এবং আমার আহলে বাইতকে (দ্বিতীয় ভারী বস্তু) তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি না? আমি কি ঈমানের ধ্বজাকে তোমাদের মাঝে উ ীন করি নি?"[১] (৭*)

অন্যত্র তিনি বলেছেন, "তোমাদের দৃষ্টি তোমাদের নবীর আহলে বাইতের প্রতি নিব করো। তারা যেদিকে যায় সেদিকে যাও, তাদের পদানুসরণ করো। তারা তোমাদের সত্য ও হেদায়েতের পথ হতে কখনো পথভ্রষ্ট করবে না এবং অধঃপতনের দিকে পরিচালিত করবে না। যদি তারা নীরবতা পালন করে তোমরাও নীরবতা পালন করবে, যখন সংগ্রামে লিপ্ত হয় সংগ্রামে লিপ্ত হবে, তাদের থেকে অগ্রগামী হয়ো না, তাহলে পথভ্রষ্ট হবে। তাদের থেকে পিছিয়ে পড়ো না, তাহলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"[২]

অন্য এক স্থানে মানুষকে আহলে বাইতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, "তারা জ্ঞানের প্রাণ ও অজ্ঞতার মৃত্যুদাতা, তাদের সহনশীলতা তোমাকে তাদের জ্ঞান সম্পর্কে, তাদের বাহ্যিক ব্যবহার ও আচরণ তোমাকে তাদের অন্তরের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে এবং নীরবতা তোমাকে তাদের যুক্তির গভীরতা সম্পর্কে অবহিত করবে। তারা কখনোই সত্যের বিরোধিতা করে না এবং এ

বিষয়ে দ্বিধা- দ্বে পতিত হয় না, তারা ইসলামের ভিত্তি এবং নিরাপত্তাদাতা, তাদের মাধ্যমেই সত্য তার প্রকৃত স্থানে সমাসীন হয় এবং বাতিল স্থানচ্যুত ও তার জিহ্বা কর্তিত হয়। তারা আল্লাহর আইন ও বিধি- বিধান সঠিকভাবে অনুসরণ করেছে ও তার ওপর আমল করেছে। ধর্মের বর্ণনা ও প্রচারকারী কত অধিক কিন্তু ধর্মকে সঠিক অনুধাবনকারীর সংখ্যা কত কম!”[৩]

অন্য একটি খুতবায় বলেছেন, “নবীর বংশধর সর্বোত্তম বংশধর, তাঁর পরিবারও সর্বোত্তম পরিবার, তাঁর আগমন সর্বোত্তম বংশ হতে, তাঁর জন্ম সেই বৃক্ষ হতে যা আল্লাহর ঘরে জন্মেছে এবং সম্মান ও মর্যাদার মধ্যে বৃ পেয়েছে। এ বৃক্ষের শাখা সমুচ্চ ও প্রসারিত এবং এর ফলও অগণিত।”[৪]

অন্যত্র বলেছেন, “আমরা নবী করিম (সা.)- এর জ্ঞানের ধারায় ইসলামী জ্ঞানের মানদণ্ড, গুপ্তভাণ্ডার ও দ্বার। দ্বার ব্যতীত ঘরে প্রবেশ অবৈধ। যে দ্বার ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করবে তাকে চোর বলা হয়।’ এ খুতবারই অন্য অংশে বলেছেন, “তাঁদের বিষয়ে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। তাঁরা আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত জ্ঞানভাণ্ডার। তাই যখন তাঁরা কথা বলেন সত্য বলেন। যখন নীরবতা পালন করেন কেউ তাঁদের অগ্রগামী হতে পারে না। দীনের অগ্রদূত ও ধ্বজাধারীরা কখনোই তাঁদের অনুসারীদের মিথ্যা বলতে পারে না, বরং অন্যদের বিবেক ও মন-মানসিকতাকে দীনের জন্য উপযোগী করে তোলাই তাঁদের দায়িত্ব।”[৫]

আবার বলেছেন, “তোমরা কখনোই সত্য ও হেদায়েতের পথকে চিনতে পারবে না যতক্ষণ না এ পথ পরিত্যাগকারীদের চিনবে এবং কোরআনের যুক্তি ও মানদণ্ডকে কখনোই অনুধাবনে সক্ষম হবে না যতক্ষণ না এর বিরোধী ও লঙ্ঘনকারীদের চিনবে, কোরআনের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত সংযুক্ত হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ ব্যক্তিবর্গকে চিনবে যারা কোরআনকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে। সুতরাং কোরআনকে এর প্রকৃত ব্যাখ্যাকারীদের থেকে গ্রহণ কর (কারণ এ সকল বিচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে তাঁরাই সঠিকভাবে চিনেন) যাঁরা জ্ঞানের প্রাণ ও অজ্ঞতার মৃত্যুদানকারী। তাঁরা এমন ব্যক্তিবর্গ (আহলে বাইত) যাঁদের বিচার ও ফয়সালা তোমাদেরকে তাঁদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত করবে, তাঁদের নীরবতা তোমাদেরকে তাঁদের যুক্তির ক্ষুরধারতা সম্পর্কে এবং তাঁদের

বাহ্যিক আচরণ তোমাদের তাঁদের অন্তরের বিশু তা সম্পর্কে জানাবে। তাঁরা দীনের বিরোধিতা করতে পারেন না এবং এ বিষয়ে দ্বিধা- দ্বে ও পতিত হন না। কোরআন তাঁদের নিকট প্রত্যক্ষ সাক্ষীরূপে নীরব বর্ণনাকারী।"[৬]

এ খুতবাগুলো ছাড়াও অন্যান্য যেসকল বক্তব্য এ মহান ব্যক্তি হতে এসেছে তা আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করে। এরকম একটি বক্তব্য, "আমাদের মাধ্যমেই তোমরা অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার হতে মুক্তি পেয়েছ, আমাদের সাহায্যেই তোমরা উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছ, তোমাদের সৌভাগ্যের সকাল আমাদের আলোকরি তে উ াসিত হয়েছে।"[৭]

অন্যত্র বলেছেন, "হে লোকসকল! সত্যপথের আহবানকারী ও সদুপদেশদাতা যিনি সৎ কর্মশীল অর্থাৎ কর্মের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর অস্তিত্বের প্রদীপরূপ আলোর মাধ্যমে নিজেদের আলোকিত করো, সেই পরিচ্ছন্ন ও সুপেয় ঝরণা যার মধ্যে কোন দূষণ ও আবর্জনার অস্তিত্ব নেই তা থেকে পানি গ্রহণ কর।"[৮]

অন্য একস্থানে নিজেদের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন, "আমরা নবুওয়াতের বৃক্ষ, রেসালতের ভিত্তি, ফেরেশতাদের গমনাগমনের স্থান, জ্ঞানের খনি ও প্রজ্ঞার উৎসস্থল। আমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারীরা রহমতের প্রতীক্ষায় রয়েছে, আর আমাদের শত্রু ও বিদ্বেষীরা আল্লাহর শাস্তি ও গজবের অপেক্ষায়।"[৯]

আবার বলেছেন, "আমরা ভিন্ন তারা কোথায় যারা নিজেদেরকে মিথ্যা ও অন্যায়ভাবে জ্ঞানের প্রতিভূ ভেবেছিল? তারা লক্ষ্য করুক, মহান আল্লাহ্ আমাদের কিরূপ উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন ও তাদের বঞ্চিত করেছেন। আমাদের দিয়েছেন ও তাদের বঞ্চিত করেছেন। আমাদের তাঁর রহমতের ছায়ায় আ য় দিয়েছেন ও তাদের বহিষ্কার করেছেন। আমাদের মাধ্যমেই মানুষ হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে ও অন্ধকার হৃদয়ের অধিকারীরা আলোকিত হবে। ইমাম ও নেতা কুরাইশ হতে এবং তাদের অস্তিত্বের এ পবিত্র বৃক্ষের উৎপত্তি বনু হাশিম থেকে। তাই অন্যরা ইমামতের যোগ্য নয় এবং তারা ব্যতীত অন্যরা নেতৃত্ব লাভ করতে পারে না।" যারা ইমামগণের বিরোধী তাদের সম্পর্কে একই খুতবায় বলেছেন, "তারা এ পৃথিবীর জীবনকে গ্রহণ করেছে ও পরকালীন

অনন্ত জীবনকে অগ্রাহ্য করেছে। তারা সুপেয় পানি ত্যাগ করে নিকৃষ্ট ও দুর্গন্ধযুক্ত পানি পান করেছে।”[১০]

অন্য খুতবাতে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেমন বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর আহলে বাইতকে সত্য ও সঠিকভাবে চিনেছে সে শহীদ হয়েছে এবং তার বিনিময় আল্লাহর নিকট এবং ঐ কর্মেরও তারা পুরস্কার পাবে যে কর্মের সি ান্ত তারা গ্রহণ করেছিল। সৎ কর্ম করার অভিপ্রায় ও ইচ্ছা, মহানবীর আহলে বাইতের পক্ষে অস্ত্রধারণ সংগ্রাম ও জিহাদের সমান ও সমকক্ষ বলে গণ্য হবে।”[১১]

উপরোক্ত খুতবার মত অন্যত্র বলেছেন, “আমরা পবিত্র, সম্মানিত ও আদর্শ মানব। আমাদের প্রতীক ও চিহ্ন নবী-রাসূলগণেরই প্রতীকচিহ্ন, আমাদের দল আল্লাহরই দল, আমাদের বিরু াচারণকারীরা শয়তানের অনুসারী ও অনুচর। যারা আমাদের ও আমাদের শত্রুদেরকে সমান বলে জানে তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।”[১২]

ইমাম হাসান যিনি রাসূলের দৌহিত্র ও বেহেশতের যুবকদের নেতা তিনি এক খুতবায় বলেছেন, “আমাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর, আমরা তোমাদের ইমাম ও নেতা।”[১৩]

৩। ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন আস-সাজ্জাদ (আ.) যখনই

(يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا الله و كونوا مع الصّادقين)

‘হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যপন্থীদের সঙ্গে থাক’ এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন তখন তিনি অধিক দোয়া করতেন। তিনি এ দোয়ায় সত্যপন্থীদের স্তরে পৌঁছার ও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য প্রার্থনা করতেন। সে সাথে আহলে বাইতের শত্রুরা দীনের নেতৃবর্গ ও নবুওয়াতের বৃক্ষসমূহের ওপর যে অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছিল এবং যে সকল বিদআতের প্রচলন ঘটিয়েছিল সে বিষয়গুলো এ দোয়ায় উল্লেখ করে তা থেকে আল্লাহর নিকট মুক্তি চাইতেন। অতঃপর এর সঙ্গে নিম্নোক্ত কথাগুলো যোগ করেছেন, “অন্যরা আমাদের বিষয়ে কর্তব্যে অবহেলা করেছে আর এ অপকর্মের ব্যাখ্যা প্রমাণের জন্য কোরআনের রূপক (মুতাশাবিহ) আয়াতসমূহের ভিত্তিতে যুক্তি প্রদর্শন করেছে। তাদের নিজেদের মনগড়া মতে এ

আয়াতগুলোকে ব্যাখ্যা ও তাফসীর করেছে এবং আমাদের বিষয়ে নবী করীম (সা.)- এর প্রতিষ্ঠিত কথা ও হাদীসকে অস্বীকার করেছে। সুতরাং ভবি তের মুসলমানরা আমাদের ব্যতীত কার আ য় গ্রহণ করবে! এ জাতি পূর্বের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং এ উম্মত বিভক্তিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, একে অপরকে মিথ্যুক ও কাফের বলছে অথচ মহান আল্লাহ্ বলেছেন : তাদের মত হয়ো না যারা স্পষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ জানার পরও পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে পড়েছে।[১৪] অতএব, কার ওপর মানুষ বিশ্বাস করে আল্লাহর বাণীর সত্যতার প্রমাণ পেশ করবে, আল্লাহর বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করবে! এক্ষেত্রে কোরআনের সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হেদায়াতপ্রাপ্ত ইমামগণের সন্তানগণ যাঁরা উ   ল প্রদীপস্বরূপ তাঁরা ব্যতীত কাউকে তোমরা পাবে কি? কেননা মহান আল্লাহ্ তাঁদের মাধ্যমেই তাঁর বান্দাদের ওপর প্রমাণ উপস্থাপন করেন। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে অবশ্যই স্পষ্ট নিদর্শন প্রেরণ করেছেন। তোমরা কি তাঁদের পরিচয় জানো? এ স্পষ্ট নিদর্শন রেসালতের পবিত্র বৃক্ষ হতে উৎসারিত নবীর বংশধর যাঁদের মহান আল্লাহ্ সকল অপবিত্রতা ও কলুষতা হতে মুক্ত করেছেন ও পবিত্ররূপে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারে কি? যাঁদের মহান আল্লাহ্ অপবিত্রতা হতে সংরক্ষণ করেছেন এবং যাদের ভালবাসা ও বন্ধুত্বকে কোরআন ফরয ও অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছে। তাঁরা ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহর নিদর্শন হতে পারে না।”[১৫] ইমাম সাজ্জাদের এ বক্তব্যটি এবং আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর খুতবাগুলোর বিভিন্ন অংশ যথার্থভাবে লক্ষ্য করুন। খুব ভালভাবেই বুঝতে পারবেন শিয়া মাজহাবকে এ বাণীগুলো কিরূপ স্পষ্টভাবে আপনার নিকট উপস্থাপিত করে। এ বক্তব্যগুলোকে অন্যান্য ইমামদের বক্তব্যসমূহের নমুনা হিসেবে গ্রহণ করুন। কারণ এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে এবং জেনে রাখুন এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ বহুল বর্ণিত ও মুতাওয়াতির।

ওয়াসসালাম

শ

সপ্তম পত্র

১৩ জিলক্বদ ১৩২৯ হিঃ

১।	কোরআন ও রাসূল (সা.)- এর সুন্নাহ্ হতে প্রমাণ উপস্থাপনের আহবান।

২।	আহলে বাইতের বক্তব্যের মাধ্যমে এর সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনের প্রচেষ্টা অগ্রহণযোগ্য কারণ নিজেরাই নিজেদের পরিচিত করানো চক্রের সৃষ্টি করে।

১। আল্লাহর বাণী ও রাসূলের হাদীস থেকে আহলে বাইতের ইমামদের অনুসরণ অপরিহার্য হবার সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করুন। যেহেতু এক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও রাসূলের বাণী ব্যতীত আপনার কথা গ্রহণ করতে পারছি না তাই ক্ষমাপ্রার্থী।

২। আপনাদের ইমামগণের বক্তব্য তাঁদের বিরোধীদের জন্য কোন প্রমাণ হতে পারে না। কারণ তাঁদের কথার দ্বারাই তাঁদের ে ষ্ঠত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।(৮*)

ওয়াসসালাম

স

অষ্টম পত্র

১৫ জিলক্বদ ১৩২৯ হিঃ

১। যে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছি তা লক্ষ্য করা হয় নি।

২। কেউ নিজের পরিচয় দান করলে তা চক্রের সৃষ্টি করে এ ধারণা ভুল।

৩। হাদীসে সাকালাইন।

৪। হাদীসে সাকালাইন মুতাওয়াতির হবার পক্ষে দলিল।

৫। যে ব্যক্তি রাসূল (সা.)- এর আহলে বাইতের (عترت) সঙ্গে সংযুক্ত না হবে সে বিপথগামী হবে।

৬। আহলে বাইত নূহ (আ.)- এর তরণীস্বরূপ; ক্ষমার দ্বার এবং দীনী বিভেদ হতে মুক্তির উপায়।

৭। আহলে বাইত বলতে এখানে কাদের বোঝানো হয়েছে?

৮। কেন তাঁদেরকে নূহ (আ.)- এর তরণী ও ক্ষমার দ্বারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

১। আমরা মহানবী (সা.)- এর বাণীর মাধ্যমেই শুধু যুক্তি প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করি নি, বরং আমাদের পত্রের শুরুতে এরূপ একটি হাদীসের প্রতি ইশারা করেছি যা পরিষ্কাররূপে আহলে বাইতের ইমামগণের অনুসরণকে ফরয ঘোষণা করেছে, অন্যদের নয়। কেননা বলেছি রাসূল (সা.) তাঁদেরকে কোরআনের সমকক্ষ, জ্ঞানবানদের নেতা, মুক্তির তরণী, উম্মতের রক্ষাকেন্দ্র ও ক্ষমার দ্বার বলে ঘোষণা করেছেন। এগুলো রাসূল হতে বর্ণিত সহীহ ও স্পষ্ট হাদীসসমূহের সারসংক্ষেপ। বলেছিলাম, আপনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ইশারা ও ইঙ্গিতই যাঁদের বোঝার জন্য যথেষ্ট (কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই)।

২। সুতরাং আমরা যা বলেছি, এ হাদীসের ভিত্তিতে তাঁদের কথা আহলে বাইতের বিরোধীদের ওপর প্রমাণ হিসেবে অগ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণে তাঁদের উপস্থাপিত বাণী চক্র বলে গণ্য হবে না।

৩। এখন রাসূলের বাণীতে যে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল তার প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি অজ্ঞ ও অসচেতন ব্যক্তিবর্গকে উচ্চৈঃস্বরে আহবান করে বলেছেন,

يَا أَيّهَا النّاسُ إِنِّي تَرَكتُ فِيكُم مَا إِن أَخَذتُم بِهِ لَن تَضِلّوا, كِتَابَ اللهِ وَ عِترَتِي أهلَ بَيتِي

"হে লোকসকল! আমি তোমাদের মাঝে এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি যদি তা ধারণ কর তবে কখনোই বিপথগামী হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব এবং আমার রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় (আহলে বাইত)।"[১৬]

তিনি আরও বলেছেন,

إِنِّي تَرَكتُ فِيكُم مَا إِنْ تَمَسّكتُم بِهِ لَن تَضِلّوا بَعدِي كِتَابَ اللهِ حَبلٌ مَمْدُوْدٌ منَ السّمَاءِ إِلَى الأَرضِ وَ عِترَتِي أَهلَ بَيتِي وَ لَن يَفتَرِقَا حَتّى يَرِدَا عَلَيّ الحَوضَ فَانظُرُوا كَيفَ تُخَلّفُونِي فِيهِمَا

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস আমানত রেখে যাচ্ছি, যদি এ দু'টিকে আঁকড়ে ধর তাহলে কখনোই গোমরাহ হবে না। তার একটি হলো আল্লাহর কিতাব কোরআন যা আসমান হতে যমীন পর্যন্ত প্রসারিত রজ্জু ও অন্যটি আমার আহলে বাইত। এ দু'টি কখনোই পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হবে না এবং এ অবস্থায়ই হাউজে কউসারে আমার সাথে মিলিত হবে। তাই লক্ষ্য রেখো তাদের সাথে তোমরা কিরূপ আচরণ করবে।"[১৭]

অন্য এক স্থানে রাসূল (সা.) বলেছেন,

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি খলীফা বা প্রতিনিধি রেখে যাচ্ছি। আল্লাহর কিতাব যা আসমান হতে যমীন পর্যন্ত প্রসারিত এবং আমার নিকটাত্মীয় ও পরিবার। তারা হাউজে কাওসারে আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন হবে না।"[১৮]

তিনি আরও বলেছেন,

“তোমাদের মাঝে দু’টি ভারী বস্তু (মূল্যবান বস্তু) রেখে যাচ্ছি। আল্লাহর কিতাব ও আমার আহলে বাইত। তারা হাউজে কাওসারে আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।”[১৯](৯*)

রাসূল (সা.) অন্যত্র বলেছেন,

“খুব শীঘ্রই আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে আমাকে আহবান করা হবে এবং আমি তা গ্রহণ করবো। আমি তোমাদের মাঝে দু’টি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি : আল্লাহর কিতাব ও আমার আহলে বাইত। আল্লাহর কিতাব রজ্জুর মত আসমান হতে যমীন পর্যন্ত প্রসারিত।” তিনি আরো বলেছেন, “আমার ইতরাত অর্থাৎ নিকটাত্মীয় রক্তজ বংশধরগণই আমার আহলে বাইত। সর্বজ্ঞাত ও সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন, এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না ও এ অবস্থায়ই আমার সাথে হাউজে কাওসারে মিলিত হবে। আমি লক্ষ্য করব আমার পর তাদের সাথে তোমরা কিরূপ আচরণ কর।”[২০]

যখন রাসূল বিদায় হ হতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন ‘গাদীরে খুম’ নামক স্থানে অবতরণ করে নির্দেশ দিলেন বৃহৎ বৃক্ষসমূহের নীচে পরিষ্কার করে সেখানে সকলকে অবস্থান নিতে। অতঃপর তিনি বললেন,

“আমাকে আহবান করা হয়েছে ও আমি তা গ্রহণ করেছি। আমি তোমাদের মাঝে দু’টি মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি যার একটি অপরটি হতে বৃহৎ। কোরআন ও আমার নিকটাত্মীয় ও রক্তজ বংশধর (আহলে বাইত)। তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখো এবং মনে রেখো তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।” অতঃপর তিনি বললেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَولايَ وَ أنا مَولى كُلِّ مُؤْمِنٍ

“নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ আমার অভিভাবক এবং আমি সকল মুমিনের অভিভাবক।”

তারপর আলী (আ.)- এর হাত উঁচু করে ধরে বললেন,

مَن كُنتُ مَولاهُ فَهذَا وَلِيُّهُ,اَللّهُمَّ وَالِ مَن وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاه.

“আমি যার মাওলা বা অভিভাবক আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ্, তুমি তাকে ভালবাস যে আলীকে ভালবাসে এবং তার প্রতি শত্রুতা পোষণ কর যে আলীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে।”[২১]

আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব বলেছেন, “রাসূল (সা.) জুহফাতে আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দান করেন ও প্রশ্ন করেন : আমি কি তোমাদের ওপর তোমাদের অপেক্ষা অধিক অধিকার রাখি না? সবাই বলল : হ্যাঁ।

অতঃপর বললেন,

إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ اِثْنَيْنِ : اَلْقُرْآن وَ عِتْرَتِيْ

“আমি তোমাদেরকে অবশ্যই দু’টি বিষয়ে প্রশ্ন করবো। আর তা হলো কোরআন ও আমার আহলে বাইত।”[২২]

৪। নির্ভরযোগ্য সুন্নাহ্ দু’টি মূল্যবান বস্তুকে আঁকড়ে ধরাকে ফরয বলেছে যা মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। হাদীসটির বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা বিশ- এর অধিক এবং এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে একথাগুলো বিভিন্নভাবে বলেছেন।

যেমনটি লক্ষ্য করেছেন বিদায় হ   থেকে ফিরার পথে গাদীরে খুমে, ত প আরাফাতের ময়দানে, তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, আবার কখনো মদীনার মিম্বারে, এমন কি তাঁর শেষ অসুস্থতার সময়ও (যখন তাঁর কক্ষ সাহাবীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল) তিনি এ কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করেছেন।

“হে লোকসকল! অতি শীঘ্রই আমার আত্মা স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করবে এবং (আমি) এ পৃথিবী থেকে চলে যাব। আমি তোমাদের এরূপ একটি কথা বলব যার পর তোমাদের ওজর পেশ করার কোন সুযোগ থাকবে না। জেনে রাখ, আমি কোরআন ও আমার আহলে বাইতকে তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি।”

অতঃপর আলী (আ.)- এর হাত উঁচু করে ধরে বললেন,

هذَا عَلِيّ مَعَ الْقُرْآنِ وَ الْقرآنُ مَعَ عَلِيٍّ لا يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض

“এই আলী কোরআনের সঙ্গে এবং কোরআনও আলীর সঙ্গে। তারা হাউজে কাওসারে মিলিত হওয়া পর্যন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।”[২৩]

এ বিষয়টিকে আহলে সুন্নাহর অনেক বড় বড় আলেম স্বীকার করেছেন, এমন কি ইবনে হাজার ‘হাদীসে সাকালাইন’ বর্ণনা করার পর বলেছেন, “জেনে রাখুন, কোরআন ও আহলে বাইতকে আঁকড়ে ধরার হাদীসটি কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং বিশের অধিক সাহাবী তা বর্ণনা করেছেন।”

অতঃপর এর সঙ্গে এ কথাগুলো যোগ করেছেন, “১১ নম্বর সন্দেহের জবাবে এ হাদীসগুলোর কয়েকটি সনদের কথা আমরা বলেছি যার কোনটি রাসূল (সা.) বিদায় হজে আরাফাতের ময়দানে, কোনটি মদীনাতে অসুস্থতার সময় তাঁর গৃহে যখন প্রচুর সাহাবী সমবেত হয়েছিলেন তখন বর্ণনা করেছেন, কোনটি গাদীরে খুমে এবং কোনটি তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় বর্ণনা করেছেন বলে বলা হয়েছে। এ হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ হতেই পারে সকল স্থানেই রাসূল (সা.) এ সত্যকে পুনরাবৃত্তি করেছেন কোরআন ও আহলে বাইতের মহান গুরুত্বের কথা চিন্তা করে।[২৪]

আহলে বাইতের ইমামগণের মর্যাদার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) তাঁদেরকে কোরআনের পাশাপাশি ও এর সমপর্যায়ে স্থান দিয়েছেন যার মধ্যে অসত্য ও বাতিল কোনরূপেই প্রবেশ করতে পারে না।

(لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه)

অর্থাৎ *এতে মিথ্যার প্রবেশাধিকার নেই, না সামনের দিক হতে, না পেছন দিক হতে।*[২৫]

এগুলোই আহলে বাইতের ইমামগণের অনুসরণের পক্ষে কোরআন ও সুন্নাতের স্পষ্ট দলিল হিসেবে আমাদের এ পথে পরিচালিত করেছে। কারণ মুসলমানরা কোরআনের স্থলে অন্য কিছুকেই গ্রহণ করতে পারে না। তাই কিরূপে সম্ভব তদস্থলে এমন কিছু গ্রহণ করবে যা কোরআনের সমমানের ও সমমর্যাদার হবে না?

৫। তদুপরি হাদীসে এসেছে-

إنّي تارِكٌ فِيكُمْ ما إن تَمَسّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلّوا : كِتابَ اللهِ و عِتْرَتِيْ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে এমন কিছু রেখে যাচ্ছি যাকে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনও বিপথগামী হবে না। (ভাবার্থ হলো যে কেউ এ দু' টিকে একসঙ্গে আঁকড়ে না ধরবে সে গোমরাহ হয়ে যাবে।) এ হাদীসের (হাদীসে সাকালাইন) সঙ্গে তাবরানীর বর্ণনানুসারে রাসূলুল্লাহ্ এ কথাটিও সংযোগ করেছেন,

فَلا تُقَدِّموهُما فَتُهْلِكُوا وَ لا تُقَصِّرُوا عَنهُما فَتُهْلِكُوا وَلا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أعْلَمُ مِنْكُمْ

তাদের চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ো না তাহলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং তাদের ব্যাপারে উপেক্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না, তবে ধ্বংসগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। তাদেরকে কোন কিছু শিক্ষাদান করতে যেও না কারণ তারা তোমাদের চেয়ে জ্ঞানী।

ইবনে হাজার বলেন, "তাদের চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ো না বা তাদেরকে উপেক্ষা করো না, তাদেরকে কিছু শেখানোর চেষ্টা করো না- নবীর এ কথাটির অর্থ হলো যে কেউ জ্ঞানের যে পর্যায়েই পৌঁছে থাকুক না কেন আহলে বাইত দীনি দায়িত্ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের ওপর প্রধান্য রাখেন।"[২৬]

৬। যে সকল প্রামাণ্য দলিল মুসলমানদের আহলে বাইতের প্রতি পরিচালিত করে ও এ পথে চলতে বাধ্য করে তার একটি হলো নবী করিম (সা.)- এর এ বাণীটি-

أَلا إِنَّ مَثَلَ أَهْل بَيْتِيْ فِيْكُم مَثَلُ سَفِيْنَةِ نُوح مَنْ رَكِبَهَا نَجا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرَقَ

জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আমার আহলে বাইত তোমাদের জন্য নূহের তরণির মত। যে ব্যক্তি তাতে আরোহণ করবে সে মুক্তি পাবে আর যে তা থেকে বিরত থাকবে সে নিমজ্জিত হবে।[২৭]

এছাড়াও রাসূল বলেছেন,

"শুধু আমার আহলে বাইতই নূহের কিস্তির মত যে তাতে আরোহণ করবে সে নাজাত পাবে, যে আরোহণ না করবে সে নিমজ্জিত হবে। আমার আহলে বাইত তোমাদের মাঝে বনি ইসরাঈলের ক্ষমার দ্বারের অনুরূপ, যে তাতে প্রবেশ করবে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।"[২৮]

অন্যত্র বলেছেন,

النُّجُومُ أمانٌ لِأَهْلِ الأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ وَ أَهْلُ بَيْتِي أمانٌ لِأُمّتِي مِنَ ا لْاِخْتِلافِ (فِي الدّينِ) فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ (يَعْنِي فِي اَحْكامِ اللهِ) اِخْتلفوا فَصَارُوا حِزْبَ

"তারকারাজি পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষাকবচ। আর আমার আহলে বাইত উম্মতের দীনের ক্ষেত্রে বিভক্তি হতে রক্ষার আ য়স্থল। যদি আরবদের মধ্যে কোন গোত্র তাদের বিরোধিতা করে (আল্লাহর হুকুম ও বিধানের ক্ষেত্রে) তবে সে গোত্র শয়তানের দলে পরিণত হবে।"[২৯] (১১*)

এগুলোই উম্মতের জন্য আহলে বাইতের অনুসরণকে অপরিহার্য করে তোলে এবং তাঁদের বিরোধিতা থেকে দূরে রাখে। আমার মনে হয় না এর থেকে সুষ্ঠু কোন ভাষা ও শব্দের মাধ্যমে এটি মানুষকে বোঝানো সম্ভব।

৭। কিন্তু আহলে বাইত বলতে এখানে যা বোঝানো হয়েছে তা রাসূল (সা.)- এর বংশধারার মধ্যকার ইমামগণের মধ্যে সীমাব , অন্য কোন ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এই সম্মান ও মর্যাদা যাঁরা আল্লাহর নির্দেশকে বাস্তবায়ন করেন ও তাঁরই ঐশী নিদর্শন তাঁরা ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। একথাটি যেরূপ হাদীস ও রেওয়ায়েত হতে সেরূপ বু বৃত্তিকভাবেও প্রমাণিত। আহলে সুন্নাতের অনেক প্রসি আলেমও তা স্বীকার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ : ইবনে হাজার তাঁর 'আসসাওয়ায়েকুল মুহরাকাহ্' গ্রন্থে বলেছেন,

"অনেকে বলেছেন : যে আহলে বাইতের কথা বলা হয়েছে তাঁরা রক্ষিত, তাঁরা আহলে বাইতের আলেমগণ হতে পারেন কারণ মানুষ তাঁদের মাধ্যমেই হেদায়েতপ্রাপ্ত হন; তাঁরা মানুষের মাঝে তারকাস্বরূপ এবং যদি তাঁরা পৃথিবীতে না থাকেন তবে মানুষের ওপর আল্লাহর আজাব পতিত হয়।"

অতঃপর বলেন, "এবং এটি মাহদী (আ.)- এর সময় ঘটবে। কারণ ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় হযরত ঈসা (আ.) তাঁর পেছনে নামায পড়বেন এবং দাজ্জাল তাঁর

সময়েই নিহত হবে। এর পরই একের পর এক আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত হতে শুরু করবে।”[৩০]

অন্যত্র তিনি বলেছেন, “মহানবী (সা.)- কে জিজ্ঞেস করা হলো : আপনার আহলে বাইতের পরবর্তীতে মানুষ কিরূপে জীবন যাপন করবে? জবাব দিলেন : কোমর ভাঙ্গা গাধার ন্যায়।”[৩১]

৮। আপনি ষ্টত বুঝতে পেরেছেন যে, নবী (সা.)- এর আহলে বাইতকে নূহ (আ.)- এর তরণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কারণ যে কেউ দীনের মৌলিক ও বিধানগত বিষয়ে (ফিকাহগত) আহলে বাইতের ইমামগণ হতে নির্দেশনা গ্রহণ করবে তারা জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করবে। আর কেউ যদি তার বিরোধিতা করে সে ঐ ব্যক্তির মত যে নূহ (আ.)- এর সময়ের াবন হতে পাহাড়ের ওপর আ য় গ্রহণ করেও মুক্তি পায় নি। এখানে নিমজ্জিত হবার অর্থ জাহান্নামে পতিত হওয়া। তাই এমন কর্ম হতে আল্লাহর আ য় প্রার্থনা করছি।

তাঁদেরকে ক্ষমার দ্বারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কারণ আল্লাহ্ ঐ দ্বারকে তাঁর শক্তিমত্তার বরাবরে তাঁর নির্দেশানুযায়ী মস্তক অবনত করা ও বিনয়ী হবার পথ হিসেবে বলেছেন এবং এ কারণেই এ দ্বার বনী ইসরাঈলের জন্য ক্ষমার পথ হয়েছিল। ত প এই উম্মতের জন্য এ দ্বারকে আহলে বাইতের মোকাবিলায় আল্লাহর নির্দেশের অনুকূলে আত্মসমর্পণ করা এবং ক্ষমা ও মাগফিরাত লাভের উপায় করা হয়েছে। ইবনে হাজার এই হাদীসগুলো উ ৃত করার পর আহলে বাইতকে নূহ (আ.)- এর তরণী ও ক্ষমার দ্বারের সঙ্গে তুলনা করার কারণ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,

“তাঁদেরকে নূহ (আ.)- এর তরণীর সঙ্গে তুলনা করার কারণ এটিই, যে কেউ তাঁদের ভালবাসবে ও সম্মান করবে সে আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করেছে এবং সে অবশ্যই আহলে বাইতের ইমামগণের মাধ্যমে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে ও তাঁদের বিরোধিতার অন্ধকার হতে মুক্তি লাভ করবে। আর যে কেউ তাঁদের বিরোধিতা করবে আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকৃতির সাগরে নিমজ্জিত ও ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হবে।”[৩২]

অতঃপর বলেছেন, “তাঁদেরকে ক্ষমার দ্বারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এজন্য যে, এ দ্বারে প্রবেশ করা বায়তুল মুকাদ্দাস বা রাইহার দ্বারে প্রবেশের মত (যদি তা আল্লাহর সামনে মস্তক অবনত করার উদ্দেশ্যে হয়) ক্ষমা লাভের কারণ। আল্লাহপাক আহলে বাইতের ভালবাসাকে উম্মতের ক্ষমা লাভের উপায় করে দিয়েছেন।”[৩৩]

সুতরাং আহলে বাইতের অনুসরণের বিষয়টি অপরিহার্য হওয়া সম্পর্কিত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির ও বহুল প্রচারিত। বিশেষত আহলে বাইত হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ সহীহ বলে পরিগণিত। আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন এ ভয় যদি না করতাম তবে আমার লেখনীকে স্বাধীন করে ছেড়ে দিতাম যাতে তা পূর্ণতায় পৌঁছায়। যা হোক যতটুকু লিখলাম আশা করি তা এ উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হবে।

ওয়াসসালাম

শ

নবম পত্র

১৭ জিলক্বদ ১৩২৯ হিঃ

এ বিষয়ে আরো অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনার আহবান।

আপনার কলমের লাগামকে ছেড়ে দিন ও কোন সমালোচনাকে ভয় করবেন না। আমার কান আপনার পূর্ণ অধিকারে এবং আমার হৃদয় আপনার জ্ঞান হতে কিছু অর্জন করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমি সম্পূর্ণ শান্তভাবে আপনার কথা   বণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছি। আপনার যুক্তি প্রদর্শনের প্রক্রিয়া আমাকে মু   করেছে। তাই ক্লান্তি ও সমালোচনার ভয়কে মন থেকে দূরীভূত করেছি। সুতরাং আপনার বুি দীপ্ত ও প্রজ্ঞাময় বক্তব্য থেকে আমাকে আরো অধিক জানার সুযোগ দিন। কারণ আপনার কথার মধ্যে আমি হারিয়ে যাওয়া প্রজ্ঞাকে খুঁজে ফিরছি। আপনার সচল কলম থেকে প্রজ্ঞাময় সকল কথা আমাকে বলুন।

ওয়াসসালাম

স

দশম পত্র

১৯ জিলক্বদ ১৩২৯ হিঃ

আরো কয়েকটি হাদীস

যদি আমার পত্রটি আগ্রহ নিয়ে পড়ে থাকেন তাহলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে এ জন্য প্রস্তুত করেছেন। আপনার পত্র দিনে দিনে আমার আকাঙ্ক্ষাকে লক্ষ্যে নিয়ে পৌঁছাচ্ছে এবং আমার কর্মকাণ্ডকে সফলতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যে ব্যক্তি পবিত্র নিয়ত ও অন্তর, সুন্দর চরিত্র, বিনয়, সৌজন্যবোধ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অধিকারী, জ্ঞানের মুকুট তার মাথায়ই শোভা পাওয়া স্বাভাবিক। যে সহনশীলতার মাল্য পরিধান করেছে তার কথা ও লেখনীতেই সত্য প্রতিমূর্ত হয় এবং সত্যপরায়ণতা ও সুবিচার তার মুখেই প্রতিভাত হয়।

আমাকে আরো অধিক জানাতে বলে আপনার নির্দেশ পালনে ও কৃতজ্ঞতাবোধে আব   হতে বাধ্য করেছেন। ইতোপূর্বে এর চেয়ে অধিক অনুগ্রহ ও সৌজন্যের সন্ধান আমি পাই নি। আল্লাহর শপথ, অবশ্য অবশ্যই আপনার দৃষ্টিকে সমু   ল করবো। তবে শুনুন।

১। তাবরানী তাঁর কাবীর গ্রন্থে এবং রাফেয়ী তাঁর মুসনাদে অবিচ্ছিন্ন সনদে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি এজন্য আনন্দিত যে, সে চায় আমার মত জীবন যাপন করতে, আমার মত মৃত্যুবরণ করতে ও আমার প্রতিপালকের চিরস্থায়ী বেহেশতে বাস করতে সে যেন আলীকে ভালবাসে এবং আলীকেই তার অভিভাবক বলে জানে, সে যেন আলীর বন্ধুকেও বন্ধু বলে জানে ও আমার পর আমার আহলে বাইতের অনুসরণ করে। কারণ তারা আমার সর্বাধিক আপন এবং তারা আমার অস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব লাভ করেছে, আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকেই তারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করেছে। ধ্বংস আমার সেই উম্মতের জন্য যারা তাদের (আহলে বাইতের) ে ষ্ঠত্বকে মিথ্যা মনে করে এবং আমার ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে কর্তন করে। আল্লাহ্ আমার শাফায়াতকে তাদের জন্য হারাম করুন।"[৩৪]

২। মুতির, বাওয়ারদী, ইবনে জারির, ইবনে শাহীন এবং ইবনে মানদুহ ইসহাকের মাধ্যমে যিয়াদ ইবনে মুতরিফ হতে বর্ণনা করেছেন, “রাসূলকে বলতে শুনেছি : যে কেউ পছন্দ করে আমার মত জীবন যাপন ও মৃত্যুবরণ করতে ও আমাকে যে চিরস্থায়ী জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেখানে প্রবেশ করতে, সে যেন আলী ও তার বংশধরদের ভালবাসে কারণ তারা কখনোই তোমাদের সত্য ও হেদায়েতের পথ হতে বিপথে পরিচালনা করবে না এবং তোমাদের গোমরাহীতেও নিক্ষেপ করবে না।”[৩৫]

৩। এরূপ আরেকটি হাদীস হলো যায়িদ ইবনে আরকাম হতে বর্ণিত হাদীস যেখানে রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে কেউ আমার মত জীবন যাপন ও মৃত্যুবরণ করতে চায়, আমার প্রভুর প্রতিশ্রুত চিরস্থায়ী বেহেশতে প্রবেশ করতে চায়, সে যেন অবশ্যই আলীকে ভালবাসে, কেননা আলী কখনোই তাকে হেদায়েত থেকে বিচ্যুত করবে না এবং গোমরাহও করবে না।”[৩৬]

৪। তেমনি হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাসূল (সা.) থেকে বলেছেন, “যে কেউ আমার প্রতি ঈমান এনেছে ও আমাকে সত্যায়ন করেছে তাদেরকে আমি আলী ইবনে আবি তালিবের বেলায়েতকে মেনে নেয়ার সুপারিশ করছি (নির্দেশ দিচ্ছি), যে ব্যক্তি আলীকে নিজের আভিভাবক মেনেছে, সে যেন আমাকেই তার আভিভাবক জেনেছে এবং যে আমাকে অভিভাবক জেনেছে সে আল্লাহকে নিজের অভিভাবক মনোনীত করেছে। যে ব্যক্তি আলীকে ভালবাসে সে আমাকেই ভালবেসেছে, আর যে আমাকে ভালবেসেছে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই ভালবেসেছে। যে কেউ আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে। আর যে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে অবশ্যই তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছে।”[৩৭]

৫। অন্যত্র হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাসূল থেকে বর্ণনা করেছেন, “হে প্রতিপালক! তুমি সাক্ষী থাকো, এ উম্মতকে আমি জানিয়েছি যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান এনেছে ও আমাকে সত্য প্রতিপন্ন করেছে সে যেন আলী ইবনে আবি তালিবের বেলায়েত হতে হাত সঙ্কুচিত না করে, কারণ আলীর বেলায়েত আমারই বেলায়েত আর আমার বেলায়েত আল্লাহরই বেলায়েত।”[৩৮]

৬। রাসূল (সা.) তাঁর এক খুতবায় বলেন, “হে লোকসকল! মর্যাদা, সম্মান ও অভিভাবকত্বের পদমর্যাদা রাসূল (সা.) ও তার বংশধরদের জন্য। সুতরাং অন্যদের অন্যায় দাবী ও বক্তব্য যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে।”[৩৯]

৭। অন্যত্র রাসূল বলেছেন, “আমার উম্মতের প্রতিটি প্রজন্মের সময়ই আমার বংশধর হতে কোন না কোন সুবিচারক ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি থাকবে। তারা বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের সৃষ্ট বিকৃত চিন্তা ও দীন ধ্বংসকারী কর্মকাণ্ডের অপনোদন করবে এবং দীন হতে অজ্ঞ ব্যক্তিদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যাসমূহকে দূরীভূত করবে। জেনে রাখো, তোমাদের ইমাম ও নেতৃবর্গ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আদর্শ ব্যক্তি, তাই কাকে নিজের ইমাম ও নেতা মনোনীত করে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে সে বিষয়ে চিন্তা করো।”[৪০]

৮। রাসূল (সা.) বলেছেন, “আমার আহলে বাইতের ইমামগণ হতে পেছনে পড়ো না, তাদের বিষয়ে গাফেল ও অসচেতন হয়ো না তাহলে তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তাদেরকে কোন বিষয়ে শিক্ষাদান করতে যেও না, তারা এ বিষয়ে তোমাদের হতে অধিকতর জ্ঞাত।”[৪১]

৯। অন্যত্র রাসূল বলেছেন, “আমার আহলে বাইতকে দেহের মধ্যে মস্তকের ন্যায় ও মস্তকের মধ্যে চোখের ন্যায় মনে কর। জেনে রেখো, চক্ষু ব্যতীত মস্তক হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পারে না।”[৪২]

১০। রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, “আমার আহলে বাইতের ভালবাসার প্রতি অনুগত ও প্রতিশ্রুতিব হও। কারণ যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে যে, সে আমাদের ভালবাসে তাহলে সে আমাদের শাফায়াতের মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশ করবে। যাঁর হাতের মুঠোয় আমার জীবন আব সেই প্রভুর শপথ, আমাদের অধিকারের প্রতি সচেতনতা ও সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত কোন সৎ কর্মই ফলদান করবে না।”[৪৩]

১১। রাসূল (সা.) বলেছেন, “আমার আহলে বাইতের প্রকৃত পরিচয় জানা জাহান্নামের অগ্নি হতে মুক্তির উপায়। আমার বংশধরদের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা পুলসিরাত অতিক্রমের অনুমতিপত্র ও রক্ষাকবচ এবং তাদের বেলায়েত আল্লাহর আজাব হতে নিরাপত্তা দানকারী।”[৪৪]

১২। রাসূল (সা.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মানুষকে চারটি প্রশ্নের জবাব দানের পূর্বে কোথাও যেতে দেয়া হবে না (১) তার জীবনকে কোন্ পথে ব্যয় করেছে (২) তার দেহকে কোন্ কাজে নিয়োজিত রেখেছে (৩) অর্থকে কোন্ পথে ব্যয় করেছে অর্থাৎ কোথা হতে আয় করেছে ও কোথায় ব্যয় করেছে (৪) আমার আহলে বাইতের প্রতি কিরূপ ভালবাসা পোষণ করেছে?"[৪৫] (১২*)

১৩। অন্যত্র রাসূল (সা.) বলেছেন, "যদি কেউ তার সমগ্র জীবন মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে ও রোযা রাখে কিন্তু আমার আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

১৪। রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাসূলের বংশধরদের প্রতি ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে সে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে। জেনে রাখো, রাসূলের আহলে বাইতের ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণকারী ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছে, রাসূলের আহলে বাইতের ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণকারী তওবাকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। জেনে রাখো, যারা রাসূলের আহলে বাইতের ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, ঈমান নিয়ে অর্থাৎ মুমিন হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে এবং মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করেছে এবং কবরেও মুনকার-নাকীর তাকে এ সুসংবাদ দান করবে। যে কেউ আমার আহলে বাইতকে ভালবেসে দুনিয়া থেকে চলে গেছে, সে নববধূ যেরূপ স্বামীর ঘরে জাঁকজমকপূর্ণভাবে ও সসম্মানে প্রবেশ করে সেরূপ বেহেশতে প্রবেশ করবে। আমার আহলে বাইতের ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণকারীর জন্য কবর হতে দু'টি দরজা বেহেশতের দিকে উন্মুক্ত করা হবে এবং আল্লাহ্ তার কবরকে ফেরেশতাদের জন্য যিয়ারতের স্থানে পরিণত করবেন। জেনে রাখো, আমার আহলে বাইতের ভালবাসাসহ প্রাণদানকারী ব্যক্তি রাসূলের দীনের পথে ও সুন্নাহর ওপর মৃত্যুবরণ করেছে এবং এও জেনে রাখো, যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তার কপালে কিয়ামতের দিন লিখা থাকবে 'আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত'।"[৪৬]

এ বক্তব্যগুলোর মাধ্যমে এক মহাসত্যকে প্রকাশ করে রাসূল (সা.) চেয়েছিলেন প্রবৃত্তি ও বাসনার কুপ্রভাবকে এদিকে (সত্যের দিকে) ফিরিয়ে আনতে। এ সকল হাদীস বর্ণনাসূত্রে মুতাওয়াতির ও বহুল বর্ণিত বিশেষত আহলে বাইতের পক্ষ থেকে তা নির্ভরযোগ্য ও সহীহ। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা যদি আল্লাহর স্পষ্ট নিদর্শন না হতেন তাহলে এই মর্যাদা ও সম্মান লাভ করতেন না। অবশ্যই যদি তাঁরা সত্যের মহাউৎস, ঐশী আদেশ- নিষেধের ক্ষেত্রে রাসূলের স্থলাভিষিক্ত ও হেদায়েতের প্রতিকৃতি না হতেন তাহলে কখনোই এরূপ মর্যাদায় ভূষিত হতেন না। তাই তাঁদের অনুসারী ও প্রেমিকরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রেমিক এবং তাঁদের বিরু াচারণকারী ও বিদ্বেষীরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরু াচারণকারী ও বিদ্বেষী বলে পরিগণিত। এ কারণে রাসূল (সা.) বলেছেন, "পরহেজগার ও মুমিন ব্যতীত কেউ আমাদের বন্ধু হতে পারে না এবং মুনাফিক ও পাষাণহৃদয় ব্যক্তি ব্যতীত কেউ আমাদের শত্রু হতে পারে না।"[৪৭]

প্রসি   কবি ফারাযদাক আহলে বাইত সম্পর্কে বলেছেন,

مِنْ مَعْشَرٍ حُبُّهُمْ دِيْنٌ وَ بُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَ قُرْبُهُمْ مُنْجِي وَ مُعْتَصِمٌ

"তাঁরা এমন ব্যক্তিবর্গ যাঁদের ভালবাসাই ধর্ম এবং তাঁদের প্রতি শত্রুতাই কুফর। তাঁদের নৈকট্যই মুক্তি ও নিরাপত্তা লাভের উপায়।"

إِنْ عُدَّ أَهْلَ التُقى كانُوا ائِمَّتَهُمْ أَوْ قِيْلَ مَنْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ قِيْلَ هُمْ

"যদি পরহেজগার ব্যক্তিদের গণনা করা হয়, তবে তাঁরা তাদের নেতা। যদি বলা হয় পৃথিবীর ওপর ে ষ্ঠতম মানুষ কারা, তবে বলা হবে তাঁরা।"

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) সব সময় বলতেন, "আমি, আমার পিতৃপুরুষ ও বংশধরগণ সবচেয়ে বু িমান, শৈশবে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সহনশীল এবং বৃ াবস্থায় তাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী। আমাদের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ মিথ্যাকে ভূলু িত করেন, নেকড়ের দাঁতগুলোকে উপড়ে ফেলেন, দুনিয়াপ্রেমিকদের লাঞ্ছিত করেন, তোমাদের বন্দীত্ব ও অপমানের অবসান ঘটান এবং তোমাদের স্কন্ধ হতে জি র ও শিকলকে অপসারিত করেন। আমাদের মাধ্যমেই তিনি শুরু করেন এবং আমাদের হতেই শেষ করেন।"[৪৮]

তাঁদের অনুসরণের পক্ষে যুক্তি হিসেবে আমাদের জন্য এটিই যথেষ্ট যে, আল্লাহপাক তাঁদেরকে অন্যদের ওপর ে ষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তাঁদের ওপর দরূদ পড়াকে ফরয নামাযের অংশ হিসেবে তাঁর প্রতিটি বান্দার ওপর অপরিহার্য করেছেন অর্থাৎ তাঁদের ওপর দরূদ না পড়লে কারো নামাযই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না তিনি যে কেউ হোন না কেন- সিদ্দীক (মহাসত্যবাদী), ফারুক (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী), যুন্নূর (আলোর অধিকারী), যুন্নূরাইন (১৩*)(দুই দ্যুতির অধিকারী), যু আনওয়ার (দ্যুতিসমূহের অধিকারী)- সকল বান্দার জন্যই নামাযের মধ্যে যেমনভাবে শাহাদাতাইন বলা ইবাদত তেমনি তাঁদের ওপর দরূদ পাঠানোও ইবাদত। তাঁদের এ মর্যাদার প্রতি চার মাজহাবের ইমামগণসহ সকল প্রসি ব্যক্তি অনুগত ও বিনীত।

ইমাম শাফেয়ী এ বিষয়ে বলেছেন,

يَا أَهْلَ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ حُبُّكُمْ فَرْضٌ مِنَ اللهِ فِيْ الْقرْآنِ أَنْزَلَهُ

“হে রাসূলের আহলে বাইত! তোমাদের ভালবাসা সবার জন্য ফরয করা হয়েছে যা কোরআনে অবতীর্ণ হয়েছে।”

كَفَاكُمْ مِنْ عَظِيْمِ الْفَضْلِ إِنَّكُمْ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لا صَلَوة لَهُ

“তোমাদের ে ষ্ঠত্বের জন্য এটিই যথেষ্ট যে, যদি কেউ নামাযে তোমাদের ওপর দরূদ না পড়ে, তার নামায কবুল হবে না।”[৪৯]

রাসূল (সা.)- এর পবিত্র সুন্নাহ্ হতে তাঁর আহলে বাইতকে অনুসরণ করার অপরিহার্যতার সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন এখানেই শেষ করছি। আল্লাহর কিতাবেও (কোরআনে) এ বিষয়ে স্পষ্ট আয়াত রয়েছে, যেহেতু আপনি ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা ইশারা হতেই অনেক কিছু বুঝেন তাই এ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণের দায়িত্ব আপনার তীক্ষ্ণ বু বৃত্তির ওপর ছেড়ে দিলাম।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন

শ

এগারতম পত্র

২০ জিলক্বদ ১৩২৯ হিঃ

১। প্রামাণ্য হাদীসের উ ৃতিতে আশ্চর্যান্বিত হওয়া।

২। এরূপ রেওয়ায়েত হতে আহলে সুন্নাতের দূরত্বের বিষয়ে চিন্তা করে হতচকিত হওয়া।

৩। কোরআন হতে দলিল- প্রমাণ উপস্থাপনের আহবান।

১। আপনার মূল্যবান পত্রটি আমার হস্তগত হয়েছে। পত্রটি সত্যকে প্রকাশের জন্য স্পষ্ট, বোঝার জন্য সহজ ও গ্রহণোপযোগী। আপনি আপনার জ্ঞানের কূপ হতে বালতি পূর্ণ করে দিয়েছেন যেন পর্বত হতে দলিল- প্রমাণের ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়েছে। আপনার পত্রটি গভীর মনোযোগের সাথে পড়েছি এবং দীর্ঘক্ষণ এর ওপর চিন্তা করেছি। আমার মনে হয়েছে, সংলাপে আপনার মধ্যে কোন ক্লান্তি আসে না, বিতর্কে আপনি অত্যন্ত শক্তিশালী ও দৃঢ় এবং বক্তব্যে প্রা ল।

২। যখন আপনার উপস্থাপিত দলিলগুলোর মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করলাম ও যুক্তি- প্রমাণের চুলচেরা বিশ্লেষণে নিমগ্ন হলাম তখন বুঝতে পারলাম আপনার অকাট্য যুক্তির মোকাবিলায় আমার মনে অ ুত এক অন্তর্দ্ব র সৃষ্টি হয়েছে। আপনার বর্ণিত হাদীসগুলো পড়ে আহলে বাইতের ইমামগণকে আল্লাহ্ ও রাসূলের সামনে এমন এক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁদের সম্মুখে আমাদের ভক্তি ও বিনয়ের পাখা মেলে দেয়া উচিত।

অন্যদিকে মুসলমানদের বৃহৎ অংশের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখেছি তারা এ হাদীসগুলোর বিরুে অবস্থান করছে। আমার দ্বিধাবিভক্ত অন্তরের এক অংশ আমাকে এই দলিল- প্রমাণের অনুসরণের দিকে আর অন্য অংশ অধিকাংশ মুসলমানের অনুসৃত পথের দিকে টানছে।

প্রথমটি এর লাগামকে আপনার হাতে ছেড়ে দিয়ে আমাকে শান্ত হতে ও আপনা হতে বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করছে আর দ্বিতীয়টি আপনার বিরোধিতা করে বিচ্ছিন্ন হতে বলছে।

৩। যদি সম্ভব হয় কোরআন হতে অকাট্য দলিল উপস্থাপনের মাধ্যমে আমার একগুঁয়ে এ

অন্তরের বিরোধিতার পথকে রু   করুন এবং আহলে বাইতের পথে আমাকে পরিচালিত করুন যেন আমার ও অধিকাংশের অনুসৃত পথের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

ওয়া আলাইকাসসালাম

স

বারতম পত্র

২২ জিলক্বদ ১৩২৯ হিঃ

কোরআনের আয়াত হতে উপস্থাপিত প্রমাণসমূহ

আলহামদুলিল্লাহ্! আপনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা কোরআনের জ্ঞানে সম্যক জ্ঞাত এবং এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক সম্পর্কে সচেতন। রাসূলের পবিত্র বংশধরগণ সম্পর্কে কোরআনে যেরূপ স্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে অন্য কারো সম্পর্কে সেরূপ স্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কি?

কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহে যেরূপ তাঁদের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, পাপ ও পঙ্কিলতা হতে তাঁরা সম্পূর্ণ পবিত্র সেরূপ অন্য কারো বিষয়ে বলা হয়েছে কি?[৫০]

আয়াতে তাতহীর অন্য কারো বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে কি? কোরআন তাঁদের ব্যতীত অন্য কারো প্রতি ভালবাসা পোষণকে ফরয ঘোষণা করেছে কি?[৫১]

হযরত জিবরাঈল (আ.) মোবাহিলার আয়াতটি তাঁরা ব্যতীত অন্য কারো জন্য এনেছেন কি? অবশ্যই না, বরং তাঁদের ব্যাপারেই বলেছেন,

"বলুন, এসো আমরা আমাদের সন্তানদের, নারীদের ও নিজ সত্তাদেরকে আহবান করি এবং আল্লাহকে বলি মিথ্যাবাদীদের ধ্বংস করুন।" (সূরা আলে ইমরান : ৬১)

هل أتى هل أتى بِمدح سواهم لا و مولى بذكرهم حلّاها

সূরা হাল আতা (সূরা দাহর) তাঁদের ব্যতীত অন্য কারো প্রশংসায় অবতীর্ণ হয় নি, বরং শুধু তাঁদের লক্ষ্য করেই অবতীর্ণ হয়েছে।

আহলে বাইত কি আল্লাহর রজ্জু নন যেখানে কোরআনে বলা হয়েছে-

(و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا)

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[৫২]

তাঁরা কি কোরআনে বর্ণিত সত্যপন্থী নন যেখানে আল্লাহ্ বলছেন,

(وكونوا مع الصادقين) "এবং সত্যপন্থীদের সঙ্গে থাক।" (সূরা তওবা : ১১৯)

সত্যপন্থী বলতে আমাদের সূত্রে বর্ণিত হাদীসানুসারে নবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইত। ইবনে হাজার তাঁর আসসাওয়ায়েক গ্রন্থের ১১ অধ্যায়ে ৯০ পৃষ্ঠায় ৫ নং আয়াতের তাফসীরে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা আমি ৬ষ্ঠ পত্রে উল্লেখ করেছিলাম।

আল্লাহ্ কি তাঁদেরকে 'সিরাতুল্লাহ্' বলে উল্লেখ করেন নি-

(و إنّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه)

নিশ্চয়ই এটি আমার সরল সঠিক পথ, এ পথের অনুসরণ কর। (সূরা আনআম : ১৫৩)

অন্যরা আল্লাহর পথ নন। তাই বলেছেন,

(ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)

"*বিচ্ছিন্নতা ও বক্রতার পথসমূহ অবলম্বন কর না, তাহলে আল্লাহর পথ হতে দূরে সরে যাবে।*"[৫৩]

এবং কোরআনে বর্ণিত উলিল আমর কি তাঁরাই নন যেখানে বলা হয়েছে-

(يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم)

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূল ও তোমাদের মধ্যকার দায়িত্বশীলদের (উলিল আমরের) আনুগত্য কর। [৫৪]

তাঁরাই কি কোরআনে বর্ণিত 'আহলুয যিকর' নন-

(فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون)

'*যদি তোমরা না জান তাহলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।*'[৫৫]

সূরা নিসার ১১৫ নং আয়াতে যে মুমিনদের বিবরণ দেয়া হয়েছে তাঁরাই কি সেই মুমিনীন নন? বলা হয়েছে- "যে কেউ সত্য প্রকাশিত হবার পর নবীর বিরু াচারণ করবে ও মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ গ্রহণ করবে আমরা তাদেরকে সেই পথেই পরিচালিত করবো এবং অবশেষে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। "[৫৬]

তাঁরাই কি সেই ব্যক্তিবর্গ নন যারা আল্লাহর দিকে মানুষদের হেদায়েত করেন। যেমন সূরা রাদের ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

(انما انت منذر و لكل قوم هاد)

"নিশ্চয়ই আপনি কেবল ভয় প্রদশনকারী এবং প্রত্যেক জাতি ও গোত্রের জন্যই হেদায়েতকারী রয়েছে।"[৫৭]

এরাই কি সেই ব্যক্তিবর্গ নন যাঁদেরকে মহান আল্লাহ্ নিয়ামত দান করেছেন?

সূরা ফাতিহা যার অপর নাম হলো সাবয়ুল মাছানী এবং কোরআনে সেই সূরাতে 'আমাদের সরল সঠিক পথে ও যাদের প্রতি আপনি নিয়ামত দান করেছেন তাদের পথে পরিচালিত করুন' বলতে কাদের পথকে বুঝানো হয়েছে?[৫৮]

সূরা নিসার ৬৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

"যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে কিয়ামতের দিন তাঁদের সঙ্গে থাকবে যাঁদের ওপর আল্লাহ্ তাঁর নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছেন, (তাঁরা হলেন) নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ কর্মশীল বান্দাগণ।"

নিঃসন্দেহে আহলে বাইতের ইমামগণ সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত। তবে কি আল্লাহ্ সর্বসাধারণের সার্বিক নেতা হিসেবে তাঁদেরকেই মনোনীত করেন নি? নবীর পরবর্তীতে মুসলমানদের নেতৃত্ব দানের ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব শুধু তাঁদের জন্যই নির্ধারিত করেন নি?

যদি বিষয়টি না জানেন তবে দেখুন-

নিশ্চয়ই তোমাদের ওয়ালী (অভিভাবক) হলেন শুধু আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং রুকুরত অবস্থায় যাকাত দেয়। যারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদের অভিভাবকত্বকে মেনে নেয় তারাই জয়ী হবে, কারণ আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।[৫৯]

মহান আল্লাহ্ ক্ষমা ও মাগফেরাতের শর্ত হিসেবে তওবা, ঈমান আনা, সৎ কর্ম করা ও আহলে বাইতের ইমামদের নেতৃত্বকে মেনে নেয়ার বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন যেমনটি সূরা ত্বহার ৮২ নং আয়াতে এসেছে-

আমি আমার ক্ষমাকে তওবার মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন, ঈমান আনয়ন, সৎ কর্ম সম্পাদন এবং হেদায়েত প্রাপ্তির[৬০] মধ্যেই রেখেছি (অর্থাৎ তারাই ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে যারা তওবা করেছে, ঈমান আনয়ন করেছে, সৎ কর্ম সম্পাদন করেছে এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে)।

তাহলে তাঁদের বেলায়েত কি একটি আমানত নয় যা সূরা আহযাবের ৭২ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

আমরা আমানতকে আসমান, যমীন ও পর্বতের নিকট পেশ করেছিলাম কিন্তু তারা তা গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল এবং তারা বোঝা বহনের ভয় করছিল কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করেছিল। কারণ মানুষ (নিজের প্রতি) অত্যাচারী এবং অজ্ঞ।[৬১]

তাঁদের (আহলে বাইতের) বেলায়েত ও অভিভাবকত্বকেই আল্লাহ্ কোরআনে سِلْمٌ (সিল্ম) বলে উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে প্রবেশের জন্য সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ, সকলেই সমবেতভাবে সিল্ম বা শান্তি ও মুক্তির মধ্যে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।"[৬২]

তাঁদের বেলায়েত বা অভিভাবকত্বকেই কি মহান আল্লাহ্ কোরআনে نعيم (নাঈম) বলে উল্লেখ করেন নি যে বিষয়ে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে (ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم)।[৬৩]

রাসূল (সা.) কি তাঁদের বেলায়েতকে ঘোষণার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন নি? এবং এ বিষয়ে রাসূলকে প্রদত্ত নির্দেশ অনেকটা রাসূলকে ভীতি প্রদর্শনের মত ছিল, নয় কি? যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন,

"হে রাসূলযা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আপনার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তা পূর্ণাঙ্গরূপে ! পৌঁছান। যদি তা না করেন আপনি আপনার রেসালতের দায়িত্বই পালন করেন নি এবং আল্লাহ্ রক্ষা করবেন। (সম্ভাব্য বিপদ হতে) আপনাকে মানুষ হতে"[৬৪]

রাসূল (সা.) গাদীর দিবসে এ বাণী প্রচারের জন্য কি ব্যাপক পদক্ষেপ নেন নি? পরিষ্কার ভাষায় পূর্ণাঙ্গরূপে বিষয়টিকে উপস্থাপন করেন নি? মহান আল্লাহ্ তখনই সূরা মায়েদার এ আয়াত

নাযিল করেন- "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের মনোনীত দীন হিসেবে গ্রহণ করলাম।"[৬৫]

তাহলে কি আপনি জানেন না মহান আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তি যে তাঁদের (আহলে বাইতের) বেলায়েত ও নেতৃত্বকে সরাসরি অস্বীকার করেছিল এবং নবীর সঙ্গে এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছেন? ঐ ব্যক্তি চিৎকার করে বলেছিল, "হে আল্লাহ্! যদি এটি সত্য ও আপনার পক্ষ হতে হয়ে থাকে, তবে আসমান হতে আমার ওপর পাথর বর্ষণ করুন এবং আজাব নাযিল করুন।" আল্লাহপাক ঐ ব্যক্তিকে হস্তীবাহিনীর ন্যায় ধ্বংস করেন। তখনই 'এক ব্যক্তি চাইল সেই আজাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত কাফিরদের জন্য এবং যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই' এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[৬৬](১৪*)

অতিশীঘ্রই পুনরুত্থান দিবসে আহলে বাইতের বেলায়েত ও নেতৃত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে যেমনটি সূরা সাফফাতের ২৪ নং আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে (وقفوهم إنّهم مسئولون)' এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে।[৬৭] এটি আশ্চর্যের বিষয় নয় কারণ তাঁদের নেতৃত্ব ও বেলায়েত এমন একটি বিষয় যা ঘোষণার জন্য সকল নবীর আগমন ঘটেছে এবং তাঁরা বিশ্বে আল্লাহর সর্বোত্তম নিদর্শন। নবীদের স্থলাভিষিক্ত ওলী ও ঐশী প্রতিনিধিগণ মানুষের কাছে এ সত্যটি প্রকাশ করে গিয়েছেন, যেমন সূরা যুখরুফের ৪৫ নং আয়াতে এসেছে-

(وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا)

তোমার পূর্বে আমাদের রাসূলদের মধ্য থেকে যাদের প্রেরণ করেছিলাম তাদের নিকট এ বিষয়ে প্রশ্ন কর।[৬৮]

আহলে বাইত সম্পর্কে এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহপাক 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই'- এর প্রতিশ্রুতি থেকেই গ্রহণ করেছেন যা সূরা আ'রাফের ১৭২ নং আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।(১৫*) আয়াতটি হলো : "আল্লাহ্ বনি আদম হতে তার জন্মের পূর্বে এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন (তার পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বের করে তাদের নিজেদের ওপর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন) যে, আমি কি

তোমাদের প্রভু নই? তারা বলল, হ্যাঁ।” এ বিষয় আহলে সুন্নাহর হাদীসসমূহেও উল্লিখিত হয়েছে।

“এবং আদম তাঁর স্রষ্টা হতে কয়েকটি বাক্য প্রাপ্ত হলেন, তার মাধ্যমে ক্ষমা চাইলেন এবং আল্লাহ্ তাঁর তওবাকে গ্রহণ করলেন।”[৬৯]

তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেছেন, ‘আল্লাহ্ তাদের (এ উম্মতকে) আজাব দান করবেন না যখন তুমি তাদের মধ্যে বর্তমান।’[৭০]

পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য তাঁরা নিরাপত্তাস্থল এবং আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচার মাধ্যম। তাঁরাই যে তাঁদের ে ষ্ঠত্বের কারণে অন্যদের হিংসার পাত্র তা সূরা নিসার ৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, “মানুষকে (নবী ও তার পরিবারবর্গকে) আল্লাহ্ তাঁর নিয়ামত হতে যা দান করেছেন তারা তার প্রতি হিংসা করে।”[৭১]

তাঁদের বিষয়েই আল্লাহ্ বলেছেন, “জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ বলে : আমরা ঈমান এনেছি।”[৭২]

আমাদের জানা উচিত আ’রাফের ব্যক্তিবর্গ তাঁরাই। এজন্য আল্লাহপাক বলেছেন, “এবং আ’রাফে একদল ব্যক্তি রয়েছেন যাদের চেহারা দেখে সবাই চিনবে।”[৭৩]

তাঁরাই আল্লাহ্ বর্ণিত সত্যবাদী ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ব্যক্তিবর্গ। কোরআন বলেছে, “মুমিনদের মধ্যে একদল লোক রয়েছে তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পালন করেছে, তাদের একদল দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে (শহীদ হয়েছে) এবং অপর দল অপেক্ষমান রয়েছে (তাদের সাথে মিলিত হবার), তারা তাদের সংকল্প কখনোই পরিবর্তন করে নি।”[৭৪]

তাঁদেরকেই আল্লাহ্ তাঁর গুণকীর্তনকারী বলে বর্ণনা করেছেন- “আল্লাহ্ যে সকল গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে (একদল লোক) সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা- বাণিজ্য ও ক্রয়- বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।”[৭৫]

তাদের ঘরসমূহ হলো সেই ঘরসমূহ যার সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেছেন, "আল্লাহ্ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং যেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন।"[৭৬]

তাঁদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ্ সূরা নূরের ৩৫ আয়াতে বলেছেন, "তাদের উদাহরণ হলো কুলঙ্গি এবং তাদের অস্তিত্ব আমারই নূরের অস্তিত্ব।[৭৭] অথচ আল্লাহর জন্য আসমান ও জমীনে সর্বোত্তম উদাহরণ বিদ্যমান এবং তিনি ক্ষমতাশালী ও প্রজ্ঞাবান।

তাঁরা আল্লাহ্ বর্ণিত অগ্রবর্তী নৈকট্যপ্রাপ্ত দল যেমনটি এ আয়াতে বলা হয়েছে-

(السّابقون السّابقون أولَائك المقرّبون)

অর্থাৎ অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই, তারাই নৈকট্যশীল।[৭৮]

এবং সত্যবাদী, শহীদ, সাক্ষ্য প্রদানকারী এবং সৎ কর্মশীল বলতে তাঁদেরই বোঝানো হয়েছে।[৭৯]

আহলে বাইত এবং তাঁদের ইমামগণ সম্পর্কেই আল্লাহপাক বলেছেন,

(وممن خلقنا أمة يهدون بالْحقّ و به يعدلون)

"আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা সত্যের দিকে মানুষকে হেদায়েত করে (পথ দেখায়) এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে।"[৮০]

আহলে বাইতের অনুসারী এবং বিরোধী ও শত্রুদের সম্পর্কেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে-

(لا يستوي أصحاب النّار و أصحاب الْجَنَّة أصحاب الْجَنَّة هم الفائزون)

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসীগণ সমান হতে পারে না। জান্নাতের অধিবাসীরাই সফলকাম।[৮১]

তাঁদের পক্ষের ও বিপক্ষের দল সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন,

(أم نجعل الّذين آمنوا و عملوا الصّالِحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتّقين كالفجّار)

"আমি কি বিশ্বাসী ও সৎ কর্মশীলদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফেরদের সমতুল্য করে দেব, না খোদাভীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব?"[৮২]

এই দু'দল সম্পর্কে অন্যত্র বলেছেন,

(أم حسب الّذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصّالِحات سواء محياهم و مماتُهم ساء ما يحكمون)

"যারা দুষ্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে দেব যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে ও তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে?"[৮৩]

আহলে বাইত ও তাঁদের অনুসারীদের সম্পর্কেই কোরআনে বলা হয়েছে-

(إنّ الّذين آمنوا و عملوا الصّالِحات أولَائك هم خيرُ البريّة)

যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম করেছে তারাই ে ষ্ঠ সৃষ্টি।[৮৪]

আহলে বাইত ও তাঁদের শত্রুদের সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে-

এই দু' বাদী- বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব, যারা কাফির তাদের জন্য আগুনের পোষাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে।[৮৫]

এবং আহলে বাইত ও তাঁদের শত্রুদের সম্পর্কেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে- মুমিন কি কখনো ফাসেকের মত হতে পারে? তারা সমান নয়। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম করেছে তাদের বাসস্থান হলো চিরস্থায়ী জান্নাত তাদের সৎ কর্মের বিনিময়স্বরূপ আর যারা গুনাহ করেছে তারা তাদের বাসস্থানকে জাহান্নামের মধ্যে প্রস্তুত করেছে। যখনই তারা চাইবে তা হতে বের হতে, তাদেরকে জোরপূর্বক ফিরিয়ে দেয়া হবে ও বলা হবে, যে জাহান্নামকে অস্বীকার করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর।[৮৬]

অন্যত্র ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ যারা হাজীদের পানি পান করানো ও কাবা শরীফের খাদেম হওয়ার কারণে অহংকার ও গর্ব পোষণ করতো তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যু করে আল্লাহর পথে? এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ্ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না।"[৮৭]

তেমনিভাবে আল্লাহপাক আহলে বাইতের বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষায় সফলতার কথা কোরআনে বর্ণনা করেছেন-

(و من النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رءوف بالعباد)

এবং মানুষের মধ্যে একদল লোক আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে নিজেদের জীবনকে বিক্রয় করে এবং আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।[৮৮]

অন্যত্র বলেছেন, "আল্লাহ্ মুমিনদের জীবন ও সম্পদকে বেহেশতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর রাস্তায় যু করে, হত্যা করে ও নিহত হয়। এ প্রতিশ্রুতি সত্য ও অবশ্যম্ভাবী যা তাওরাত, ইি ল ও কোরআনে এসেছে- 'এবং আল্লাহ্ হতে কে অধিক ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী?'

সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের ওপর যা তোমরা আল্লাহর সঙ্গে করেছ। তারা (এ মুমিনগণ) তওবাকারী, ইবাদতকারী, কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদাকারী, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী, আল্লাহর দেয়া সীমাসমূহের হেফাজতকারী। (সূরা তওবা : ১১১ ও ১১২)

যারা স্বীয় ধনসম্পদ ব্যয় করে (দান করে) রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্য তাদের সওয়াব তাদের পালনকর্তার নিকট সংরক্ষিত। তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (বাকারা : ২৭৪)[৮৯]

তাঁরাই সত্যকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ তার সাক্ষ্য প্রদান করে বলেছেন, "যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে ও সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই তো খোদাভীরু ও মুত্তাকী (পরহেজগার)।[৯০]

সুতরাং তাঁরাই রাসূল (সা.)- এর গোত্রের সর্বোচ্চ নিষ্ঠাবান এবং তাঁর সবচেয়ে নিকটাত্মীয় যাঁদের মহান আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন,

(و أنذر عشيرتك الأقربين)"এবং তোমার নিকটাত্মীয়দের ভীতি প্রদর্শন কর।" এবং তাঁরাই কোরআনে বর্ণিত উলুল আরহাম বা নিকটাত্মীয় যেমনটি বলা হয়েছে সূরা আনফালের ৭৫ নং

আয়াতে (أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض)অর্থাৎ বস্তুত যারা নিকটাত্মীয় তারা পরস্পর অধিক হক্বদার এবং এদের সম্পর্কেই কোরআনে বলা হয়েছে তাঁদের মর্যাদা কিয়ামতের দিন বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং নবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে জান্নাতুন নাঈমে অবস্থান করবেন। এর প্রমাণ কোরআনের এ আয়াত যাতে বলা হয়েছে-

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের পরিবার ও বংশের যারা তাদের (ঈমানের ক্ষেত্রে) অনুসরণ করেছে সেই বংশধরদেরও আমি তাদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল হতে কিছুই কম করা হবে না।"[৯১]

তাঁরাই সেই ব্যক্তিবর্গ যাঁদের অধিকারকে আল্লাহ্ আদায় করতে বলেছেন-

وآت ذا القربىحقّه অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দের অধিকার আদায় কর। তাঁরাই খুমসের অধিকারী যা আদায় না করলে তাঁদের হক্ব আমাদের ওপর কিয়ামতের দিনও থেকে যাবে- "জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু অর্জন কর, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের.।" (সূরা আনফাল : ৪১)

তাঁরা ফাই সম্পদেরও অধিকারী কারণ আল্লাহ্ বলেছেন, "যা মহান আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে রাসূলকে দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়- স্বজনের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের।" (সূরা হাশর : ৭)

নবীর আহলে বাইতকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ বলেছেন,

(إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهّركم تطهيرا)

"হে আহলে বাইত! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ চান তোমাদের হতে পাপ পঙ্কিলতা দূরীভূত করতে ও সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।" (সূরা আহযাব : ৩৩)

তাঁদেরকেই আল্লাহ্ আলে ইয়াসিন বলে সম্বোধন করে সালাম দিয়েছেন- و سلام على الياسين অর্থাৎ আলে ইয়াসিনের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।[৯২] (সূরা সাফফাত : ১৩০)

তাঁরাই রাসূলের বংশধর যাঁদের ওপর দরূদ পড়াকে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য নামাযে ওয়াজিব করেছেন-

﴿إنّ الله و ملائكته يصلّون على النّبِيّ يا أيّها الّذين آمنوا صلّوا عليه و سلّموا تسليما﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর ওপর দরূদ পড়েন, হে ঈমানদারগণ! তোমরাও রাসূলের ওপর দরুদ পাঠ কর।[৯৩]

সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ওপর সালাম কিরূপে পাঠ করতে হবে জানি কিন্তু দরূদ কিরূপে পড়ব?" রাসূল (সা.) বললেন, "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ কর।

এ হাদীস হতে বুঝা যায় আহলে বাইতের ওপর দরূদ পাঠও এই আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আলেমগণ এই আয়াতকে আহলে বাইতের শানে বর্ণিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর আসসাওয়ায়েক গ্রন্থের ১১ অধ্যায়েও তাই করেছেন।[৯৪]

طوبى لهم তাদের জন্যই সুসংবাদ ও তাদের জন্যই চিরস্থায়ী বেহেশত এবং তার দ্বারগুলো উন্মুক্ত রয়েছে।[৯৫]

আরব কবি বলেছেন,

من يباريهم و في الشّمس معنى؟ مجهد متعب لمن باراها

"কে পারে তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে অর্থাৎ সূর্যের সাথে যে প্রতিযোগিতা করে তার ওপরই ক্লান্ত ও ান্তের অর্থ বর্তায় (অর্থাৎ সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে)।"

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে তাঁরা মনোনীত, আল্লাহর অনুমতিক্রমে পুণ্যকর্মে তাঁরা অন্যদের হতে অগ্রগামী। তাঁরা আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী এবং তাঁদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ বলেছেন,

"অতঃপর কিতাবকে (আল কোরআন) তাঁর বান্দাদের মধ্যে মনোনীত ব্যক্তিদের হাতে সমর্পণ করলাম। আর বান্দাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে এবং তারা ইমামদের নেতৃত্বকে মেনে নেয় নি।"

তাদের (বান্দাগণের) অনেকেই মধ্যপন্থী ও ন্যায়পরায়ণ এবং তারা আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী। যেমন কোরআনে এসেছে-

“এবং তাদের অনেকেই পুণ্যকর্মে অগ্রগামী হয়েছে এবং তারাই ইমাম।” এটি একটি বড় নিয়ামত।[৯৬]

আহলে বাইতের ফজীলত বর্ণনা করে যে সকল আয়াত এসেছে তা বর্ণনার জন্য এ পর্যন্তই যথেষ্ট বলে মনে করেছি। তবে আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি হযরত আলী (আ.)- এর শানে কোরআনে ৩০০ আয়াত বর্ণিত হয়েছে।[৯৭]

অন্য আরেকজন তাফসীরকারক বলেছেন, “কোরআনের এক চতুর্থাংশ আয়াত আহলে বাইতের শানে বর্ণিত হয়েছে এবং এটি আশ্চর্যের কোন বিষয় নয়, কারণ আহলে বাইত ও কোরআন একই সত্তার দুই অংশ।”

এখন পর্যন্ত যে সমস্ত স্পষ্ট আয়াত আপনার নিকট বর্ণনা করলাম তা কোরআনের মূল ও ভিত্তি (هُنَّ أُمُّ الْكِتَاب)। এ আয়াতগুলো খুব সহজে গ্রহণ করুন (মেনে নিন)। আর ভক্তি ও উদারতার সাথে সূক্ষ্মভাবে এসব আয়াত অধ্যয়ন করুন এবং এসব আয়াত সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান মহান আল্লাহর বাণী হতে গ্রহণ করুন যে সম্পর্কে অন্য কোন জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাকে অবগত করবে না।

ওয়াসসালাম

শ

তেরতম পত্র

২৩ জিলক্বদ ১৩২৯ হিঃ

আপনার কোন কোন যুক্তি প্রতিজ্ঞাগত দুর্বলতাপ্রসূত কারণ আয়াতের শানে নুযূল ও হাদীস দুর্বল।

আপনার লেখনীর জন্য ধন্যবাদ। আপনার কলমের প্রতি বিন্দু কালির জন্য আমার পক্ষ হতে সাবাস। পত্রের প্রতিটি পৃষ্ঠা কলমের খোঁচায় যেভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে যদি কেউ চায় ঐ লেখনীর বিরু কলম ধারণ করতে সেটি তার উর্ধ্বে এবং কোন সমালোচনাকারীর ধরাছোঁয়ার বাইরে। প্রতিটি পৃষ্ঠা ও ছত্র একটি উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং পাতাগুলো যেন সেদিকেই ধাবিত হচ্ছে। আপনার বাক্যবিন্যাস কাউকে আবৃত্তি করে শুনালে সুন্দর, অ ুত এ কথাগুলো আপনি শুনতে পাবেন।

কিন্তু আপনার সর্বোচ্চ লেখনীটিতে যেন জ্ঞানের স্রোতধারা প্রবাহিত হয়েছে আর তাতে অসংখ্য ঢেউ যেন উথলে উঠছে। সুস্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে দৃঢ় ও শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আপনার জন্য যতটুকু সম্ভব ছিল (এ ক্ষুদ্র পত্রে) তা আপনি বলেছেন। তাতে কমতি বা ত্রুটির কোন স্থান নেই। সুতরাং কেউ যদি আপনার যুক্তি ও প্রমাণকে খণ্ডন করতে চায় তবে সে গোঁয়ার্তুমি ও নীচতার দিকেই যেন যাত্রা করেছে এবং অন্যায় পথে অজ্ঞদের মত বিতর্ক শুরু করেছে গায়ের জোরে।

কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েত ও আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনাকারী শিয়া, যার ফলে তা আহলে সুন্নাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাঁদের হাদীস হতে প্রদর্শিত যুক্তিও তাঁরা গ্রহণ করেন না। সুতরাং সেগুলোর আপনি কি জবাব দিবেন? যদি অনুগ্রহপূর্বক জবাব দান করেন, বাধিত হবো।

ওয়াসসালাম

স

চৌদ্দতম পত্র

২৪ জিলক্বদ ১৩২৯ হিঃ

১। যুক্তির বিরুদে উত্থাপিত আপত্তিটি সঠিক নয়।

২। আপত্তি উত্থাপনকারী শিয়া সম্পর্কিত প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অনবগত।

৩। মিথ্যা হাদীস বর্ণনা নিষি করার ক্ষেত্রে শিয়ারা অন্যদের অপেক্ষা অধিকতর কঠোর।

১। জবাব হলো আপত্তি উত্থাপনকারী যুক্তি উপস্থাপনের প্রতিজ্ঞাসমূহে[৯৮] ভুল করেছেন।

যুক্তির প্রথম প্রস্তাব অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রতিজ্ঞাটিতে যেখানে বলা হয়েছে 'এই আয়াতসমূহের শানে নুযূল বর্ণনাকারীগণ সকলে শিয়া তা স্পষ্টতই ভুল। কারণ আমরা যেভাবে বর্ণনা করেছি আহলে সুন্নাহর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ ঘটনাসমূহ সেভাবেই বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহর হাদীসগ্রন্থ, মুসনাদ ও রেওয়ায়েতসমূহে এ বিষয়ের বর্ণনা শিয়াদের হতে অধিক যা আমরা আমাদের 'তানযিলুল আয়াতিল বাহিরাহ্ ফি ফাযলিল ইতরাতিত ত্বাহিরাহ'[৯৯] গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এজন্য আল্লামাহ্ বাহরাইনীর 'গায়াতুল মারাম' গ্রন্থটি দেখতে পারেন যা সর্বত্রই পাওয়া যায়।

আর দ্বিতীয় প্রস্তাব বা বৃহৎ প্রতিজ্ঞাটিতে বলেছেন, 'আহলে সুন্নাহ্ শিয়া রাবীদের রেওয়ায়েতকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না এবং তাদের বর্ণিত হাদীস যুক্তি প্রমাণের ক্ষেত্রে আনেন না' এ কথাটি অধিকতর অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত।

আমার কথার সপক্ষে প্রমাণ হলো আহলে সুন্নাহর গ্রন্থসমূহ এবং রেওয়ায়েতগুলো প্রসি ও সর্বপরিচিত শিয়া রাবীদের দ্বারা পূর্ণ। তাঁরা খোদ সিহাহ সিত্তাহসহ অন্যান্য গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হাদীসগুলোর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে শিয়া রাবীদের হতে হাদীসসমূহ উপস্থাপন করেন যদিও তাঁদেরকে শিয়া, বিচ্যুত, রাফেযী, সুন্নী বিরোধী, ইমামদের বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও অতির নকারী হিসেবে অভিহিত করেন।

অন্যদিকে স্বয়ং বুখারীর কয়েকজন শিক্ষক শিয়া বলে পরিচিত, যাঁদেরকে তিনি রাফেযী ও সুন্নীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী বলে মনে করেছেন তদুপরি এ ত্রুটিসমূহ বুখারী ও অন্যান্যদের দৃষ্টিতে তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা ও সততার বিষয়ে কোন ক্ষতিসাধন করে নি। এ কারণেই সিহাহ হাদীসগ্রন্থসমূহে তাঁদের রেওয়ায়েত প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও কি আমরা আপত্তি উত্থাপনকারীর কথায় কর্ণপাত করে বলব, "আহলে সুন্নাহ্ শিয়া রাবীদের রেওয়ায়েত বিশ্বাস করেন না বা তা থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করেন না?" না কখনোই নয়।

২। প্রতিবাদকারী ব্যক্তিবর্গ যদি সত্যকে জানতেন এবং বুঝতেন, শিয়ারা মহানবী (সা.)- এর পবিত্র আহলে বাইতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের অনুরূপ হওয়া ব্যতীত কিছু চায় না, তাঁদের পথ ব্যতীত ভিন্ন কারো পথে চলতে চায় না, তবে এটি স্বীকার করতেন যে, তাদের (শিয়া) রাবীদের মত সত্যবাদী, আমানতদার এবং বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাকারী পাওয়া দুরূহ বৈ কিছু নয়। শিয়া হাদীস বর্ণনাকারীদের জ্ঞানগত যোগ্যতা ও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অনুসৃত সতর্কতার জুড়ি মেলা ভার। দুনিয়া বিমুখতা, ইবাদত, সুন্দর চরিত্র, আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংযমের ক্ষেত্রে তাঁদের মত ব্যক্তিবর্গের সন্ধান লাভ দুষ্কর। তাঁরা তাঁদের দিবা- রাত্রির সমগ্র কর্ম প্রচেষ্টাকে যত্ন সহকারে ও যথার্থভাবে হাদীস মুখস্থকরণ, লিখন ও সংরক্ষণের কাজে কঠিনভাবে নিয়োজিত করেছেন। এক্ষেত্রে কেউ তাঁদের অগ্রগামী হতে পারে নি। সঠিক ও সত্যকে যাচাই- বাছাই ও হাদীসের বিশুদ্ধতার মান রক্ষায় তাঁদের সমপর্যায়ে কেউ নেই।

যদি আপত্তি উত্থাপনকারীর নিকট তাঁদের (শিয়া রাবীদের) প্রকৃতরূপ স্পষ্ট হত, তবে নির্দ্বিধায় তিনি তাঁর বিশ্বাস ও নির্ভরতার বাহনকে তাঁদের হাতে অর্পণ করতেন এবং সেই সাথে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিটিও তাঁদের হাতে দিয়ে নিরাপত্তা বোধ করতেন। কিন্তু তাঁদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞানতা তাঁকে অপরিচিত কোন শহরের অন্ধকার গলিতে নিক্ষেপ করেছে নতুবা তাঁকে এক অন্ধকার রাত্রিতে অন্ধ এক বাহনে বসিয়ে রেখেছে যে, কোন দিকেই তাঁর যাবার সুযোগ নেই।

এ কারণেই সিকাতুল ইসলাম কুলাইনী তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে সত্যবাদী বলে কথিত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে বাবভেই কুমী ও উম্মতের নেতা বলে পরিচিত মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে আলী তুসীর মত ব্যক্তিবর্গকে দোষারোপ করেছেন ও তাঁদের মূল্যবান ও পবিত্র গ্রন্থগুলোকে হালকা মনে করেছেন অথচ এ গ্রন্থগুলো আহলে বাইতের পক্ষ হতে তাঁদের নিকট আমানতস্বরূপ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁদের গ্রন্থগুলোর প্রতি উপেক্ষার অর্থ তাঁদের শিক্ষক যাঁরা জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে পৃথিবীর ওপর আদর্শ ও নমুনাস্বরূপ সেই ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি। আমাদের মনে রাখতে হবে এই ব্যক্তিবর্গ (শিয়া আলেম ও হাদীস বর্ণনাকারীগণ) তাঁদের সমগ্র জীবনকে মানুষের মাঝে দীন প্রচার এবং আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সা.) ও মুসলমানদের নেতা ও ইমামদের বাণী প্রচার ও প্রসারের জন্য নিয়োজিত করেছেন।

৩। ভালমন্দ সকল মানুষই স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, এ ব্যক্তিবর্গ মিথ্যা হতে দূরে ছিলেন। এই ব্যক্তিবর্গের লিখিত সহস্র গ্রন্থ যা সবখানেই পাওয়া যায় সেগুলো অধ্যয়নে দেখা যায় তাঁরা মিথ্যাবাদীদের প্রতি লানত বর্ষণ করেছেন এবং নিজেরাই এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, মিথ্যা হাদীস বর্ণনা বড় গুনাহ ও তার পরিণাম জাহান্নাম। তাঁরা এরূপ হাদীস বর্ণনার গুণে গুণান্বিত যেগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃত মিথ্যা রোযাকে বাতিল করে দেয় এবং তা যদি রমযান মাসে হয় তবে সে কারণে কাযা ও কাফফারাহ্ দু'টিই দিতে হবে (অন্যান্য ইচ্ছাকৃত রোযা ভঙ্গের কারণসমূহের মত)। তাঁদের বর্ণিত হাদীস ও ফিকাহ্ গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্টরূপে তাঁরা এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং কিরূপে তাঁদের হাদীস বর্ণনার বিষয়ে দোষারোপ করা হয় যখন তাঁদের জীবনী থেকে জানা যায় তাঁরা অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন এবং তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। এটি কিরূপ যে, খারেজী, মুর্জিয়া, কাদরিয়াদের এমন অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় না অথচ শিয়া ও আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের প্রতি এরূপ অভিযোগ আরোপ করা হয়। এটাকে কি প্রকাশ্য অনাচার বা অজ্ঞতা ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায়? অজ্ঞতা ও অপমান হতে আল্লাহর আ য় চাই। সেই সাথে আল্লাহর নিকট কামনা, তিনি যেন তাঁর প্রতি অনাচার ও শত্রুতা হতে আমাদের আ য় দান করেন।

ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم

ওয়াসসালাম

শ

পনরতম পত্র

২৫ জিলক্বদ ১৩২৯ হিঃ

১। সত্যের বিচ্ছুরণ।

২। আহলে সুন্নাহ্ যে শিয়া রাবীদের দলিল- প্রমাণ গ্রহণ করেন তার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে নমুনা স্থাপনের আহবান।

১। আপনার সর্বশেষ পত্রটি যথার্থ, সুশৃঙ্খল, সুস্পষ্ট উপমা সমৃ , ফলদায়ক ও লক্ষ্যের সন্নিকটবর্তী হয়েছে। এর বিষয়বস্তুও পাঠ্য, যথেষ্ট বিস্তৃত, পরস্পর সম্পর্কিত ও অস্পষ্টতা দূরকারী।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা পড়েছি এবং লক্ষ্য করেছি সমগ্র পত্র জুড়ে যেন বিদ্যুতের ঝলকানী এবং সত্যের ঝরণাধারা প্রবাহমান।

২। আহলে সুন্নাহর হাদীস লেখকগণ শিয়া রাবীদের হাদীস বর্ণনা করেন বলে দাবী করেছেন কিন্তু তার সপক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করেন নি। ভাল হতো যদি আহলে সুন্নাহর নিকট গ্রহণযোগ্য শিয়া রাবীদের নামগুলো উ ৃত করতেন এবং তাঁরা যে শিয়া ছিলেন এর সপক্ষে দলিল পেশ করতেন।

যদি সম্ভব হয়, আপনি তা উপস্থাপনের মাধ্যমে আমার বিশ্বাসের প্রদীপকে সমু ল করুন।

ওয়াসসালাম

স

ষোলতম পত্র

২ জিলহজ ১৩২৯ হিঃ

আহলে সুন্নাহর হাদীসসমূহের রাবীদের মধ্যে ১০০ জন শিয়া রাবী রয়েছেন!!

এ সুযোগে আপনার নির্দেশের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিচ্ছি। এ পত্রে যে সকল ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বোঝা বেঁধে প্রস্তুত হয়েছেন এবং ঘাড় লম্বা করে কৌতুহলের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন তাঁদের জন্য সুন্নী সূত্রে শিয়া রাবীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা আরবী বর্ণমালার পর্যায়ক্রমে তাঁদের পিতাদের নামসহ উল্লেখ করছি।

الف

১। আবান ইবনে তাগলিব ইবনে রিবাহ (কুফী ক্বারী)

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর নাম উল্লেখ করে বলেছেন, "আবান ইবনে তাগলিব কুফার অধিবাসী, প্রতিষ্ঠিত শিয়া কিন্তু সত্যবাদী, তাঁর সত্যবাদিতার কারণে তাঁর হাদীস আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাঁর বিচ্যুত ধারণা তাঁর দায়িত্বেই।" আরো বলেছেন, "আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইবনে মুঈন, আবু হাতেম তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।" ইবনে আদী তাঁর নাম উল্লেখ করে বলেছেন, "শিয়া বিশ্বাসে সে অটল ছিল।" এবং সা'দী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "সত্য হতে বিচ্যুত এবং প্রকাশ্যে বিচ্যুতি প্রদর্শন করত।" এ ছাড়াও যাহাবী তাঁর সম্পর্কে যা বলেছেন তা লক্ষ্য করুন, যাহাবী তাঁকে সেসব ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন যাঁদের থেকে মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর নামের পার্শ্বে তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। হাকাম, আ'মাশ ও ফুযাইল ইবনে আমর হতে আবান যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সহীহ মুসলিম ও সুনানে আরবাআহতে[১০০] রয়েছে। তদুপরি মুসলিম, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ, শো'বা এবং ইদরিস আউদী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১৪১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২। ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আমর ইবনে আসওয়াদ ইবনে আমর নাখয়ী

তাঁর মাতা ‘মালিকা’ ইয়াযীদ ইবনে কাইস নাখায়ীর কন্যা ও আসওয়াদের বোন। ইয়াযীদ ইবনে কাইসের দুই পুত্র ইবরাহীম ও আবদুর রহমান তাদের চাচা এবং কাইসের ভ্রাতা আলকামা ও উবাইয়ের ন্যায় কাইসের পুত্রগণ মুসলমানদের নিকট ‘সিকাহ’ ও নির্ভরযোগ্য বলে পরিচিত। সিহাহ সিত্তাহসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের লেখকগণ তাঁদের বর্ণিত হাদীস রেওয়ায়েত করে তাঁর থেকে বিভিন্ন বিষয় প্রমাণ করেছেন যদিও তাঁরা জানতেন এরা সকলেই শিয়া মতাবলম্বী। (১৬*)

ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘মা’আরিফ’ গ্রন্থের ২০৬ পৃষ্ঠায় ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদকে শিয়া (হাদীস বর্ণনাকারী) বলে উল্লেখ করে নিম্নোক্ত বিষয়কে অকাট্য বলেছেন-

তিনি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে তাঁর মায়ের চাচা আলকামা ইবনে কাইস, হাম্মাম ইবনে হারিস, আবু উবাইদা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, আবু উবাইদা ও তাঁর মামা আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এজন্য আপনি সহীহ মুসলিমে তিনি তাঁর মামা আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ, সাহম ইবনে মিনজাব, আবু মুয়াম্মার, উবাইদ ইবনে নাজলা ও আব্বাস হতে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলো দেখতে পারেন।

তেমনি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে মনসুর, আ’মাশ, জুবাইদ, হাকাম ও ইবনে আউন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া সহীহ মুসলিমে ফুজাইল ইবনে আমর, মুগীরাহ্, যিয়াদ ইবনে কালিব, ওয়াসিল, হাসান ইবনে উবাইদুল্লাহ্, হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান ও সাম্মাক তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবরাহীম ৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৫ বা ৯৬ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের শাসনামলে মৃত্যুবরণ করেন।

৩। আহমাদ ইবনে মুফাদ্দাল ইবনে কুফী বাদরী

আবু জারআ এবং আবু হাকীম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা দু’জনই আহমাদের শিয়া হবার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিলেন।

'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে আহমাদ সম্পর্কে আবু হাতেম বলেছেন, "আহমাদ ইবনে মুফাদ্দাল শিয়া হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে প্রথম সারির এবং একজন সত্যবাদী ব্যক্তি।"

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর নাম এনেছেন এবং সাংকেতিকভাবে তৎপার্শ্বে আবু দাউদ ও নাসায়ী লিখেছেন যার অর্থ আবু দাউদ ও নাসায়ী তাঁকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। (১৭*)

সহীহ আবু দাউদ ও নাসায়ীতে সুফিয়ান সাওরী, আসবাত ইবনে নাসর এবং ইসরাঈল হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪। ইসমাঈল ইবনে আবান (**আজদী কুফী**)

তিনি বুখারীর শিক্ষক ছিলেন। যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর নাম এনেছেন এবং তাঁর বিষয়ে বলেছেন, "বুখারী ও তিরমিযী তাঁদের সহীহতে তাঁকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন ও তাঁর হাদীস থেকে দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।" তিনি আরো বলেন, "ইয়াহিয়া ও আহমাদ তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন এবং বুখারী তাঁকে সত্যবাদী বলেছেন।" অন্যরাও তাঁকে শিয়া মতাবলম্বী বলে জানতেন। তিনি ২৮৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। অবশ্য কাইসারনী তাঁর মৃত্যুকাল ২১৬ হিজরী বলে মনে করেন।

বুখারী সরাসরি তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যেমনটি কাইসারনী বলেছেন ও অন্যরা তা সত্যায়ন করেছেন।

৫। ইসমাঈল ইবনে খালীফা মাল্লাঈ কুফী (**আবু ইসরাঈল বলে প্রসিদ্ধ**)

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে الكنى (কুনিয়াসমূহ) অধ্যায়ে তাঁর পরিচিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "সে একজন কট্টর শিয়া এবং সেই অংশের অন্তর্ভুক্ত যারা উসমানকে কাফির মনে করতো", তাঁর সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে যা এখানে বর্ণনা করা অপ্রয়োজনীয়

মনে করছি। এতদসত্ত্বেও তিরমিযী ও সুনান বর্ণনাকারী অনেকেই তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হাতেম তাঁর হাদীসকে উত্তম বলেছেন এবং প্রশংসা করেছেন। আবু জারআ বলেছেন, “সে সত্যবাদী, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আলীর বিষয়ে বাড়াবাড়ি রকমের বিশ্বাস পোষণকারী। আহমাদ বলেছেন, “তাঁর বর্ণিত হাদীস সংরক্ষণ করা উচিত।” ইবনে মুঈন তাঁর সম্পর্কে একস্থানে বলেছেন, “তিনি সিকাহ ও বিশ্বাসযোগ্য।” তাঁর বিষয়ে ফালাস মনে করেন তিনি মিথ্যাবাদী নন। সহীহ তিরমিযী ও অন্যরা হাকাম ইবনে উতাইবা এবং আতিয়া আউফী হতে তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তদুপরি ইসমাঈল ইবনে উমার বাজালী তাঁর সমপর্যায়ের অনেক হাদীস বর্ণনাকারী তাঁর হাদীস নকল করেছেন।

ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘আল মা’আরিফ’ গ্রন্থে তাঁকে শিয়া রাবী ও হাদীস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন।

৬। ইসমাঈল ইবনে যাকারিয়া আসাদী (খালকানী, কুফী)

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন, “ইসমাঈল ইবনে যাকারিয়া খালকানী কুফী একজন শিয়া ও সত্যবাদী। সিহাহ সিত্তাহর হাদীস লেখকগণ যাঁদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর নামের পাশে তিনি যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন তার অর্থ হলো সিহাহ সিত্তাহর লেখকগণ তাঁকে নির্ভরযোগ্য রাবী মনে করেন। সহীহ বুখারীর বর্ণনামতে তিনি মুহাম্মদ ইবনে সাওকা, উবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমর হতে এবং সহীহ মুসলিমে তিনি সুহাইল, মালিক ইবনে মুগুল ও অন্যান্যদের হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহাইন তাঁর সূত্রে আছেম হতে কয়েকটি হাদীস নকল করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে সাবাহ্ ও আবু রাবিই হতে তাঁর সূত্রে সহীহাইন (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) এবং মুসলিম, মুহাম্মদ ইবনে বাক্কার হতে তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১৭৪ হিজরীতে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শিয়া হবার বিষয়টি সর্বজনবিদিত। তাঁর সম্পর্কে এমনও বলা হয়েছে যে, তিনি বিশ্বাস করতেন, হযরত মূসা (আ.)- কে যিনি তুর পর্বতে আহবান করেছিলেন

তিনি আলী ইবনে আবি তালিব ছিলেন এবং প্রথমও আলী, শেষও আলী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যও আলী। অবশ্যই এ বিষয়গুলো মিথ্যাবাদীরা অন্যায় ও ভিত্তিহীনভাবে তাঁর নামে প্রচার করেছে এজন্য যে, তিনি হযরত আলীর অনুসারী ও অন্যদের থেকে এ বিষয়ে ৫ ষ্ঠ ছিলেন।

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে বলেছেন, যে বিষয়গুলো খালকানীর নামে প্রচার করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন কারণ একথাগুলো ধর্মহীন ব্যক্তিদের কথা।

৭। ইসমাঈল ইবনে ইবাদ ইবনে আব্বাস তালেকানী, আবুল কাসেম (সাহেব ইবনে আব্বাদ বলে পরিচিত)

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর নামের পাশে সাংকেতিক চিহ্ন (د ت) লিখেছেন যার অর্থ আবু দাউদ ও তিরমিযী তাঁর হাদীস হতে দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। অতঃপর তাঁর পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি একজন শিয়া কিন্তু আরবী ভাষায় দক্ষ এবং হাদীসশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী।"

আমি বলতে চাই তাঁর শিয়া হবার বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ কারণেই তিনি ও তাঁর পিতা উভয়েই এত মর্যাদা ও সম্মান থাকা স ও আলে বুওয়াইহদের শাসনকার্যে রাষ্ট্রীয় পদ গ্রহণ করেন। তাদের মন্ত্রীদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম সাহেব পদবী লাভ করেন। তারপর হতে যে কেউ মন্ত্রী পদ লাভ করলে তাকে ঐ নামে ডাকা হত।

তিনি মুয়াইয়েদুদ্দৌলা আবু মানসুর ইবনে রোকনুদ্দৌলা ইবনে বুওয়াইহ- এর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ও ৩৭৩ হিজরী সনের শা'বান মাসে মুয়াইয়েদুদ্দৌলা গোরগানে মৃত্যুবরণ করলে মুয়াইয়েদুদ্দৌলার ভ্রাতা আবুল হাসান আলী ফখরুদ্দৌলাও ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁকে উক্ত পদে বহাল রাখেন। তাঁর দরবারে সাহেবের বিশেষ মর্যাদা ছিল এবং নিজ পিতা আব্বাদ ইবনে আব্বাস যেরূপ বুওয়াইহদের শাসনকার্যে বিশেষ প্রভাব রাখতেন ত প তিনিও প্রভাবশালী ছিলেন।

৩৮৫ হিজরীর ২৪ সফর যখন তিনি ৫৯ বছর বয়সে রেই শহরে ইন্তেকাল করেন, শহরের সকল দোকান- পাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ও সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল, শহরের সকল মানুষ তাঁর

বাড়ির সামনে সমবেত হয়ে তাঁর জানাযার জন্য অপেক্ষা করছিল, স্বয়ং ফখরুদ্দৌলা, তাঁর মন্ত্রীরা এবং সেনাবাহিনীর প্রধানগণ শোকের পোষাক পরিধান করেন; যখন তাঁর জানাযা বাড়ী হতে বের করা হয় সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ফখরুদ্দৌলা সাধারণ মানুষের সাথে হেঁটে জানাযায় অংশগ্রহণ করেন এবং কয়েকদিন শোক পালনের নির্দেশ দেন। কবিগণ তাঁর মৃত্যুতে শোকগাঁথা রচনা করেন। পরবর্তী সকলেই তাঁর প্রশংসা করেছেন।

আবু বকর খাওয়ারেজমী বলেন, সাহেব ইবনে আব্বাদ মন্ত্রণা পরিষদের কোলে প্রশিক্ষিত হয়েছেন (যেহেতু তাঁর পিতা মন্ত্রী ছিলেন), রাজকুটীরে তাঁর যাতায়াত সব সময় ছিল ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মন্ত্রীত্বের স্তন হতে দু   তিনিই পান করেছেন। যেমনটি আবু মাইদ বুসতামী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

ورث الـــــــــوزارة كــــــــابراً عـــــــن كــــــابر   موصــــــــــــولة الإســــــــــناد بالإســـــــــــناد

يـــــــــروى عـــــــن العبــــــــاس عبــــــادوزا   رتـــــــه و إسماعيــــــــــل عـــــــن عبــــــــاد

“যেরূপ সহীহ হাদীসের রেওয়ায়েতের সনদগুলো পরস্পর সম্পর্কিত থাকে ও কোন সনদই বাদ যায় না সেরূপ তিনি মন্ত্রীত্বরূপ উত্তরাধিকার সম্মানিত হতে সম্মানিতের মাধ্যমে লাভ করেছেন, ইবাদ আব্বাস হতে এবং আব্বাস ইসমাঈল হতে উত্তরাধিকার সূত্রে তা লাভ করেছিলেন।”

সায়ালেবী তাঁর ‘ইয়াতীমাহ্’ গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “তাঁর জ্ঞান, চরিত্র ও মর্যাদা বর্ণনা করতে পারে এরূপ কোন বিশেষণ আমার সম্মুখে নেই। এমন একটি বাক্য যা তাঁর দানশীলতা, অনুগ্রহ, তাঁর লক্ষ্য ও সৎ কর্মের বর্ণনা দানে সক্ষম এবং যাতে তাঁর সকল সুন্দর বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটেছে এরূপ বাক্য আমি প্রস্তুত করতে পারি নি। কারণ আমার বাণীর দীর্ঘতা তাঁর মর্যাদার সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছার ক্ষমতা রাখে না, আমার সকল প্রচেষ্টা তাঁর সরলতম বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় অক্ষম।” অতঃপর তাঁর কলমকে সাহেবের বৈশিষ্ট্য ও গুণ বর্ণনায় মুক্ত করে দিয়েছেন।

সাহেব অনেক মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন তার মধ্যে আরবী বর্ণমালার পর্যায়ক্রমে একটি অভিধান লিখেছেন যার নাম ‘আল মুহিত’।

তাঁর একটি বিরল গ্রন্থাগার ছিল। এর পক্ষে প্রমাণ হলো সামানী সুলতান নূহ ইবনে মানসুরের পত্রের প্রতি তাঁর জবাব। ঐ পত্রে নূহ তাঁকে তাঁর রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণের আহবান জানান। জবাব পত্রে তিনি নূহকে জানান তাঁর পক্ষে স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব নয় কারণ তাঁর প্রয়োজনীয় বইয়ের পরিমাণ এত অধিক যে, চারশ’ উটের প্রয়োজন সেগুলো বহন করার জন্য এবং এগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ যে, তা ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এথেকে তাঁর গ্রন্থশালার বিশালতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তাঁর সম্পর্কে এটুকু বর্ণনাই এখানে পর্যাপ্ত মনে করছি।

৮। ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবি কারিমা কুফী (মুফাসসির, যিনি সিদ্দী নামে পরিচিতি ও প্রসিদ্ধ)

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে তাঁকে শিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর হুসাইন ইবনে ওয়াকেদ মারওয়াজী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি সিদ্দীকে হযরত আবু বকর ও উমরের বিরু কথা বলতে শুনেছেন। এতদসে ও সুফিয়ান সাওরী, আবু বকর ইবনে আয়াশ ও তাঁদের সমপর্যায়ের অন্যান্য রাবীরা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসলিম ও সুনানে আরবাআহর লেখকগণ তাঁর হাদীস হতে দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন এবং তাঁর হাদীসকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁকে সত্যবাদী বলেছেন। ইবনে আদী বলেছেন, “তিনি সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য।” ইয়াহিয়া কাত্তান বলেছেন, “তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন অসুবিধা নেই।” ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ বলেছেন, “আমি সিদ্দী সম্পর্কে কারো নিকট ভাল বৈ মন্দ শুনি নি। সকলেই তাঁর হাদীস নকল করেছেন।”

ইবরাহীম নাখায়ী সিদ্দীর পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁকে কোরআন তাফসীর করতে দেখে বললেন, “তাফসীরকারকদের পন্থায় সে তাফসীর করছে” অর্থাৎ শিয়া মাজহাব অনুযায়ী

তাফসীর করছে। এ বিষয়ে ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে যাহাবী যা বলেছেন তা অধ্যয়ন করুন।

সহীহ মুসলিমে তিনি আনাস ইবনে মালিক, সা’দ বিন উবাদা ও ইয়াহিয়া ইবনে আব্বাদ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসলিম ও সুনানে আরবাআহতে আবু ইবাদ, সুফিয়ান সাওরী, হাসান ইবনে সালিহ, জায়িদা এবং ইসরাঈল তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি এ সকল ব্যক্তিত্বের শিক্ষক ছিলেন। ১২৭ হিজরীতে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

৯। ইসমাঈল ইবনে মূসা ফাজারী কুফী

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে ইবনে আদীর বরাত দিয়ে বলেছেন- শিয়া মতবাদের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক ও বাড়াবাড়ির দোষে দুষ্ট ছিলেন ইসমাঈল। আবদান (যাহাবীর বর্ণনানুসারে) বলেছেন, “হান্নাদ ও ইবনে আবি শাইবা আমার ইসমাঈলের নিকট গমনকে অপরাধ বলে মনে করতেন এবং বলতেন : কেন ঐ ফাসেক যে পূর্ববর্তী লোকদের নিন্দা করে তার নিকট যাওয়া- আসা কর? এতদসত্ত্বে ও খুজাইমা ও আবু উরুবা তাঁর থেকে চরিত্র ও গুণাবলী অর্জন করেছেন। তিনি তাঁদের এবং আবু দাউদ ও তিরমিযীরও শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা ইসমাঈল হতে হাদীস শিক্ষা দান করেছেন এবং তাঁদের হাদীসগ্রন্থে তাঁর হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ ও দলিল উপস্থাপন করেছেন। আবু হাতেম বলেছেন, “তিনি সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য।” নাসায়ী বলেছেন, “তাঁর হাদীস অনুযায়ী আমল করতে কোন অসুবিধা নেই।” একথাগুলো সবই যাহাবীর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে রয়েছে। সহীহ তিরমিযী ও সুনানে আবু দাউদ শরীফে তিনি মালিক, শারিক, উমর ইবনে শাকির ও আনাসসহ অনেকের হতেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ২৪৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। অনেকেই তাঁকে সিদ্দীর দৌহিত্র মনে করতেন, তবে তিনি তা অস্বীকার করেন।

ت

১০। তালিদ ইবনে সুলাইমান কুফী আ'রাজ

ইবনে মুঈন তাঁর নাম উল্লেখ করে বলেছেন, "তিনি উসমানের নিন্দা করায় উসমানের গোত্র ও বংশের লোকজন ও দাসরা তীর নিক্ষেপ করে তাঁর পা ভেঙ্গে দেয়।"

আবু দাউদ বলেছেন, "সে রাফেযী এবং হযরত আবু বকর ও উমরের নিন্দা করত।" এসব জানার পরও আহমাদ ও ইবনে নুমাইর তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন এবং সেসব হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আহমাদ বলেছেন, "তালিদ শিয়া মতাদর্শী কিন্তু তাঁর হাদীসানুযায়ী আমল করতে কোন অসুবিধা নেই।" যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন আলেমের মন্তব্য এনেছেন যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি। তিনি তাঁর নামের পাশে সাংকেতিক চিহ্ন তিরমিযী লিখেছেন অর্থাৎ তিরমিযী তাঁর সূত্রে আতা ইবনে সায়িব এবং আবদুল মালিক ইবনে উমাইর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ث

১১। সাবিত ইবনে দিনার (আবু হামযাহ্ সুমালী বলে খ্যাত)

তিনি যে শিয়া ছিলেন এ বিষয়টি দিবালোকের মত পরিষ্কার ও উ ল। যাহাবী বর্ণনা করেছেন, "আবু হামযাহর উপস্থিতিতে উসমানের নাম উঠলে জিজ্ঞাসা করতেন : উসমান কে? এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য এটিই ছিল যে, উসমানের প্রতি তাঁর উপেক্ষার দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটান।" যাহাবী আরো বলেছেন, "সুলায়মানী আবু হামযাহকে রাফেজী বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁর নামের পার্শ্বে সাংকেতিক তিরমিযী ব্যবহার করেছেন কারণ তিরমিযীতে তাঁর সনদে ও সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।"

আবু নাঈম ও ওয়াকী তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর হাদীস হতে দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তিরমিযী তাঁর সূত্রে আব্বাস, শা'বী এবং তাঁদের সমসাময়িক আরো দু'জন রাবী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১২। সুয়াইর ইবনে ফাখিতাহ আবু জাহম কুফী (উম্মে হানী বিনতে আবু তালিবের দাস)

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর নাম এনেছেন এবং ইউনুস ইবনে আবু ইসাহাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাফেজী ছিলেন। এতদসত্ত্বে ও সুফিয়ান ও শো'বাহ তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন। সহীহ তিরমিযীর মতে তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার এবং যাইদ ইবনে আরকাম হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইমাম বাকির (আ.)-এর সমসাময়িক এবং তাঁর খাদিম হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আমর ইবনে জারকাযী, ইবনে কাইস মাছির এবং সালত ইবনে বাহরামের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের দাবীর পক্ষে প্রমাণ।

ج

১৩। জাবির ইবনে ইয়াযীদ ইবনে হারিস জো'ফী কুফী

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর নাম উল্লেখ করে বলেছেন, "তিনি একজন শিয়া আলেম" এবং সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি জাবিরকে বলতে শুনেছেন যে, নবীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আলী (আ.)-এর নিকট স্থানান্তরিত হয়েছে, এভাবে আলী হতে ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের মাধ্যমে ইমাম সাদিক (আ.) সে জ্ঞান লাভ করেছেন। জাবির ইমাম সাদিক (আ.)-এর সমকালীন ছিলেন। যাহাবী যুহাইর হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শুনেছেন, জাবের বলতেন, "আমি পঞ্চাশ হাজার হাদীস জানি যা কাউকে বলি নি।" একদিন একটি হাদীস বর্ণনা করে বললেন, "এটি ঐ পঞ্চাশ হাজার হাদীসের একটি।" যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন, "যখনই জাবির কোন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন : নবীগণের প্রতিনিধিদের মধ্যে সর্বোত্তম প্রতিনিধি একথা বলেছেন।" যাহাবী ইবনে আদী হতে জাবির সম্পর্কে বলেছেন, যে কারণে জাবিরের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে তন্মধ্যে তিনি রাজআ'ত বা মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় বিশ্বাস করতেন।

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদালে' যায়েদা হতে বর্ণনা করেছেন, জাবির জো'ফী রাফেজী ছিলেন ও প্রথম তিন খলীফার নিন্দা করতেন। তদুপরি নাসায়ী ও আবু দাউদ তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা

করে বিভিন্ন স্থানে দলিল হিসাবে পেশ করতেন। এজন্য সহীহ্ নাসায়ী ও আবু দাউদ শরীফের নামাযের সাহু সিজদার অধ্যায়ে তাঁর বর্ণিত হাদীস দেখতে পারেন।

শো'বা, আবু আওয়ানাহ্ ও আরো অনেকেই তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন।

যাহাবী তাঁর মিযান গ্রন্থে সাংকেতিকভাবে আবু দাউদ ও তিরমিযী তাঁর নামের পাশে লিখেছেন এটি বোঝানোর জন্য যে, আবু দাউদ ও তিরমিযীর সনদে তিনি অন্যতম হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেছেন, "জাবির জো'ফী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে একজন সতর্ক, খোদাভীরু ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন।" সুফিয়ান আরো বলেছেন, "আমি তাঁর ন্যায় পরহেজগার ব্যক্তি কাউকে দেখি নি।"

শো'বা বলেছেন, "জাবির একজন সত্যবাদী মানুষ। যখনই তিনি 'আমাকে খবর দেয়া হয়েছে', 'আমাকে বলা হয়েছে' বা 'আমি বলতে শুনেছি' এভাবে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে পরিগণিত হতেন।"

ওয়াকী বলেছেন, "সকল কিছুতেই সন্দেহ করতে পারো কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ করো না যে, জাবির জো'ফী একজন সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী।"

ইবনে আবদুল হাকীম ইমাম শাফেয়ীকে বলতে শুনেছেন, "আবু সুফিয়ান সাওরী শো'বাকে বলেছেন : যদি জাবির জো'ফীকে খারাপ কিছু বল বা তার নিন্দা কর, তবে আমিও তোমাকে ছাড়বো না।"

জাবির ১২৭ বা ১২৮ হিজরীতে এ নশ্বর ধরাধাম ত্যাগ করেন। মহান আল্লাহর রহমত তাঁর ওপর বর্ষিত হোক।

১৪। জাবির ইবনে আবদুল হামিদ দ্বাবি কুফী

ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থে তাঁকে শিয়া বলেছেন। যাহাবী তাঁর মিযান গ্রন্থে তাঁর নামের পার্শে যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন তার অর্থ সিহাহ সিত্তাহর সকল লেখকই তাঁর হাদীস হতে দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করতেন এবং তাঁর হাদীসের ওপর নির্ভর করতেন। যাহাবী

তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন, "তিনি রেই শহরের একজন আলেম এবং সত্যবাদী। তাঁর হাদীস সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী এ বিষয়টির ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে।"

তিনি আ'মাশ, মুগীরাহ্, মানসুর, ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ এবং আবু ইসাহাক শায়বানী হতে যেসকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে লিপিব   হয়েছে। এছাড়া এ দুই হাদীসগ্রন্থে তিনি কুতাইবা ইবনে সাঈদ, ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া এবং উসমান ইবনে আবি শাইবা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা অধ্যয়ন করতে পারেন। ১৮৭ হিজরীতে ৭৭ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৫। জা'ফর ইবনে যিয়াদ আহমার কুফী

আবু দাউদ তাঁর কথা বলেছেন, "সত্যবাদী ও শিয়া মতাবলম্বী।" জাওযাজানী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "শিয়া মতাবলম্বী হওয়ায় তিনি পথচ্যুত।" ইবনে আদী বলেছেন, "তিনি একজন সৎ কর্মশীল ও পুণ্যবান ব্যক্তি।" তাঁর প্রপৌত্র হুসাইন ইবনে আলী ইবনে জা'ফর ইবনে যিয়াদ বলেছেন, "আমার প্রপিতা জা'ফর খোরাসানের শিয়াদের প্রধান ছিলেন।"

আবু জা'ফর দাওয়ানেকী নির্দেশ দিয়েছিল তাঁকে বন্দী করে তার নিকট উপস্থিত করার জন্য। তাই একদল শিয়াসহ তাঁকে শৃঙ্খলাব   ও গলায় বেড়ী পড়িয়ে তার নিকট নেয়া হয়। দাওয়ানেকী তাঁকে আমৃত্যু মাটির নীচের একটি বন্দীশালায় আব   করে রাখে।

ইবনে উয়াইনাহ্, ওয়াকি, আবু গাসসান মাহদী, ইয়াহিয়া ইবনে বিশর হারিরী ও ইবনে মাহদী তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। সুতরাং তিনি এদের শিক্ষক ছিলেন।

ইবনে মুঈন ও অন্যরা তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আহমাদ বলেছেন, "তিনি হাদীস বর্ণনার যোগ্যতার অধিকারী।"

যাহাবী তাঁর মিযান গ্রন্থে উপরোক্ত বিষয়গুলো এনেছেন। তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে তিরমিযী ও নাসায়ী সাংকেতিকভাবে লিখেছেন এটি বোঝানোর জন্য যে, তাঁরা তাঁর হাদীসকে প্রামাণ্য মনে

করতেন। বায়ান ইবনে বিশর, আতা ইবনে সায়েব এবং তাঁদের সমকালীন অনেকের হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ তিরমিযী ও নাসায়ীতে এসেছে। তিনি ১৬৭ হিজরীতে মারা যান।

১৬। জা'ফর ইবনে সুলাইমান দ্বাবয়ী বাসরী (আবু সুলাইমান)

ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থের ২০৬ পৃষ্ঠায় তাঁকে শিয়া হাদীসবিদগণের মধ্যে এনে তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আহমাদ ইবনে মিকদাম তাঁকে রাফেজী বলেছেন। ইবনে আদী তাঁকে শিয়া হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, "তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণকে আমি ত্রুটি বলে মনে করি না, কারণ তাঁর হাদীস উপেক্ষা করার মত নয়, বরং তাঁর হাদীস বর্ণনা প্রশংসার যোগ্য এবং সেগুলো গ্রহণ করা উচিত।"

আবু তালিব বলেছেন, "আহমাদকে বলতে শুনেছি, জা'ফর ইবনে সুলাইমান দ্বাবয়ী'র হাদীস বর্ণনায় সমস্যা নেই এবং তা গ্রহণযোগ্য। তখন তাঁকে বলা হলো : সুলাইমান ইবনে হারব বলেন : জা'ফরের হাদীস লিপিব করা উচিত নয়। জবাবে তিনি বলেন : না, তিনি এরূপ কথা বলেন নি। জা'ফরের সমস্যা শুধু এটিই যে, সে শিয়া এবং আলীর প্রশংসায় প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেছে।"

ইবনে মুঈন বলেন, "আবদুর রাজ্জাক হতে এমন কিছু শুনেছি যাতে করে তাঁর মাজহাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পেরেছি। আবদুর রাজ্জাককে প্রশ্ন করলাম : আপনার শিক্ষকগণ মুয়াম্মার, ইবনে জারীহ, আউজাই, মালিক ও সুফিয়ান সকলেই সুন্নী ছিলেন। আপনি আহলে বাইতের পথকে কার থেকে শিক্ষা করেছেন? তিনি জবাব দিলেন : আমি জা'ফর ইবনে সুলাইমান দ্বাবয়ীকে একজন জ্ঞানী ও হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছি এবং তাঁর থেকেই শিয়া মাজহাবের শিক্ষা গ্রহণ করেছি।"

কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর মুকাদ্দামী ইবনে মুঈনের বিপরীত ধারণা পোষণ করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জা'ফর আবদুর রাজ্জাক হতে শিয়া মাজহাব শিক্ষা করেছেন। এজন্য মুহাম্মদ

আবদুর রাজ্জাককে অভিশাপ দিয়ে বলতেন, "হায়! আবদুর রাজ্জাক যদি মরতো! কারণ সেই জা'ফরকে বিভ্রান্ত করেছে ও শিয়া মাজহাব গ্রহণ করিয়েছে।"

আকিলী সাহল ইবনে আবি খাদ্‌সাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন, "জা'ফর ইবনে সুলাইমানকে বললাম : শুনলাম হযরত আবু বকর ও উমরকে আপনি কটু ভাষায় সম্ভাষণ করেন। জবাবে বললেন : অবশ্যই না, তবে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি।"

ইবনে হাইয়ান তাঁর 'সিকাহ্' গ্রন্থে জারির ইবনে ইয়াযীদ ইবনে হারুন থেকে বর্ণনা করেছেন, "আমার পিতা আমাকে জা'ফর দ্বাবয়ীর নিকট প্রেরণ করে বলতে বললেন : আমার পিতার নিকট খবর পৌঁছেছে আপনি হযরত আবু বকর ও উমরকে কটু ভাষায় সম্ভাষণ করেন। তিনি বললেন : না। তবে আমি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি।" সুতরাং বোঝা যায় তিনি রাফেযী ছিলেন।

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে এতক্ষণ আমরা যা বললাম তাই লিখেছেন, অতঃপর স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, "দ্বাবয়ী শিয়া আলেমদের মধ্যে একজন দুনিয়াবিমুখ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।" যাহাবীর বর্ণনামতে মুসলিম তাঁর সহীহ মুসলিমে তাঁর হাদীসকে ভিত্তি করে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন ও এমন হাদীসও বর্ণনা করেছেন যা শুধু তাঁর থেকেই বর্ণিত হয়েছে।

যেসকল হাদীস তিনি সাবিত বানানী, জা'দ ইবনে উসমান, আবু ইমরান জওনী, ইয়াযীদ ইবনে রাশ্ক ও সায়ীদ জারিরি হতে বর্ণনা করেছেন এবং যেসকল হাদীস কুতান ইবনে নুছাইর, ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া, কুতাইবা, মুহাম্মদ ইবনে উবাইদা ইবনে হিসাব, ইবনে মাহদী ও মুসাদ্দাদ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন তা সহীহ মুসলিমে দেখতে পারেন।

তিনিই রাসূল (সা.) হতে ইয়াযীদ রাশ্ক, মাতরাফ ও ইমরান ইবনে হুসাইন সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা.) এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন ও যার প্রধান হিসেবে আলী (আ.)- কে মনোনীত করেন। অতঃপর সৈন্যবাহিনীর এক অংশ আলীর বিরু রাসূলের নিকট অভিযোগ করে। তখন রাসূল (সা.) বলেন : আলী সম্পর্কে তোমরা কি বলতে চাও? আলী আমা হতে এবং

আমিও আলী হতে, সে আমার পর সকল মুমিনের নেতা ও অভিভাবক।” এ হাদীসটি নাসায়ী তাঁর হাদীসগ্রন্থে এনেছেন। ইবনে আদী তাঁর নাসায়ী শরীফের সহীহ হাদীসসমূহের তালিকায় তা লিপিব করেছেন এবং যাহাবীও জা’ফর দ্বাবয়ীর অবস্থা ও পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে বিষয়টিকে সত্যায়ন করেছেন।

তিনি ১৭৮ হিজরীর রজব মাসে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

১৭। জামিই ইবনে উমাইরা ইবনে সা’লাবা কুফী (**তাইমী তাইমুল্লাহ্**)

‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে তাঁর পরিচয় পর্বে আবু হাতেম তাঁকে যেরূপ বর্ণনা করেছেন তা হলো : তিনি কুফার অধিবাসী, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সৎ, একজন প্রকৃত শিয়া ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।(১৮*)

ইবনে হাব্বান বলেছেন (যেমনটি মিযান গ্রন্থে এসেছে) “তিনি রাফেযী।” আমার মতে যেহেতু আলা ইবনে সালিহ, সাদাকাত ইবনুল মুসান্না এবং হাকীম ইবনে জুবাইর তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাই তিনি এদের শিক্ষক ছিলেন।

সুনান গ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণিত তিনটি হাদীস রয়েছে। যাহাবীর বর্ণনা মতে তিরমিযী তাঁকে উত্তম বলেছেন এবং তাঁর প্রশংসা করেছেন।

জামিই ইবনে উমাইরা তাবেয়ীনের অন্তর্ভুক্ত। তিনি হযরত আয়েশা এবং ইবনে উমর হতে হাদীস শুনেছেন। ইবনে উমর হতে তিনি যেসকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তার অন্যতম হলো : রাসূলকে অনন্তর বলতে শুনেছি, আলীকে বলতেন, أنت أخي في الدّنيا و الآخرة অর্থাৎ তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার ভাই।

ح

১৮। হারিস ইবনে হাছিরাহ্ আজাদী কুফী (**আবু নোমান**)

আবু হাতিম রাজী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি একজন প্রকৃত ও সম্ভ্রান্ত শিয়া।" আবু আহমাদ জুবাইরী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি রাজাআ'ত (মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ায়) বিশ্বাস করতেন।" ইবনে আদী বলেছেন, "যদিও তাঁকে আমি দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী মনে করি তদুপরি তাঁর হাদীস সংকলিত হওয়া উচিত, তিনি ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত যা কুফাকে শিয়া আগুনে ভস্মীভূত করেছে।" জানিয বলেছেন, "আমি জারীরকে প্রশ্ন করলাম : হারিস হাছিরাহকে দেখেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, একজন বৃ জ্ঞানী ব্যক্তি, স্বল্পভাষী, গম্ভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী।" ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন তাঁর নাম এভাবে স্মরণ করেছেন, "নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী এবং শিয়া।" নাসায়ীও তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনে মুগুল, আবদুল্লাহ্ ইবনে নুমাইর এবং তাঁদের সমকালীন অনেকেই তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন অর্থাৎ তিনি তাঁদের শিক্ষক ছিলেন এবং তাঁরা তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতেন।

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন। যে সকল হাদীস তিনি যাইদ ইবনে ওয়াহাব, আকরামা ও অন্যান্যদের হতে বর্ণনা করেছেন তা সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

নাসায়ী আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব রাওয়াজানী, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মালিক মাসউদী সূত্রে হারিস ইবনে হাছিরাহ্ হতে এবং তিনি যাইদ ইবনে ওয়াহাব হতে বর্ণনা করেছেন, "আলী (আ.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূলের ভাই, আমি ব্যতীত যে কেউ এই দাবি করবে, সে মিথ্যাবাদী, "

হারিস ইবনে হাছিরাহ্ আবু দাউদ সাবিয়ী হতে এবং তিনি ইমরান ইবনে হুসাইন হতে বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম ও আলী তাঁর পাশে বসেছিলেন তখন রাসূল (সা.) এ আয়াত তেলাওয়াত করেন-

“বল, কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে ও কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন?” (সূরা নমল : ৬২)

আলী তা বণ করে ভয়ে কম্পমান হলে রাসূল তাঁর পিঠে হাত রেখে বললেন, “তোমাকে মুমিন ব্যতীত কেউ ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ব্যতীত কেউ তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না এবং কিয়ামত পর্যন্ত এটি অব্যাহত থাকবে।”

এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে কাসির ও অন্যান্যরা হারিস ইবনে হাছিরাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। যাহাবী নাফি ইবনে হারিস হতে একই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর হাদীসের সনদ হারিস ইবনে হাছিরাহতে পৌঁছলে তাঁর সম্পর্কে বলেন, “তিনি একজন সত্যবাদী কিন্তু শিয়া ব্যক্তিত্ব।”

১৯। হারিস ইবনে আবদুল্লাহ্ হামেদানী

তিনি হযরত আলী (আ.)- এর বিশেষ সাহাবী ও তাবেয়ীনের অন্তর্ভুক্ত। তিনি যে শিয়া ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি প্রথম ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে রিজালশাস্ত্রবিদ ইবনে কুতাইবা শিয়া রিজাল (অর্থাৎ অন্যতম শিয়া হাদীস বর্ণনাকারী) বলেছেন।

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে তাঁকে তাবেয়ীদের অন্যতম বড় আলেম বলে উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে হাইয়ান সূত্রে বলেছেন, “তিনি শিয়া বিশ্বাসে বাড়াবাড়ি করতেন।” অতঃপর আহলে সুন্নাহর পক্ষ হতে তাঁর ওপর বিভিন্ন অভিযোগ ও দোষারোপের বিবরণ দিয়ে বলেছেন, “তদুপরি তাঁরা স্বীকার করতেন তিনি সবচেয়ে বড় ফকীহ্ ও আলেম এবং ফিকাহশাস্ত্রের উওরাধিকার বিষয়ক হিসাব সুন্দরভাবে সামাধান করতে পারতেন।” সুনানে আরবাআহতে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে এবং নাসায়ী হাদীসের রাবীদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কড়াকড়ি সে ও তাঁর হাদীস হতে দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন ও তাঁকে শক্তিশালী রাবী মনে করতেন।

যদিও শিয়া হবার কারণে আহলে সুন্নাহ্ তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন তথাপি হাদীসগ্রন্থ সমূহের সকল অধ্যায়েই তাঁরা তাঁর হাদীস এনেছেন। শা'বী তাঁকে মিথ্যাবাদী বললেও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন।

যাহাবী তাঁর 'মি'যানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে বলেছেন, "শা'বী সম্ভবত হারিসের বর্ণনার ধরন ও তাঁর বর্ণিত বিভিন্ন কাহিনীকে অস্বীকার করেছেন কিন্তু রাসূল (সা.) হতে তাঁর বর্ণিত হাদীসকে নয়।"

আরো বলেছেন, "হারেস জ্ঞান ও ইলমের এক বিশাল পাত্র। অতঃপর মুহাম্মদ ইবনে সিরিনের সূত্রে বলেছেন, "আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের পাঁচজন ছাত্র ছিল যাঁরা তাঁর হতে জ্ঞান শিক্ষা করেছেন। আমি তাঁদের চারজনকে দেখেছি কিন্তু পঞ্চম ব্যক্তি হারিসকে দেখি নি যদিও তিনি জ্ঞান ও চরিত্রে অন্যদের হতে ে ষ্ঠ ছিলেন।"

এর সঙ্গে তিনি এ কথাটি যুক্ত করেছেন, "আলকামা, মাসরুক ও উবাইদার মধ্যে কে উত্তম সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।" আমার মতে মহান আল্লাহ্ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের শা'বীর ওপর ে ষ্ঠত্ব দিয়েছেন যাঁরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন ও তাঁকে নীচ ও হীন বলেছেন অর্থাৎ তাঁর উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন (এ সকল আলেম হারিস সম্পর্কে শা'বীর মিথ্যা অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান করছেন)।

যেমন ইবনে আবদুল্লাহ্ তাঁর 'জামেয়ুল বায়ান' গ্রন্থে ইবরাহীম নাখয়ী যিনি শো'বার কথাকে মিথ্যা বলেছেন সেটি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "আমার মনে হয় শা'বী হারিসকে মিথ্যাবাদী বলার শাস্তি পেয়েছে।" ইবনে আবদুল বার বলেছেন, "হারিস হতে কোন মিথ্যাই কখনো শুনি নি। তাঁর প্রতি অন্যদের ক্ষোভের কারণ আলীর প্রতি তাঁর অতিরিক্ত ভালবাসা ও অন্যদের ওপর আলীকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়।" এ কারণেই শা'বী তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। শা'বীর বিশ্বাস ছিল আবু বকর প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ও তিনি অন্য সকলের চেয়ে ে ষ্ঠ ত প তিনি উমরকে আবু বকর ব্যতীত অন্যদের হতে ে ষ্ঠ মনে করতেন.।[১০১]

আমার জানা মতে অন্য যাঁরা হারিসের বিরু অপবাদ আরোপ করেছেন তাঁদের একজন হলেন মুহাম্মদ ইবনে সা'দ। তিনি তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে হারিস সম্পর্কে বলেছেন, "সে

একজন খারাপ আকীদায় বিশ্বাসী ব্যক্তি।” আমি বিশ্বাস করি হারিসের বিষয়ে ইবনে সা’দ সংকীর্ণতা দেখিয়েছেন এবং শিয়া রিজাল ও রাবীদের বিষয়ে তিনি তাঁর জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে ইনসাফ করেন নি। হারিসের খারাপ আকীদা বলতে যা সা’দ বুঝিয়েছেন তা হলো আহলে বাইতের মহান মান ও মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা ও বিশ্বাস। ইবনে আবদুল বারও তেমনি মনে করেন।

হারিস ৬৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

২০। হাবিব ইবনে আবি সাবিত আসাদী কাহেলী, কুফী

তিনি তাবেয়ীনের অন্যতম, ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘মা’আরিফ’ গ্রন্থে ও শাহরেস্তানী তাঁর ‘মিলাল ও নিহাল’- এ তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। যাহাবী তাঁর মি’যান গ্রন্থে তাঁর নামের পার্শ্বে সিহাহ সিত্তাহর চিহ্ন দিয়েছেন এজন্য যে, সিহাহ সিত্তাহর হাদীস লেখকগণ তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ হতে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন ও তাঁকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। তিনি বলেছেন, “সিহাহ সিত্তাহর হাদীস লেখকগণ সন্দেহাতীতভাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস হতে বিধি-বিধান গ্রহণ করতেন এবং ইবনে মুঈন ও অন্যান্য অনেকে তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।”

আমার মতে শিয়া হবার কারণেই দূলাবী তাঁকে দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন। ত প ইবনে আউনের কর্মও আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে, কারণ তিনি হাবিবের মধ্যে কোন ত্রুটি অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে তাঁকে এক চোখ অন্ধ বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু বাস্তবে চোখের ত্রুটি কোন ত্রুটি নয়, বরং তাঁর মধ্যেই ত্রুটি যে কথা ও বাক্যে শালীনতা রক্ষা করে না।

আপনি এজন্য সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সাঈদ ইবনে জুবাইর ও আবু ওয়াইল হতে হাবিব যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা অধ্যয়ন করুন। কিন্তু যাইদ ইবনে ওয়াহাব হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস শুধু সহীহ বুখারীতে রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে তিনি মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, তাউস, জাহহাক মুশরেফী, আবুল আব্বাস ইবনে শায়ের, আবু মিনহাল আবদুর রহমান, আতা ইবনে

ইয়াসার, ইবরাহীম সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও মুজাহিদ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম ও বুখারীতে তাঁর হাদীসগুলো মূসাআ'র সাওরী ও শো'বাহর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের সূত্র অনুযায়ী সুলাইমান আ'মাশ, হুসাইন, আবদুল আযীয ইবনে সাইয়াহ্ ও আবু ইসহাক শায়বানী তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাবিব ১১৯ হিজরীতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

২১। হাসান ইবনে হাই

হাই- এর পূর্ণ নাম সালিহ ইবনে সালিহ হামাদানী। সুতরাং তিনি (হাসান) আলী ইবনে সালিহর ভ্রাতা। দু' ভাইই শিয়াদের প্রসি ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। হাসান ও আলী পরস্পর জমজ ভাই ছিলেন, তবে আলী হাসানের কয়েক মুহূর্ত পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাই হাসান আলীকে নাম ধরে ডাকতেন না, বরং তাঁকে সম্মানিত সম্ভাষণ করতেন ও আবু মুহাম্মদ বলে ডাকতেন। মুহাম্মদ ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে আলী ইবনে হাই- এর পরিচয় পর্বে তা উল্লেখ করেছেন।

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে এ দু'জন সম্পর্কেই বলেছেন। হাসান সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "তিনি প্রসি ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ও শিয়া মতানুসারী। তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত ইমামদের পিছনে জুমআর নামায পড়তেন না ও অত্যাচারী শাসকের বিরু রুখে দাঁড়ানোকে ওয়াজিব মনে করতেন। তাঁর ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, তিনি হযরত উসমানের জন্য দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করতেন না।"

ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি হাদীস বর্ণনায় বিশ্বাসযোগ্য ও সত্যপরায়ণ। প্রচুর হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন, তবে শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।"

ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থে তাঁকে হাদীসবেত্তা ও শিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। শিয়া রিজালদের যে তালিকা তিনি তাঁর গ্রন্থের শেষে সন্নিবেশিত করেছেন সেখানে তিনি তাঁর নাম এনেছেন।

মুসলিম ও সুনানের রচয়িতাগণ তাঁর হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপন করতেন। সহীহ্ মুসলিমের সূত্র মতে হাসান সামাক ইবনে হারব, ইসমাঈল আদী, আছেম আহওয়াল ও হারুন ইবনে সা'দ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং উবায়দুল্লাহ্ ইবনে মূসা আব্বাসী, ইয়াহিয়া ইবনে আদম, হামিদ ইবনে আবদুর রহমান রাওয়াসেবী, আলী ইবনে যাইদ, আহমাদ ইবনে ইউনুস এবং তাঁদের পর্যায়ের অনেকেই তাঁর নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করেছেন।

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে ইবনে মুঈন ও অন্যান্যদের উ ৃ তি দিয়ে বলেছেন, "তাঁরা তাঁকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন।" আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, "রিজালদের মধ্যে শারিক হতে হাসান অধিক নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ।" যাহাবী আবু হাতেমের উ ৃ তি দিয়ে বলেছেন, "হাসান নির্ভরযোগ্য, সংরক্ষণকারী এবং বিশ্বস্ত।" আবু জারআ বলেছেন, "হাসানের মধ্যে ইবাদত, দুনিয়াবিমুখতা, ফিকাহর জ্ঞান ও হাদীস সমন্বিত হয়েছিল।" নাসায়ীও তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আবু নাঈম বলেছেন, "আটশ মুহাদ্দিস হতে হাদীস লিপিব ও শিক্ষা গ্রহণ করেছি কিন্তু হাসান ইবনে সালিহের ন্যায় কাউকেই পাই নি। তিনি ব্যতীত সকলেই কোথাও না কোথাও ভুল করেছেন।"

উবাইদা ইবনে সুলাইমান বলেছেন, "আমার মনে হয় সালিহের আত্মিক পবিত্রতার কারণে আল্লাহ্ তাঁকে শাস্তি দানে লজ্জাবোধ করবেন।"

ইয়াহিয়া ইবনে আবু বকর হাসান ইবনে সালিহকে বললেন, "মৃত ব্যক্তির গোসলের প তি আমাদের জন্য বর্ণনা করুন।" হাসান প্রচণ্ড ক্রন্দনের ফলে শেষ পর্যন্ত তা বর্ণনা করার মত অবস্থা লাভ করলেন না।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মূসা বলেছেন, "আমি আলী ইবনে সালিহের জন্য কোরআন পড়তাম, যখন সূরা মরিয়মের ৮৪ নং আয়াত (فلا تعجل عليهم) যেখানে 'কাফেরদের শাস্তির জন্য তড়িঘড়ি করো না' বলা হয়েছে সেখানে পৌঁছলাম, তাঁর দৃষ্টি ভ্রাতা হাসানের ওপর পতিত হলো যিনি কিয়ামতের শাস্তির ভয়াবহতার কথা শুনে মূর্ছা গিয়েছিলেন এবং ভূপতিত গরুর ন্যায় খরখর শব্দ করছিলেন। আলী তাঁকে মাটি হতে উঠিয়ে মুখমণ্ডল হতে ধুলা-বালি বিদূরিত করে পানি দিয়ে ধুয়ে দিলেন, তাঁকে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসালেন, কিছুক্ষণ পর তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন।

ওয়াকি বলেছেন, "হাসান এবং আলী সালিহের দুই পুত্র। এ দু'পুত্র তাঁদের মাতার সঙ্গে রাত্রিকে তিন ভাগ করে পালাক্রমে রাত্রি জাগতেন ও ইবাদত করতেন। তাঁদের মাতার মৃত্যুর পর রাত্রিকে দু'ভাগে ভাগ করে ইবাদত করতেন। যখন আলী মৃত্যুবরণ করেন তখন হাসান সমগ্র রাত্রি ইবাদতের জন্য জাগতেন।"

আবু সুলাইমান দারানী বলেন, "হাসান ইবনে সালিহ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিকে এরূপ দেখি নি যে, আল্লাহর ভয় তাঁর চেহারায় এতটা প্রকট হয়। এক রাত্রিতে তিনি নামাযে সূরা নাবা তেলাওয়াত শুরু করে ভয়ে মূর্ছা গেলেন। জ্ঞান ফিরলে পুনরায় নামায শুরু করে তা পড়ে শেষ করতে সক্ষম হলেন না।"

তিনি ১০০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ ও ১৯৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

২২। হাকীম ইবনে উতাইবা কুফী

ইবনে কুতাইবা স্পষ্টত বলেছেন, "তিনি শিয়া ছিলেন।" তিনি তাঁর 'মা'আরেফ' গ্রন্থেও তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। বুখারী ও মুসলিম তাঁর হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এজন্য যে সকল হাদীস তিনি আবু জুহাইফা, ইবরাহীম নাখয়ী, মুজাহিদ এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর হতে বর্ণনা করেছেন তা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে অধ্যয়ন করতে পারেন।

সহীহ মুসলিম সূত্র মতে আবদুর রহমান ইবনে আবী লাইলা, কায়েস ইবনে মুখাইমারা, আবূ সালিহ, যার ইবনে আবদুল্লাহ্, সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবযী, ইয়াহিয়া ইবনে হাজ্জার, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের দাস নাফে, আতা ইবনে আবু রিবাহ, আম্মারাহ্ ইবনে উমাইর, আবাক ইবনে মালিক, শো'বা, মাইমুন ইবনে মেহরান, হাসান আরানী, মুসআব ইবনে সা'দ এবং আলী ইবনে হুসাইন হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারীতে শুধু আবদুল মালিক ইবনে আবি গানিয়াহ্ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সহীহ মুসলিমে আ'মাশ, আমর ইবনে কাইস, যাইদ ইবনে আবি উনাইসাহ্, মালিক ইবনে মুগুল, আবান ইবনে তাগলিব, হামযাহ্ যিয়াত, মুহাম্মদ ইবনে জাহহাদাহ্, মাতরাফ এবং আবু আওয়ানাহ্ তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি ১১৫ হিজরীতে মাত্র ৩০ বছর বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

২৩। হাম্মাদ ইবনে ঈসা জুহফা (যিনি জুহফাতে নিমজ্জিত হয়েছেন)

আবু আলী তাঁর 'মুনতাহাল মাকাল' গ্রন্থে তাঁর নাম এনেছেন। হাসান ইবনে আলী ইবনে দাউদ রিজাল সম্পর্কিত তাঁর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে এবং রিজাল ও অভিধান লেখকগণ সকলেই তাঁকে শিয়া আলেম, নির্ভরযোগ্য এবং হেদায়েত প্রাপ্ত ইমামদের সাহাবী হিসেবে বলেছেন। তিনি ইমাম সাদিক (আ.) হতে সত্তরটি হাদীস   বণ করেছেন, তন্মধ্যে বিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ শিয়া আলেমগণ অবিচ্ছিন্ন সনদে নকল করেছেন।

হাম্মাদ ইবনে ঈসা একবার ইমাম কাযেম (আ.)- এর নিকট গিয়ে বললেন, "আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গীকৃত। আমার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাকে বাড়ি, স্ত্রী, সন্তান, দাস এবং মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি বছর হ   করার তৌফিক দান করেন।"

ইমাম প্রথমে বললেন, "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলে মুহাম্মাদ। হে আল্লাহ্! আপনি তাকে বাড়ি, স্ত্রী, সন্তান, দাস ও পঞ্চাশ বছরে পঞ্চাশটি হ   করার তৌফিক দান করুন।"

হাম্মাদ বলেন, "যখন ইমাম পঞ্চাশ বছরের শর্ত আরোপ করলেন তখন বুঝলাম এর বেশী আমাকে দান করা হবে না। বর্তমানে আটচল্লিশ বছর হলো প্রতি বছর আমি হ   করছি। এটি আমার সেই ঘর যা আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন। আমার স্ত্রীও এই ঘরে অবস্থান করছে এবং আমার কথা শুনছে, আমার পুত্র ও দাসও এখানে রয়েছে।"

এ ঘটনার দু'বছর পর তাঁর পঞ্চাশটি হ   পূর্ণ হয়। পরবর্তী বছর তিনি তাঁর বন্ধু আব্বাস নওফেলীসহ হ   র উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। যখন ইহরামের স্থান জোহফাতে পৌঁছলেন তখন ইহরামের জন্য গোসল করতে গেলে ঢলের পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। পঞ্চাশ বারের অধিক হ   করার তৌফিকও তাঁর হলো না। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন। তিনি ২০৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি কুফার অধিবাসী কিন্তু বসরাতে জীবন নির্বাহ করেছেন এবং সত্তরাধিক বয়সে দুনিয়া ত্যাগ করেন।

আমরা তাঁর পরিচিতি ও বিবরণ 'মুখতাসারুল কালাম ফি মুয়াল্লিফিশ- শিয়া ফি সাদরিল ইসলাম' গ্রন্থে এনেছি।

যাহাবী তাঁর মিযান গ্রন্থে তাঁর নামের পাশে (ت ق) চিহ্ন ব্যবহার করেছেন সুনানের লেখকগণের নামের আদ্যক্ষর হিসেবে যাঁরা তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইমাম সাদিক (আ.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যারা তাঁর শিয়া হবার কারণে বিদ্বেষবশত তাঁর বিরু   অশোভন কথা বলেছে যাহাবী তাদের সমালোচনা করেছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো দারে কুতনী তাঁকে দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন অথচ তাঁর বর্ণিত হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এ ধরনের ব্যক্তিদের কর্ম এরূপই (وكذلك يفعلون)।

২৪। হামারান ইবনে আ'য়ুন (যুরারাহর ভ্রাতা)

তাঁরা দু'জনই (হামারান ও যুরারাহ্) প্রসি   শিয়া, শরীয়তের রক্ষাকারী, মুহাম্মদের বংশধরদের জ্ঞানের সমুদ্র, অন্ধকারের প্রদীপ এবং হেদায়েতের পতাকা ও ধ্বজাধারী। এ দু'জন ইমাম বাকির

ও ইমাম সাদিক (আ.)- এর সঙ্গে সব সময় সম্পৃক্ত ছিলেন, সেজন্য ইমামগণের নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

যাহাবী হামারানকে তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন ও সাংকেতিক (ق) চিহ্ন তাঁর নামের পাশে লিপিব করেছেন সুনানের হাদীস বর্ণনাকারী বোঝানোর জন্য। অতঃপর বলেছেন, “তিনি আবু তুফাইল ও অন্যান্যদের হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।”

হামযাহ্ তাঁর জন্য কোরআন পাঠ করতেন এবং তিনি কোরআন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন। ইবনে মুঈন তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “তিনি গুরুত্বপূর্ণ নন।” আবু হাতেম বলেছেন, “তিনি সম্মানিত শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত।” আবু দাউদ তাঁকে রাফেযী বলেছেন।

خ

২৫। খালিদ ইবনে মুখাল্লাদ কাতওয়ানী কুফী (আবু হাইসাম)

তিনি ইসমাঈল বুখারীর শিক্ষক। ইবনে সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৮৩ পৃষ্ঠায় তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “তিনি প্রকাশ্যে নিজেকে শিয়া বলে দাবী করতেন।” তিনি ২১৩ হিজরীর মহররম মাসের ১৫ তারিখে আব্বাসী খলীফা মামুনের শাসনামলে কুফায় ইন্তেকাল করেন। তিনি শিয়া মাজহাবের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করতেন। অনেকেই তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করতেন...।

আবু দাউদ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “পরম সত্যবাদী কিন্তু শিয়া।”

জাওযাজানী বলেছেন, “তিনি কোন ভয়- ভীতি ছাড়াই প্রকাশ্যে বিরোধীদের সমালোচনা করতেন ও তাঁর খারাপ আকীদা- বিশ্বাসকে বর্ণনা এবং তা রক্ষার চেষ্টা করতেন।”

আবু দাউদ ও জাওযাজানীর বক্তব্যগুলো যাহাবী তাঁর মিযান গ্রন্থে এনেছেন। মুসলিম ও বুখারী কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এজন্য যে সকল হাদীস তিনি মুগীরাহ্ ইবনে আবদুর রহমান হতে বর্ণনা করেছেন তা সহীহ বুখারীতে দেখতে পারেন। সহীহ মুসলিমে তিনি মুহাম্মদ ইবনে জা’ফর ইবনে আবি কাসির, মালিক ইবনে আনাস ও মুহাম্মদ ইবনে মূসা হতে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা অধ্যয়ন করুন।

কিন্তু সুলাইমান ইবনে বেলাল ও আলী ইবনে মুসাহহার সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে রয়েছে। বুখারী কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি তাঁর থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন ও মুহাম্মদ ইবনে উসমান ইবনে কারামার মাধ্যমে দু'টি হাদীস তাঁর হতে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ মুসলিমে আবু কুরাইব, আহমাদ ইবনে উসমান আওদী, কাসিম ইবনে যাকারিয়া, আবদ ইবনে হামিদ, ইবনে আবি শাইবা এবং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে নুমাইর তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুনান লেখকগণ তাঁর মাজহাব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সে ও তাঁর বর্ণিত হাদীস হতে দলিল- প্রমাণ এনেছেন।

দ

২৬। দাউদ ইবনে আবু দাউদ (আবুল জাহহাফ)

ইবনে আদী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "আমি তাঁর বর্ণিত হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপন করি না, তিনি শিয়া এবং তাঁর সকল রেওয়ায়েতেই আহলে বাইতের ে ষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে...।" কথাটি গভীরভাবে চিন্তা করুন ও ভাবুন কতটা আশ্চর্যজনক! আহলে বাইতের বিদ্বেষীরা দাউদকে কতটা কষ্ট দিয়েছে লক্ষ্য করুন! যদিও সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আলী ইবনে আবিস ও অন্যান্য শীর্ষ পর্যায়ের রিজালগণ তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন তদুপরি তাঁর প্রতি এরূপ আচরণ?! আবু দাউদ ও নাসায়ী তাঁর বক্তব্য থেকে দলিল উপস্থাপন করেছেন। আহমাদ ও ইয়াহিয়া তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। নাসায়ী বলেছেন, "তাঁর হাদীসে সমস্যা নেই।" হাতেম বলেছেন, "হাদীস বর্ণনায় তিনি একজন সৎ ব্যক্তি।"

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে উপরোক্ত বক্তব্যগুলো এনেছেন। যেসকল হাদীস সুনানে আবু দাউদ ও নাসায়ীতে তাঁর সূত্রে আবু হাতেম আশজায়ী, ইকরামা ও অন্যান্যদের হতে বর্ণিত হয়েছে তা লক্ষ্য করুন।

ز

২৭। যুবাইদ ইবনে হারিস ইবনে আবদুল করিম (ইয়ামী আবু আবদুর রহমান)

তিনি কুফার অধিবাসী ছিলেন। যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত, নির্ভরযোগ্য ও শিয়া।" অতঃপর কাত্তানের সূত্রে বলেছেন, "তিনি একজন বিশ্বস্ত রাবী।" তাছাড়া হাদীস বিশ্লেষণশাস্ত্রের[১০২] পণ্ডিতগণের অনেকেই তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন বলে কাত্তান উল্লেখ করেছেন।

আবু ইসহাক জাওযাজানী অন্যান্য আহলে বাইত বিদ্বেষীদের ন্যায় বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর সম্পর্কে যা বলেছেন তা হলো : কুফাবাসীদের অনেকেই যদিও প্রসি মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত তদুপরি তাঁদের মাজহাব জনসাধারণের নিকট প্রশংসনীয় নয়, যেমন আবু ইসহাক, মানসুর, যুবাইদ ইয়ামী, আ'মাশ এবং এদের সমবয়সী ও নিকটবর্তী অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু জনসাধারণ তাঁদের সত্যবাদিতার কারণে তাঁদের হাদীসকে গ্রহণ করেন। অবশ্য হাদীস মুরসাল (সনদ বা রাবী উহ্য থাকলে) হলে তা গ্রহণ করতেন না।

লক্ষ্য করুন অবশেষে সত্য তাঁর মুখ হতে উৎসারিত হয়েছে। আহলে বাইত বিদ্বেষী হওয়া সে ও এক্ষেত্রে তিনি ইনসাফ রক্ষা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই শিয়া হাদীসবিদ মহান ব্যক্তি, মুহাদ্দিসদের শিরোমণি হওয়া সে ও অধিকাংশ সময়ই অন্যায় আচরণের শিকার হয়েছেন, এমন কি আহলে বাইত বিদ্বেষী কোন ব্যক্তি যে তাঁদের মাজহাবকে (যে মাজহাবের উৎস রাসূল (সা.)-এর বংশধারার পবিত্র ব্যক্তিগণ, ক্ষমার দ্বার, পৃথিবীর নিরাপদ আ য়, উম্মাতের মুক্তির তরণি) প্রশংসার চোখে দেখতে নারাজ এমন ব্যক্তিও বাধ্য হয়ে এ ব্যক্তিবর্গের দ্বারস্থ হয়েছেন ও তাঁদের জ্ঞান সমুদ্র হতে লাভবান হবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন ও নিজেকে এক্ষেত্রে তাঁদের অমুখাপেক্ষী ভাবতে পারছেন না।

আরব কবি এ বিষয়ে সুন্দর বলেছেন,

إذا رضـــــيت عـــــنّي كـــــرام عشـــــيرتي　　　فـــــلا زال غضـــــباناً علـــــيّ لئامهــــــا

"যদি আমার গোত্রের সম্ভ্রান্ত ও উদার ব্যক্তিরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয় তবে তাদের হীন ও সংকীর্ণ ব্যক্তিদের নিন্দার ভয় আমি করি না।"

তাই এই মহান ব্যক্তিগণ জাওযাজানী ও তাঁর মত লোকদের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করেন না যখন সিহাহ সিত্তাহ্ ও সুনানের বড় ব্যক্তিত্বগণ তাঁদের হাদীসের ওপর দলিল- প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নির্ভর করেছেন। নিশ্চয়ই সহীহ বুখারী ও মুসলিম আপনার নিকট রয়েছে সেখানে আবু ওয়াইল, শো'বা, ইবরাহীম নাখয়ী এবং সা'দ ইবনে উবাইদা হতে যুবাইদ যেসকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা পড়ুন।

কিন্তু মুজাহিদ হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস শুধু বুখারীতে রয়েছে। সহীহ মুসলিমে তিনি মুররা হামাদানী, মুহাবির ইবনে দাসসার, আম্মারাহ্ ইবনে উমাইর এবং ইবরাহীম তায়িমী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অন্যদিকে শো'বা, সুফিয়ান সাওরী, মুহাম্মদ ইবনে তালহা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যা বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে ও সহীহ মুসলিমে যুহাইর ইবনে মুয়াবিয়া, ফুজাইল ইবনে গাজওয়ান এবং হুসাইন নাখয়ী তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যুবাইদ ১২৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

২৮। যাইদ ইবনে হাব্বাব কুফী (আবুল হাসান তামিমী)

ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থে তাঁকে শিয়া রাবী ও রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁকে আবেদ, বিশ্বস্ত, সত্যবাদী বলে প্রশংসা করেছেন। ইবনে মুঈন এবং ইবনে মাদীনীর সূত্রেও তিনি যাইদের বিশ্বস্ততাকে সত্যায়ন করেছেন। আবু হাতেম ও আহমাদ তাঁর সত্যবাদিতাকে প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আদীর ভাষায় "যাইদ ইবনে হাব্বাব একজন পবিত্র স্বভাবের মানুষ। তাঁর সত্যবাদিতার বিষয় সন্দেহাতীতভাবে কুফাবাসীদের নিকট প্রমাণিত।"

মুসলিম তাঁর বর্ণিত হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। যে সকল হাদীস তিনি মুয়াবিয়া ইবনে সালিহ, সাহহাক ইবনে উসমান, কুররাহ্ ইবনে খালিদ, ইবরাহীম ইবনে নাফে, ইয়াহিয়া ইবনে আইউব, সাইফ ইবনে সুলাইমান, হাসান ইবনে ওয়াকিদ, ইকরামা ইবনে আম্মার, আবদুল আযীয ইবনে আবি সালমা এবং আফলাহ্ ইবনে সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন তা সহীহ মুসলিমে রয়েছে।

এছাড়া সহীহ মুসলিমে তাঁর হতে ইবনে আবি শাইবা, মুহাম্মদ ইবনে হাতেম, হাসান হালওয়ানী, আহমাদ ইবনে মুনযির, ইবনে নুমাইর, ইবনে কুরাইব, মুহাম্মাদ ইবনে রাফে, জুহাইর ইবনে হারব ও মুহাম্মদ ইবনে ফারাজ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৯। সালিম ইবনে আবিল জা'দ আশজাঈ কুফী

উবাইদ, যিয়াদ, ইমরান ও মুসলিম এরা সকলেই আবুল জা'দের পুত্র। ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২০৩ পৃষ্ঠায় এদের সকলকে স্মরণ করেছেন। সেখানে মুসলিমের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "আবুল জা'দের ছয় পুত্রসন্তান ছিল। যাঁদের দু'জন শিয়া, এরা হলেন সালিম ও উবাইদ। দু'জন মুর্জিয়া আকীদায় বিশ্বাসী ও খারেজী ছিল। তাঁদের পিতা তাঁদের সব সময় বলতেন : আমার সন্তানগণ! কেন তোমরা বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত হয়ে পড়েছ?"[১০৩]

সালিম ইবনে আবিল জা'দ সম্পর্কে কয়েকজন প্রসি রিজালশাস্ত্রবিদের মন্তব্য হলো : তিনি শিয়া ছিলেন। ইবনে কুতাইবাও তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থের ২০৬ পৃষ্ঠায় তাঁকে শিয়া রিজাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। শাহরেস্তানী তাঁর 'মিলাল ওয়ান নিহাল'-এ তাঁকে শিয়া রিজাল বলেছেন। যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে সালিমকে নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য করেছেন ও বলেছেন, "তিনি নোমান ইবনে বাশীর এবং জাবির হতে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে।"

আমার জানা মতে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে তিনি আনাস ইবনে মালিক এবং কুরাইব হতেও হাদীস বর্ণনা করেছেন যা আগ্রহী অনুসন্ধানকারীরা খুঁজে দেখতে পারেন।

যাহাবী বলেছেন, "আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং ইবনে আমর হতেও তাঁর রেওয়ায়েত সহীহ বুখারীতে রয়েছে।"

তাছাড়া সহীহ বুখারীতে উম্মে দারদা হতেও তাঁর হাদীস এসেছে। সহীহ মুসলিমে মা'দান ইবনে আবি তালহা ও তাঁর পিতা হতে সালিমের বর্ণিত হাদীস রয়েছে।

তিনি ৯৭ বা ৯৮ হিজরীতে সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে মৃত্যুবরণ করেন। অনেকে বলেছেন তিনি উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনকালে ১০১ বা ১০২ হিজরীতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

৩০। সালিম ইবনে আবি হাফসা আজলী (কুফার অধিবাসী)

শাহরেস্তানী তাঁর 'মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থে তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। ফালাস বলেছেন, "তিনি দুর্বল রাবী এবং শিয়া হিসেবে কট্টর।" ইবনে আদী বলেছেন, "তাঁর ত্রুটি হলো নবীর আহলে বাইত সম্পর্কে অতিরি ত বিশ্বাস রাখা যদিও আমার মতে এটি সমস্যা নয়।" মুহাম্মদ ইবনে বাশির আবদি বলেছেন, "সালিম ইবনে আবি হাফসা লম্বা দাড়ি বিশিষ্ট একজন আহমক ব্যক্তি। সে বলত : আহ! যদি সব কিছুতেই আলী (আ.)- এর সহযোগী ও শরীক হতে পারতাম!"

হুসাইন ইবনে আলী জো'ফী বলেছেন, "সালিম ইবনে আবি হাফসাকে লম্বা দাড়ির নির্বোধ ব্যক্তি মনে হয়েছে, যে সব সময় বলত : বৃ ইহুদীর হত্যাকারী আমি উপস্থিত হয়েছি। বনি উমাইয়্যার ধ্বংসকারী আমি উপস্থিত হয়েছি।" আমর ইবনে যার সালিম ইবনে হাফসাকে বললেন, "তুমি হযরত উসমানকে হত্যা করেছ।" সে আশ্চর্য হয়ে বললো, "আমি?" আমর বললেন, "হ্যাঁ, তুমি যেহেতু তাঁর হত্যায় খুশী হয়েছ, সেহেতু তুমি তাঁর হত্যার অংশীদার।"

আলী ইবনে মাদীনী বলেছেন, "জারিরকে বলতে শুনেছি, সালিম ইবনে আবি হাফসাকে আমি ত্যাগ করেছি এজন্য যে, সে শিয়াদের পক্ষ সমর্থন করত ও শিয়াদের শত্রুদের বিরু কঠিন প্রতিরোধের আ য় নিত।" উপরোক্ত বিষয়গুলো যাহাবী সালিমের পরিচয় পর্বে এনেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় তাঁর (সালিমের) পরিচয় বর্ণনা করে বলেছেন, "শিয়া বিশ্বাসে তিনি খুবই কট্টর ছিলেন। সালিম বনি আব্বাসের শাসনকালে একবার মক্কায় প্রবেশ করেছিল আর চিৎকার করে বলছিলেন : বনি উমাইয়্যাদের ধ্বংসকারী আমি উপস্থিত হয়েছি (তোমাদের সহযোগিতার জন্য এসেছি)। এসময় তাঁর ক সুস্পষ্ট ও উচ্চ ছিল। তাঁর কথা যখন দাউদ ইবনে আলীর কানে পৌঁছল সে প্রশ্ন করল : লোকটি কে? তাকে বলা হলো : লোকটি সালিম ইবনে আবি হাফসা। লোকেরা দাউদকে তাঁর আকীদা- বিশ্বাস সম্পর্কে জানাল।"

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে বলেছেন, "তিনি ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত যারা হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন ও তাঁদের ত্রুটি তুলে ধরে পর্যালোচনা করেন।" এতদসে ও সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এবং মুহাম্মদ ইবনে ফুযাইল তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন এবং তিরমিযী তাঁর হাদীস গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। ইবনে মুঈন তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

তিনি ১৩৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৩১। সা'দ ইবনে তারিফ ইসসকাফ হানজালী (কুফার অধিবাসী)

যাহাবী তাঁর পরিচিতি পর্বে তাঁর নামের পার্শ্বে (ت,ق) লিখেছেন এটি বুঝানোর জন্য যে, সুনান লেখকগণ তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ফালাসের উ ৃতি দিয়ে বলেছেন, "সা'দ দুর্বল রাবী এবং শিয়া মতবাদে বাড়াবাড়ি করে থাকেন।"

কিন্তু তাঁর এই বাড়াবাড়ির বিষয়টি তিরমিযী ও অন্যদের তাঁর হাদীস গ্রহণের পথে অন্তরায় হয় নি। তাই তিনি ইকরামা, আবু ওয়াইল, আসবাগ ইবনে নুবাতাহ্, ইমরান ইবনে তালহা এবং উমাইর ইবনে মামুন হতে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তিরমিযী তা নকল করেছেন। এছাড়া তাঁর বর্ণিত হাদীস যা ইসরাঈল, হাব্বান ও আবু মুয়াবিয়া বর্ণনা করেছেন তা তিরমিযীতে রয়েছে।

৩২। সাঈদ ইবনে আশওয়া

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "সাঈদ ইবনে আশওয়া (বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত) কুফার কাজী, একজন সৎ ব্যক্তি ও সত্যবাদী হিসেবে সবার নিকট পরিচিত।" নাসায়ী বলেছেন, "তিনি ত্রুটি মুক্ত।" তাঁর সঙ্গে সাঈদ ইবনে আমর ও শো'বার বন্ধুত্ব ছিল। জাওযাজানী তাঁকে বিচ্যুত, অতির নকারী ও কট্টর শিয়া বলে উল্লেখ করেছেন।

অথচ বুখারী ও মুসলিম তাঁর বর্ণিত হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন এবং শো'বা হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস দু'টি সহীহতেই বর্ণিত হয়েছে। যাকারিয়া ইবনে আবি যায়িদাহ্ এবং খালিদ খাজা বুখারী ও মুসলিমের নিকট তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি খালিদ ইবনে আবদুল্লাহর শাসনামলে মৃত্যুবরণ করেন।

৩৩। সাঈদ ইবনে খাইসাম হেলালী

ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে জুনাইদ বলেছেন, "ইয়াহিয়া ইবনে মুঈনকে বলা হলো : সাঈদ ইবনে খাইসাম শিয়া, তাঁর ব্যাপারে আপনার কি মনে হয়? তিনি জবাব দিলেন : তিনি শিয়া হলেও বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।"

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে ইবনে মুঈন হতে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন। তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে সাংকেতিক অর্থে তিরমিযী ও নাসায়ী লিখেছেন কারণ তাঁরা তাঁদের সহীহ হাদীসগ্রন্থে তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া যাহাবী আরো উল্লেখ করেছেন সাঈদ, ইয়াহিয়া ইবনে আবি যিয়াদ ও মুসলিম মালাঈ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর ভ্রাতু ুত্র আহমাদ ইবনে রাশিদ তাঁর থেকে হাদীস নকল করেছেন।

৩৪। সালামাহ্ ইবনে ফাযল আবরাশ (রেই শহরের কাজী)

তিনি 'মাগাযী' (যু সমূহ) গ্রন্থের একজন রাবী ও বর্ণনাকারী। গ্রন্থটি ইবনে ইসহাক সংকলিত। সালামাহর বংশীয় নাম আবু আবদুল্লাহ্।

'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে ইবনে মুঈনের সূত্রে বলা হয়েছে- সালামাহ্ আবরাশ রেই শহরের অধিবাসী এবং শিয়া। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস রয়েছে যা গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই।

মিযানে আবু জারআর সূত্রে বলা হয়েছে রেইয়ের অধিবাসীরা সালামাহর ভ্রান্ত আকীদার কারণে তাঁকে পছন্দ করত না।

আমার মতে তাঁর প্রতি আগ্রহ না থাকা ও তাঁকে পছন্দ না করার কারণ নবীর আহলে বাইতের প্রতি তাদের অনিচ্ছা ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি।

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর নামের পার্শ্বে সাংকেতিকভাবে আবু দাউদ ও তিরমিযী লিখেছেন কারণ তাঁরা তাঁকে বিশ্বস্ত মনে করতেন এবং তাঁদের হাদীসগ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যাহাবী বলেছেন, "তিনি একজন নামাযী, খোদাভীরু ব্যক্তি।" ১৯১ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি ইবনে মুঈন হতে বর্ণনা করেছেন, "আমরা তাঁর নিকট অনেক কিছু শিক্ষা করেছি ও তাঁর হতে লিখেছি। তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'মাগাযী' সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

যানীজ বলেছেন, "সালামাহকে বলতে শুনেছি : আমি ইবনে ইসহাক হতে 'মাগাযী' গ্রন্থটি দু'বার শুনেছি ও শিক্ষালাভ করেছি। তার থেকে 'মাগাযীর' সমপরিমাণ হাদীসও শিক্ষা গ্রহণ করেছি।"

৩৫। সালামাহ্ ইবনে কুহাইল ইবনে হুসাইন ইবনে কাদিহ ইবনে আসাদ হাযরামী

তাঁর পারিবারিক নাম আবু ইয়াহিয়া। আহলে সুন্নাহর কয়েকজন আলেম তন্মধ্যে ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থের ২০৬ পৃষ্ঠায় এবং শাহরেস্তানী তাঁর 'মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৭ পৃষ্ঠায় তাঁকে শিয়া রাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন।

সিহাহ সিত্তাহর এবং অন্যান্য হাদীসবেত্তাগণ তাঁর হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

বুখারী ও মুসলিমের মতে তিনি আবু জুহাইফা, সুয়াইদ ইবনে গাফলাহ্, শো'বা ও আতা ইবনে আবি রিবাহ হতে হাদীস শিক্ষা করেছেন।

বুখারীতে কেবল জুনদাব ইবনে আবদুল্লাহ্ হতেই তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু সহীহ মুসলিমে তিনি কুরাইব, জার ইবনে আবদুল্লাহ্, বুকাইর ইবনে আশায, যাইদ ইবনে কা'ব, সা'দ ইবনে যুবাইর, মুজাহিদ, আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ, আবু সালামাহ্ ইবনে আবদুর রহমান, মুয়াবিয়া ইবনে সুওয়াইদ, হাবিব ইবনে আবদুল্লাহ্ এবং মুসলিম বাতিন হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বুখারী ও মুসলিমের দৃষ্টিতে সুফিয়ান সাওরী ও শো'বা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও ইসমাঈল ইবনে খালিদ তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। মুসলিমে সাঈদ ইবনে মাসরুক, আকিল ইবনে খালিদ, আবদুল মালিক ইবনে সুলাইমান, আলী ইবনে সালিহ এবং ওয়ালিদ ইবনে হারব শুধু তাঁর থেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি ১২১ হিজরীর ১০ মুহররম (আশুরার দিনে) মৃত্যুবরণ করেন।

৩৬। সুলাইমান ইবনে সারুদ খুযায়ী (কুফার অধিবাসী)

তিনি ইরাকের শিয়াদের নেতা ছিলেন। লোকজন বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করত এবং তিনি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন। ইরাকের শিয়ারা ইমাম হুসাইন (আ.)- কে পত্র লিখার জন্য তাঁর ঘরেই সমবেত হয়েছিলেন। যেসকল ব্যক্তি ইমাম হুসাইনের খুনের বদলা নেয়ার দাবীতে আন্দোলন করেছিলেন (তাওয়াবীন) তিনি তাঁদের নেতা ছিলেন। তিনি প্রায় চার হাজার ব্যক্তি নিয়ে ৬৫ হিজরীর রবিউস সানী মাসে কুফার নুখাইলাতে ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদের বিরু   সৈন্য সমাবেশ করেন। তাঁরা সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হলে আল জাজিরাহ্ নামক স্থানে কঠিন যু র পর তাঁরা সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। সুলাইমান নিজেও 'আইনুল ওয়ারদাহ্' নামক স্থানে ইয়াযীদ ইবনে হাছিন ইবনে নুমাইর কর্তৃক তীর বি   হয়ে শাহাদাতের পেয়ালা পান

করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৯৩ বছর। মুসাইয়্যেব ইবনে নাজবাহ্ ও তাঁর মাথা মারওয়ান ইবনে হাকামের জন্য সিরিয়ায় পাঠানো হয়।

ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত'- এর ৬ষ্ঠ খণ্ডে, ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর 'আল আসাবা'র ১ম খণ্ডে এবং যেসকল ব্যক্তি হাদীসবিদদের জীবনী লিখেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর নাম তাঁদের গ্রন্থে লিখেছেন। সকলেই ধর্মপরায়ণতা, খোদাভীতি ও ৫ ষ্ঠত্বের কারণে তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি উন্নত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের কারণে তাঁর নিজ গোত্রের মধ্যে বিশেষ প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর সহযো া হিসেবে সিফফনের যু ইসলামের অনেক বড় শত্রুদের নিধন করেছেন।

সুলাইমান আহলে বাইতের শত্রুদের বিপথগামী বলে বিশ্বাস করতেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁর হাদীস হতে দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি রাসূল (সা.) হতে সরাসরি এবং জুবাইর ইবনে মুতয়েমের সূত্রে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু ইসহাক সাবিয়ী এবং আদী ইবনে সাবিত তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুলাইমান সারুদ এই দুই হাদীস গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.), উবাই ইবনে কা'ব ও ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.) হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামুর, আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াসার ও অন্যান্যরা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩৭। সুলাইমান ইবনে তারখান তায়িমী (বসরার অধিবাসী)

কাইস ইমামের দাস এবং একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী। ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থে তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন এবং সিহাহ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ লেখকগণ তাঁর হাদীস হতে দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আনাস ইবনে মালিক, আবু মাজায, বকর ইবনে আবদুল্লাহ্, ক্বাতাদাহ্ এবং উসমান নাহদী হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংরক্ষিত আছে। মুসলিমে এরা ছাড়াও অন্যদের হতে তিনি হাদীস নকল করেছেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের সূত্র মতে শো'বা, সুফিয়ান সাওরী এবং স্বীয় পুত্র মুয়াম্মার তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমের সূত্রে আরো অনেকেই তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১৪৩ হিজরীতে পৃথিবী হতে বিদায় নেন।

৩৮। সুলাইমান ইবনে ক্বারাম ইবনে মায়ায (আবু দাউদ দাবয়ী, কুফী)

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে ইবনে হিব্বান সূত্রে বলেছেন, "তিনি রাফেযী ও আহলে বাইতের ইমামদের বিষয়ে অতির নকারী।"

এতদসত্ত্বেও আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং মিযানের বর্ণনা মতে ইবনে আদী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "সুলাইমানের বর্ণিত হাদীস উত্তম এবং সুলাইমান ইবনে আরকাম হতে তাঁর হাদীস অধিকতর গ্রহণযোগ্য।" মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী ও আবু দাউদ তাঁদের সহীহতে তাঁর বর্ণিত হাদীস এনেছেন।

যাহাবী ঐ সকল হাদীসগ্রন্থের সাংকেতিক চিহ্ন তাঁর নামের পার্শ্বে (মিযান গ্রন্থে) লিপিব করেছেন।

সহীহ মুসলিমে বিশু সূত্রে আবুল জাওয়াব সুলাইমান ইবনে ক্বারাম হতে এবং তিনি আ'মাশ হতে (মারফু হাদীস) বর্ণনা করেছেন। المرء مع من أحبّ "মানুষ তার সঙ্গেই থাকবে (পুনরুত্থিত হবে) যাকে সে ভালবাসে।"

তেমনি সুনানের গ্রন্থসমূহে তিনি সাবিত হতে এবং সাবিত আনাস হতে বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা.) বলেছেন : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপরিহার্য (ফরয)।" তাছাড়া তিনি আ'মাশ, আমর ইবনে মুররাহ্ ও আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিস

হতে এবং যুহাইর ইবনে আকমার আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর হতে বর্ণনা করেছেন, "হাকাম ইবনে আবুল আস রাসূলের অনুকরণ করত ও রাসূলের বাণীকে বিকৃত করে অশ্লীল ভঙ্গিতে কুরাইশদের নিকট বর্ণনা করত। তাই রাসূল (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত তার বংশধরদের ওপর লা'নত করেছেন।

৩৯। সুলাইমান ইবনে মেহরান কাহেলী আ'মাশ (কুফার অধিবাসী)

শিয়া আলেমে ণীর অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি ও মুহাদ্দিস। আহলে সুন্নাহর অনেকেই তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। ইমাম ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থে এবং শাহরেস্তানী তাঁর 'মিলাল ওয়ান নিহাল'- এ এটি স্বীকার করেছেন।

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে জাওযাজানীর দৃষ্টিতে যুবাইদের পরিচয় পর্বে তাঁর উ ৃতি এভাবে এনেছেন- কুফার অধিবাসীদের মধ্যে একদল লোক ছিল যাঁদেরকে কুফার অধিবাসীরা তাঁদের মাজহাবের কারণে পছন্দ করত না। এরা কুফার মুহাদ্দিসদের শিরোমণি বলে পরিচিত ছিলেন। যেমন আবু ইসহাক, মানসুর, যুবাইদ ইয়ামী, আ'মাশ এবং তাঁদের সমপর্যায়ের ও নিকটবর্তী কয়েকজন ব্যক্তি। সততা ও সত্যবাদিতার কারণে লোকজন তাঁদের হাদীস গ্রহণ করত।

এর সঙ্গে তিনি আরো কিছু কথা সংযুক্ত করেছেন যা তাঁর মূর্খতার পরিচয় বহন করে। কিন্তু শিয়া মাজহাবের এ মহান ব্যক্তিবর্গের স্কন্ধে যে গুরুদায়িত্ব রয়েছে এবং নবী (সা.)- এর রেসালতের দায়িত্বের বিনিময়স্বরূপ তাঁর পরিবারের প্রতি ভালবাসা ও নবীর নির্দেশ অনুযায়ী দু'টি মূল্যবান ও ভারী বস্তুকে আঁকড়ে ধরার কর্তব্যকে পালন করতে গিয়ে তাঁদের কোন ভয়- ভীতিকে গুরুত্ব দেয়া চলে না তাই আহলে বাইতের শত্রু ও তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী তাঁদের প্রশংসা করুক বা না করুক তা তাঁদের সত্যবাদিতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আহলে বাইত বিরোধী ব্যক্তিরা তাঁদের সত্যবাদিতার কারণে নয়, বরং যেহেতু এক্ষেত্রে তাদের অক্ষমতা ছিল সেহেতু বাধ্য হয়ে এই মুহাদ্দিসগণের মুখাপেক্ষী হয়েছে। তারা যদি এদের হাদীসগুলো গ্রহণ না করত

তবে মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াতের সকল প্রভাব ও চিহ্ন মুছে যেত যেমনটি যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে আবান ইবনে তাগলিবের পরিচয় দিতে গিয়ে স্বীকার করেছেন।

আমার ধারণা, মুগীরাহ্ যে বলত, ‘আবু ইসহাক ও আ’মাশ কুফার অধিবাসীদের ধ্বংস করবে’ এর কারণ তাঁরা দু’জনই শিয়া ছিলেন। নতুবা আবু ইসহাক ও আ’মাশ জ্ঞানের সমুদ্র ও রাসূলের হাদীসের সংরক্ষক ছিলেন। আ’মাশের জীবনে আশ্চর্যজনক কিছু ঘটনা ঘটেছে যা তাঁর মর্যাদা ও সম্মানের প্রমাণ। যেমন :

ক) ইবনে খাল্লেকান তাঁর ‘ওয়াফায়াতুল আইয়ান’ গ্রন্থে আ’মাশের জীবনী লিখতে গিয়ে বলেছেন, উমাইয়্যা খলীফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিক আ’মাশের নিকট একজন দূত পাঠিয়ে হযরত উসমানের গুণ এবং আলীর খারাপ দিকগুলো সমন্বিত করে একটি গ্রন্থ রচনা করতে বলল। আ’মাশ পত্রটি গ্রহণ করে ভেড়ার মুখে দিলে ভেড়া তা চাবিয়ে খেয়ে ফেলে এবং আ’মাশ দূতকে বলেন : হিশাম ইবনে আবদুল মালিককে গিয়ে বল এটি তার প্রস্তাবের জবাব। দূত বলল : হিশাম শপথ করেছে তোমার লিখিত জবাব না নিয়ে গেলে আমাকে হত্যা করবে। দূত আ’মাশের ভ্রাতা ও বন্ধুদের মাধ্যমে আ’মাশকে পত্রের জবাব লিখতে আহবান জানাল। অনেক পীড়াপীড়ির পর আ’মাশ লিখলেন : বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। যদি উসমান পৃথিবীপূর্ণ ফজীলতসম্পন্ন হন তাহলে তা আপনার কোন উপকারে আসবে না আর যদি আলী (আ.) সারা বিশ্বের সব খারাপ বৈশিষ্ট্য ধারণ করেন (নাউজুবিল্লাহ্) আপনার তাতে কোন ক্ষতি হবে না, বরং আপনার উচিত হবে নিজের বিষয়ে চিন্তা করা। ওয়াসসালাম।”

খ) ইবনে আবদুল বার বিভিন্ন আলেমদের পরস্পর সাক্ষাতের বিভিন্ন ঘটনা তাঁর ‘জামেয়ু বায়ানিল ইলম ও ফাজলুহু’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে আলী ইবনে খাশরাম হতে বর্ণনা করেছেন,

“ফযল ইবনে মূসাকে বলতে শুনেছি, আবু হানীফার সঙ্গে আ’মাশকে দেখতে গিয়েছিলাম। আবু হানীফা বললেন : যদি আপনার জন্য কষ্ট না হত তবে আমি আপনাকে দেখার জন্য আরো অধিক আসতাম। আ’মাশ জবাবে বললেন : আল্লাহর শপথ, আপনি যদি আপনার ঘরেও থাকেন তা

আমার জন্য সহ্য করা কঠিন সেক্ষেত্রে আপনার চেহারা দেখা ও সহ্য করা আরো কঠিন।” ইবনে খাশরাম বলেন, “ফযল বলেছেন : যখন আ’মাশের ঘর হতে বেরিয়ে আসলাম, আবু হানীফা আমাকে বললেন : আ’মাশ কোন মাসেই রোযা রাখেন না।”

ইবনে খাশরাম বলেন, ফযলকে প্রশ্ন করলাম, “আবু হানীফার এটি বলার উদ্দেশ্য কি?” ফযল বললেন, “তাঁর উদ্দেশ্য হলো এটি বুঝানো যে, আ’মাশ সেহরীর ক্ষেত্রে হুজাইফা বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী আমল করেন।”(* ১৯(

আমার মতে বরং তিনি কোরআনের এ আয়াত অনুযায়ী আমল করতেন-

(و كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر,ثمّ أتمّوا الصّيام إلى اللّيل)

খাও ও পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের জন্য সাদা রেখা কাল রেখা হতে পৃথক না হয়। অতঃপর তোমাদের রোযাকে রাত্রি পর্যন্ত পূর্ণ কর। (সূরা বাকারা : ১৮৭)

গ) ‘ওয়াজিযাহ্’ গ্রন্থের লেখক এবং আল্লামাহ্ মাজলিসী তাঁর ‘বিহারুল আনওয়ার’ গ্রন্থে হাসান ইবনে সাঈদ নাখয়ী হতে এবং তিনি শারিক ইবনে আবদুল্লাহ্ কাজী হতে বর্ণনা করেছেন, “অসুস্থতায় আ’মাশ মৃত্যুবরণ করেন, সেই অসুস্থতার সময় তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমি যখন সেখানে অবস্থান করছিলাম ইবনে শাবরামাহ্, ইবনে আবি লাইলা এবং আবু হানীফা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ও তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি জবাব দিলেন : দুর্বল হয়ে পড়েছি; নিজের গুনাহ্ ও ভুলের কারণে ভীত ও ক্রন্দনরত আছেন বলে জানালেন। আবু হানীফা তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : হে আবু মুহাম্মদ! আল্লাহকে ভয় কর, নিজের ভেতর প্রত্যাবর্তন কর, হযরত আলী সম্পর্কে তুমি যে হাদীসগুলো বলেছ তা ফিরিয়ে নাও। আ’মাশ বললেন : তুমি আমাকে এরূপ বলছ? তাঁকে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন ও তাঁর তীব্র সমালোচনা করলেন।”

‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে যাহাবী বলেছেন, “তিনি বিশ্বস্ত রাবীগণের শীর্ষস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত ও নির্ভরযোগ্য।” ইবনে খাল্লেকানও তাঁর ‘ওয়াফায়াতুল আ’য়ান’ গ্রন্থে তাঁকে প্রসি আলেম, সত্যবাদী, নির্ভরযোগ্য, পরহেজগার ও ন্যায়পরায়ণ বলে উল্লেখ করেছেন।

সিহাহ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য হাদীস লেখকগণ তাঁর বর্ণিত হাদীসের ওপর নির্ভর করেছেন ও প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যবহার করেছেন। আপনি এজন্য সাঈদ ইবনে ওয়াহাব, সাঈদ ইবনে যুবাইর, মুসলিম বাতিন, শো'বা, মুজাহিদ, আবু ওয়াইল, ইবরাহীম নাখয়ী ও আবু সালিহ যাকরান হতে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ এবং তাঁর হতে শো'বা, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে উয়াইনা, আবু মুয়াবিয়া মুহাম্মদ, আবু আওয়ানাহ্, জারির এবং হাফছ ইবনে গিয়াছ যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে দেখতে পারেন।

আ'মাশ ৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ ও ১৪৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

ش

৪০। শারিক ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে সিনান ইবনে আনাস নাখয়ী (কুফার কাজী)

ইবনে কুতাইবা তাঁকে শিয়া রিজাল বলেছেন ও তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থে তাঁর শিয়া হবার বিষয়টি অকাট্য বলে স্বীকার করেছেন।

'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইবনে ইদরিসের উক্তি দিয়ে বলা হয়েছে তিনি আল্লাহর শপথ করে বলেছেন যে, শারিক শিয়া।

আবদুল্লাহ্ ইবনে ইদরিস ছাড়াও আবু দাউদ রাহাওয়াইহর উক্তি দিয়ে মিযানে বলা হয়েছে তিনি শারিককে বলতে শুনেছেন- عليّ خير البشر فمن أبى فقد كفر আলী সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, যে তা অস্বীকার করে, সে কাফির।[১০৪] আমার মতে রাসূল (সা.)- এর পর আলী (আ.) শ্রেষ্ঠ মানুষ যেমনটি শিয়ারা বিশ্বাস করে। এ কারণেই জাওযাজানী যিনি আমাদের পথ হতে বিচ্যুত, তদুপরি তিনি শারিকের প্রশংসা করেছেন।

'মিযানুল ই'তিদাল'- এর সূত্রে শারীক ঐ সকল ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত যাঁরা আলী (আ.)- এর খেলাফতের সপক্ষে সুস্পষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি আবু রাবীয়া আইয়াদীর সূত্রে ইবনে বুরাইদা হতে এবং তিনি তাঁর পিতা হতে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে (সহীহ ও মারফু হাদীস) রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন-

لكلّ نبيّ وصيّ و وارث و إن عليّا وصيّي و وارثي অর্থাৎ সকল নবীরই প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী রয়েছে, আলী আমার স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী।

শারিক আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর গুণ ও ফাজায়েল বর্ণনা করতেন ও এর মাধ্যমে বনি উমাইয়্যার সম্মানকে ভূলু ি ত করতেন।

ইবনে খাল্লেকানের 'ওয়াফায়াতুল আ'য়ান' গ্রন্থে শারিকের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে 'দুররাতুল গাউছ' গ্রন্থের লেখক হারিরীর সূত্রে (ঐ গ্রন্থ হতে) বর্ণনা করেছেন। শারিকের একজন উমাইয়্যা বন্ধু ছিল। একদিন শারিক আলীর ফজীলত বর্ণনা করে একটি হাদীস বর্ণনা করলে উমাইয়্যা বন্ধুটি বলল, نعم الرجل عليّ অর্থাৎ আলী কত ভাল মানুষ! এ কথা শুনে শারিক রাগান্বিত হয়ে বললেন, "আলী (আ.)- কে শুধু একজন ভাল মানুষ বলেই শেষ করলে, এর সঙ্গে উত্তম কিছু যোগ না করেই।"[১০৫]

'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে ইবনে আবি শাইবা আলী ইবনে হাকীম হতে এবং তিনি আলী ইবনে কাদিম হতে বর্ণনা করেছেন, "ইতাব ও আরেকজন ব্যক্তি শারিকের নিকট আগমন করলে ইতাব শারিককে বললেন : লোকেরা বলে আপনি খেলাফতের বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে আছেন। শারিক এর জবাবে তাঁকে বললেন : হে মূর্খ! কিরূপে আমি খেলাফতের বিষয়ে সন্দেহে থাকব যখন আমি সব সময় ইচ্ছা করি যদি সম্ভব হত আলী (আ.)- এর সঙ্গে থেকে যু করে তাঁর শত্রুদের রক্তে আমার তরবারী রি ত করতে পারতাম!"

যদি কেউ শারিকের জীবনপ তি নিয়ে পর্যালোচনা করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, তিনি আহলে বাইতকে ভালবাসতেন এবং তাঁদের বন্ধুদের নিকট হতে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছেন।

'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে শারিকের পুত্র আবদুর রহমান হতে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন, "আমার পিতা জাবির জো'ফী হতে দশ হাজার মাসআলা এবং বিভিন্ন আশ্চর্যজনক ও কঠিন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন।"

‘মিযানুল ই’তিদাল’- এ আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক হতে বলা হয়েছে, “শারিক কুফার আলেম ও হাদীসবিদদের মধ্যে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা হতে অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন। তিনি আলী বিদ্বেষীদের প্রতি চরম শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন ও তাদের প্রতি কটু কথা বলতেন।”

আবদুস্ সালাম ইবনে হারব তাঁকে বললেন, “আপনি কি আপনার এক ভ্রাতাকে দেখতে যাবেন?” তিনি বললেন, “কে তিনি?” বলা হলো, “মালিক ইবনে মুগুল।” শারিক বললেন, “যে ব্যক্তি আলী (আ.) ও আম্মারের দোষ ধরে ও তাঁদেরকে ছোট মনে করে সে আমার ভাই নয়।”

একবার তাঁর সামনে মুয়াবিয়া সম্পর্কে কথা উঠলে কেউ একজন মুয়াবিয়াকে সহনশীল বলে প্রশংসা করলে শারিক বললেন, “যে ব্যক্তি সত্যকে চিনে না ও সত্যের বিরু   দাঁড়ায় (আলীর বিরু   যু   করে) সে ব্যক্তি সহনশীল হতে পারে না।”

শারিক সেই ব্যক্তি যে আসেম ইবনে যার হতে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ হতে সহীহ সনদে (হাদীসে মারফু) মহানবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, “যখন মুয়াবিয়াকে আমার মিম্বারে দেখবে তখন তাকে হত্যা কর।”[১০৬]

উপরোক্ত ঘটনাসমূহ যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (শারিকের পরিচিতি অধ্যায়ে)।

‘ওয়াফায়াতুল আ’য়ান’ গ্রন্থে শারিকের পরিচিতি অধ্যায়ে এসেছে, একবার আব্বাসীয় খলীফা মাহদীর সামনে শারিক ও মুসআব ইবনে আবদুল্লাহর মধ্যে বাক্য বিনিময় হয়। মুসআব তাঁকে বলে, “তুমি তো সেই ব্যক্তি যে হযরত আবু বকর ও উমরের ভুল ধরে সমালোচনা কর...।”

শিয়া বিষয়ে এতটা কঠোর হওয়া সে   ও যাহাবী তাঁকে সত্যবাদী ও হাদীস সংরক্ষণকারীদের শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম বলেছেন এবং ইবনে মুঈন হতে নকল করেছেন, “তিনি সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য।” শারিকের পরিচিতি পর্বের শেষ অংশে বলেছেন, “শারিক জ্ঞানের একজন উত্তম সংরক্ষক ও ধারক ছিলেন।” ইসহাক আযরাক তাঁর হতে ৯ হাজার হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। আবু তওবা হালাবী বলেছেন, “আমরা রামাল্লায় থাকাকালীন আলোচনা উঠেছিল বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর ে ষ্ঠ রাবী কে? কেউ বললেন, ইবনে লাহিয়াহ্, কেউ বললেন, আনাস ইবনে মালিক। এ

বিষয়ে ঈসা ইবনে ইউনুসকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : মুসলিম উম্মাহর ৫ ষ্ঠ রাবী বর্তমানে শারিক, যতদিন তিনি জীবিত আছেন।”

মুসলিম ও সুনানে আরবাআহর হাদীস সংকলকগণ শারিক কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এজন্য যেসকল হাদীস তিনি যিয়াদ ইবনে আলাকা, আম্মার দাহনী, হিশাম ইবনে উরওয়াহ্, ইয়ালী ইবনে আতা, আবদুল মালিক ইবনে উমাইর, আম্মারাহ্ ইবনে ক্বাক্বা, আবদুল্লাহ্ ইবনে শাবরামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন ও ইবনে আবী শাইবাহ্, আলী ইবনে হাকীম, ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ, ফযল ইবনে মূসা, মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ্ এবং আলী ইবনে হাজার তাঁর হতে বর্ণনা করেছেন তা অধ্যয়ন করুন।

তিনি খোরাসান অথবা বুখারায় ৯৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৭৭ বা ১৭৮ হিজরীর জিলক্বদের প্রথম শনিবার কুফায় ইন্তেকাল করেন।

৪১। শো’বাহ্ ইবনে হাজ্জাজ, আবুল ওয়ারদ্ আতকী ওয়াসিতের অধিবাসী কিন্তু বসরায় জীবন) কাটান, তাঁর বংশগত নাম আবু বুসতাম((২০*)

তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ইরাকে হাদীসবিদদের অবস্থার মূল্যায়নের কাজ শুরু করেন এবং দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী ও তাঁদের বর্ণিত হাদীস হতে দূরে সরে আসেন।

আহলে সুন্নাহর কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত আলেম ও ব্যক্তিত্ব যেমন ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘মা’আরিফ’ গ্রন্থে এবং শাহরেস্তানী তাঁর ‘মিলাল ওয়ান নিহাল’- এ তাঁকে শিয়া রিজালের (হাদীসবিদ) অন্তর্ভুক্ত বলেছেন।

সিহাহ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য হাদীস লেখকগণ তাঁর হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে তাঁর বর্ণিত হাদীস রয়েছে। এ দুই হাদীসগ্রন্থে তিনি আবু ইসহাক সাবিয়ী, ইসমাঈল ইবনে আবি খালিদ, মানসুর, আ’মাশ ও অনেকের থেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং মুহাম্মদ ইবনে জা’ফর, ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান, উসমান ইবনে জাবালাহ্ ও অন্যান্যরা তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি ৮৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ ও ১৬০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন।

ص

৪২। সা'সাআহ্ ইবনে সাউহান ইবনে হাজার ইবনে হারিস আবদী

ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থের ২০৬ পৃষ্ঠায় তাঁকে প্রসি রাবীদের সারিতে ফেলেছেন। ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "তিনি হযরত আলী (আ.)- এর সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন ও যু তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি একজন বাগ্মী ও আলীর বিশেষ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ও তাঁর দু' ভাই জাহিদ ও সাইহান উষ্ট্রের যু হযরত আলীর পক্ষে যু করেন। সাইহান সা'সাআহ্ হতে অধিকতর বাগ্মী ছিলেন, তাই বক্তব্য দানের বিশেষ দায়িত্বও তাঁর ওপর ছিল ও উষ্ট্রের যু র (জঙ্গে জামাল) পতাকা তাঁর হাতেই ছিল এবং এ যু ই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[১০৭] তাঁর অন্যতম ভ্রাতা যাইদও এ যু শহীদ হন এবং তাঁর মৃত্যুর পর পতাকা ধারণ করেন সা'সাআহ্ ইবনে সাউহান।"

ইবনে সা'দ আরো বলেছেন, "সা'সাআহ্ হযরত আলী (আ.) ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যদিও তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী তদুপরি কম হাদীস নকল করেছেন।"

ইবনে আবদুল বার তাঁর ইসতিয়াব গ্রন্থে বলেছেন, "সা'সাআহ্ রাসূল (সা.)- এর জীবদ্দশায়ই ইসলাম গ্রহণ করেন কিন্তু সে সময়ে তাঁর বয়স কম থাকায় রাসূলের সান্নিধ্যে আসতে পারেন নি।" তিনি তাঁর গোত্র আবদ কাইসের নেতা ছিলেন এবং বাগ্মী, ভাষার অলঙ্কারশাস্ত্রে পণ্ডিত, বু মান, মিষ্টভাষী, ধর্মপরায়ণ ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হযরত আলীর বিশেষ সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন।

ইবনে আবদুল বার ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন হতে বর্ণনা করেছেন যে, সা'সাআহ্, যাইদ ও সাইহান সাউহানের এ তিন পুত্রই ভাল বক্তা ছিলেন এবং যাইদ ও সাইহান উষ্ট্রের যু নিহত হন।

তিনি আরো বলেছেন, “হযরত উমরের খেলাফতকালে একবার একটি সমস্যা দেখা দিলে তিনি সকলের নিকট পরামর্শ চাইলেন। সকলেই যখন নিশ্চুপ রইলেন যুবক সা’সাআহ্ নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে সঠিক পরামর্শ দান করলেন। খলীফাসহ সবাই তাতে সন্তুষ্ট হলেন।”

সুতরাং এটি আশ্চর্যের কোন বিষয় নয় যে, সাউহানের পুত্ররা সবাই আরবের মর্যাদাপূর্ণ ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘মা’আরিফ’ গ্রন্থে তাঁদেরকে প্রসি ও বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। তিনি আরো বলেন, “সাউহানের সন্তানরা হলেন যাইদ ইবনে সাউহান, সা’সাআহ্ ইবনে সাউহান ও সাইহান ইবনে সাউহান এবং তিনি বনি আবদে কাইসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে যাইদ ভাল হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : যাইদ এক উত্তম ব্যক্তি যার হাত কাটা যাবে এবং জুনদুবও এক উত্তম ব্যক্তি। রাসূলকে বলা হলো : কেন দু’ব্যক্তির কথা বলছেন? রাসূল বললেন : তাদের একজনের হাত তার হতে ত্রিশ বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে ও অপরজন তরবারীর মাধ্যমে সত্য থেকে মিথ্যাকে পৃথক করবে।”

তিনি এও বলেছেন, “তাদের একজন হলো যাইদ ইবনে সাউহান, জালূলার যু   তাঁর হাত কর্তিত হয় এবং জঙ্গে জামালে তিনি আলী (আ.)- এর সঙ্গে ছিলেন এবং আলীকে বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন! আমি এবার নিজেকে নিহত হতে দেখতে পাচ্ছি। ইমাম তাঁকে বললেন : কিরূপে তুমি তা জান, হে আবু সুলাইমান? তিনি বললেন : স্বপ্নে দেখেছি আমার কর্তিত হাত আসমান হতে নেমে এসেছে ও আমাকে টেনে ওপরে নিতে চাচ্ছে।’ আমর ইবনে ইয়াসরেবী এ যু   তাঁকে শহীদ করে ও তাঁর ভ্রাতা সাইহানকেও সেদিন হত্যা করে।

এ বিষয়টি কারো অজানা নয় যে, ‘যাইদের হাত তাঁর অনেক পূর্বেই বেহেশতে প্রবেশ করবে’ রাসূলের এ ভবি দ্বাণী সকল মুসলমানের দৃষ্টিতেই নবুওয়াতের প্রমাণ, ইসলামের অন্যতম মু’জিযা ও সত্যপন্থীদের পক্ষে দলিল। যেসকল ব্যক্তি যাইদ সম্পর্কে লিখেছেন তাঁদের সকলেই তাঁর বিষয়ে রাসূলের এ কথাটি বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁর সূত্রে এ হাদীসটি রাসূল হতে

বর্ণনা করেছেন। এজন্য হাদীসগ্রন্থসমূহ ও অন্যান্য গ্রন্থ যেখানে যাইদের পরিচিতি বর্ণনা করা হয়েছে যেমন 'ইসতিআব' ও 'আল ইসাবাহ্' গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে পারেন।

সুতরাং শিয়া হওয়া স ে ও রাসূল (সা.) তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন। সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের জন্য।

আসকালানী তাঁর 'আল ইসাবাহ্' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সা'সাআহ্ সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি হযরত আলী ও উসমান হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সিফফিনের যু ে তিনি হযরত আলী (আ.)- এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি একজন মিষ্টভাষী ও বাগ্মী ব্যক্তি ছিলেন এবং মুয়াবিয়ার সঙ্গে তাঁর শত্রুতা ছিল।"

আসকালানী আরো বলেছেন, "শা'বী বলেছেন : আমি সা'সাআহ্ হতে বক্তব্য দান প তি শিক্ষা গ্রহণ করেছি।"[১০৮]

আবু ইসহাক সাবিয়ী, মিনহাল ইবনে আমর, আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরাইদা ও অন্যান্যরা তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আলাঈ কয়েকটি সূত্রে উল্লেখ করেছেন, "মুগীরাহ্ ইবনে শো'বা মুয়াবিয়ার নির্দেশে তাঁকে কুফা হতে আল জাজিরাহ্ বা বাহরাইনে নির্বাসন দেয় এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। যেরূপ উসমান আবু যার গিফারীকে বাবযায় নির্বাসন দেন এবং তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করেন।"

যাহাবী সা'সাআহ্ সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি হাদীস বর্ণনায় প্রসি ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।" ইবনে সা'দ ও নাসায়ী তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। যাহাবী তাঁর নামের পাশে সাংকেতিকভাবে নাসায়ী কর্তৃক তাঁর হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপনের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

আমার মতে যাঁরা তাঁর হাদীস ব্যবহার হতে বিরত থেকেছেন তাঁরা নিজেদেরই ক্ষতি করেছেন ও নিজেদের প্রতি অবিচার করেছেন, তাঁর প্রতি নয়।

ط

৪৩। তাউস ইবনে কাইসান খাওলানী হামাদানী ইয়ামানী (**আবু আবদুর রহমান**)

তাঁর মাতা পারস্য দেশীয় ও পিতা নামির ইবনে কাসিত গোত্রের। তাঁর পিতা বাজির ইবনে রাইসানের ক্রীতদাস এবং হামিরী।

আহলে সুন্নাহর আলেমগণ তাঁকে প্রাচীন শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। শাহরেস্তানী তাঁর ‘আল মিলাল ওয়ান নিহাল’ গ্রন্থে ও ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘মা’আরিফ’ গ্রন্থে তাঁকে শিয়া রিজাল বলে উল্লেখ করেছেন।

সিহাহ সিত্তাহর হাদীস লেখকগণ তাঁর হাদীসকে ব্যবহার করে প্রমাণ ও দলিল উপস্থাপন করেছেন। এজন্য আপনি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর ও আবু হুরাইরা হতে তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো দেখতে পারেন।

এছাড়া হযরত আয়েশা, যায়েদ বিন সাবিত, আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ মুসলিমে রয়েছে। তাঁর থেকে বুখারীতে শুধু যুহরী হাদীস বর্ণনা করেছেন ও মুসলিমে মাত্র কয়েকজন রাবী তাঁর থেকে হাদীস নকল করেছেন।

তিনি মক্কায় ১০৪ বা ১০৬ হিজরীতে জিলহ মাসের সপ্তম দিনে হে র কয়েকদিন পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম হাসান ইবনে আলীর পুত্র আবদুল্লাহ্ মানুষের ভীড়ের মধ্যে তাঁর জানাযা বহন করেন। এত অধিক লোক জানাযায় অংশগ্রহণ করে যে, জনতার চাপে আবদুল্লাহর পরিধেয় বস্ত্র পশ্চাত দিকে ছিড়ে যায় ও তাঁর পাগড়ী খুলে পড়ে যায়।

ظ

৪৪। যালিম ইবনে আমর ইবনে সুফিয়ান আবুল আসওয়াদ দু’আলী

তাঁর শিয়া হওয়ার বিষয়টি ও ইমাম আলী, হাসান, হুসাইন এবং আহলে বাইতের অন্যান্য সদস্যগণের প্রতি তাঁর ভালবাসার দিকটি সূর্যালোকের চেয়েও স্পষ্ট। আমরা আমাদের ইসলামের প্রাথমিক যুগের শিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কিত ‘মুখতাছারুল কালাম ফি মুয়াল্লিফিশ- শিয়া মিন সাদরিল ইসলাম’ গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাঁর শিয়া হবার ব্যাপারে

কোন সন্দেহ না থাকা স ও সিহাহ সিত্তাহর লেখকগণ তাঁর হাদীস প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য ব্যবহার করেছেন।

এজন্য সহীহ বুখারীতে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব হতে তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো দেখুন। এছাড়া আবু মুসা আশা'আরী ও ইমরান ইবনে হুসাইন হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ মুসলিমে লক্ষণীয়। ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামুর যেসকল হাদীস তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন তা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরাইদাহ্ ও মুসলিমে তাঁর পুত্র আবু হারব তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৯৯ হিজরীতে বসরায় যে মহামারী দেখা দেয় তাতে তিনি অসুস্থ হয়ে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন। তিনি আলী (আ.)- এর নির্দেশানুযায়ী আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রের (علم نحو) নিয়ম- কানুন তৈরী করেন। এ বিষয়গুলো আমরা আমাদের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

ع

৪৫। আমের ইবনে ওয়ায়েলা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার লাইসী

তাঁর বংশীয় নাম আবু তুফাইল। তিনি উহুদ যু র বছর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন ও মহানবী (সা.)- এর সময়কালের আট বছর পেয়েছিলেন।

ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থে তাঁকে রাফেযীদের মধ্যে কট্টর অংশের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম হুসাইনের রক্তের বদলা গ্রহণকারী মুখতার সাকাফীর সেনাবাহিনীর পতাকাধারী ও রাসূল (সা.)- এর সর্বশেষ জীবিত সাহাবী বলেও তিনি তাঁকে স্মরণ করেছেন।

ইবনে আবদুল বার তাঁর 'ইসতিয়াব' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি কুফায় বসবাস করতেন ও সকল স্থানে হযরত আলী (আ.)- এর সঙ্গে ছিলেন, হযরত আলীর মৃত্যুর পর মক্কায় যান। তিনি একজন বিজ্ঞ, জ্ঞানী, উপস্থিত বু সম্পন্ন, মিষ্টভাষী ও সাহিত্যিক ছিলেন। আলীর অনুসারীদের মধ্যে একজন সত্যিকারের খোদামুখী ব্যক্তি।"

তিনি আরো বলেছেন, “আবু তুফাইল একদিন মুয়াবিয়ার দরবারে উপস্থিত হলে মুয়াবিয়া তাঁকে প্রশ্ন করলেন : তোমার বন্ধু আবুল হাসান (আলী)- এর প্রতি তোমার ভালবাসার অবস্থা এখন কিরূপ? তিনি জবাব দিলেন : হযরত মূসার প্রতি তাঁর মাতার ভালবাসার ন্যায়। তবে পার্থক্য এটুকু যে, আলীর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কারণে আমি লজ্জিত ও তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

মুয়াবিয়া বললেন : তুমি উসমানকে গৃহবন্দীকারী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বললেন : না, তবে তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মুয়াবিয়া বললেন : তবে কেন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যাও নি? আবু তুফাইল বললেন : সে তোমার সাহায্য চেয়েছিল তবুও কেন তুমি তার সাহায্যে যাও নি অথচ সিরিয়ার সকল অধিবাসী তোমার সঙ্গে ছিল ও তোমার নির্দেশ মানত। তবে কি তোমার কোন অভিসন্ধি ছিল? মুয়াবিয়া বললেন : তবে কি তুমি দেখ নি আমি উসমানের খুনের দাবীতে কিয়াম করেছি? এটিই তার প্রতি আমার সাহায্য। আবু তুফাইল বললেন : তোমার একথা কবি আখু জাফের মত যিনি বলেছেন,

لألفينك بعد الموت تندبني

আমি দেখছি আমার মৃত্যুর পর আমার জন্য ক্রন্দন করছ

و في حياتي ما زودتني زادا

অথচ আমার জীবদ্দশায় কোন সাহায্যই তুমি কর নি।

যুহরী, আবু যুবাইর, ইবনে আবি হুসাইন, আবদুল মালিক ইবনে আবজার, ক্বাতাদাহ্, মা’রুফ, ওয়ালিদ ইবনে জামিহি, মানসুর ইবনে হাইয়ান, কাসিম ইবনে আবি বুরদাহ্, আমর ইবনে দিনার, ইকরামা ইবনে খালিদ, কুলসুম ইবনে হাবিব, ফোরাত কায্যায্, আবদুল আযীয ইবনে রাফী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেসকল হাদীস তাঁরা আবু তুফাইল হতে বর্ণনা করেছেন তা সহীহ মুসলিমে রয়েছে।

সহীহ মুসলিমের বর্ণনা মতে আবু তুফাইল হ সম্পর্কিত একটি হাদীস রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে রাসূলের গুণাবলীসমূহ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

নবুওয়াতের নিদর্শন ও নামায সম্পর্কে মুয়াজ ইবনে জাবাল হতে এবং কাযা ও ক্বাদার (ভাগ্য) সম্পর্কিত একটি হাদীস তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ হতে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি হযরত আলী (আ.), হুজাইফা ইবনে উসাইদ, হুজাইফা ইবনে ইয়ামান, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব হতেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাঁরা সহীহ মুসলিম ও সিহাহ সিত্তাহর অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের ওপর গবেষণা করেছেন তাঁরা বিষয়টি ভালভাবেই জানেন।

তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে কয়েকটি কথা প্রচলিত রয়েছে। হিজরী ১০০, ১০২, ১০৭ অথবা ১১০ সাল তাঁর মৃত্যুর বছর বলে উল্লিখিত হয়েছে। ইবনে কাইসারানী ১২০ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করেন।

৪৬। আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব ইসলামী রাওয়াজানী (কুফী)

দারে কুতনী বলেন, “আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব শিয়া ও সত্যবাদী।” ইবনে হাইয়ান বলেছেন, “আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব রাফেযী বিশ্বাসের দিকে মানুষদের দাওয়াত করতেন।”

ইবনে খুজাইমা বলেছেন, “এমন এক ব্যক্তি যিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কিন্তু মাজহাবের বিষয়ে অভিযুক্ত, তিনি হলেন আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব।”

আব্বাদই সেই ব্যক্তি যিনি ফযল ইবনে কাসিম হতে ও তিনি সুফিয়ান সাওরী হতে, তিনি যুবাইদ হতে এবং যুবাইদ মুররাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ নিম্নোক্ত আয়াতটিকে এভাবে তেলাওয়াত করতেন- و كفى الله المؤمنين القتال بعليّ অর্থাৎ আল্লাহপাক আলীর মাধ্যমে মুমিনদের যু   হতে মুক্তি দিয়েছেন।

আবার তিনি শারিক হতে, তাঁর হতে আছিম, তিনি যার হতে ও তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ হতে বর্ণনা করেছেন, “রাসূল (সা.) বলেছেন : যখন মুয়াবিয়াকে আমার মিম্বারে দেখবে তখন তাকে হত্যা কর।” তাবারী ও অন্যরা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আব্বাদ সব সময় বলতেন, “যে ব্যক্তি তার দৈনন্দিন নামাযে নবী (সা.)- এর আহলে বাইতের শত্রুদের হতে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহর সাহায্য না চায়, সে নবীর বংশধরদের শত্রুদের সঙ্গে পুনরুত্থিত হবে।”

তিনি আরো বলেছেন, “মহান আল্লাহ্ ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে এর উর্ধ্বে যে, আলী (আ.)- এর সঙ্গে বাইয়াত ভঙ্গ করে যু করার পরও তালহা ও যুবাইরকে বেহেশতে দেয়ার মত বিচার করবেন।”

সালিহ ইবনে জাযারাহ্ বলেছেন, “আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব হযরত উসমানের তীব্র সমালোচনা করতেন এবং আবাদান আহওয়াজী নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন : আব্বাদ ইবনে ইয়াকুব হযরত আলী (আ.)- এর অধিকারকে অবৈধভাবে দখলকারীদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতেন।”

এতদস ও আহলে সুন্নাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যেমন বুখারী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, ইবনে খুযাইমা ও ইবনে আবি দাউদ তাঁর থেকে হাদীসশাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেছেন। এ কারণেই তিনি তাঁদের শিক্ষক ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি।

আবু হাতেম যদিও এক্ষেত্রে এই সকল ব্যক্তিবর্গের বিপরীতে তাঁর সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন তদুপরি বলেছেন, “তিনি (আব্বাদ) একজন বড় মাপের মানুষ ও বিশ্বস্ত।”

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “তিনি আলী ও তাঁর বংশধরদের বিষয়ে অতির নকারী শিয়া ও বিদআতের প্রবর্তক, তদুপরি হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত।” অতঃপর আমরা তাঁর সম্পর্কে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি তিনি তাই বলেছেন।

বুখারী তাঁর সহীহ হাদীসে তাঁর হতে কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি ২৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন। কিন্তু কাসিম ইবনে যাকারিয়া মুতরিয তাঁর প্রতি যে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে তা সমুদ্র খনন করে পানি আনয়নের মতই মিথ্যা অভিযোগ ছাড়া কিছু নয়। এ ধরনের হীন ব্যক্তি হতে আল্লাহর আ য় চাই।

و الله المستعان على ما تصفون (তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্য স্থল।

৪৭। আবদুল্লাহ্ ইবনে দাউদ আবদুর রহমান হামাদানী (কুফী)

তিনি বসরার হারাবাত্তাহর অধিবাসী। ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘মা’আরিফ’ গ্রন্থে তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। বুখারী তাঁর সহীহে তাঁর হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এজন্য আ’মাশ, হিশাম ইবনে উরওয়া ও ইবনে জারীহ হতে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ দেখতে পারেন। বুখারীতে কয়েকটি স্থানে মুশাদ্দাদ, আমর ইবনে আলী ও নাছর ইবনে আলী তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি ২১২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৪৮। উসামা ইবনে আমর ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাবের ইবনে বাশির ইবনে আতাওয়ারা ইবনে আমের ইবনে মালিক ইবনে লাইস (আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে হাদ, আবুল ওয়ালিদ কুফী)

তিনি হযরত আলী (আ.)- এর সাহাবী এবং তাঁর মাতা সালমা ইবনে উমাইস খাসআমি আসমা বিনতে উমাইসের ভগ্নী। সেই সূত্রে তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে জা’ফর, মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের খালাতো ভাই ও হযরত হামযাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা আম্মারার মাতৃকুলের ভাই।

ইবনে সা’দ তাঁকে কুফার অধিবাসী তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন এবং ইলম ও ফিকাহশাস্ত্রের পণ্ডিত বলে তাঁকে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর ‘তাবাকাত’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৮৬ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন- আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ কিছু সংখ্যক কোররাকে (ক্বারী ও কোরআন বিশারদ) নিয়ে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরু বিদ্রোহ করেন। এটি আবদুর রহমান মুহাম্মদ ইবনে আশআসের সময়ের ঘটনা। আবদুল্লাহ্ দাজিলের যু নিহত হন। তিনি ফকীহ্, হাদীস বিশেষজ্ঞ, শিয়া ও একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন।

এ যু ৮১ হিজরীতে সংঘটিত হয়। সিহাহ সিত্তাহর লেখকগণ ও অন্যান্য হাদীসবিদ আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদের হাদীস দলিল- প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যবহার করেছেন।

আবু ইসহাক শায়বানী, মা'বাদ ইবনে খালিদ ও সা'দ ইবনে ইবরাহীম তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সিহাহ সিত্তাহ্ ও মুসনাদসমূহে হাদীসগুলো রয়েছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মতে তিনি হযরত আলী, হযরত আয়েশা ও মায়মুনা হতে সরাসরি হাদীস শিক্ষা করেছেন।

৪৯। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবান ইবনে সালিহ, ইবনে উমাইর কুরশী (কুফার অধিবাসী এবং মেশকদানী উপাধীতে ভূষিত)

তিনি মুসলিম, আবু দাউদ, বাগাভী (বাগাওয়ী) ও তাঁদের সমকালীন অনেকেরই উস্তাদ ছিলেন। এ সকল ব্যক্তিবর্গ তাঁর হতে জ্ঞান ও হাদীস শিক্ষা করেছেন।

আবু হাতেম বলেছেন, 'তিনি শিয়া কিন্তু খুবই সত্যবাদী ব্যক্তি।' সালিহ ইবনে মুহাম্মদ জায়রাহ্ বলেন, "তিনি বিশ্বাসে বাড়াবাড়ি করে থাকেন তদুপরি আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ তাঁর পিতা হতে বলেছেন : মেশকদানেহ্ নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত।"

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে বলেছেন, "তিনি খুবই সত্যপরায়ণ ও হাদীসবেত্তা। তিনি ইবনে মোবারক, দার অওয়ারদী ও তাবাকা হতে হাদীস শুনেছেন এবং মুসলিম, আবু দাউদ, বাগাভী ও আরো অনেকেই তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।" যাহাবী তাঁর নামের পাশে সাংকেতিকভাবে মুসলিম ও আবু দাউদ লিখেছেন যেহেতু তাঁরা তাঁর হাদীস ব্যবহার করে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তদুপরি আমরা এতক্ষণ বিভিন্ন আলেম হতে তাঁর সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছি তিনিও তাই বলেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক, আবদাহ্ ইবনে সুলাইমান, আবদুর রহমান ইবনে সুলাইমান, আলী ইবনে হাশিম, আবুল আহওয়াছ, হুসাইন ইবনে আলী জো'ফী এবং মুহাম্মদ ইবনে ফুজাইল হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান। ফিতনাসমূহ সম্পর্কে মুসলিম কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যাহাবীর মতে তিনি ২৩৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আবুল আব্বাস সিরাজের মতে তাঁর মৃত্যু ২৩৭ অথবা ২৩৮ হিজরীতে।

৫০। আবদুল্লাহ্ ইবনে লাহিয়া ইবনে উকবা হাজরামী (মিশরের আলেম ও কাজী)

ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থে তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে লাহিয়ার পরিচয় পর্বে ইবনে আদীর সূত্রে বলা হয়েছে, "তিনি শিয়া মতবাদে বাড়াবাড়ি করতেন।"

আবু ইয়ালী কামিল ইবনে তালহা হতে বর্ণনা করেছেন, "লাহিয়া, হাই ইবনে আবদুল্লাহ্ মাগাফেরী, তিনি আবু আবদুর রহমান হাবলী হতে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর হতে বর্ণনা করেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইন্তেকালের পূর্বে অসুস্থতায় পড়লেন তখন তিনি বললেন : আমার ভাইকে বলো আমার নিকট আসতে, হযরত আবু বকর এলে নবী তাঁর হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন : আমার ভাইকে আমার নিকট আসতে বলো, হযরত উসমান এলে নবী করিম (সা.) পুনরায় মুখ ফিরিয়ে বললেন : আমার ভাইকে ডাক। অতঃপর হযরত আলীকে খবর দেয়া হলে তিনি নবীর শয্যা পাশে গেলেন। রাসূল (সা.) তাঁকে স্বীয় চাদরে জড়িয়ে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন। যখন আলী (আ.) রাসূলের নিকট থেকে চলে আসলেন তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো : নবী (সা.) আপনাকে কি বলেছেন? তিনি বললেন : রাসূল আমাকে জ্ঞানের এক হাজার দ্বারের শিক্ষা দিলেন যার প্রতিটি দ্বার হতে আবার হাজার দ্বার উন্মোচিত হয় এরূপ ভাবে।"

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর নামের পাশে (د,ت,ق) লিখেছেন অর্থাৎ আবু দাউদ, তিরমিযী ও সুনানে আরবাআহর হাদীস লেখকগণ তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাদীসসমূহ আপনি আহলে সুন্নাহর এ হাদীস গ্রন্থসমূহে দেখতে পারেন।

ইবনে খাল্লেকান তাঁর 'ওয়াফায়াতুল আ'য়ান' গ্রন্থে তাঁকে প্রশংসার সাথে স্মরণ করেছেন। সহীহ মুসলিমে ইবনে ওয়াহাব তাঁর হতে এবং তিনি ইয়াযীদ ইবনে আবি হাবিব হতে হাদীস নকল করেছেন।

ইবনে কাইসারানী তাঁর ‘আল জাম বাইনা কিতাবাই আবি নাসর আল কালাবাযী ওয়া আবি বাকর আল ইস্ফাহানী’ নামক রিজাল গ্রন্থে মুসলিম ও বুখারীর হাদীস বর্ণনাকারীদের তালিকায় লাহিয়ার নাম এনেছেন।

তিনি ১৭৪ হিজরীর রবিউসসানী মাসের ১৫ তারিখ রবিবারে মৃত্যুবরণ করেন।

৫১। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাইমুন কাদ্দাহ (মক্কার অধিবাসী ও ইমাম সাদিক [আঃ]- এর সাহাবী)

যাহাবী তাঁর নামের পাশে সাংকেতিকভাবে তিরমিযী লিখেছেন। কারণ তিরমিযী তাঁর হাদীস নকল করেছেন ও প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যবহার করেছেন। তিনি ইমাম জা’ফর ইবনে মুহাম্মদ আস্ সাদিক (আ.) ও তালহা ইবনে আমর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন বলেও যাহাবী উল্লেখ করেছেন।

৫২। আবদুর রহমান ইবনে সালিহ আযদী, আবু মুহাম্মদ (কুফার অধিবাসী)

তাঁর ছাত্র ও বন্ধু আব্বাস দাওরী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “তিনি শিয়া ছিলেন।” ইবনে আদী বলেছেন, “সে শিয়া হবার কারণে অগ্নিতে দ হয়েছে।”

সালিহ জাযরাহ্ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “তিনি হযরত উসমানের সমালোচনা করতেন ও তাঁর প্রতি অপমানজনক কথা বলতেন।”

আবু দাউদ বলেন, “তিনি সাহাবীদের দোষত্রুটি সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। তাই তিনি একজন মন্দ ব্যক্তি।” তদুপরি আব্বাস দাওরী ও ইমাম বাগাভী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং নাসায়ীও তাঁর হাদীস নকল করেছেন।

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে তাঁর নামের পাশে সাংকেতিকভাবে নাসায়ী লিখেছেন, কারণ নিসায়ী তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ হতে দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করতেন। ইবনে মুঈন তাঁকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তিনি পূর্ববতী ব্যক্তিদের বিভিন্ন বাণীও লিপিব করতেন।

তিনি ২৩৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আপনি শারিক ও অন্যদের হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সুনান গ্রন্থসমূহে দেখতে পারেন।

৫৩। আবদুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম ইবনে নাফে হিমইয়ারী সানআনী

তিনি শিয়াদের তৎকালীন সময়ের একজন সৎ ও প্রসি ব্যক্তি। ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থে তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। ইবনে আসির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ 'আল কামিল'- এ[১০৯] ২১১ হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনাকালে তাঁর মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন, "এ বছর আবদুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম সানআনী মুহাদ্দিস মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আহমাদের উস্তাদ ছিলেন ও তাঁকে তিনি হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছিলেন।"

মুত্তাকী হিন্দী তাঁর 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থের ৫৯৯৪ নং হাদীস বর্ণনাকালে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ও তাঁর শিয়া হবার বিষয়টি সত্যায়ন করেছেন।[১১০] যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে বলেছেন, "আবদুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম ইবনে নাফে ইবনে আবু বকর হিমইয়ারী সানআনী একজন বড় আলেম ও বিশ্বস্ত রাবী।" তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে আরো বলেন, "তিনি অনেক কিছু লিখেছেন যেমন তাঁর 'আল জামেয়ুল কাবীর' গ্রন্থটি জ্ঞানের ভাণ্ডার। মানুষ জ্ঞান আহরণের জন্য নিকট ও দূর সব স্থান হতে তাঁর নিকট আসত। তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আহমাদ, ইসহাক, ইয়াহিয়া, যাহলী, রামাদী ও আবদের নাম স্মরণীয়।" অতঃপর যাহাবী তাঁকে মিথ্যায়নে আব্বাস ইবনে আবদুল আযীযের উ ৃতি এনে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, "এ বিষয়টিতে কোন মুসলমানই, এমন কি আব্বাসের সহযোগী হাফিযগণও একমত নন। হাদীসশাস্ত্রবিদগণ সকলেই তাঁর বর্ণিত হাদীস তাঁদের দলিল- প্রমাণে ব্যবহার করেছেন।" অতঃপর তাঁর পরিচয় সম্পর্কে তায়ালেসীর বাণী এভাবে এনেছেন, "ইবনে মুঈনকে বলতে শুনেছি : একদিন আবদুর রাজ্জাক হতে এমন কিছু কথা শুনেছি যা থেকে সে যে শিয়া তা বুঝতে পেরেছি। তাকে প্রশ্ন করলাম : তোমার শিক্ষকগণ যাঁদের হতে তুমি জ্ঞান শিক্ষা করেছ, যেমন মুয়াম্মার, মালিক, ইবনে জারিহ, আবু সুফিয়ান এবং আওজায়ী সকলেই সুন্নী, তুমি শিয়া মাজহাব কোথায় শিক্ষা লাভ

করেছ? সে বলল : জা'ফর ইবনে সুলাইমান দ্বাবয়ী আমার নিকট এসেছিলেন, আমি তাঁকে হেদায়েতপ্রাপ্ত, জ্ঞানী ও সৎ পেয়েছি, তাঁর নিকটই এ মাজহাবের শিক্ষা লাভ করেছি।"

আবদুর রাজ্জাক তাঁর এ কথায় নিজে শিয়া হবার বিষয়টি স্বীকার করেছেন ও বলেছেন জা'ফর দ্বাবয়ী থেকে তা শিখেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে আবি বাকর মুকাদ্দামীর মতে জা'ফর দ্বাবয়ী আবদুর রাজ্জাকের মাধ্যমে শিয়া হয়েছেন। এ কারণেই যাহাবীর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে আবি বাকরের কথা বলা হয়েছে, তিনি আবদুর রাজ্জাককে সব সময় অভিসম্পাত করতেন এ কারণে যে, তিনি জা'ফর দ্বাবয়ীকে পথভ্রষ্ট করেছেন (শিয়া মাজহাব শিক্ষা দানের মাধ্যমে)।

ইবনে মুঈন প্রায়ই আবদুর রাজ্জাকের যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করতেন যদিও তিনি তাঁর সামনে স্বীকার করতেন যে, তিনি শিয়া।

আহমাদ ইবনে আবি খাইসামাহ বলেছেন, "ইবনে মুঈনকে বলা হলো আহমাদ বলেন, উবাইদুল্লাহ্ ইবনে মূসার বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রহণযোগ্য নয় যেহেতু সে শিয়া।" ইবনে মুঈন জবাব দিলেন, "যে আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই তাঁর শপথ, আবদুর রাজ্জাক এ বিষয়ে উবাইদুল্লাহ্ হতে শতগুণ বাড়াবাড়ি করেন অথচ আমি আবদুর রাজ্জাক হতে যে পরিমাণ হাদীস শিক্ষা করেছি তা উবায়দুল্লাহ্ হতে শেখা হাদীসের কয়েকগুণ।"

আবু সালিহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল দ্বারারী বলেছেন, "আমরা সানয়াতে আবদুর রাজ্জাকের নিকট ছিলাম। আমাদের বলা হলো : আহমাদ ইবনে মুঈন ও অন্যান্যরা শিয়া হবার কারণে আবদুর রাজ্জাক কর্তৃক বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেন না অথবা অপছন্দ করেন। এ খবর শুনে আমরা খুব মর্মাহত হলাম। মনে মনে ভাবলাম, আবদুর রাজ্জাকের নিকট হাদীস শিক্ষার জন্য এত পথ পাড়ি দিয়ে এত খরচ করে এত পরি ম ও ক্লান্তি সহ্য করলাম, সবই অর্থহীন হয়ে গেল। অতঃপর হ র মৌসুমে হাজীদের সঙ্গে মক্কার দিকে রওয়ানা হলাম। সেখানে ইয়াহিয়া ইবনে মুঈনের সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন : হে আবু সালিহ! যদি আবদুর রাজ্জাক ইসলাম থেকেও ফিরে যায় তবুও তাঁর হাদীসকে ত্যাগ করবো না।"

ইবনে আদী হতে যেমনটি আবদুর রাজ্জাক সম্পর্কে ‘মিযানুল ই’তিদাল’- এ এসেছে, “তিনি আহলে বাইতের প্রশংসায় এমন সব হাদীস বর্ণনা করেন যার সঙ্গে অন্য কেউ একমত নয়[১১১] ও আহলে বাইত বিরোধীদের এমন সব ত্রুটি ও বিচ্যুতির বিবরণ দিয়েছেন যা অন্য কেউ দেয় নি। তাঁকে শিয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে।”[১১২]

এতদসত্ত্বেও যখন আহমাদ ইবনে হাম্বলকে প্রশ্ন করা হলো : হাদীসের বিষয়ে আবদুর রাজ্জাক হতে উত্তম কাউকে দেখেছেন কি? তিনি জবাব দিলেন, “না।”[১১৩]

ইবনে কাইসারানী তাঁর ‘আল জাম বাইনা রিজালিস সহিহাইন’ গ্রন্থে আবদুর রাজ্জাক সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল হতে বলেছেন, “যখনই লোকেরা মুয়াম্মারের হাদীসের বিষয়ে সন্দেহে পড়ত তখন আবদুর রাজ্জাকের মতামতকে প্রধান্য দিত।”

মুখাল্লাদ শা’য়িরী বলেন, “আমি আবদুর রাজ্জাকের নিকট ছিলাম, কেউ একজন মুয়াবিয়ার প্রসঙ্গ আনলে আবদুর রাজ্জাক বললেন : আমাদের এ সভাকে আবু সুফিয়ানের পুত্রের স্মরণে নোংরা ও অপবিত্র করো না।”

যাইদ ইবনে মোবারক বলেছেন, “আমরা আবদুর রাজ্জাকের নিকট অবস্থান করছিলাম, তিনি ইবনে হাদাসান হতে বর্ণিত হাদীসের আলোচনার এ পর্যায়ে পৌঁছলেন যে, হযরত উমর ইমাম আলী ও হযরত আব্বাসের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : হে আব্বাস! তুমি এসেছ তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের মিরাসের দাবীতে আর এই ব্যক্তি আলী এসেছে তার স্ত্রীর উত্তরাধিকার পিতার সূত্র হতে নেয়ার জন্য। তখন আবদুর রাজ্জাক বললেন : এই ব্যক্তির অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণকে লক্ষ্য কর, রাসূলের চাচাকে বলছে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের মিরাস চান? আর তাঁর ভাই আলীকে বলছে তাঁর স্ত্রীর পিতার মিরাস চান। ঔদ্ধত্য কোথায় গিয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেও তার এতটা আপত্তি।”[১১৪]

এত কিছু আনা সত্ত্বেও আহলে সুন্নাহর প্রায় সকল আলেম ও হাদীসবিদ তাঁর হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন ও জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁদের সকলেই তাঁর হাদীস হতে কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এ কারণেই ইবনে খাল্লেকান তাঁর ‘ওয়াফায়াতুল

আ’য়ান’ গ্রন্থে আবদুর রাজ্জাকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, “রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর পর আবদুর রাজ্জাক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট জ্ঞান ও হাদীস শিক্ষার জন্য মানুষের এত অধিক আগমন ঘটে নি।”

তিনি তাঁর এ গ্রন্থে আরো বলেছেন, “তাঁর সমকালীন ইসলামী সমাজের প্রতিষ্ঠিত আলেমগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর হাদীস নকল করেছেন তাঁদের মধ্যে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (আবদুর রাজ্জাক তাঁর হাদীসের শিক্ষাগুরু), আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন ও অন্যান্যরাও রয়েছেন।” আমার জানা মতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সিহাহ সিত্তাহর সবক’টিতে ও মুসনাদসমূহে (যে গ্রন্থসমূহে রেওয়ায়েতের সনদগুলো উল্লেখ করা হয়ে থাকে) পূর্ণ রয়েছে।

তিনি ১২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও ২০ বছর বয়সে হাদীস ও ইসলামের অন্যান্য জ্ঞানে ব্যাপৃত হন। তিনি ২১১ হিজরীর শাওয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ইমাম সাদিক (আ.)- এর সময়কালের ২২ বছর পেয়েছিলেন। তিনি ইমাম জাওয়াদ (আ.)- এর শাহাদাতের ৯ বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ আহলে বাইতের ইমামগণের সাথে তাঁকে পুনরুত্থিত করুন যাঁদের জন্য তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন।

৫৪। আবদুল মালিক ইবনে আ’য়ুন

আবদুল মালিকের ভ্রাতা যুরারাহ্, হামরান এবং বুকাইর ও সন্তানগণ (আবদুর রহমান, মালিক, মূসা, দ্বারিস ও উম্মুল আসওয়াদ) সকলেই পূর্ববর্তী শিয়াদের মধ্যে সৎ কর্মশীল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা শরীয়তের পাত্র পূর্ণ করার মত খেদমতের তৌফিক লাভ করেছিলেন এবং উত্তম ও নেক সন্তানের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁদের পিতাদের মত ও পথকে ধারণ করেছিলেন।

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে আবদুল মালিক সম্পর্কে বলেছেন, “আবদুল মালিক ইবনে আ’য়ুন আবু ওয়াইল ও অন্যান্যদের হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হাতেম বলেছেন, “তিনি

হাদীসের বিষয়ে গ্রহণযোগ্যতার পর্যায়ে রয়েছেন।” ইবনে মুঈন বলেছেন, “তাঁর কথা মূল্য ও গুরুত্বহীন।” অন্য কেউ বলেছেন, “সত্যবাদী কিন্তু রাফেযী।”

ইবনে উয়াইনা বলেছেন, ‘আবদুল মালিক আমাদের জন্য হাদীস বর্ণনা করতেন ও তিনি রাফেযী ছিলেন।” আবু হাতেম বলেছেন, “তিনি প্রকৃতই শিয়া ও তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য।” সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা ও সুফিয়ান সাওরী তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্যদের মত তাঁর হাদীসকেও তাঁরা সমগুরুত্ব দিয়ে লিপিব   করেছেন।

ইবনে কাইসারানী তাঁর ‘জাম বাইনা রিজালুস সহিহাইন’ গ্রন্থে তাঁর বিষয়ে বলেছেন, “আবদুল মালিক ইবনে আ’য়ুন হামরানের ভ্রাতা, কুফার অধিবাসী শিয়া।” তিনি সহীহ বুখারীর তাওহীদের আলোচনার অধ্যায়ে আবু ওয়ায়েল হতে এবং সহীহ মুসলিমের ঈমানের আলোচনায় তাঁর সূত্রেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমেও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা তাঁর থেকে হাদীস নকল করেছেন।

তিনি ইমাম সাদিক (আ.)- এর সময় মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তে ইমাম সাদিক (আ.) তাঁর জন্য দোয়া করেন।

আবু জা’ফর ইবনে বাবাওয়াইহ্ বর্ণনা করেছেন, ইমাম সাদিক (আ.) সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে মদীনায় তাঁর কবর যিয়ারত করেছেন। কি সৌভাগ্য তাঁর (طوبى له و حسن مآب)!

৫৫। উবাইদুল্লাহ্ ইবনে মূসা আবাসী (কুফার অধিবাসী এবং বুখারীর শি   ক, তাঁর সহীহ গ্রন্থে)

ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘মা’আরিফ’[১১৫] গ্রন্থে তাঁকে হাদীসবিদদের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন ও শিয়া হবার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। ঐ গ্রন্থের ‘আল ফিরাক’ অধ্যায়ে কতিপয় শিয়া রিজালের নামের তালিকায় তাঁর নাম এনেছেন।[১১৬]

ইবনে সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে তাঁর পরিচিতি পর্বে তাঁকে শিয়া বলে অভিহিত করে বলেছেন, “তিনি শিয়া মাজহাব সত্য হবার বিষয়ে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ

কারণেই সাধারণ জনগণের অনেকেই তাঁর হাদীস গ্রহণ করত না। তিনি কোরআনের প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল ছিলেন এবং সর্বক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত করতেন ও এ থেকে লাভবান হতেন।”

ইবনে মাসউদ তাঁর ‘কামিল’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১ ও ৯ পৃষ্ঠায় তাঁর মৃত্যুসন ২১৩ হিজরী বলেছেন ও আরো বলেছেন, “উবাইদুল্লাহ্ ইবনে মূসা আবাসী একজন শিয়া ফকীহ্ ও বুখারীর শিক্ষক ছিলেন এবং বুখারীকে তিনি তাঁর হাদীস নকল করার অনুমতি দিয়েছিলেন।”

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “উবাইদুল্লাহ্ ইবনে মূসা কুফার অধিবাসী ও বুখারীর শিক্ষক। তিনি স্বভাবগতভাবেই সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কিন্তু শিয়া মতাবলম্বী ও আহলে সুন্নাহর পথ হতে বিচ্যুত।” আবু হাতেম ও ইবনে মুঈন তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। যাহাবী আরো বলেন, “আবু হাতেম হতে বলেছেন : আবু নাঈম তাঁর থেকে বিশ্বস্ত এবং উবাইদুল্লাহ্ ইসরাঈল হতে অধিক নির্ভরযোগ্য। কারণ ইসরাঈল উবাইদুল্লাহর নিকট কোরআন শিক্ষা করতেন।”

আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আজালী বলেন, “উবাইদুল্লাহ্ ইবনে মূসা কোরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একজন। তাঁকে কখনো মাথা উ ত করতে দেখি নি বা হাসতেও দেখি নি।”

আবু দাউদ বলেছেন, “উবাইদুল্লাহ্ আবাসী আহলে সুন্নাহ্ হতে বিচ্যুত শিয়া মতাবলম্বী।”

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে মাতার ইবনে মাইমুনের পরিচিতি পর্বে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “উবাইদুল্লাহ্ একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এবং তিনি শিয়া মতাবলম্বী। ইবনে মুঈন উবাইদুল্লাহ্ ইবনে মূসা ও আবদুর রাজ্জাক হতে হাদীস শিক্ষা করেছেন যদিও জানতেন তাঁরা দু’জন শিয়া।”

যাহাবী তাঁর মিযানে আবদুর রাজ্জাকের পরিচয় দিতে গিয়ে আহমাদ ইবনে আবি খাইসামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন, “ইবনে মুঈনকে প্রশ্ন করা হলো : আহমাদ বলেন, শিয়া হবার কারণে উবাইদুল্লাহ্ ইবনে মূসার হাদীস অগ্রহণযোগ্য। ইবনে মুঈন বললেন : যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই

তাঁর শপথ, আবদুর রাজ্জাক শিয়া বিষয়ে উবাইদুল্লাহ্ হতে কয়েকশ’ গুণ অধিক বাড়াবাড়ি করেন অথচ আমি তাঁর হতে উবাইদুল্লাহ্ অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশী হাদীস শিক্ষা লাভ করেছি।”

আমার জানা মতে আহলে সুন্নাহ্ ও অন্যান্যরা তাঁদের সহীহ হাদীস গ্রন্থে উবাইদুল্লাহর হাদীস থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আপনি এজন্য শাইবান ইবনে আবদুর রহমান হতে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ যা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা দেখতে পারেন। আ’মাশ, হিশাম ইবনে উরওয়া এবং ইসমাঈল ইবনে আবি খালিদ হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস বুখারী শরীফে রয়েছে।

যে সকল হাদীস তিনি ইসরাঈল, হাসান ইবনে সালিহ ও উসামা ইবনে যাইদ হতে বর্ণনা করেছেন তা সহীহ মুসলিমে রয়েছে। বুখারী তাঁর হতে সরাসরি ও ইসহাক ইবনে ইবরাহীম, আবু বকর ইবনে আবি শাইবা, আহমাদ ইবনে ইসহাক বুখারী, মাহমুদ ইবনে গাইলান, আহমাদ ইবনে আবি সারিজ, মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে আশকাব, মুহাম্মদ ইবনে খালিদ যাহলী এবং ইউসুফ ইবনে মূসা কাত্তান সূত্রে তাঁর হতে হাদীস নকল করেছেন।

মুসলিম হাজ্জাজ ইবনে শাঈর, কাসিম ইবনে যাকারিয়া, আবদুল্লাহ্ ইবনে দারেমী, ইসহাক ইবনে মানসুর, ইবনে আবি শাইবা, আবদ ইবনে হামিদ, ইবরাহীম ইবনে দিনার এবং ইবনে নুমাইরের সূত্রে তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে বলেছেন, “তিনি ২১৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি দুনিয়াবিমুখ, ইবাদতকারী ও হাদীসের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ছিলেন।”

তিনি জিলক্বদ মাসে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর কবরে পবিত্রতা ছড়িয়ে দিন ও তাঁকে তাঁর রহমতের ছায়ায় আ য় দিন।

৫৬। উসমান ইবনে উমাইর সাকাফী (তিনি কুফা ও বাজালীর অধিবাসী)

তাঁর কুনিয়াত আবু ইয়াকজান। তাছাড়া তিনি ‘উসমান ইবনে আবি জারআ’, ‘উসমান ইবনে কাইস’ এবং ‘উসমান ইবনে আবি হামিদ’ নামেও পরিচিত।

আবু আহমাদ যুবাইরী বলেছেন, ‘তিনি রাজাআ’ত বা আহলে বাইতের ইমামদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন।”

আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, “আবুল ইয়াকজান বনি আব্বাসের বিরুদ্ধে ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসানের বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছেন।”

ইবনে আদী বলেছেন, “তাঁর মাজহাব গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও রাজাআ’তে বিশ্বাসী ছিলেন, তদুপরি হাদীসবিদগণ তাঁর হাদীস গ্রহণ করতেন।”

এখানে আমি একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই তা হলো, যখনই এ সকল ব্যক্তিবর্গ কোন শিয়া মুহাদ্দিসের ত্রুটি অন্বেষণে লিপ্ত হন ও তাঁদের মান-মর্যাদার হানি ঘটাতে চান, রাজাআ’তের বিষয়ে তাঁদের বিশ্বাসকে সামনে টেনে আনেন। এর ভিত্তিতেই তাঁরা উসমান ইবনে উমাইরকে দুর্বল বলেছেন যখন মুঈন বলেছেন, “তাঁর হাদীসের কোন মূল্য নেই।” এতদসত্ত্বেও আ’মাশ, সুফিয়ান, শো’বা, শারিক ও এদের মত অনেকেই তাঁর নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করেছেন।

আবু দাউদ, তিরমিযীসহ অন্যান্য হাদীসবিদগণ তাঁর হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এজন্য আনাস ইবনে মালিক হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস দেখতে পারেন।

এ বিষয়গুলো যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর নামের পাশে (د,ت,ق) লিখেছেন এটি বুঝানোর জন্য যে, সুনান লেখকগণ তাঁর হাদীস নকল করেছেন।

৫৭। আদী ইবনে সাবিত, কুফী

ইবনে মুঈন বলেন, “তিনি শিয়া এবং এ বিষয়ে চূড়ান্ত রকম বাড়াবাড়ি করতেন।”

দারে কুতনী বলেন, “তিনি রাফেযী এবং এক্ষেত্রে বাড়াবাড়িকারী। কিন্তু হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য।”

জাওযাজানী বলেন, “তিনি আহলে সুন্নাহর পথ হতে বিচ্যুত।”

মাসউদী বলেন, “শিয়া বিশ্বাস এবং হাদীসের বিষয়ে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাসী অন্য কাউকে আমি দেখি নি।”

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে বলেছেন, “তিনি শিয়া আলেম ও সত্যপরায়ণ, তাঁদের মসজিদের ইমাম ও কাজী (বিচারক)। যদি সকল শিয়াই তাঁর মত হত তবে তাদের মন্দ বিষয়সমূহ দূরীভূত হয়ে যেত।” অতঃপর বিভিন্ন হাদীসবেত্তা হতে উপরোক্ত উ ্তিসমূহ যা আমরা বলেছি তা এনেছেন।

তিনি আরো বলেছেন, “দারে কুতনী, আহমাদ ইবনে হাম্বল, আহমাদ আজালী এবং নাসায়ী তাঁকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বলেছেন।” তিনি তাঁর নামের পাশে সিহাহ সিত্তাহর সংকেত লিখেছেন তাঁর হাদীস বর্ণনার বিষয়টি তাঁদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবার কারণে।

এজন্য আপনি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বাররা ইবনে আযেব, তার মাতামহ আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াযীদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি আউফী, সুলাইমান ইবনে সারুদ এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস দেখতে পারেন।

কিন্তু যার ইবনে হাবিশ এবং আবু হাজিম আশজায়ী হতে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ শুধু মুসলিম শরীফে রয়েছে। তাছাড়া আ’মাশ, মাসআর (বা মুসা’আর), সাঈদ, ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আনসারী, যাইদ ইবনে আবি আনিসা এবং ফুজাইল ইবনে গাজওয়ান তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৮। আতীয়াহ্ ইবনে সা’দ ইবনে জুনাদাহ্ আওফী, আবুল হাসান কুফী (**প্রসিদ্ধ তাবেয়ী**)

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে সালিম মুরাদী হতে বর্ণনা করেছেন, “আতীয়াহ্ শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী।”

ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘মা’আরিফ’ গ্রন্থে তাঁর প্রপৌত্র হুসাইন ইবনে হাসান ইবনে আতীয়াহর পরিচিতি পর্বে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “আতীয়াহ্ ইবনে সা’দ হাজ্জাজের শাসনামলে একজন বড়

ফকীহ্ আলেম ছিলেন এবং শিয়া আকীদা পোষণ করতেন।" তিনি তাঁর গ্রন্থের 'ফিরাক' অধ্যায়ে শিয়া রিজালদের নামের তালিকায় তাঁর নাম এনেছেন।

ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে তাঁকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে বোঝা যায় তিনি শিয়া মতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর পিতা সা'দ ইবনে জুনাদাহ্ ইমাম আলী (আ.)- এর সাহাবী ও অনুচর ছিলেন। হযরত আলী (আ.) যখন কুফায় ছিলেন একদিন সা'দ এসে বললেন, "আমীরুল মুমিনীন! আমার এক পুত্রসন্তান জন্মেছে, তার জন্য নাম মনোনীত করুন।" ইমাম বললেন, هذا عطية الله "এটি আল্লাহর দান।" তাই তাঁর নাম রাখা হয় আতীয়াহ্।

ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থে বলেছেন, "আতীয়াহ্ তাঁর পুত্র আশআসসহ হাজ্জাজের বিরুে বিদ্রোহ করেন এবং ইবনে আশআসের বাহিনী পরাস্ত হলে তিনি পারস্য পালিয়ে যান, হাজ্জাজ পারস্যে তার প্রতিনিধি মুহাম্মদ ইবনে কাসিমকে লিখে পাঠায় : আতীয়াহকে গ্রেফতার করে আলী ইবনে আবি তালিবের ওপর লা'নত করতে বলো। যদি সে তা না করে তবে তাকে চরম বেত্রাঘাত করে তার শ্রু মুণ্ডন করে দেবে। মুহাম্মদ তাঁকে এনে উপরোক্ত কাজে রাজী করাতে ব্যর্থ হয়ে চারশ বেত্রাঘাত করে ও তাঁর শ্রু মুণ্ডন করে দেয়।

যখন কুতাইবা খোরাসানের গভর্ণর হলেন তখন আতীয়াহ্ তাঁর নিকট গেলেন এবং উমর ইবনে হুবাইরা ইরাকের শাসক হলে তাঁর নিকট পত্র লিখে ইরাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন এবং ১১১ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কুফায় ছিলেন।

ইবনে সা'দ বলেন, "তিনি একজন বিশ্বস্ত রাবী এবং অনেক সুন্দর হাদীস তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে।"

তাঁর কয়েকজন প্রপৌত্র ছিল, তাঁরা সকলেই আহলে বাইতের অনুসারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, জ্ঞানী ও আলেম ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল, যেমন হুসাইন ইবনে হাসান ইবনে আতীয়াহ্, যিনি হাফস ইবনে গিয়াসের পরে মিশরের কাজী হন। অতঃপর তিনি মাহদীর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ২০১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। অনুরূপ মুহাম্মদ ইবনে সা'দ

ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আতীয়াহ্ বাগদাদের কাজী ছিলেন ও মুহাদ্দিস হিসেবে তাঁর পিতা সা'দ এবং চাচা হুসাইন ইবনে হাসান ইবনে আতীয়াহ্ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আতীয়াহ্ আউফীর হাদীস হতে আবু দাউদ ও তিরমিযী প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এ দুই সহীহ গ্রন্থে তিনি ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ খুদরী ও ইবনে উমর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বেহেশতের নারীদের নেত্রী হযরত ফাতিমা (আ.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর হতে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁরা হলেন তাঁর পুত্র হাসান ইবনে আতীয়াহ্, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত, মাসআর, হাসান ইবনে আদাওয়ান ও অন্যান্যরা।

৫৯। আলা ইবনে সালেহ তায়িমী (কুফার অধিবাসী)

'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর পরিচিতি পর্বে আবু হাতেম হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি একজন প্রকৃতই শিয়া।

আমার জানা মতে এতদসত্বে ও আবু দাউদ ও তিরমিযী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস হতে দলিল উপস্থাপন করেছেন। ইবনে মুঈন তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

আবু হাতেম ও আবু জারআ বলেছেন, "তাঁর হাদীস অনুসরণে কোন সমস্যা নেই।"

আপনি ইয়াযীদ ইবনে আবি মরিয়ম ও হাকাম ইবনে উতাইবা হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ তিরমিযী, আবু দাউদ এবং আহলে সুন্নাহর অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে দেখতে পারেন।

আবু নাঈম, ইয়াহিয়া ইবনে বুকাইর ও তাঁদের সমপর্যায়ের অনেকেই তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আলা ইবনে সালিহ আলা ইবনে আবিল আব্বাস নন। কারণ আলা ইবনে আবিল আব্বাস সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা ও সুফিয়ান সাওরীর শিক্ষক ও মাশায়িখ (তাঁর থেকে তাঁরা হাদীস বর্ণনার অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন) এবং তিনি আবু তুফাইল হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি আলা ইবনে সালিহের বেশ কিছুদিন পূর্বের। তাছাড়া তিনি আলা ইবনে সালিহের (কুফার অধিবাসী) বিপরীতে মক্কার কবি ছিলেন।

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে দু’জনকেই স্মরণ করেছেন এবং উভয়কে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। কবি আলার আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর প্রশংসায় বেশ কিছু কবিতা রয়েছে যা সত্যানুসন্ধানীদের জন্য সত্য পথ পাবার অকাট্য প্রমাণ। তাছাড়া ইমাম হুসাইনের উদ্দেশ্যে তাঁর মর্সিয়াগুলো হৃদয়বিদারক। নবী করিম (সা.) ও মুমিনদের নিকট তিনি এ কারণে ধন্যবাদার্হ। আল্লাহ্ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট।

৬০। আলকামা ইবনে কাইস ইবনে আবদুল্লাহ্ নাখয়ী, আবু শাবাল (ইয়াযীদের পুত্র আসওয়াদ ও ইবরাহীমের চাচা)

তিনি আহলে বাইতের প্রতি তীব্র ভালবাসা পোষণকারীদের অন্যতম। শাহরেস্তানী তাঁর ‘আল মিলাল ওয়ান নিহাল’- এ তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। তিনি শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত যাঁর সম্পর্কে আবু ইসহাক জাওযাজানী বলেছেন, “কুফার কিছু সংখ্যক লোক তাঁদের আকীদা ও মাজহাবের কারণে পছন্দ করত না, তাঁরা কুফার মুহাদ্দিসদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।”

আলকামা ও তাঁর ভ্রাতা উবাই আলী (আ.)- এর অনুচরদের মধ্যে পরিগণিত এবং সিফিফনের যুে অংশগ্রহণ করেছেন। উবাই এ যুে শহীদ হন এবং তাঁকে অত্যধিক নামাযী হবার কারণে ‘আবিস্ সালাত’ অর্থাৎ নামাযের পিতা বলা হতো।

আলকামা অবশ্য জামালের যু , সিফিফনের যু ও নাহরাওয়ানের যুে বায়াতভঙ্গকারী, বিদ্রোহী এবং যারা দীন থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তাদের রক্তে নিজের তরবারীকে সিক্ত করেছিলেন। তাঁর পা ঐ যুে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং তিনি আল্লাহর পথে যু কারীদের মধ্যে গণ্য এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মুয়াবিয়ার সঙ্গে তাঁর শত্রুতা ছিল।

মুয়াবিয়া তার শাসনামলে যে সকল ব্যক্তিকে তার সম্মুখে উপস্থিত হবার নির্দেশ দেয় আলকামা তাদের অন্যতম। মুয়াবিয়ার প্রতিনিধি আবু বারদাহকে আলকামা বলেন, “আমাকে এর থেকে বাদ দাও, আমাকে ত্যাগ কর।”

ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৫৭ পৃষ্ঠায় আলকামার অবস্থা সম্পর্কে এ বিষয়টি উল্লেখ করেন। আহলে সুন্নাহর হাদীসবিদদের নিকট তাঁর শিয়া হবার বিষয়টি পূর্ণ অবগতির পরেও তিনি মর্যাদা ও ন্যায়পরায়ণতার আলোয় উ ল। সিহাহ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য হাদীস লেখকগণ তাঁর হাদীস দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আপনি ইবনে মাসউদ, আবু দারদা ও হযরত আয়েশা হতে তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিমে দেখতে পারেন। এছাড়া সহীহ মুসলিমে তিনি হযরত উসমান এবং ইবনে মাসউদ হতে কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাঁর ভ্রাতু ্র ইবরাহীম নাখয়ী তাঁর সূত্রে যেসকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তাও সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ, ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ ও শা'বী তাঁর সূত্রে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান। তিনি ৬২ হিজরীতে কুফায় মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

৬১। আলী ইবনে বাদিমা

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে আহমাদ ইবনে হাম্বল হতে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তাঁর বর্ণিত হাদীস নির্ভরযোগ্য ও দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। তিনি শিয়াদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়।" যাহাবী ইবনে মুঈন সূত্রে বলেছেন, "তিনি হাদীস বর্ণনায় বিশ্বস্ত ও ইকরামা এবং অন্যান্যদের হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।"

শো'বা ও মুয়াম্মার তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর নামের পাশে যে সংকেত লিখেছেন তার অর্থ আহলে সুন্নাহর হাদীসবিদগণ তাঁর হাদীস বর্ণনা ও নকল করেছেন।

৬২। আলী ইবনে জা'দ, আবুল হাসান জওহারী বাগদাদী (বনি হাশিমের ীতদাস)

তিনি বুখারীর অন্যতম শিক্ষক। ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থে তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে যাহাবী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি ষাট বছর পালাক্রমে একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন খেতেন।"

ইবনে কাইসারানী তাঁর ‘জাম বাইনা সহিহাইন’ গ্রন্থে বলেছেন, “বুখারী তাঁর হতে **১২**টি হাদীস নকল করেছেন।”

তিনি ২০৩ হিজরীতে ৯৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৬৩। আলী ইবনে যাইদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুহাইর ইবনে আবি মালিকা ইবনে জাফআন, **আবুল হাসান কুরশী তায়িমী** (**বসরার অধিবাসী**)

আহমাদ আজালী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “তিনি শিয়া মাজহাবের অনুসারী।” ইয়াযীদ ইবনে জারিগ বলেছেন, “আলী ইবনে যাইদ রাফেযী।” এতদসত্ত্বেও তাবেয়ীদের মধ্যে অনেকেই যেমন শো’বা, আবদুল ওয়ারিস ও তাঁদের সমপর্যায়ের অন্যান্যরা তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন।

তিনি বসরার ৫ ষ্ঠ তিন ফকীহর একজন। ক্বাতাদাহ্, আলী ইবনে যাইদ এবং আশআস হাদানী তিনজনই অন্ধ ছিলেন। হাসান বসরীর মৃত্যুর পর আলী ইবনে যাইদকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য বলা হয়, কারণ তাঁর মান-মর্যাদা ও জ্ঞানের বদৌলতে তাঁর সঙ্গে কেবল নামকরা ও সর্বপরিচিত ব্যক্তিবর্গই ওঠাবসা করতেন। এরূপ সম্মান কোন শিয়ার জন্য বসরাতে বিরল।

উপরোক্ত বিষয়গুলো যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কাইসারানী তাঁর ‘জাম বাইনা রিজালুস সহিহাইন’ গ্রন্থে বলেছেন, “মুসলিম সাবিত বানানীর সঙ্গে তাঁর রেওয়ায়েত নকল করেছেন। তিনি জিহাদ সম্পর্কে আনাস ইবনে মালিক হতে হাদীস শুনেছেন।”

তিনি **১৩১** হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৬৪। হাসান ইবনে সালিহের ভ্রাতা আলী ইবনে সালিহ

হাসান ইবনে সালিহের পরিচিতি পর্বে তাঁর ভাই আলী ইবনে সালিহ সম্পর্কেও বলেছি। তিনি তাঁর ভ্রাতার মতই প্রাচীন শিয়াদের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে তাঁর হাদীস প্রমাণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

আলী ইবনে সালিহ সালামা ইবনে কুহাইল হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী আলী ইবনে সালিহ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর জমজ ভ্রাতা হাসানের সঙ্গে ১০০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁর ভ্রাতার পূর্বেই ১৫১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৬৫। আলী ইবনে রাব আবু ইয়াহিয়া ফাযারী (কুফার অধিবাসী)

ইবনে হাইয়ান বলেছেন, "তিনি শিয়া বিষয়ে বাড়াবাড়ি করতেন।" এজন্যই জাওযাজানী বলেছেন, "তাঁর কথা গ্রহণযোগ্য নয় ও তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন।" আবু দাউদ বলেছেন, "তাঁর হাদীস ত্যাগ করা হয়েছে।"

কিন্তু দারে কুতনী ও ইবনে মুঈন তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন। আবু হাতেমের মতে তাঁর হাদীস গ্রহণে অসুবিধা নেই।

আবু জারআ বলেছেন, "তিনি সত্যবাদী।" আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, "আমি তাঁকে সত্যপরায়ণ পেয়েছি।" ইবনে মুঈনও তাঁকে সত্যবাদী বলেছেন।

বিভিন্ন হাদীস বিশেষজ্ঞের উপরোক্ত মতামতগুলোকে যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে আবু ইয়াহিয়াকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর নামের পাশে সাংকেতিকভাবে (ق ,س) লিখেছেন কারণ সুনানের লেখকগণ তাঁর হাদীসসমূহ প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যবহার করেছেন। তিনি হিশাম ইবনে উরওয়া ও উবাইদুল্লাহ্ ইবনে উমর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "উসমান সম্পর্কে আ'মাশের হাদীস ইসমাঈল ইবনে রাজা তাঁর সূত্রেই বর্ণনা করেছেন।"

তিনি ১৮৪ হিজরীতে খলীফা হারুন উর রশীদের শাসনামলে কুফায় মৃত্যুবরণ করেন।

৬৬। আলী ইবনে কাদিম কুফী (আবুল হাসান খুযায়ী)

তিনি আহমাদ ইবনে ফোরাতের শিক্ষক। আহমাদ ইবনে ফোরাত, ইয়াকুব ফাসায়ী ও তাঁদের পর্যায়ের অনেকেই তাঁর হতে হাদীস শিক্ষা করেছেন এবং তাঁর হাদীস দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে ২৮২ পৃষ্ঠায় স্বীকার করেছেন যে, তিনি কট্টর ধরনের শিয়া ছিলেন। এ কারণেই ইয়াহিয়া তাঁকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু আবু হাতেম তাঁকে সত্যবাদী বলেছেন।

বিভিন্ন হাদীসবিদদের তাঁর সর্ম্পকিত উপরোক্ত মন্তব্যগুলো যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর নামের পাশে সাংকেতিকভাবে আবু দাউদ ও তিরমিযী লিখেছেন এটি বোঝানোর জন্য যে, তাঁরা তাঁর হাদীস নকল করেছেন। তাঁরা সাঈদ ইবনে আবু উরুরা এবং কাতার হতে আবু হাসান খুযায়ীর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি খলীফা মামুনের শাসনামলে ২১৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

৬৭। আলী ইবনে মুনযির তারায়েফী

তিরমিয়ী, নাসায়ী, ইবনে সায়েদ, আবদুর রহমান ইবনে আবি হাতেম এবং তাঁদের সমকালীন অনেকেই তাঁর ছাত্র। তাঁরা তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা ও দলিল হিসেবে তাঁর কথা পেশ করেছেন।

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর নামের পাশে (ت س ف) লিখেছেন কারণ সুনানের লেখকগণ তাঁর হাদীস দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

তিনি নাসায়ী সূত্রে বলেছেন, "আলী ইবনে মুনযির প্রকৃত শিয়া এবং বিশ্বস্ত। তাঁর ওপর নির্ভর করা যায়।" ইবনে আবি হাতেম বলেছেন, "তিনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত।" তিনি ইবনে ফুযাইল, ইবনে উয়াইনা ও ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম হাদীস বর্ণনা বরেছেন। সুতরাং নাসায়ী তাঁর শিয়া হবার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তদুপরি তাঁর সহীহতে তাঁর হাদীস ব্যবহার করেছেন। কুৎসা রটনাকারীদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

ইবনে মুনযির ২৫৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

৬৮। আলী ইবনে হাশিম ইবনে বুরাইদ খায্যাজ আয়েযী (আবুল হাসান কুফী)

ইমাম আহমাদের শিক্ষক ও মাশায়িখ[১১৭]। আবু দাউদ বলেছেন, "তিনি শিয়া, তবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।"

ইবনে হাইয়ান বলেছেন, "আলী ইবনে হাশিম শিয়া মতবাদে বাড়াবাড়ি করতেন।" জা'ফর ইবনে আবান বলেছেন, "ইবনে নুমাইরকে বলতে শুনেছি, আলী ইবনে হাশিম শিয়া ও এ বিষয়ে কট্টর।" বুখারী বলেছেন, "আলী ইবনে হাশিম ও তাঁর পিতা বাড়াবাড়ি রকমভাবে শিয়া মাজহাবের পক্ষপাতিত্ব করতেন।" আমার মতে এ কারণেই বুখারী তাঁর হাদীস পরিত্যাগ করেছেন। তবে সিহাহ সিত্তাহর বাকী পাঁচজন হাদীসলেখক তাঁর হাদীস দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

ইবনে মুঈন ও অন্যান্যরা তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন। আবু দাউদ তাঁকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আবু জারআ বলেছেন, "তিনি সত্যবাদী।"

নাসায়ী বলেছেন, "তিনি ত্রুটিমুক্ত ও তাঁর হাদীসের ওপর আমল করা যায়।"

উপরোক্ত মন্তব্যগুলো যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে এনেছেন।

খাতীব বাগদাদী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে আলী ইবনে হাশিম সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান বাগানদী সূত্রে বলেছেন, "আলী ইবনে মাদিনী বলেন : আলী ইবনে হাশিম ইবনে বুরাইদ শিয়া ও সত্যপরায়ণ।"

তিনি আরো বলেছেন, "মুহাম্মদ ইবনে আলী আজুরী আবু দাউদকে আলী ইবনে হাশিম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : তাঁর সম্পর্কে ঈসা ইবনে ইউনুসকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি তাঁর জবাবে বললেন : তিনি শিয়া পরিবারের সদস্য ও তাঁদের মধ্যে মিথ্যার কোন বালাই নেই।"

খাতীব ইবরাহীম ইবনে জাওযাজানীর উ ৃতি দিয়ে বলেছেন, "হাশিম ইবনে বুরাইদ ও তাঁর পুত্র আলী ইবনে হাশিম তাঁদের মাজহাবের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করতেন।"

তদুপরি সিহাহ সিত্তাহর পাঁচজন তাঁর হাদীস প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যবহার করতেন। আপনি সহীহ মুসলিমের 'নিকাহ্' অধ্যায় ও অনুমতি বিষয়ক আলোচনা পর্যায়ক্রমে হিশাম ইবনে উরওয়া এবং তালহা ইবনে ইয়াহিয়া হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস দেখতে পারেন।

তাছাড়া সহীহ মুসলিমে আবু মুয়াম্মার, ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ইবনে আবান তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু শাইবার পুত্রগণ এবং তাঁদের সমপর্যায়ের অনেকেরই উস্তাদ ছিলেন এবং তাঁরা তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাহাবী বলেছেন, "আহমাদের শিক্ষকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করেন।" ১৮১ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

৬৯। আম্মার ইবনে যারীক (কুফী)

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে সুলায়মানীর উ ৃ তি দিয়ে বলেছেন, "তিনি রাফেযী।" রাফেযী হওয়া স ে ও মুসলিম, আবু দাউদ এবং নাসায়ী তাঁর হাদীস দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি আ'মাশ, আবু ইসহাক সারিয়ী, মানসুর এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে ঈসা হতে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সহীহ মুসলিমে রয়েছে। এ হাদীসগ্রন্থে আবুল জাওয়াব, আবুল আহ্ওয়াছ, সালাম ইবনে আহমাদ জুবাইরী এবং ইয়াহিয়া ইবনে আদম তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭০। আম্মার ইবনে মুয়াবিয়া অথবা ইবনে আবি মুয়াবিয়া (তাঁকে ইবনে খাব্বাব এবং কখনো কখনো ইবনে সালিহ দুহনী বাজালী কুফীও বলা হয়েছে)

তাঁর বংশীয় নাম আবু মুয়াবিয়া। তিনি শিয়াদের প্রসি ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। আহলে বাইতের প্রেম ও ভালবাসার কারণে তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে, এমন কি এ কারণে বুশর ইবনে মারওয়ান তাঁর পা কর্তন করে। তিনি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, সুফিয়ান সাওরী, শো'বা, শারিক এবং

আবাবের শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা তাঁর হতে হাদীস শিক্ষা করেছেন ও তাঁর হাদীস প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যবহার করেছেন।

আহমাদ, ইবনে মুঈন, আবু হাতেম ও অন্যান্যরা তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন। মুসলিম এবং সুনানে আরবাআহতে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

যাহাবী তাঁর মিযান গ্রন্থে উপরোক্ত মন্তব্যসমূহ এনেছেন। দুই স্থানে তাঁর পরিচিতি বর্ণনা করে তাঁর শিয়া ও বিশ্বস্ত হবার বিষয়টি সত্যায়ন করেছেন। তিনি সু ষ্টরূপে বলেছেন, "আকিল ব্যতীত অন্য কেউই তাঁর বিষয়ে কিছু বলেন নি ও শিয়া হওয়া ব্যতীত অন্য কোন ক্রুটির কথা কেউ উল্লেখ করেন নি।"

হ   সম্পর্কে আবু যুবাইর হতে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সহীহ মুসলিমে রয়েছে। তিনি ১৩৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৭১। আমর ইবনে আবদুল্লাহ্ আবু ইসহাক সাবিয়ী হামাদানী (কুফার অধিবাসী)

ইবনে কুতাইবার 'মা'আরিফ' ও শাহরেস্তানীর 'মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থানুসারে তিনি মুহাদ্দিসদের শীর্ষস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত ও শিয়া ছিলেন। এ মাজহাবকে আহলে বাইতের শত্রুরা (নাসেবী) ভাল দৃষ্টিতে দেখে না যদিও প্রকৃত ও সত্য পথ এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এ কারণেই 'মিযানুল ই'তিদাল'-এ যুবাইদের পরিচয় পর্বে যাহাবী জাওযাজানীর উ ৃতি দিয়ে বলেছেন, "জাওযাজানী বলেছেন : কুফায় একদল লোক ছিলেন, জনসাধারণ তাঁদের আকীদার কারণে পছন্দ করতো না, তাঁরা কুফার মুহাদ্দিসদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় যেমন আবু ইসহাক, ম ুর, যুবাইদ ইয়ামী, আ'মাশ এবং তাঁদের সমবয়স্ক ও নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ। মানুষ কেবল সত্যবাদিতার কারণেই তাঁদের হাদীস গ্রহণ করত, এমন কি যদি তাঁরা পূর্ণাঙ্গ সনদ ব্যতীত কোন হাদীস বর্ণনা করতেন তবুও মানুষ তা মেনে নিত।"

যেসব পূর্ণাঙ্গ সনদহীন হাদীস (হাদীসে মুরসাল) তিনি বর্ণনা করেছেন ও নাসেবীরাও তা মেনে নিয়েছে এরূপ একটি হাদীস হলো আমর ইবনে ইসমাঈলের আবু ইসহাক সূত্রে বর্ণিত হাদীস যা

‘মিযানুল ই’তিদাল’- এ তাঁর পরিচয় পর্বে উ ৃত হয়েছে-   রাসূল (সা.) বলেছেন, “আলীর নমুনা বৃক্ষস্বরূপ, যার মূল আমি, শাখা- প্রশাখা হলো স্বয়ং আলী, তার ফল হল হাসান ও হুসাইন এবং শিয়ারা তার পত্রসমূহ।”

মুগীরাহ্ যিনি বলেছেন, আ’মাশ ও আবু ইসহাক কুফাবাসীদের ধ্বংস করেছে তা এ কারণে যে, তাঁরা নবী পরিবারের প্রতি বিশেষ ভালবাসা পোষণ করতেন ও নবীর সুন্নাহ্ সংরক্ষণে ছিলেন ব পরিকর। তাঁরা জ্ঞানের সমুদ্র এবং আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। এ সকল বৈশিষ্ট্যের কারণেই সিহাহ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য হাদীসবেত্তাগণ তাঁদের হাদীস প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যবহার করতেন।

আপনি বাররা ইবনে আজেব, যাইদ ইবনে আরকাম, হারিসা ইবনে ওয়াহাব, সুলাইমান ইবনে সারুদ, নুমান ইবনে বাশার, আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াযীদ খাতমী এবং মাইমুন হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ মুসলিম ও বুখারীতে দেখতে পারেন।

শো’বা, সুফিয়ান সাওরী, যুহাইর এবং স্বীয় প্রপৌত্র ইউসুফ ইবনে ইসহাক ইবনে আবি ইসহাক তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে খাল্লেকান ‘ওয়াফায়াতুল আ’য়ান’ গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “তিনি হযরত উসমানের শাসনামলের শেষদিকে (তিন বছর পূর্বে) জন্মগ্রহণ করেন ও ১২৭ বা ১২৮ হিজরীতে, কারো মতে ১২৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন ও মাদায়েনীর মতে তিনি ১৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৭২। আউফ ইবনে আবি জামিলা বাসরী, আবু সাহল (যদিও আরাবী [মরুচারী বেদুইন আরব] নন তথাপি আরাবী বলে প্রসিদ্ধ)

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, তাঁকে সব সময় সত্যবাদী আতা বলে ডাকা হত এবং বলা হয় যে, তিনি শিয়া। কেউ কেউ তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন। অতঃপর

জা’ফর ইবনে সুলাইমান হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শিয়া এবং বান্দার তাঁকে রাফেযী বলেছেন।

ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘মা’আরিফ’ গ্রন্থে তাঁকে শিয়া রিজাল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। রূহ, হাউযাহ্, শো’বা, নাযর ইবনে শামিল, উসমান ইবনে হাইসাম ও তাঁদের পর্যায়ের অনেকেই তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন। সিহাহ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের লেখকগণ তাঁর হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। আবুল হাসান বাসরীর পুত্রদ্বয় হাসান ও সাঈদ, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন এবং সাইয়ার ইবনে সালামাহ্ হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ বুখারীতে রয়েছে।

নাযর ইবনে শামিল হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ মুসলিমে পাবেন। আবু রাজা উতারাদী হতে তাঁর নকলকৃত হাদীস উভয় হাদীস গ্রন্থেই রয়েছে।

তিনি ১৪০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

ف

৭৩। ফযল ইবনে দাকিন

দাকিনের মূল নাম আমর ইবনে হাম্মাদ ইবনে যুহাইর মালায়ী কুফী। তিনি আবু নাঈম নামে প্রসি । তিনি সহীহ বুখারীর হাদীসের শিক্ষক।

আহলে সুন্নাহর আলেমগণের মধ্যে অনেকেই, যেমন ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘মা’আরিফ’ গ্রন্থে তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন।

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “ফযল ইবনে দাকিন নির্ভরযোগ্য, তবে তাঁর একমাত্র ত্রুটি হলো তিনি শিয়া।” তাঁর সম্পর্কে ইবনে জুনাইদ খাতলীর বক্তব্য উ ৃত করে যাহাবী বলেছেন, “জুনাইদ বলেন : ইবনে মুঈনকে বলতে শুনেছি যখনই কোন ব্যক্তির নাম নেয়া হয় যদি নাঈম তাঁর প্রশংসা করেন তাহলে বোঝা যায় সে ব্যক্তি শিয়া। আর যদি তিনি বলেন অমুক ব্যক্তি মুর্জিয়া, এর অর্থ সে সুন্নী।”

যাহাবীর মতে ইয়াহিয়া ইবনে মুঈনের এ কথা তাঁর মুর্জিয়া হবার সপক্ষে দলিল। আমার মতে এ কথাটি এও প্রমাণ করে, ফযল একজন প্রত্যয়ী শিয়া।

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে খালিদ ইবনে মুখাল্লাফের পরিচিতি পর্বে জাওযাজানী হতে উল্লেখ করেছেন, “আবু নাঈম কুফী মাজহাবের (অর্থাৎ শিয়া)।”

সুতরাং ফযল ইবনে দাকিন যে শিয়া ছিলেন এটি সন্দেহাতীতভাবে সত্য। সিহাহ সিত্তাহর লেখকগণ তাঁর হাদীস দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

হাম্মাম ইবনে ইয়াহিয়া, আবদুল আযীয ইবনে আবি সালামাহ্, যাকারিয়া ইবনে আবি যায়িদা, হিশাম দাস্তওয়াঈ, আ’মাশ, মাসআর, সাউরী, মালিক, ইবনে উয়াইনা, শাইবান ও যুহাইর হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ বুখারীতে রয়েছে।

সাইম ইবনে আবি সুলাইমান, ইসমাইল ইবনে মুসলিম, আবু আছেম মুহাম্মদ ইবনে আইয়ুব সাকাফী, আবু উসমান, মূসা ইবনে আলী, আবু শিহাব মূসা ইবনে নাফে, সুফিয়ান, হিশাম ইবনে সা’দ, আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আইমান ও ইসরাঈল হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ মুসলিমে দেখতে পারেন।

বুখারী তাঁর থেকে সরাসরি ও মুসলিম হাজ্জাজ ইবনে শায়ের, আবদ ইবনে হামিদ, ইবনে আবি শাইবা, আবু সাঈদ আশাজ, ইবনে নুমাইর, আবদুল্লাহ্ দারেমী, ইসহাক হানযালী এবং যুহাইর ইবনে হা্ব সূত্রে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাঁর জন্ম কুফাতে ১৩০ হিজরীতে ও মৃত্যু ২১০ হিজরীর শাবান মাসের শেষ মঙ্গলবার আব্বাসী খলীফা মু’তাসীমের শাসনামলে। ইবনে সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৭৯ পৃষ্ঠায় তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, ‘‘তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। হাদীসের বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ ও প্রামাণ্য।”

৭৪। ফুযাইল ইবনে মারযূক আগার, আবু আবদুর রহমান (কুফার অ তম শীর্ষ ানীয় ব্যি)

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে তাঁকে শিয়া বলে প্রসি এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা ও মুঈন সূত্রে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবনে আদী হতে বলেছেন, ‘‘আমার মতে হাদীসের ক্ষেত্রে

তাঁর মধ্যে কোন ত্রুটি নেই।” হাইসাম ইবনে জামিল সূত্রে বলেছেন, “তিনি জ্ঞান ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সত্যপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত ও এর পথনির্দেশক।

মুসলিম শাফিক ইবনে উকবা হতে নামায সম্পর্কিত ও আদি সাবেত হতে যাকাত সম্পর্কিত তাঁর বর্ণিত হাদীস দলিল হিসেবে এনেছেন। তাছাড়া মুসলিম যাকাত সম্পর্কে ইয়াহিয়া ইবনে আদম ও আবু উসামা সূত্রে তাঁর বর্ণিত হাদীস ব্যবহার করেছেন। সুনান গ্রন্থগুলোতে ওয়াকী, ইয়াযীদ, আবু নাঈম আলী ইবনে জা’দ এবং তাঁদের পর্যায়ের কয়েকজন রাবী তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যাইদ ইবনে হাব্বাব রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে তাঁর সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে তাঁর নামে মিথ্যা বলেছেন।

তিনি ১৫৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৭৫। ফিতর ইবনে খালীফা হা াত, কুফার অধিবাসী

আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ তাঁর পিতাকে ফিতর ইবনে খালীফা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, “তিনি বিশ্বস্ত ও তাঁর হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।” তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ একজন বু মান ও সচেতন ব্যক্তির হাদীস যদিও তিনি শিয়া মতাবলম্বী।

ইবনে মুঈন হতে আব্বাস বলেছেন, “ফিতর ইবনে খালীফা শিয়া ও বিশ্বস্ত।” আহমাদ বলেছেন, “ফিতর ইয়াহিয়া ইবনে মুঈনের মতে নির্ভরযোগ্য, কিন্তু একজন কট্টর ও বিরস লোক।” এজন্যই আবু বকর ইবনে আয়াশ বলেছেন, “ফিতর ইবনে খালীফার কোন হাদীসই পরিত্যক্ত হয় নি এ কারণ ব্যতীত যে, তিনি বিচ্যুত আকীদায় বিশ্বাসী অর্থাৎ তাঁর মধ্যে শিয়া হওয়া ব্যতীত অন্য কোন ত্রুটি নেই যার কারণে তাঁর হাদীস গ্রহণ করা যাবে না।”

জাওযাজানী বলেছেন, “ফিতর ইবনে খালীফা একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি। জা’ফর আহমার ফিতরের অসুস্থতার সময় তাঁকে বলতে শুনেছে : যদি এমন হত আমার শরীরের প্রতিটি লোম ফেরেশতায় পরিণত হয়ে আহলে বাইতের প্রতি আমার ভালবাসা ও প্রেমের কারণে তাসবিহ পড়ত!”

ফিতর আবু তুফাইল ও মুজাহিদ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু উসামা, ইয়াসিন ইবনে আদম, ফাবিছা ও এ পর্যায়ের রাবীদের অনেকে তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আহমাদ ও অন্যান্যরা তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন। আবু হাতেম বলেছেন, "তিনি হাদীস বর্ণনার যোগ্যতাসম্পন্ন" এবং নাসায়ী তাঁকে নির্ভরযোগ্য, ক্রটিহীন, হাদীসের সংরক্ষক (হাফিয), বু মান ও চতুর বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে সা'দ বলেছেন, "ইনশাল্লাহ্ তিনি বিশ্বস্ত।"

যাহাবী উপরোক্ত বিষয়গুলো তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল'-এ এনেছেন। ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থে শিয়া রিজালদের নামের তালিকায় তাঁর নাম এনেছেন।

বুখারীর বর্ণনানুযায়ী ফিতর মুজাহিদ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সুফিয়ান সাওরী তাঁর হাদীস নকল করেছেন (সহীহ বুখারী 'আদব' অধ্যায়)। সুনানে আবরাআহর লেখকগণ তাঁর হাদীস তাঁদের গ্রন্থসমূহে এনেছেন।

ম

৭৬। মালিক ইবনে ইসমাঈল ইবনে যিয়াদ ইবনে দারহাম নাহদী (আবু গাসসান কুফী)

বুখারীর সহীহতে তিনি তাঁর উস্তাদ বলে উল্লিখিত হয়েছেন। ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে তাঁকে স্মরণ করেছেন। তাঁর পরিচিতি অংশের শেষে তিনি বলেছেন, "আবু গাসসান একজন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত রাবী। তিনি নিজেকে শিয়া বলে পরিচয় দিতেন ও এ বিষয়ে কট্টর ছিলেন।"

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে যেভাবে বলেছেন তাতে বোঝা যায় তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ ও মান-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আরো বলেছেন, "শিয়া মতের শিক্ষা মালিক তাঁর শিক্ষক হাসান ইবনে সালিহ হতে পেয়েছেন। ইবনে মুঈন বলেছেন, "কুফায় আবু গাসসান হতে নির্ভরযোগ্য কাউকে পাওয়া যায় না।"

আবু হাতেম বলেছেন, "আমি তাঁর অপেক্ষা বিশ্বস্ত অন্য কাউকে কুফায় পাই নি। আবু নাঈমসহ অন্য কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। তিনি একজন ইবাদতকারী ও সম্মানিত ব্যক্তি। যখনই তাঁর প্রতি

আমি দৃষ্টি দিয়েছি তখনই তাঁকে মনে হয়েছে যেন কবর হতে উঠে এসেছেন, তাঁর কপালে সিজদার দু'টি স্থান স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হত।"

বুখারী তাঁর সহীহের কয়েকটি স্থানে তাঁর হতে কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসলিম তাঁর সহীহের 'হুদুদ' অধ্যায়ে হারুন ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারীতে আবু গাসসান যাঁদের হতে হাদীস নকল করার অনুমতি পেয়েছিলেন ও তাঁর শিক্ষক বলে পরিগণিত হতেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা হলেন ইবনে উয়াইনা, আবদুল আযীয ইবনে সালামাহ্ ও ইসরাঈল। বুখারী তাঁর হাদীস হতে সরাসরি এবং মুসলিম যুহাইর ইবনে মুয়াবিয়া হতে তাঁর হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন।

তিনি ২১৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৭৭। মুহাম্মদ ইবনে খাযেম[১১৮] (**আবু মুয়াবিয়া জারির তামিমী কুফী বলে প্রসিদ্ধ**)

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "মুহাম্মদ ইবনে খাযেম (ع) জারির বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। তাঁর মধ্যে উল্লেখ করার মত কোন ত্রুটি আমি পাই নি। 'কুনিয়াত' সম্পর্কে আলোচনা পর্বে তাঁর সম্পর্কে আমরা বলব।"

অতঃপর কুনিয়াতের আলোচনায় তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "আবু মুয়াবিয়া জারির বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ রাবীদের অন্যতম। তিনি হাকিম নিশাবুরীর উ ৃতি দিয়ে বলেছেন : হাকিমের মতে বুখারী ও মুসলিম তাঁর হাদীস প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন ও তিনি তাঁকে প্রসি শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন যাঁরা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করতেন।"

যেহেতু সিহাহ সিত্তাহর হাদীস লেখকগণ তাঁর হাদীস দলিল হিসেবে উপস্থাপন করতেন সেহেতু যাহাবী তাঁর নামের পার্শ্বে (ع) লিখেছেন এজন্য যে, এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে।

আপনি আ'মাশ ও হিশাম ইবনে উরওয়া হতে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ বুখারী ও মুসলিমে অধ্যয়ন করতে পারেন। তাছাড়া কয়েকজন নির্ভরযোগ্য রাবী হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ মুসলিমে রয়েছে। সহীহ বুখারীর মতে আলী ইবনে মাদিনী, মুহাম্মদ ইবনে সালাম, ইউনুস ইবনে ঈসা, কুতাইবা এবং মুসাদ্দিদ তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহীহ মুসলিমের বর্ণনানুসারে সাঈদ ওয়াসেতী, সাঈদ ইবনে মানসুর, আমর নাকিদ, আহমদ ইবনে সিনান, আবু নুমাইর, ইসহাক হানযালী, আবু বকর ইবনে আবি শাইবা, আবু কুরাইব এবং যুহাইর তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ দু'টি হাদীসগ্রন্থেই মূসা যামান তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু মুয়াবিয়া ১১৩ হিজরীতে জন্ম ও ১৯৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৭৮। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ দ্বাবী, তাহানী নিশাবুরী (আবু আবদুল্লাহ্ হাকিম)

তিনি মুহাদ্দিস ও হাফিযদের (হুফফায) নেতা এবং সহস্রাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি তাঁর জ্ঞানার্জনের জন্য যে বিভিন্ন শহর ও দেশে ভ্রমণ করেন তাতে প্রায় দু'হাজার শিক্ষকের নিকট হাদীস ও অন্যান্য জ্ঞান শিক্ষা করেন।

তাঁর সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়রা, যেমন আলূসী, ইমাম ইবনে ফুরাক ও অন্যান্যরা তাঁকে অগ্রাধিকার দিতেন। তাঁরা তাঁকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর ে ষ্ঠত্বের বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁর পরবর্তী সময়ের সকলেই তাঁর হতে জ্ঞান শিক্ষা করেছেন ও তাঁর ছাত্র হিসেবে গণ্য।

তিনি শিয়াদের মতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং শরীয়ত ও মাজহাবের খেদমতকারী ও সংরক্ষক বলে বিবেচিত হতেন।

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল'- এ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি সত্যবাদীদের নেতৃস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত ও শিয়া হিসেবে প্রসি ।" ইবনে তাহিরের উ ৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, "হাকিম আবু আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে আবু ইসমাঈল আবদুল্লাহ্ আনসারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : হাদীস

বর্ণনায় শীর্ষস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু দুষ্ট চরিত্রের রাফেযী।” অতঃপর যাহাবী তাঁর সূত্রে তাঁর ভাষায় ভুল ও আশ্চর্যজনক একটি কথা বর্ণনা করেছেন, আবু আবদুল্লাহ্ বলেছেন, “হযরত মুস্তাফা (সা.) নাভী কর্তিত ও খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আলী রাসূল (সা.)- এর স্থলাভিষিক্ত ও মনোনীত প্রতিনিধি।” যদিও তিনি এ বিষয়ে স্বীকারোক্তি করেছেন যে, তাঁর জ্ঞান ও সত্যবাদিতার কারণে সকলের নিকট তিনি গ্রহণযোগ্য।

তিনি ৩২১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন ও ৪০৫ হিজরীর সফর মাসে আল্লাহর রহমতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন।

৭৯। মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবি রাফে (মদীনার অধিবাসী)

তাঁর পিতা উবাইদুল্লাহ্, ভ্রাতা ফযল ও আবদুল্লাহর প্রপিতা আবু রাফে, চাচা রাফে, হাসান মুগীরাহ্, আলী এবং তাঁদের সকল সন্তানই সৎ কর্মশীল ও প্রাচীন শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের বিভিন্ন লেখনী শিয়া মতবাদে তাঁদের অটলাবস্থা ও দৃঢ়তার প্রমাণ, আমরা আমাদের ‘ফুসূলুল মুহিম্মা’ গ্রন্থের ১২ খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে ইবনে আদী মুহাম্মদ হতে বর্ণনা করেছেন, “তিনি কুফার শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত।” যাহাবী তাঁর নামের পাশে (ت ق) লিখেছেন, কারণ সুনানের লেখকগণ তাঁর হাদীস নকল করেছেন। তিনি বলেছেন, “মুহাম্মদ তাঁর পিতা ও প্রপিতা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।” মানদাল ও আলী ইবনে হাশিম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাব্বান ইবনে আলী, ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ালী ও অন্যান্যরাও তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ্ কখনো কখনো তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইদুল্লাহ্ হতেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাবরানী তাঁর ‘মু’জামুল কবীর’ গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবি রাফে সূত্রে তাঁর পিতা ও দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, “রাসূল (সা.) হযরত আলীকে বলেন : প্রথম যে সকল ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে তারা হলো আমি, তুমি, হাসান ও হুসাইন এবং আমাদের অনুসারীরা

(শিয়া), তারা আমাদের পশ্চাতে, ডানে ও বামে সারিব ভাবে প্রথম বেহেশতে প্রবেশকারী হিসেবে পরিগণিত হবে।”

৮০। মুহাম্মদ ইবনে ফুযাইল ইবনে গাযওয়ান (আবু আবদুর রহমান কুফী)

ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থে তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৭১ পৃষ্ঠায় তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত এবং প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি শিয়া মতাবলম্বী।" সা'দ তাঁর কোন কোন হাদীস দলিল হিসাবে গ্রহণ করতেন না।

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থের শেষে যে সকল রাবী তাঁদের পিতার মাধ্যমে পরিচিত তাঁদের পরিচয় দান করতে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি শিয়া ও সত্যবাদী।" মুহাম্মদ নামধারীদের তালিকায় তাঁর নাম স্মরণ করে বলেছেন, আহমাদ তাঁকে শিয়া বলেছেন, তিনি সত্যবাদী এবং সুন্দর ও সঠিক হাদীস বর্ণনাকারী। আবু দাউদ তাঁকে উগ্র ও কট্টর শিয়া বলে অভিহিত করে বলেছেন, তিনি প্রসি হাদীসবিদদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি হামযাহর জন্য কোরআন পাঠ করতেন।"

যাহাবী সংকলিত গ্রন্থের কথা বলতে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "ইবনে মুঈন তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন। আহমাদ তাঁকে ভাল বলেছেন। নাসায়ী বলেছেন : কোন সমস্যা নেই।"

সিহাহ সিত্তাহর হাদীসবিদগণ তাঁর হাদীস দলিল হিসাবে গ্রহণ ও পেশ করেছেন। যে সকল হাদীস তিনি তাঁর পিতা ফুযাইল, আ'মাশ, ইসমাঈল ইবনে আবি খালিদ ও অন্যান্যদের হতে বর্ণনা করেছেন তা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। বুখারীর বর্ণনানুসারে মুহাম্মদ ইবনে নুমাইর, ইসহাক হানযালী, ইবনে আবি শাইবা, মুহাম্মদ ইবনে সালাম, কুতাইবা, ইমরান ইবনে মাইসারাহ্ এবং আমর ইবনে আলী তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মুসলিমের মতানুসারে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমের, আবু কুরাইব, মুহাম্মদ ইবনে তারিফ, ওয়াসেল ইবনে আবদুল আলা, যুহাইর, আবু সাঈদ আশাজ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ, মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না, আহমাদ ওয়াকিয়ী এবং আবদুল আযীয ইবনে উমর ইবনে আবান তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি ১৯৫ হিজরীতে মতান্তরে ১৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৮১। মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম তায়েফী

ইমাম সাদিক (আ.)- এর প্রসি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। শাইখুত তায়েফাহ্ আবু জা'ফর তুসী তাঁকে শিয়া রিজাল বলেছেন। হাসান ইবনে আলী ইবনে দাউদ[১১৭] বিশ্বস্ত রাবীদের তালিকায় তাঁকে স্মরণ করেছেন।

যাহাবী তাঁর পরিচিতি পর্বে ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন ও অন্যদের হতে তাঁর নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন এবং বলেছেন, "কাছনী, ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া ও কুতাইবা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।" আবদুর রহমান ইবনে মাহদী মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম সম্পর্কে বলেছেন, "তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য (সহীহ)।" মা'রুফ ইবনে ওয়াসেল বলেছেন, "সুফিয়ান সাওরীকে তাঁর নিকট হাঁটু গেঁড়ে বসে হাদীস লিখতে দেখেছি।"

আমার মতে যাঁরা তাঁকে দুর্বল বলে উপেক্ষা করেছেন তাঁদের এ উপেক্ষার কারণ তাঁর শিয়া হওয়া। কিন্তু তাঁকে দুর্বল বলার এ প্রচেষ্টা তাঁর কোনই ক্ষতি করে নি। ওযু সম্পর্কে আমর ইবনে দিনার হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ মুসলিমে রয়েছে।

'তাবাকাতে ইবনে সাদ'- এ যেভাবে উ ৃত হয়েছে তাতে ওয়াকী ইবনে জাররাহ্, আবু নাঈম, মুঈন ইবনে ঈসা ও অন্যান্যরা তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন। তিনি ১৭৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর সমনামী মুসলিম ইবনে জাম্মাযও একই বছর ইন্তেকাল করেন বলে ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে তাঁর পরিচিতি পর্বে উল্লেখ করেছেন।

৮২। মুহাম্মদ ইবনে মূসা ইবনে আবদুল্লাহ্ ফিতরী (মদীনার অধিবাসী)

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর শিয়া হবার বিষয়টি আবু হাতেম হতে এবং বিশ্বস্ততার বিষয়টি তিরমিযী হতে উল্লেখ করেছেন। তাঁর নামের পাশে সাংকেতিক চিহ্নে মুসলিম ও 'সুনানে আরবাআহ্' লিখেছেন এটি বোঝানোর জন্য যে, তাঁরা তাঁর হাদীস হতে প্রমাণ

উপস্থাপন করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু তালহা হতে যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন তা সহীহ মুসলিমের ‘আত্’ইমাহ্’ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি মাকবারী ও তাঁর পর্যায়ের কয়েকজন হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবি ফাদিক, ইবনে মাহদী, কুতাইবা ও সমপর্যায়ের অনেকেই তাঁর হতে হাদীস নকল করেছেন।

৮৩। মুয়াবিয়া ইবনে আম্মার দোহনী বাজালী কুফী

শিয়াদের মধ্যে তিনি পরিচিত ও উ   ল ব্যক্তিত্ব। তিনি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং বিশ্বস্ত। তাঁর পিতা আম্মার সেসব ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা দৃঢ়তা ও সত্যের পথে অটল থাকার আদর্শ হিসেবে প্রবাদ পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর পথে অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করে ধৈর্যশীলদের নমুনা হয়েছিলেন। অত্যাচারী শাসকরা শিয়া হবার কারণে তাঁর পা কেটে দিয়েছিল। তাতেও তিনি কখনও কোন দুর্বলতা প্রদর্শন করেন নি বা পিছিয়ে আসেন নি, বরং ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত অবিচল ছিলেন। তাঁর পুত্র মুয়াবিয়াও পিতার পথকে আঁকড়ে ধরে রাখেন। সন্তান পিতার প্রতিকৃতি (الولد سرّ أبيه)।

যে ব্যক্তি এরূপ পিতার সদৃশ, তিনি ভুল পথে যেতে পারেন না, তিনি ইমাম সাদিক ও ইমাম কাযেম (আ.)- এর সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ও তাঁদের জ্ঞানের ধারক ও বাহক।

তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমরা সনদসহ তাঁর হতে বর্ণিত হাদীসগুলো উল্লেখ করেছি। ইবনে আবি উমাইর ও অন্যান্য শিয়া রাবী তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসলিম ও নাসায়ী তাঁর বর্ণিত হাদীস প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যুবাইর হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ মুসলিমে রয়েছে। মুসলিমের বর্ণনানুসারে ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া ও কুতাইবা তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুয়াবিয়া তাঁর পিতা আম্মার এবং তাঁর পর্যায়ের অনেকের হতেই হাদীস নকল করেছেন। আহলে সুন্নাহর হাদীস গ্রন্থসমূহে এ রেওয়ায়েতগুলো রয়েছে।

তিনি ১৭৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৮৪। মা'রুফ ইবনে খারবুয কারখী (ইবনে ফিরুজ ও ইবনে আলী নামেও পরিচিত)

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি সত্যবাদী ও শিয়া।" তিনি তাঁর নামের পাশে সাংকেতিকভাবে বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ লিখেছেন, কারণ তাঁরা তাঁর হাদীস দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে তিনি আবু তুফাইল হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং রাবী হিসেবে কম হাদীস বর্ণনাকারী। আবু আছেম, আবু দাউদ, উবাইদুল্লাহ্ ইবনে মূসা ও অন্যান্যরা তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হাতেম বলেছেন, "তাঁর হাদীস সহীহ তাই অবশ্যই তা লিপিব হওয়া উচিত।"

ইবনে খাল্লেকান তাঁর 'ওয়াফায়াতুল আ'য়ান' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি দাসে ণীর এবং আলী ইবনে মূসা রেযা (আ.)- এর ভক্তদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর উপদেশবাণীর একটিতে বলেছেন, "আমি আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি ও আমার যা কিছু ছিল তা আমার মাওলা আলী ইবনে মূসা রেযা (আ.)- এর খেদমতে নিয়োজিত করেছি।"

ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থে তাঁকে শিয়া রিজালদের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন।

মুসলিম তাঁর হাদীস প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর সহীহতে 'হ ' অধ্যায়ে আবু তুফাইল হতে তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ২০০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৮৫। মানসুর ইবনে মো'তামার ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে রাবীয়া সালামী কুফী

তিনি ইমাম বাকির ও সাদিক (আ.)- এর সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি তাঁদের নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন। 'মুনতাহাল মাকাল ফি আহওয়ালির রিজাল' গ্রন্থে তা উ ৃ ত হয়েছে।

ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ' গ্রন্থে তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন এবং জাওযাজানী তাঁকে সে সকল মুহাদ্দিসের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন যাঁদের মাজহাবগত আকীদার (ধর্মের মৌল ও শাখাগত বিষয়ে) কারণে লোকেরা তাঁদের পছন্দ করত না। এজন্যই তিনি বলেছেন, "কুফার লোকদের মধ্যে একদল ছিলেন যাঁদের মাজহাবের কারণে জনসাধারণ তাঁদের পছন্দ করত না, তাঁরা কুফার মুহাদ্দিসদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, যেমন আবু

ইসহাক, মানসুর, যুবাইদ ইয়ামী, আ'মাশ এবং তাঁদের নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাঁদের মুখের বিশ্বস্ততার কারণে তাঁদেরকে গ্রহণ করত।"

আমার প্রশ্ন হলো কি বিষয়ে এই সত্যপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তাদের শত্রুতার কারণ ঘটেছিল? তাঁরা নবীর আহলে বাইত হতে যা এসেছে তার প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন বলে? নাকি যে মূল্যবান ভারী বস্তুকে আঁকড়ে ধরার জন্য রাসূল (সা.) বলেছিলেন তা আঁকড়ে ধরার কারণে? যেহেতু তাঁরা মুক্তির তরণিতে আরোহণ করেছিলেন, নবীর জ্ঞানের শহরের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন এবং তাঁরা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে সব সময় ক্রন্দন করতেন ও নবীর সুন্নাহকে তাঁর বংশধরদের অনুসরণের মাধ্যমে জীবিত রেখেছিলেন এরূপ বিষয়গুলোই তাঁদের প্রতি শত্রুতার আগুন ালিয়েছিল। তাঁদের জীবনী অধ্যয়নে আমাদের নিকট তাই প্রমাণিত হয়।

ইবনে সা'দ মানসুরের পরিচিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "আল্লাহর ভয়ে অধিক ক্রন্দনের কারণে তাঁর চোখগুলো প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সব সময় তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুপাত হত বলে তিনি হাতে সর্বক্ষণ রুমাল রাখতেন ও চোখের পানি তা দিয়ে বার বার মুছতেন। তিনি ষাট বছর রোযা রেখেছেন এবং অধিকাংশ সময় নামাযে মশগুল থাকতেন।"[২২০]

প্রশ্ন হলো এমন আমলকারী ব্যক্তি মানুষের অপছন্দ ও তিরস্কারের পাত্র হওয়া কি বাঞ্ছনীয়? অবশ্যই না। কিন্তু তদুপরি আমরা এমন উম্মতের মুখোমুখি যারা ইনসাফ করে না। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইবনে সা'দ মানসুর সম্পর্কে হাম্মাদ ইবনে যাঈদ হতে উ ৃত করেছেন, "মানসুরকে মক্কায় দেখেছিলাম। আমি তাঁকে খাশাবিয়া ভেবেছিলাম কিন্তু তাঁকে দেখে আমার বিশ্বাস হয় নি যে, তিনি মিথ্যা বলতে পারেন।"

আপনার প্রতি আমার আহবান গায়ের জোরে অন্যদের হীন বলা, ছোট করে দেখা ও তাঁদের প্রতি শত্রুতাভাব পোষণ করার যে প্রবণতা এসব কথার মধ্যে রয়েছে তার মূল্যায়ন করুন। দেখুন, কতটা ভয়ঙ্কর একজন মুমিনের ব্যাপারে এরূপ মন্তব্য যিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি তিনি মিথ্যা কথা বলেন।

আফসোস! আফসোস! মিথ্যা বলা যেন রাসূল (সা.)- এর আহলে বাইতের বন্ধু ও তাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের মজ্জাগত। সম্ভবত মানসুর সত্যবাদিতার বিপরীত পথে চলেছেন তাই নাসেবীরা (আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষীরা) তাঁর মত আহলে বাইতপন্থীদের জন্য মিথ্যাবাদী হতে উত্তম কোন বিশেষণ খুঁজে পায় নি। তাই তারা তাঁদের জন্য খাশাবিয়া, তুরাবিয়া, রাফেযা এবং এরূপ বিশেষণগুলো নির্বাচন করেছেন। সম্ভবত তাঁরা আল্লাহর এ বাণীটি বণ করেন নি :

(ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيْمان)

তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না, কত নিকৃষ্ট (জাহেলিয়াতের) এ মন্দ উপনাম ঈমান আনয়নের পর। (সূরা হুজরাত : ১১)

ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘মাআরিফ’ গ্রন্থে খাশাবিয়া উপনাম শিয়াদের জন্য ব্যবহার করে বলেছেন তাঁরা রাফেযী। তাঁদের এ নামকরণের কারণ হলো ইবরাহীম আশতার উবাইদুল্লাহ্ যিয়াদের মুখোমুখি হবার মুহূর্তে ইবরাহীমের সকল সঙ্গীদের হাতে কাষ্ঠ ছিল। খাশাবিয়া অর্থ কাষ্ঠধারীগণ। আমার মতে তারা এ সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য এরূপ নাম এজন্য নির্বাচন করেছিল যাতে করে তিরস্কারের মাধ্যমে তাঁদের অপরাজেয় মানসিকতাকে দুর্বল করা যায়। কিন্তু এ কাষ্ঠধারীগণ (খাশাবিয়া) নাসেবীদের নেতা ইবনে মারজানাকে (উবাইদুল্লাহকে) হত্যা করে এ বিষবৃক্ষকে উৎপাটন করেছেন। যারা রাসূলের বংশধরদের কারবালায় শহীদ করেছিল। সেই জালেম ও অত্যাচারীদের লেজ কেটেছিলেন (সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর)। সুতরাং তারা যে উপনামের মাধ্যমে আমাদের ছোট করতে চেয়েছিল তা আমাদের সম্মানের বস্তু। তেমনি হযরত আলীর আবু তুরাব উপাধির কারণে শিয়াদের যে তুরাবিয়া বলা হয় তাও আমাদের নিকট ত্রুটি বলে গণ্য নয়, বরং তা আমাদের গর্বিত ও সম্মানিত করে।

মূল আলোচনা থেকে অন্যদিকে সরে গিয়েছিলাম, সুতরাং ফিরে আসি আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায়। মানসুরের হাদীসের বিষয়ে সিহাহ সিত্তাহরও অন্যান্য হাদীসবেত্তাগণ একমত পোষণ করেন যে, তিনি শিয়া হওয়া স ে ও তাঁর হাদীস ও কথা প্রমাণ উপস্থাপনে কোন সমস্যা নেই। এজন্য তাঁরা তা দলিল হিসেবে ব্যবহার করতেন। আপনি আবু ওয়ায়েল, আবু

যুহা, ইবরাহীম নাখয়ী ও তাঁদের পর্যায়ের অন্যান্য রাবীগণ তাঁর হতে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে দেখতে পারেন। বুখারী ও মুসলিমে শো'বা, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে উয়াইনা, হাম্মাদ ইবনে যাইদ এবং এরূপ প্রসি   অনেক রাবীই তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে সা'দ বলেছেন, "মানসুর ১৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি নিরাপদ, বিশ্বস্ত, অনেক হাদীস বর্ণনাকারী, উঁচু পর্যায়ের মুহাদ্দিস ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।" আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

৮৬। মিনহাল ইবনে আমর তাবেয়ী (কুফার অধিবাসী)

কুফার প্রসি   শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই জাওযাজানী তাঁকে দুর্বল ও মন্দ মাজহাবের অনুসারী বলেছেন।

ইবনে হাযমও তাঁর সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছেন। ইয়াহিয়া ইবনে সাইদও তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন। কিন্তু আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, "মিনহালের প্রতি আমার আকর্ষণ আবু বিশর হতে অধিক এবং তিনি অধিকতর বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।"

মুখতারের শাসনামলে তিনি নিজেকে শিয়া বলে প্রচার করতেন। তাই এ বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হওয়া স ও মুহাদ্দিসরা তাঁর হাদীসের বিশু তার বিষয়ে সন্দেহ করতেন না। তাই মাসউদী, শো'বা, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত এবং তাঁদের পর্যায়ের অনেকেই তাঁর নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করেছেন। ইবনে মুঈন, আহমাদ আজালী ও অন্যরাও তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন। যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে উপরোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করে তাঁর নামের পাশে সাংকেতিকভাবে বুখারী ও মুসলিম লিখেছেন যেহেতু তাঁরা তাঁর হাদীস দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সাঈদ ইবনে জুবাইর হতে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সহীহ বুখারীতে রয়েছে। যাইদ ইবনে আবি আনিসা সহীহ বুখারীর 'তাফসীর' অধ্যায়ে তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মানসুর ইবনে মো'তামার নবীদের সম্পর্কে তাঁর হতে হাদীস নকল করেছেন।

৮৭। মূসা ইবনে কাইস হাযরামী (তাঁর কুনিয়াত হলো আবু মুহাম্মদ)

আকিলী তাঁকে বাড়াবাড়ি আকীদা পোষণকারী রাফেযীদের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। সুফিয়ান হযরত আবু বকর ও আলী সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "আলী আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।" মূসা সালামাহ্ ইবনে কুহাইল হতে, তিনি আয়ায ইবনে আয়ায হতে, আয়ায মালিক ইবনে জাউনা হতে বর্ণনা করেছেন, "উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমাহ্ বলেছেন : আলী সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই কেউ তাঁর অনুসরণ করলে সেও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আর কেউ আলীকে ত্যাগ করলে প্রকৃতপক্ষে সে সত্যকেই ত্যাগ করেছে। এটি আল্লাহর পক্ষ হতে আমাদের প্রতি আরোপিত প্রতিশ্রুতি।" আবু নাঈম, ফযল ইবনে দাকিন হতে এবং তিনি মূসা ইবনে কায়িস হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

মূসা আহলে বাইতের ফজীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করে কিছু সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন যা আকিলীর মনোকষ্টের কারণ। তাই মূসা সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ইবনে মুঈন তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন।

আবু দাউদ এবং সাঈদ ইবনে মানসুর তাঁদের সুনান গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ হতে দলিল পেশ করেছেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলো যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে এনেছেন। যেসব হাদীস তিনি সালামাহ্ ইবনে কুহাইল ও হাজর ইবনে আনবাসাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন তা সুনান গ্রন্থসমূহে রয়েছে।

ফযল ইবনে দাকিন, উবাইদুল্লাহ্ ইবনে মূসা ও অন্যান্য প্রসি   রিজাল তাঁর হতে হাদীস নকল করেছেন। তিনি আব্বাসীয় খলীফা মানসুরের শাসনামলে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

ن

৮৮। নাফিই ইবনে হারিস হামাদানী সাবিয়ী (আবু দাউদ নাখয়ী কুফী)

আকিলী বলেছেন, “তিনি রাফেযী মতবাদে বাড়াবাড়ি করতেন।” বুখারী তাঁর শিয়া হওয়াকে ত্রুটি বলে মনে করতেন।

সুফিয়ান, হাম্মাম (হুমাম), শারীক এবং তাঁদের পর্যায়ের অনেকেই তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন। তিরমিযী তাঁর সহীহতে তাঁর হাদীস প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। হাদীস গ্রন্থের লেখকগণ তাঁর হাদীস গ্রহণ করতেন। আপনি আনাস ইবনে মালিক, ইবনে আব্বাস, ইমরান ইবনে হুসাইন এবং যাইদ ইবনে আরকাম হতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ তিরমিযীতে দেখতে পারেন।

উপরোক্ত কথাগুলো যাহাবী তাঁর ‘মিযান’ গ্রন্থে এনেছেন।

৮৯। নূহ ইবনে কাইস ইবনে রাবাহ হাদানী ওয়াতাহী (তাঁকে বাসরী বলেও উল্লেখ করা হয়েছে)

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে সালিহুল হাদীস বা গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন। তাঁর মতে আহমাদ এবং ইবনে মুঈনও তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন। আবু দাউদ তাঁকে শিয়া বলেছেন এবং নাসায়ী বলেছেন, “তাঁর কোন সমস্যা নেই।”

যাহাবী মুসলিম ও সুনানের গ্রন্থকারদের নাম সাংকেতিকভাবে তাঁর নামের পাশে লিখেছেন কারণ তিনি তাঁদের মতে সত্যপরায়ণ রিজালদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আউন হতে পানীয় সম্পর্কিত তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সহীহ মুসলিমে রয়েছে। তাছাড়া পোষাক সম্পর্কিত একটি হাদীস যা তিনি তাঁর ভ্রাতা খালিদ ইবনে কাইস সূত্রে বর্ণনা করেছেন তা সহীহ মুসলিমে দেখতে পারেন। মুসলিমের নিকট নাসর ইবনে আলী তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুনানে আরবাআহয় আবুল আশআস ও তাঁর পর্যায়ের অনেকেই তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আইয়ুব, আমর ইবনে মালিক এবং আরো কয়েকজন হতে হাদীস নকল করেছেন।

হ

৯০। হারুন ইবনে সা'দ আজালী কুফী

যাহাবী তাঁর নামের পাশে সাংকেতিকভাবে মুসলিম লিখেছেন, যেহেতু তিনি মুসলিমের রিজাল ও রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তাঁর চরিত্র বর্ণনা করে বলেছেন, "তিনি সত্যবাদী কিন্তু কট্টর রাফেযী ও অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী।" আব্বাস ইবনে মুঈন হতে বলেছেন, "হারুন শিয়া গালীদের (বাড়াবাড়ির আকীদা পোষণকারী) অন্তর্ভুক্ত।" তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ খুদরী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে আবি হাফছ আত্তার, মাসউদী এবং হাসান ইবনে হাই তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হাতেম তাঁকে ত্রুটিহীন বলে উল্লেখ করেছেন।

৯১। হাশিম ইবনে বুরাইদ ইবনে যাইদ (আবু আলী কুফী)

যাহাবী তাঁর নামের পাশে সাংকেতিক আবু দাউদ ও নাসায়ী লিখেছেন, কারণ তিনি এ দুই সহীহর রিজালদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ইবনে মুঈনের সূত্রে তাঁর রাফেযী ও শিয়া হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বস্ত হবার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। অতঃপর আহমাদ হতে তাঁর ত্রুটিহীনতার কথা বলেছেন। হাশিম যাইদ ইবনে আলী এবং মুসলিম বাতিন হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর পুত্র আলী ইবনে হাশিম ও খারিবী তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাশিম যে শিয়া পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এ সত্যটি আলী ইবনে হাশিমের পরিচিতি পর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

৯২। হুবাইরা ইবনে বারীম হিমায়ারী

তিনি হযরত আলী (আ.)- এর সাহাবীদের অন্তর্গত। আলীর প্রতি ভালবাসা ও তাঁর বেলায়েতের স্বীকৃতিতে তিনি হারিসের মত। যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁর নামের পাশে সুনানের লেখকগণের নাম সাংকেতিক চিহ্নে লিখেছেন, কারণ সুনানসমূহের সনদে রাবীদের

তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। অতঃপর আহমাদের সূত্রে বলেছেন, “তিনি ত্রুটিহীন এবং হারিস হতে আমাদের নিকট অধিকতর প্রিয়।”

যাহাবী আরো বলেছেন, “ইবনে খাররাশ বলেছেন যে, তিনি দুর্বল। সিফিফনের যু তিনি যু াহতদের হত্যা করেন।” জাওযাজানী বলেছেন, “তিনি মুখতার সাকাফীর পক্ষে খাযেরের যু অংশ গ্রহণ করেন।”

শাহরেস্তানী তাঁর ‘মিলাল ওয়ান নিহাল’- এ তাঁকে শিয়া রিজালদের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন এবং তিনি হযরত আলী হতে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সুনান গ্রন্থসমূহে লিপিব রয়েছে। আবু ইসহাক ও আবু ফাখিতাহ্ তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৯৩। হিশাম ইবনে যিয়াদ (**আবু মাকদাম বাসরী**)

শাহরেস্তানী তাঁর ‘মিলাল ওয়ান নিহাল’- এ তাঁকে শিয়া রিজালদের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’- এ নামানুসারে এবং কুনিয়ার স্থানে ﻫﺎء বর্ণের স্থলে তাঁর পরিচয় দান করেছেন। কুনিয়ার আলোচনায় তাঁর নামের পাশে (ت ق) লিখেছেন, কারণ সুনান লেখকগণ তাঁর ওপর নির্ভর করতেন।

যে সকল হাদীস তিনি হাসান ও কারযী হতে বর্ণনা করেছেন তা সহীহ তিরমিযীতে দেখতে পারেন। শাইবান ইবনে ফারুখ, কাওয়ারিরী এবং অন্যান্যরা তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৯৪। হিশাম ইবনে আম্মার ইবনে সাইর ইবনে মাইসারাহ আবুল ওয়ালিদ (**জা’ফারী দামেস্কী**)

তিনি বুখারীর সহীহতে তাঁর উস্তাদ। ইবনে কুতাইবা তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। তিনি তাঁর ‘মা’আরিফ’ গ্রন্থের ‘আল ফিরাক’ অধ্যায়ে শিয়া রিজালদের নামের তালিকায় তাঁর নাম এনেছেন।

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে তাঁকে ইমাম, খাতীব, ক্বারী, মুহাদ্দিস, দামেস্কের আলেম, সত্যবাদী ও অধিক হাদীস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করে বলেছেন তিনি এমন অনেক হাদীস নকল করেছেন যা অনেকেরই পছন্দ নয়।

বুখারী 'যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ও দরিদ্রকে সময় দেয়' সে সম্পর্কিত হাদীসের এবং 'সঠিক

ক্রয়- বিক্রয় ও ব্যবসায় প তি' সম্পর্কিত আলোচনা অধ্যায়ে তাঁর হতে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে অধিকতর অবগত আছেন। তাঁর বর্ণিত অন্যান্য হাদীস নবী করীম (সা.)- এর সাহাবীদের ফাজায়েল, পানীয়সমূহের আলোচনায় এবং মাগাজী বা যু সমূহ নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইয়াহিয়া ইবনে হামযাহ্, সাদাকা ইবনে খালিদ, আবদুল হামিদ ইবনে আবিল ঈশরীন ও অন্যান্যদের হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে বলেছেন, "অসংখ্য লোক কোরআন ও হাদীস শিক্ষার জন্য তাঁর নিকট যেত ও তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করত।"

ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর শিক্ষকদের অন্যতম। হিশাম আবু লাহিয়া হতে হাদীস বর্ণনার অনুমতিপ্রাপ্ত। আবদান বলেছেন, "তৎকালীন সময়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।" কেউ বলেছেন, "হিশাম বাগ্মী, ভাষা অলংকারশাস্ত্রবিদ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।"

আমার মতে তিনি অন্যান্য শিয়াদের মত কোরআনের শব্দসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করতেন অর্থাৎ বর্তমানে কোরআনে যে বর্ণ ও ধ্বনি রয়েছে সেভাবেই রাসূল (সা.)- এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে হিশামের পরিচিতি পর্বে বর্ণনা করা হয়েছে- আহমাদ তাঁর এ বিশ্বাসের কথা শুনে বলেন, "আমি তাকে অজ্ঞ ও মূর্খ পেয়েছি। আল্লাহ্ তাকে হত্যা করুন।" আহমাদ হিশামের লিখিত একটি গ্রন্থের প্রথমে দেখলেন লেখা রয়েছে-

الحمد لله الّذي تجلّى لخلقه بخلقه

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে তাঁর সৃষ্টির কাছে প্রকাশিত করেছেন।

আহমাদ তা দেখে রাগের প্রচণ্ডতায় একবার উঠছিলেন ও একবার বসছিলেন এবং ক্রোধের সাথে বললেন যারা হিশামের পেছনে নামায পড়েছেন তাঁরা যেন তা পুনরায় আদায় করেন।

হিশামের বক্তব্যতে আল্লাহর পবিত্রতা, তাঁর সৃষ্টিতে তাঁর নিদর্শনের প্রমাণ, তাঁর পবিত্রতার প্রকৃতি ও মর্যাদা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা দৃষ্টিমান ব্যক্তিদের নিকট গোপন নয়। কারণ তাঁর বক্তব্য এই কথার সমার্থক যে, প্রতিটি বস্তুতেই আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে। অবশ্যই তাঁর কথা এ থেকেও পরিষ্কার ও বোধগম্য। কিন্তু আলেমগণ নিজের ইচ্ছামত একজন অপরের বিরু কথা বলেছেন।

হিশাম ১৫৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও ২৪৫ হিজরীর মুহররম মাসে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

৯৫। হাশিম ইবনে বাশির ইবনে কাসিম ইবনে দীনার সালামী (**আবু মুয়াবিয়া**, **ওয়াসেতী**)

তিনি প্রকৃতপক্ষে বাল্খের লোক, কারণ তাঁর প্রপিতা কাসিম ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ওয়াসেত এসেছিলেন।

ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘মা’আরিফ’ গ্রন্থে তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং তাঁর পর্যায়ের অনেকেরই শিক্ষক। যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে তাঁর নামের পাশে সিহাহ সিত্তাহর গ্রন্থকার কর্তৃক তাঁর হাদীস হতে যুক্তি প্রদর্শনের সাংকেতিক চিহ্ন লিখেছেন এবং তাঁকে হাফিয বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে তিনি সেসব আলেমের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা যুহরী ও হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান হতে হাদীস বণ করেছেন।

ইয়াহিয়া ইবনে কাত্তান, আহমাদ, ইয়াকুব দাউরাকী এবং অনেকেই তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যে সকল হাদীস তিনি হামিদ তাভীল, ইসমাঈল ইবনে আবি খালিদ, আবু ইসহাক শায়বানী ও অন্যদের হতে বর্ণনা করেছেন তা সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে আপনি দেখতে পারেন।

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনানুসারে উমর, নাকেদ, আমর ইবনে যুরারাহ্ এবং সাঈদ ইবনে সুলাইমান তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া বুখারীতে আমর ইবনে আওফ, সা’দ ইবনে নাদর, মুহাম্মদ ইবনে নিবহান, আলী ইবনে মাদিনী ও কুতাইবা তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন

এবং সহীহ মুসলিমে আহমাদ ইবনে হাম্বল, শুরাইহ্, ইয়াকুব দাউরাকী, আবদুল্লাহ্ ইবনে মুতী, ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া, সাঈদ ইবনে মানসুর, ইবনে আবি শাইবা, ইসমাঈল ইবনে সালিম, মুহাম্মদ ইবনে সাবাহ, দাউদ ইবনে রশিদ, আহমাদ ইবনে মানী, ইয়াহিয়া ইবনে আইউব, যুহাইর ইবনে হারব, উসমান ইবনে আবি শাইবা, আলী ইবনে হাজার এবং ইয়াযীদ ইবনে হারুন তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি ১৮৩ হিজরীতে ৭৯ বছর বয়সে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

و

৯৬। ওয়াকী ইবনে জাররাহ্ ইবনে মালিহ ইবনে আদী (তাঁর কুনিয়াত তাঁর পুত্র সুফিয়ান রাওয়াসীর নামা সারে আবু সুফিয়ান)

তিনি কাইস গাইলান গোত্রের লোক। ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘মা’আরিফ’ গ্রন্থে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। ইবনে মাদিনী তাঁর ‘তাহ্যীব’ গ্রন্থে তাঁর শিয়া হবার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

মারওয়ান ইবনে মুয়াবিয়ার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে, তিনি রাফেযী। একদিন ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন মারওয়ানের নিকট বেশ কিছু লিখিত বস্তু দেখলেন যার প্রতিটি লেখা ছিল অমুক এরূপ, অমুক এরূপ, সেখানে ওয়াকীর নামও লিখা ছিল এবং তাতে তাঁকে রাফেযী বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ইবনে মুঈন তাঁকে বললেন, “ওয়াকী তোমার চেয়ে উত্তম।” সে শুনে বলল, “হ্যাঁ।’ ওয়াকী একথা শুনে বললেন, “ইয়াহিয়া আমাদের বন্ধু।”

আহমাদ ইবনে হাম্বলকে প্রশ্ন করা হলো, “যদি আবদুর রহমান ইবনে মাহদী এবং ওয়াকী কোন বিষয়ে দ্বৈতমত পোষণ করেন তবে কার কথাকে গ্রহণ করবেন?” তিনি যে দৃষ্টিকোণ থেকে আবদুর রহমানকে দেখতেন সে দৃষ্টিতে বললেন, “আবদুর রহমানকে।” কারণ আবদুর রহমানের দৃষ্টিতে পূর্ববর্তীগণ ত্রুটিমুক্ত, ওয়াকীর দৃষ্টিতে নন।

এ কথার সপক্ষে দলিল হলো যাহাবীর ‘মিযান’-এ হাসান ইবনে সালিহের পরিচিতি পর্বে ওয়াকীর যে বক্তব্য তিনি এনেছেন। ওয়াকী বলেছেন, “হাসান ইবনে সালিহ্ আমার নেতা ও পথ প্রদর্শক।” তাঁকে বলা হলো, “হাসান হযরত উসমানের জন্য দোয়া করেন না।” ওয়াকী বললেন, “তুমি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ওপর দরূদ পড়?” এখানে ওয়াকী হযরত উসমানকে হাজ্জাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলো যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’-এ এনেছেন। সিহাহ সিত্তাহর হাদীসবিদগণ তাঁর হাদীসসমূহ যুক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যে সকল হাদীস তিনি আ’মাশ, সাওরী, শো’বা, ইসমাঈল ইবনে আবি খালিদ এবং আলী ইবনে মোবারক হতে বর্ণনা করেছেন তা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। এ দুই হাদীসগ্রন্থেই ইসহাক হানযালী এবং মুহাম্মদ ইবনে নুমাইর তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বুখারীর বর্ণনামতে, আবদুল্লাহ্ ইবনে হামিদী, মুহাম্মদ ইবনে সালাম, ইয়াহিয়া ইবনে জা’ফর ইবনে আ’য়ুন, ইয়াহিয়া ইবনে মূসা, মুহাম্মদ ইবনে মাকাতিল তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের মতে, যুহাইর, ইবনে আবি শাইবা, আবু কুরাইব, আবু সাঈদ আশাজ, নাছর ইবনে আলী, সাঈদ ইবনে আযহার, ইবনে আবি উমর, আলী ইবনে খাশরাম, উসমান ইবনে আবি শাইবা এবং কুতাইবা ইবনে সাঈদ তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি ১৯৭ হিজরীর মুহররম মাসে হ হতে ফেরার পথে ৬৮ বছর বয়সে ফাইদ নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন।

ي

৯৭। ইয়াহিয়া ইবনে জাযযার আরানী কুফী (**আমীরুল মুমিনীন আলী [আঃ]- এর সাহাবী**)

যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল’ গ্রন্থে তাঁর নামের পাশে সহীহ মুসলিম ও সুনান লেখকগণের নাম সাংকেতিকভাবে লিখেছেন তাঁদের তাঁর হাদীসসমূহ দলিল হিসেবে ব্যবহারের কারণে। তিনি তাঁকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বলেছেন।

হাকাম ইবনে উতাইবার সূত্রে তিনি বলেছেন, “ইয়াহিয়া ইবনে জাযযার শিয়া বিষয়ে বাড়াবাড়ি করতেন।”

ইবনে সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২০৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, ইয়াহিয়া ইবনে জাযযার শিয়া ছিলেন এবং তাঁর কথায় এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি ছিল। তিনি তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন ও তাঁর হাদীস নকল করেছেন। আমার জানা মতে, সহীহ মুসলিমে নামাযের অধ্যায়ে তাঁর হাদীস রয়েছে। তাছাড়া ‘ঈমান’ অধ্যায়েও আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলা হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাকাম ইবনে উতাইবা ও আরানী এবং অন্যরা সহীহ মুসলিমে তাঁর হতে হাদীস নকল করেছেন।

৯৮। ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান (**তাঁর কুনিয়াত আবু সাঈদ**, **বনি তামীমের দাস**, **বসরার অধিবাসী এবং তাঁর সময়ের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভু**)

ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘মা’আরিফ’ গ্রন্থে তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। সিহাহ সিত্তাহর গ্রন্থকারগণ ও অন্যান্যরা তাঁর হাদীস প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং হামিদ তাভীল, হিশাম ইবনে উরওয়া, ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আনসারী এবং অন্যদের হতে তিনি যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। তাঁদের দু’জনের মতেই মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না ও বানদার তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বুখারীর বর্ণনানুসারে মুসাদ্দিদ, আলী ইবনে মাদিনী ও বায়ান ইবনে আমর এবং মুসলিমের বর্ণনানুসারে মুহাম্মদ ইবনে হাতেম, মুহাম্মদ ইবনে খাল্লাদ বাহেলী, আবু কামেল, ফুযাইল ইবনে

হুসাইন জাহদারী, মুহাম্মদ মোকাদ্দামী, আবদুল্লাহ্ ইবনে হাশিম আবু বকর ইবনে আবি শাইবা, আবদুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবদুল্লাহ্ কাওয়ারিরী, ইয়াকুব দারুকী, আহমাদ ইবনে আবদুহু, আমর ইবনে আলী এবং আবদুর রহমান ইবনে বাশির তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১৯৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

৯৯। ইয়াযীদ ইবনে আবি যিয়াদ কুফী (**কুনিয়াত আবু আবদুল্লাহ্, বনি হাশিমের দাস**)

যাহাবী তাঁর 'মিযানুল ই'তিদাল'- এ সাংকেতিকভাবে মুসলিম ও সুনানে আরবাআহর নাম তাঁর নামের পাশে লিখেছেন। তাঁরা তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু ফুযাইল হতে বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ ইবনে আবি যিয়াদ শিয়াদের প্রসি   ব্যক্তিত্ব।

তিনি আরো স্বীকার করেছেন ইয়াযীদ কুফার আলেমদের মধ্যে প্রসি   ছিলেন। তিনি আবু বারযা বা আবু বারদা হতে হাদীস নকল করেছেন যে, আবু বারদা বলেছেন, "আমরা নবী (সা.)- এর সঙ্গে ছিলাম তখন গান বাজনার শব্দ ভেসে আসল, পরে বোঝা গেল মুয়াবিয়া ও আমর ইবনে আস এর আয়োজন করেছে। নবী (সা.) বললেন : হে আল্লাহ্! তাদের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করো ও আগুনের দিকে পরিচালনা করো।" (এ হাদীস বর্ণনার কারণে অনেকেই এটি তাঁর ক্রুটি হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর ওপর জুলুম করেছে।)

আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলী হতে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ মুসলিম তাঁর সহীহতে 'আত্ইমাহ্' অধ্যায় হতে উ ৃত করেছেন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি ১৩৬ হিজরীতে ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন।

১০০। আবু আবদুল্লাহ্ জাদলী

যাহাবী কুনিয়াসমূহের আলোচনায় তাঁর নামের পাশে (ت د) লিখেছেন, কারণ তিনি আবু দাউদ ও তিরমিযীর রিজালদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তাঁকে হিংসুক শিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি

জাওযাজানী হতে বর্ণনা করেছেন আবু আবদুল্লাহ্ মুখতারের বাহিনীর পতাকাধারী ছিলেন এবং আহমাদের সূত্রে তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন।

শাহরেস্তানী তাঁর ‘আল মিলাল ওয়ান নিহাল’- এ তাঁকে শিয়া রিজালের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন এবং ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘মা’আরিফ’ গ্রন্থে তাঁকে রাফেযী বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সহীহ তিরমিযী, আবু দাউদ, মুসনাদ ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে।

ইবনে সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠায় তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “তিনি কট্টর শিয়া ও এ আকীদায় অটল ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে মনে করা হয় মুখতারের বিশেষ সেনাবাহিনীর অংশ হিসেবে ৮০০ ব্যক্তির যে দলটি আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরের সঙ্গে যু করে তিনি তার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবনে যুবাইর যখন বনি হাশিম ও ইবনে হানাফিয়াকে গৃহবন্দী করে চতুর্দিকে আগুন ালিয়ে ভীতির সঞ্চার করে তাদের হতে বাইয়াত গ্রহণ করার চেষ্টা করে আবু আবদুল্লাহ্ জাদলী এ অবস্থাতে তাঁদের রক্ষা করেন। আল্লাহ্ নবী পরিবারের পক্ষ হতে তাঁর কর্মের পুরস্কার দান করুন।

এই সংক্ষিপ্ত সময়ে যে একশ তাকওয়া সম্পন্ন, শক্তিশালী, সম্ভ্রান্ত ও প্রসি শিয়া ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করলাম তাঁদের শেষ ব্যক্তি হলেন আবু আবদুল্লাহ্ জাদলী। তাঁরা আহলে সুন্নাহর জন্য নিদর্শন ও দলিল, তাঁরা উম্মতের ইলমের পাত্র যাঁদের মাধ্যমে নবুওয়াত সংরক্ষিত হয়েছে এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহ সিহাহ্, মুসনাদ এবং সুনান গ্রন্থগুলোতে স্থান পেয়েছে। তাঁদের পূর্ণ নাম উল্লেখ করে আহলে সুন্নাহর আলেমদের মতে যে তাঁরা শিয়া ছিলেন এতদস ও তাঁরা (আহলে সুন্নাহর আলেমরা) তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহ প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যবহার করতেন তা বর্ণনা করেছি। যদিও তাঁরা নিজস্ব মত ও নিয়মানুযায়ী চলতেন তদুপরি তাঁদের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিলেন। সুতরাং আমার মনে হয় যাঁরা এ কথা বলেন, আহলে সুন্নাহ্ শিয়া রিজালদের হাদীস গ্রহণ করেন না ও তাঁদের হাদীস দলিল ও যুক্তি হিসেবে পেশ করেন না এমন ব্যক্তিবর্গ নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন। তাঁরা খুব শীঘ্রই বুঝতে পারবেন আহলে সুন্নাহর হাদীসবিদগণের নিকট কোন হাদীস গ্রহণের মানদণ্ড শিয়া ও সুন্নী হওয়া নয়, বরং তাঁদের সত্যবাদিতা ও আমানতদারীই। যদি

শর্ত এটিই হয়, শিয়া সূত্র হতে বর্ণিত হাদীস সম্পূর্ণ বর্জনীয় তবে নবুওয়াতের চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে মুছে যাবে। যেমনটি যাহাবী তাঁর ‘মিযান’ গ্রন্থে আবান বিন তাগলিবের পরিচিতি পর্বে স্বীকার করেছেন। মহান আল্লাহ্ সত্যকে আপনার মাধ্যমে সাহায্য করুন। আপনি জানেন, প্রাচীন শিয়াদের মধ্যে যাঁদের আমি উল্লেখ করেছি তাঁদের বাইরে অনেকেই রয়েছেন আহলে সুন্নাহর আলেমগণ যাঁদের হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করতেন। তাঁদের সংখ্যা যেমন অধিক তেমনি তাঁদের মর্যাদা ও হাদীসের আধিক্য সনদের মূল্যের দিক থেকেও সমধিক। তাঁদের জ্ঞান, সময়ের দিক হতে অগ্রগামিতা ও শিয়া বিষয়ে দৃঢ়তাও লক্ষণীয়। মহানবী (সা.)- এর সাহাবীদের মধ্যে এ ধরনের ব্যক্তিত্বের নামের তালিকা ও পরিচয় আপনার অবগতির জন্য আমাদের ‘ফুসূলুল মুহিম্মা’ গ্রন্থে এনেছি। এছাড়া তাবেয়ীদের মধ্যকার শিয়া আলেমদের পরিচয়ও আমরা সেখানে দিয়েছি। তাঁদের সকলেই হাফিয, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য। তাঁদের অনেকেই আলী (আ.)- এর সহযোগী হয়ে যু করে শহীদ হয়েছেন, কেউ জঙ্গে জামালে, কেউ সিফিফনে, কেউ নাহরাওয়ানে, কেউবা বুসর ইবনে আরতাতের বিরু ইয়েমেন ও হেজাজের যু এবং মুয়াবিয়ার পক্ষ হতে বসরায় সৃষ্ট গোলযোগে[২২১] শাহাদাত বরণ করেছেন। আবার কেউ কেউ বেহেশতের যুবকদের নেতা ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (আ.)- এর সঙ্গে কারবালায় এবং তাঁর নাতী যাইদ ইবনে আলীর সঙ্গে কুফায় শহীদ হয়েছেন এবং তাঁরা অপমানকে সহ্য করেন নি বরং ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। অনেকেই অত্যাচারিত হয়ে হিজরত করতে বা ভয়- ভীতির কারণে ঈমানকে গোপন রাখতে বাধ্য হয়েছেন, যেমন আহনাফ ইবনে কাইস, আসবাগ ইবনে নুবাতাহ্ এবং ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামুর যিনি আরবী হরফে ‘নোকতা’ চিহ্ন সংযোজন করেন। তন্মধ্যে খালিল বিন আহমদ ফারায়েযী যিনি লুগাত বা অভিধানশাস্ত্র এবং স্বরচিহ্নের প্রবর্তক এবং মায়াজ ইবনে মুসলিম হাররা যিনি ইলমে ছারফের প্রবক্তা ও এ ধরনের আরো অনেক প্রবক্তা রয়েছেন যাঁদের নামের তালিকা দিতে গেলে মোটা একটি গ্রন্থ সৃষ্টি হবে। যা হোক নাসেবীদের (আহলে বাইত বিদ্বেষী) মধ্যে যারা

তাঁদের প্রতি আক্রমণ করেছে এবং চুলচেরা বিশ্লেষণের নামে দুর্বল বলার চেষ্টা করেছে ও তাঁদের হাদীস গ্রহণে অনীহা দেখিয়েছে তাদের কথা বাদ দিন।

আহলে বাইতের অনুসারীদের মধ্যে এরূপ শত সহস্র প্রতিষ্ঠিত আলেম ও হাফিয ছিলেন যাঁদেরকে আহলে সুন্নাহর আলেমরা উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু শিয়া আলেমগণ তাঁদের পরিচয় ও তালিকা প্রকাশ করে তাঁদের অবদানকে বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন ও ইসলামের চিরায়ত সত্য ও সহজ শরীয়তের প্রসারে তাঁদের ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন যাতে সত্যান্বেষীরা তাঁদের সম্পর্কে জানতে পারে। আপনি তা অধ্যয়নে তাঁদের সততা, আমানতদারিতা, দুনিয়াবিমুখতা, নিষ্ঠা, খোদাভীতি (তাকওয়া) ও ইবাদতের নমুনা ও আদর্শ খুঁজে পাবেন। আরো বুঝতে পারবেন তাঁরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সা.), পবিত্র কোরআন ও ইমামগণের বাণীকে কিরূপে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর বরকতের দ্বারকে তাঁদের মাধ্যমেই আমাদের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। তিনি আরহামুর রাহিমীন।

ওয়াসসালাম

শ

সতেরতম পত্র

৩ জিলহজ ১৩২৯ হিঃ

১। আলোচকের হৃদয়বান দৃষ্টির প্রশংসা।

২। আহলে সুন্নাহর নিকট শিয়া রাবীদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি স্বীকার।

৩। আহলে বাইত সম্পর্কে আল্লাহর বাণীর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা।

৪। এ প্রমাণসমূহ এবং মুসলমানদের সার্বিক অবস্থার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ।

১। আপনার চক্ষুর কসম, আমার এ চক্ষু আপনার হৃদয়ের মত এরূপ উদ্যোগী কোন হৃদয় ও আপনার ফলের মত এরূপ বাচন ক্ষমতাসম্পন্ন ফল যা ত গলাধঃকরণযোগ্য তা দেখে নি। এরূপ ভেদ্য কোন তীর আমার হৃদয়পটে বি হয় নি এবং এরূপ শ্রুতিমধুর বাণীও আমার কর্ণ কখনও শোনে নি। আপনার বাচনের কোমলতা ও যুক্তির তীর্যতা আমার কর্ণপটে ধ্বনিত হচ্ছে। আপনার সকল পত্রেই আপনি একজন বিশেষজ্ঞের মত দৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও উল্লেখযোগ্য দিকগুলো ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টির বিষয়টি মেনে চলেছেন। কথোপকথন ও সংলাপে আপনি অন্যদের চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয়ের অধিকারীতে পরিণত হন। আপনার এ পত্রের জন্য আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। এটি এমন এক পত্র যাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ পত্র সত্যের মাধ্যমে মিথ্যার আপাদমস্তকে আঘাত হেনেছে ও নিজের দিকে ফিরিয়ে এনেছে।

২। কোন সুন্নী মুসলমানের জন্য এ বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য শিয়া ভাইয়ের হাদীসকে গ্রহণ করে তার মাধ্যমে যুক্তি পেশ করাতে। আপনার এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ সঠিক ও স্পষ্ট। এর বিরু বাদীদের বিরোধিতা যুক্তিহীন ও গলাবাজী ছাড়া কিছু নয়। যাঁরা এ কথা বলেন, শিয়া রিজালদের হাদীস যুক্তি হিসেবে গ্রহণীয় নয়; তাদের কর্ম ও কথা পরস্পর বৈপরীত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। সুতরাং তাদের কর্ম ও কথা একই পথে নয়, বরং পরস্পরকে

প্রত্যাখ্যান করে বিপরীত পথে চলছে। এ মৌলনীতির ভিত্তিতে আপনার যুক্তি অকাট্য ও তাদের যুক্তি ভিত্তিহীনতায় পর্যবসিত হয়েছে। আপনার এ বিষয় সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ অপরিহার্য। আমি এর নাম রাখলাম 'আহলে সুন্নাহর সনদে শিয়া সনদসমূহ'। অবশেষে এমনটি হবে আশা করি, সত্যান্বেষীদের জন্য এ পথ ব্যতীত কোন পথ ও কোন স্থানই অবশিষ্ট থাকবে না। তাই আপনি ইসলামী বিশ্বে এরূপ একটি পরিবর্তন আনতে পারবেন বলে আমি মনে করি।

৩। আমরা সকলেই আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং তিনি হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) ও আহলে বাইতের অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে যত আয়াত অবতীর্ণ করেছেন তা আপনার বর্ণিত আয়াত হতে অধিক। কিন্তু কেন অধিকাংশ মুসলমান এ পথ হতে দূরে সরে আছেন ও দীনের মৌল ও শাখাগত কোন বিষয়েই তাঁদের ওপর নির্ভর করছেন না তা বোধগম্য নয়।

৪। তাঁরা (আহলে সুন্নাহর আলেমগণ) বিতর্কিত বিষয়গুলোতে কেন তাঁদের দিকে প্রত্যাবর্তন করছেন না? এমন কি তাঁদের আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও আলোচনা করছেন না, বরং দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁদের বিপরীতে অবস্থান করছেন। সাধারণ মুসলমানরাও তেমনি পূর্ববর্তীদের মত দীনের ক্ষেত্রে আহলে বাইতের বাইরের ব্যক্তিদের অনুসরণ করছেন এবং ভাবছেন না এটি রাসূল (সা.)- এর সুন্নাহর পরিপন্থী।

সুতরাং যদি কোরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিষয়টি পরিষ্কার হত তাহলে মুসলমানরা আহলে বাইতের ইমাম ও আলেমদের হতে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না ও অন্যদের তাঁদের স্থলাভিষিক্ত করতেন না। তাই বোঝা যায় কোরআন ও সুন্নাহ্ হতে তাঁরা যা বুঝেছেন তা হলো এ বিষয়গুলো আহলে বাইতের প্রশংসার জন্যই শুধু বলা হয়েছে। তাঁরা এ থেকে আহলে বাইতের প্রতি সম্মান ও ভালবাসার বিষয় ব্যতীত আর কিছুই অনুধাবন করেন নি। তাই পূর্ববর্তী সৎ কর্মশীল বান্দাগণ যে পথকে সঠিক বলে মনে করেছেন ও যে পথ সত্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী বলে মনে করেছেন আপনিও তাঁদের পথকে গ্রহণ করুন যেহেতু কোরআন ও হাদীসের গূঢ়ত সম্পর্কে তাঁরাই অধিক অবগত ছিলেন।

ওয়াসসালাম

স

আঠারতম পত্র

৪ জিলহ ১৩২৯ হিঃ

১। তাঁর সহৃদ্যতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

২। সার্বিকভাবে মুসলমানদের বিষয়ে তাঁর ভ্রান্ত ধারণা।

৩। উম্মতের নেতৃবৃন্দ ও শাসকরা আহলে বাইত হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন।

৪। আহলে বাইতের ইমামগণ যে কোন যুক্তিতেই অন্যদের হতে কম নন।

৫। কোন্ ন্যায়পরায়ণ বিচারালয় তাঁদের অনুসারীদের গোমরাহ ও বিচ্যুত বলতে পারে?

১। এ অক্ষমের প্রতি আপনার সুদৃষ্টির জন্য ধন্যবাদ। আপনি যেহেতু সুশীল মানুষ তাই অন্যের শুধু ভাল দিকগুলো দেখেন। আমি আপনার এ সহৃদ্যতা ও কোমল অনুভূতির প্রতি বিনীত এবং এ হৃদয়বানতার মধ্যে আপনার মহ র প্রমাণ পাচ্ছি।

২। কিন্তু আপনার প্রতি আমার আহবান সার্বিকভাবে মুসলমানদের আহলে বাইত হতে মুখ ফিরিয়ে রাখার বিষয়ে আপনার যে দৃষ্টিভঙ্গি তা পরিবর্তন করুন। কারণ মুসলমানদের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী শিয়া মতাবলম্বী এবং তাঁরা আহলে বাইত হতে মুখ ফিরিয়ে নেন নি। তাঁরা দীনের মৌল ও শাখাগত বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে আহলে বাইতের অনুসরণকে অপরিহার্য মনে করেন। সুতরাং তাঁরা সকল সময়েই, সকল অবস্থায়ই এর ওপর বিশ্বাসী ছিলেন ও একে আল্লাহর নির্দেশের নিকট আত্মসমর্পণ মনে করতেন। পূর্ববর্তী পুণ্যবান শিয়া ব্যক্তিবর্গ রাসূলের ইন্তেকালের সময় হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ বিশ্বাসের ওপর দৃঢ় ও মজবুত রয়েছেন এবং এ বিশ্বাসের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন।

৩। মুসলমানদের নেতা ও শাসকবর্গ আহলে বাইত হতে প্রথম মুখ ফিরিয়ে নেন এবং এ প্রবণতা রাসূলের ওফাতের পর খেলাফত নিয়ে শুরু হয়। কারণ তাঁরা খেলাফতকে নিজেদের অধিকার মনে করেছিলেন। যদিও কোরআন ও হাদীসের স্পষ্ট দলিল এক্ষেত্রে আলী ইবনে আবি তালিবকে

মনোনীত করেছিল। যেহেতু আরবরা একই পরিবারে নবুওয়াত ও খেলাফতকে সহ্য করতে পারে নি তাই সুস্পষ্ট প্রমাণকে বিকৃত ও ভুল ব্যাখ্যা করে তা উপেক্ষা করেছে। খেলাফতকে গোত্রসমূহের নেতাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপকরণ ও মাধ্যমে পরিণত করেছে। কখনো ক্ষমতা এখানে, কখনো ওখানে, কখনো বা দূরবর্তী কোন গোত্রের হাতে; এজন্য তারা তাদের সমগ্র শক্তিকে কাজে লাগায়, যারা এর বিরোধিতা করে তাদেরকে নির্মমভাবে দমন করা হয়। এ অবস্থায় বাধ্য হয়ে অধিকাংশ মুসলমান আহলে বাইত হতে দূরে সরে যায়। নেতৃস্থানীয়রা এ উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য কোরআন ও সুন্নাহর দলিল- প্রমাণগুলোকে (আহলে বাইতের অনুসরণ অপরিহার্য হবার পক্ষের দলিল) ভুল ব্যাখ্যা দান করলেন। যদি তাঁরা এ সকল প্রমাণ ও দলিলসমূহের প্রকৃত অর্থকে গ্রহণ করতেন, আহলে বাইতের দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন ও দীনের মৌল ও শাখাগত বিষয়ে সাধারণ মুসলমানদের ঐ দিকে পরিচালিত করতেন তাহলে এ পথ তাদের জন্যও রু   হত না আবার নিজেরাও আহলে বাইতের প্রতি আহবানকারী ও ৎ ষ্ঠ প্রচারক- এ (মুবাল্লিগ) পরিণত হতেন কিন্তু এটি তাঁদের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী ছিল। তাই সঠিক দূরদৃষ্টি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় তাঁরা দেন নি।

যদি কেউ সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে এ বিষয়টিকে লক্ষ্য করে তাহলে সে বুঝতে সক্ষম হবে যে, মাজহাব ও মাজহাবী বিষয়াদির ক্ষেত্রে আহলে বাইতের ইমামদের ইমামত হতে ফিরে আসার বিষয়টি রাসূল (সা.)- এর ওফাতের পর তাঁর আহলে বাইতের সর্বজনীন ইমামত (নেতৃত্ব), বেলায়েত ও খেলাফত হতে ফিরে আসার বিষয়েরই একটি শাখাগত ও গৌণ বিষয় মাত্র। তাই যেসব শারয়ী (ধর্মীয়) দলিল- প্রমাণ রাসূলের ওফাতের পর আহলে বাইতের সর্বজনীন ইমামত, হুকুমত (শাসন কর্তৃত্ব) ও খেলাফত নির্দেশক সেগুলোর ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদানের পরই যেসব শারয়ী দলিল ধর্মীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ নেতৃত্ব নির্দেশ করে সেগুলোরও ভিন্ন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যদি তা করা না হত তাহলে কেউ তাঁদের হতে মুখ ফিরিয়ে নিত না।

৪। কোরআন ও হাদীসে ইমামতের সপক্ষে আসা দলিলগুলো বাদ দিলেও আশা'আরী মতবাদের ইমাম ও আহলে সুন্নাহর অন্যান্য ইমামগণ হতে আহলে বাইতের ইমামগণ ইলম, আমল ও

তাকওয়ার ক্ষেত্রে কোন অংশেই কম কি? তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে যখন কোন স্বল্পতা নেই তখন কেন আমরা অন্যদের অনুসরণ করতে যাব? কিরূপে তাঁদের আনুগত্য অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে?

৫। কোন্ ন্যায়পরায়ণ বিচারালয় তাঁদের (আহলে বাইতের) অনুসারীদের গোমরাহ হবার হুকুম জারি করতে পারে? আহলে বাইতের বেলায়েতের রজ্জুধারীদের বিপথগামী বলতে পারে? আহলে সুন্নাহ্ এ বিষয়ে কিভাবে এরূপ হুকুম করতে পারে?

ওয়াসসালাম

শ

উনিশতম পত্র

৫ জিলহ   ১৩২৯ হিঃ

১। ন্যায়পরায়ণ বিচারালয় আহলে বাইতের অনুসারীদের বিপথগামী হবার হুকুম করে না।

২। তাঁদের মাজহাব ও মতের অনুসরণ এ মাজহাবের অনুসারীদের আনুগত্যের জিম্মাদারী (দায়িত্ব) হতে মুক্তি দেয়।

৩। কারো কারো মতে অনুসরণের জন্য তাঁরা অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী।

৪। খেলাফতের বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের দলিল আহবান।

১। ন্যায়পরায়ণ আদালত আহলে বাইতের বেলায়েতকে ধারণকারী ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসারীদের বিপথগামী হবার হুকুম করে না। আহলে বাইতের ইমামগণের মধ্যে এমন কোন ঘাটতি নেই যার কারণে অন্য মাজহাবের ইমামগণের অনুসরণ করতে হবে।

২। নিঃসন্দেহে এ মাজহাবের অনুসারীদের জন্য আহলে বাইতের ইমামগণের অনুসরণের বিষয়টি তাঁদের আনুগত্যের দায়িত্ব হতে মুক্তি দেয় এবং অন্য চার মাজহাবের ইমামগণের অনুসরণের মত এটিও জায়েয।

৩। কখনো কখনো বলা হয় যে, আপনাদের বার ইমামের অনুসরণ আহলে সুন্নাহর চার ইমামের অনুসরণ অপেক্ষা ৻ য়তর কারণ এই বার জন একটি মাত্র মাজহাবের অধিকারী এবং একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় একক মৌল ভিত্তিতে এ মাজহাবকে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অপর পক্ষে আমাদের চার ইমাম ফিকাহগত বিষয়ে পরস্পর বিপরীতে অবস্থান করছেন। ফিকাহর বিভিন্ন অধ্যায়ে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য এত অধিক যে, তা বলে শেষ করার মত নয়, তদুপরি একজন ব্যক্তির গবেষণা ও কর্মপ্রচেষ্টা কখনোই বার জনের সমান নয়। এটি যে কোন ন্যায়বান লোকের নিকট সত্য বলে প্রতিভাত এবং এখানে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

এটি অবশ্য ঠিক যে, কখনো কখনো নাসেবীরা আহলে বাইত হতে আপনার মাজহাবের উৎপত্তি এ বিষয়টিতে সন্দেহ সৃষ্টি করে। আমি পরবর্তীতে এর সপক্ষে দলিল পেশ করবো।

৪। এখন আপনার নিকট আমার আহবান কোরআন ও হাদীসের প্রামাণ্য দলিলসমূহকে যা হযরত আলী (রা.)- এর খেলাফতের পক্ষে যুক্তিপূর্ণ বলে আপনার মনে হয় তা আমার জন্য উপস্থাপন করুন। আহলে সুন্নাহর সহীহ ও সুস্পষ্ট সনদে তা আসতে হবে।

ওয়াসসালাম

স

দ্বিতীয় আলোচনা

সর্বজনীন নেতৃত্ব

নবী (সা.)- এর খেলাফত

বিশতম পত্র

৯ জিলহজ্ব ১৩২৯ হিঃ

১। কোরআন ও সুন্নাহর দলিলসমূহের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত।

২। কোরআনের আয়াত 'নিকটাত্মীয়দের ভীতি প্রদর্শন কর'।

৩। আহলে সুন্নাহর হাদীসবিদ ও গ্রন্থকারগণের এ আয়াত সম্পর্কে বক্তব্য।

১। যিনি মহানবী (সা.)- এর জীবনেতিহাস অধ্যয়ন ও আল্লাহ্ প্রবর্তিত বিধি- বিধান, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও তার শরীয়তসম্মত নিয়মবিধি প্রণয়ণ ও ভিত্তি প্রস্তুতের প তি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেছেন তিনি বুঝতে পারবেন, হযরত আলী (আ.)- ই বিভিন্ন বিষয়ে রাসূলের পরামর্শদাতা, শত্রুর বিরু তাঁর সহযোগী, তাঁর জ্ঞানের পাত্র, তাঁর নির্দেশের উত্তরাধিকারী ও খেলাফতের ক্ষেত্রে তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি ছিলেন। যদি কোন ব্যক্তি রাসূলের নবুওয়াতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে (যু , শান্তি, সফর, হিজরত ও অন্যান্য) তাঁর কথা ও জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য সূত্র ও বর্ণনাগুলো লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন তিনি তাঁর প্রচার কার্যক্রম শুরুর সময় হতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এটিকে স্পষ্ট করেছেন।

২। যখন ইসলাম মক্কায় কোন প্রভাবই রাখত না তখন মহান আল্লাহ্ কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি নাযিল করে রাসূলকে নির্দেশ দেন و أنذر عشيرتك الأقربين অর্থাৎ নিজের নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন কর। অতঃপর রাসূল (সা.) তাদের আবু তালিবের ঘরে সমবেত করেন, তাদের সংখ্যা সেদিন ৪০ জন ছিল। তাঁদের মধ্যে আবু তালিব, আবু লাহাব, হামযাহ্, ও আব্বাস ছিলেন।

এ হাদীসের শেষে নবী (সা.) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা! আমি আল্লাহর শপথ করে বলতে পারি আমি আরবদের মধ্যে এমন কোন যুবকের সন্ধান জানি না যে

তার গোত্র ও সম্প্রদায়ের জন্য এরূপ উত্তম কোন বস্তু এনেছে যা আমি এনেছি, যার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ রয়েছে। আমি তোমাদের সেদিকে দাওয়াত করছি।

فأيّكم يوازرني على أمري هذا على أن يكون أخي و وصيّي و خليفتي فيكم؟

তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আমাকে এক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে ও আমার পৃষ্ঠপোষক হবে, সে আমার ভাই, খলীফা, প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত হবে।"

আলী (আ.) ব্যতীত সেদিন সকলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। যদিও তখন তাঁর বয়স কম ছিল তবু তিনি দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, أنا يا نبيّ الله أكون وزيرك "হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার সহযোগী হব।" তখন নবী (সা.) তাঁর হাত আলী (আ.)- এর কাঁধে রেখে বলেছিলেন,

إنّ هذا أخي و وصيّي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و أطيعوه "নিশ্চয়ই সে তোমাদের মধ্যে আমার ভাই, স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি (খলীফা) অতএব, তার কথা বণ কর ও আনুগত্য কর।

তারা একথা শুনে হাসতে হাসতে আবু তালিবকে বলল, "তোমাকে বলা হলো তোমার সন্তানের কথা বণ কর ও তার আনুগত্য কর।"

৩। প্রচুর সংখ্যক হাদীসের হাফেজ এই হাদীসটি এভাবেই বর্ণনা করেছেন যেমন ইবনে ইসহাক, ইবনে জারির, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে মারদুইয়া, আবু নাঈম ও বায়হাকী তাঁদের সুনান গ্রন্থে এবং সা'লাবী ও তাবারী তাঁদের 'তাফসীরে কাবীর' গ্রন্থে সূরা শুআরার তাফসীরে, তাছাড়া তাবারী তাঁর 'তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে, ইবনে আসির তাঁর 'কামিল'[২২২] গ্রন্থের ২য় খণ্ডে এ হাদীসটি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। যে স্থানে রাসূল (সা.)-কে আল্লাহ্ তাঁর দাওয়াতকে প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন সে ঘটনা বর্ণনায় এটি নকল করা হয়েছে। আবুল ফিদা তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের[২২৩] ১ম খণ্ডে 'প্রথম মুসলমান কে' এ আলোচনায় এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু জা'ফর আসকাফী মু'তাযিলী তাঁর 'নাকজুল উসমানিয়া'[২২৪] গ্রন্থে এ হাদীসকে বিশু বলে স্বীকার করেছেন। হালাবী তাঁর সীরাত গ্রন্থে আরকামের ঘরে নবী (সা.) ও সাহাবীদের গোপন সভা সম্পর্কিত আলোচনায় এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[২২৫] একই অর্থে

এবং সদৃশ শব্দের ব্যবহারে এ হাদীসটি অনেক প্রসি গ্রন্থকার ও রাবী বর্ণনা করেছেন, যেমন তাহাভী, জিয়া মুকাদ্দাসী তাঁর ‘আল মুখতারাহ্’, সাঈদ ইবনে মানসুর তাঁর সুনানে। এটি জানার জন্য আহমাদ ইবনে হাম্বলের ‘মুসনাদ’ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠা দেখতে পারেন। তাছাড়া ঐ গ্রন্থেরই ১ম খণ্ডের ৩৩১ পৃষ্ঠায় ইবনে আব্বাস হতে একটি মূল্যবান হাদীস এনেছেন যাকে এ হাদীসের সারাংশ বলা যেতে পারে। এ হাদীসটিতে ইবনে আব্বাস অন্যদের ওপর আলী (আ.)-এর দশটি ৫ ষ্ঠত্বের কথা বলেছেন।

এ মূল্যবান হাদীসটি নাসায়ী তাঁর ‘খাসায়েসুল আলাভিয়া’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ও হাকিম নিশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৩২ পৃষ্ঠায় ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ‘কানযুল উম্মাল’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে এই হাদীস বিস্তারিতভাবে এসেছে।[২২৬] মুসনাদে আহমাদের পাদটিকায় ‘মুনতাখাব কানযুল উম্মাল’ রয়েছে, তাতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ৫ম খণ্ডের ৪১ পৃষ্ঠা হতে ৪৩ পৃষ্ঠার পাদটিকায় তা দেখতে পারেন। যাহাবীও তাঁর ‘তালখিস’ গ্রন্থে হাদীসটির বিশু তার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

ওয়াসসালাম

শ

একুশতম পত্র

১০ জিলহ   ১৩২৯ হিঃ

হাদীসটির সনদের বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপন।

আপনার শত্রু ও বিরোধীরা এ হাদীসটি সঠিক নয় বলেন ও এটি অস্বীকারের জন্য কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন। হাদীসটি যে নির্ভরযোগ্য নয় তার প্রমাণ হলো বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেন নি। সিহাহ সিত্তাহর অন্যান্য গ্রন্থকারও তা নকল করেন নি। আমার মনে হয় না আহলে সুন্নাহর কোন বিশ্বস্ত রাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আপনিও এই সনদে হাদীসটি সহীহ মনে করেন না বলে আমার বিশ্বাস।

ওয়াসসালাম

স

বাইশতম পত্র

১২ জিলহজ   ১৩২৯ হিঃ

১। এ হাদীসের সনদের বিশু তা।

২। কেন তাঁরা তা গ্রহণ হতে বিরত ছিলেন?

৩। যাঁরা তাঁদের পরিচয় জানেন তাঁরা তাঁদের বিরত থাকাকে অসম্ভব মনে করেন না।

১। যদি আমি আহলে সুন্নাহর সূত্রে হাদীসটি নির্ভরযোগ্য না জানতাম তাহলে তা এখানে উল্লেখ করতাম না। তদুপরি ইবনে জারীর ও ইমাম আবু জা'ফর আসকাফী হাদীসটি শতভাগ বিশু বলেছেন।[২২৭] হাদীস বিশারদদের অনেকেই তা সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীসটির বিশু তা আপনার নিকট প্রমাণ করার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, আহলে সুন্নাহর সেই সকল বিশ্বস্ত রাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যাঁদের ওপর সিহাহ সিত্তাহর গ্রন্থকারগণ কোন উৎক । ছাড়াই নির্ভর করেন ও তাঁদের হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেন। আপনি মুসনাদে আহমাদের ১ম খণ্ডের ১১১ পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করুন যেখানে আসওয়াদ ইবনে আমের[২২৮] শারিক[২২৯] হতে, তিনি আ'মাশ[২৩০] হতে, তিনি মিনহাল[২৩১] হতে, তিনি ইবাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আমাদী[২৩২] হতে অবিচ্ছিন্ন সনদে হযরত আলী (আ.) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই সনদের সিলসিলার সকল রাবীই প্রামাণ্য ও সিহাহ সিত্তাহর রিজালদের অন্তর্ভুক্ত। কাইসারানী তাঁর 'জাম বাইনা সহিহাইন' গ্রন্থে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। সুতরাং হাদীসটির বিশু তার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। তদুপরি অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যা এটিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

২। কিন্তু মুসলিম ও বুখারীর মত যাঁরা হাদীসটি বর্ণনা করেন নি এ উদ্দেশ্যে যে, এটি খেলাফতের বিষয়ে তাঁদের আকীদার পরিপন্থী এবং এ কারণেই অনেক হাদীসই তাঁদের নিকট গ্রহণীয় হয় নি। তাঁরা ভীত ছিলেন যদি তা বর্ণনা করেন তাহলে তা শিয়াদের হাতের অস্ত্রে পরিণত হবে, তাই

সেগুলো গোপন করেছেন। আহলে সুন্নাহর অনেক আলেমই এ পথ অবলম্বন করেছেন ও এরূপ সকল হাদীস গোপন করেছেন। হাদীস গোপন করার বিষয়ে তাঁদের মধ্যে প্রসি অনেকেই ছিলেন। ইবনে হাজার তাঁর 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন এবং বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 'ইলম' অধ্যায়ে باب من خص بالعلم قوما دون قوم নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছেন।[২৩৩]

৩। আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) ও আহলে বাইতের অন্যান্য ইমামগণের সুন্দর বাণীসমূহের প্রতি বুখারীর কলম স্থবির এবং তাঁদের ে ষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব বর্ণনায় তাঁর কলমের কালি শুষ্ক, তাই তাঁর এ সকল হাদীস বর্ণনা হতে বিরত থাকার বিষয়টি আশ্চর্যের কিছু নয়।

ولا حول و لا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم

ওয়াসসালাম

শ

তেইশতম পত্র

১৪ জিলহজ ১৩২৯ হিঃ

১। হাদীসটির অস্তিত্বের বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন।

২। যদি হাদীসটি মুতাওয়াতির না হয়ে থাকে তবে তা প্রমাণ ও দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩। এই হাদীস বিশেষ প্রতিনিধিত্বের কথা বলে, সর্বজনীন প্রতিনিধিত্ব নয়।

৪। এই হাদীস 'মানসুখ' (রহিত) হয়ে গেছে।

১। মুসনাদে আহমাদের ১ম খণ্ডের ১১১ পৃষ্ঠায় হাদীসটি পেয়েছি এবং এর সনদের সকল রাবী বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য বলে গৃহীত। এছাড়া অন্যান্য সূত্রগুলোও এর পরিপূরক ও একে দৃঢ়তা দেয় এবং হাদীসটি রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত বলে আমার বিশ্বাস হয়েছে।

২। কিন্তু আপনি ইমামতের বিষয়টি প্রমাণ করতে চাইলে এমন হাদীস বর্ণনা করতে হবে যা একাধারে সহীহ ও মুতাওয়াতির (বহুল বর্ণিত) হবে কিন্তু এ হাদীসটি তাওয়াতুরের (বহুল বর্ণিত) পর্যায়ে পৌঁছে নি বলে আমার মনে হয়। যেহেতু ইমামতের বিষয়টি আপনাদের দৃষ্টিতে দীনের মৌল বিষয়ের (উসূলে দীন) অন্তর্গত তাই এ হাদীসটি প্রামাণ্য নয়।

৩। কেউ কেউ বলেন এ হাদীসটি এটিই প্রমাণ করে যে, রাসূল (সা.)- এর আহলে বাইতের মধ্যে আলী (আ.)- ই একজন যিনি খলীফা হবেন (অর্থাৎ আহলে বাইতের জন্য একটি খেলাফত নির্দিষ্ট, তা আলী [রা.]- এর)। তাই এ হাদীস আহলে সুন্নাহর আকীদার পরিপন্থী নয়।

৪। আবার অনেকেই বলেছেন এ হাদীস মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে কারণ রাসূল (সা.) তাঁর মূল বিষয় হতে ফিরে এসেছেন। তাই প্রথম তিন খলীফার হাতে বাইয়াত গ্রহণে সাহাবীদের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন) কোন প্রতিবন্ধকতাই ছিল না।

ওয়াসসালাম

স

চব্বিশতম পত্র

১৫ জিলহজ ১৩২৯ হিঃ

১। আমাদের এ হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করার কারণ।

২। বিশেষ খেলাফতের বিষয়টি ‘ইজমা’র ভিত্তিতে বাতিল হয়ে যায়।

৩। ‘নাসখ’ বা রহিত হবার বিষয়টি এখানে অসম্ভব।

১। আহলে সুন্নাহ্ খেলাফত ও নেতৃত্বের বিষয়টি মুতাওয়াতির হোক বা না হোক যে কোন সহীহ হাদীস হতেই প্রমাণ উপস্থাপন করেন। আমরাও তাঁদের মোকাবিলায় এরূপ করি। যেহেতু তাঁদের বর্ণনামতেও এ হাদীসটি সহীহ সেহেতু হাদীসটি মানতে তাঁদের বাধ্য করাটা আমরা প্রয়োজন মনে করি। কিন্তু আমাদের মধ্যে ইমামতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুতাওয়াতির হওয়া অপরিহার্য ও আমাদের বর্ণিত সূত্র এক্ষেত্রে তাওয়াতুরের পর্যায়ে রয়েছে।

২। কিন্তু এ হাদীস আহলে বাইতের মধ্যে হযরত আলী (আ.)- এর বিশেষ খেলাফতকে উল্লেখ করছে এ কথাটি সুন্নী ও শিয়া সবার নিকট অগ্রহণযোগ্য। কারণ যে কেউ আহলে বাইতের মধ্যে আলী (আ.)- কে রাসূলের স্থলাভিষিক্ত মনে করে, সে বিশ্বাস করে আলী (আ.) সকল মুসলমানের ওপর রাসূলের খলীফা। যে কেউ এক্ষেত্রে আলীর সর্বজনীন নেতৃত্বকে না মানে সে তাঁর বিশেষ খেলাফতকেও অস্বীকার করে। তাই এ ব্যাখ্যা মুসলমানদের নিকট অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং এ বিষয়ে মুসলমানদের ‘ইজমা’র বিষয়টি কিরূপে উত্থাপিত হতে পারে?

৩। ‘নাসখের’ বিষয়টি এখানে বু ি বৃত্তিক ও শরীয়তগতভাবে অসম্ভব তা নিশ্চয়ই ভুলে যান নি। কারণ নাসখ তখনই হয় যখন ঐ পূর্বের হাদীসের ওপর আমলের উপযোগিতা না থাকে। তদুপরি এ হাদীসের নাসখ বা রহিতকারী কোন হাদীসের অস্তিত্ব নেই যাতে প্রমাণিত হয় রাসূল এ হাদীস হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন, বরং রাসূল এ হাদীসটিকে সত্যায়ন ও দৃঢ় করার জন্য একের পর এক সমার্থক হাদীস মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণনা করেছেন যা নাসখের বিষয়টিকে বাতিল বলে প্রতিপন্ন

করে, এমন কি যদি অন্যান্য সমর্থনকারী হাদীসের অস্তিত্ব নাও থাকত তদুপরি নাসখ আমরা কোথা থেকে প্রমাণ করতাম? আপনি কোথা হতে এ দাবী করছেন, নবী (সা.) এ হাদীস হতে ফিরে এসেছেন? যাঁরা এরূপ বলেন তাঁদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ বলেছেন, "তারা কেবল অনুমান ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। অথচ তাদের নিকট তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথনির্দেশক এসেছে।" (সূরা নাজম : ২৩)

ওয়াসসালাম

শ

পঁচিশতম পত্র

১৬ জিলহজ ১৩২৯ হিঃ

১। এ হাদীসের প্রতি তাঁর বিশ্বাস।

২। এ বিষয়ে আরো আলোচনার আহবান।

১। সেই শক্তির প্রতি ঈমান আনছি যিনি আপনার জ্ঞানের আলোয় আমার অন্ধকারকে দূরীভূত করে আলোকিত করেছেন ও আমার অস্পষ্টতাকে দূর করেছেন। সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আপনাকে তাঁর নিদর্শন ও চিহ্নে পরিণত করেছেন।

২। এ বিষয়ে আরো প্রামাণ্য হাদীস উপস্থাপন করুন।

ওয়াসসালাম

স

ছাব্বিশতম পত্র

১৭ জিলহজ ১৩২৯ হিঃ

১। হযরত আলী (আ.)- এর ৫ ষ্ঠত্বের বিষয়ে দশটি ফজীলত বর্ণিত হয়েছে যা অন্য কারো মধ্যে ছিল না।

২। কেন আমরা এ হাদীস হতে দলিল পেশ করেছি?

১। হাদীসে ‘দার’ (যে হাদীসটি বিংশতম পত্রে উল্লেখ করেছি) ছাড়াও আরেকটি হাদীস এখানে বর্ণনা করছি আপনার অবগতির জন্য।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে, ইমাম নাসায়ী তাঁর ‘খাছায়েসুল আলাভীয়া’তে, হাকিম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে, যাহাবী তাঁর ‘তালখিস’ গ্রন্থে (হাদীসটির বিশু তাকে স্বীকার করে) ও সুনান লেখকগণ তাঁদের সুনানে আমর ইবনে মাইমুন হতে এ হাদীসটি এনেছেন এবং এর বিশু তার বিষয়ে একমত হয়েছেন। আমর বলেন, “ইবনে আব্বাসের নিকট বসেছিলাম, নয় দল লোক তাঁর নিকট এসে বলল : আমাদের সঙ্গে আসুন নতুবা আপনার নিকট হতে সবাইকে চলে যেতে বলুন। আপনার সঙ্গে আমাদের কথা আছে। ইবনে আব্বাস বললেন : তোমাদের সঙ্গে যাব।” আমর ইবনে মাইমুন বলেন, “ইবনে আব্বাস তখনও অন্ধ হন নি, তাঁর চোখ ভাল ছিল। ইবনে আব্বাস তাদের সঙ্গে একদিকে চলে গেলেন। তাঁরা কি কথা বললেন তা আমরা শুনি নি। কিছুক্ষণ পর ইবনে আব্বাস তাঁর পরিধেয় বস্ত্রটি ঝাড়তে ঝাড়তে ফিরে এলেন ও বলতে লাগলেন : এমন ব্যক্তির তারা নিন্দা করছে যার দশটি ফজীলত রয়েছে যা কোন ব্যক্তির মধ্যেই নেই। তারা এমন ব্যক্তির নিন্দা করছে যার সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল (সা.) বলেছেন : এমন ব্যক্তিকে আমি আজ যু প্রেরণ করবো যাকে আল্লাহ্ কোনদিনই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন না, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাকে ভালবাসে আর সেও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। যখন রাসূল এ মর্যাদার কথা বলছিলেন তখন সকলেই ঘাড় টান করে অপেক্ষা

করছিল এ সৌভাগ্য তার ভাগ্যে জুটুক। তখন রাসূল (সা.) বললেন : আলী কোথায়? আলী আসলেন, তাঁর তখন চক্ষু পীড়া ছিল, তিনি কিছু দেখতে পারছিলেন না। রাসূল নিজ জিহ্বার পানি তাঁর চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং তিনবার যু র পতাকাটি এদিক- ওদিক নাড়িয়ে আলীর হাতে দিলেন। আলী তা নিয়ে খায়বারে গেলেন ও যু   জয়ী হয়ে ইহুদী গোত্রপতি হুয়াইয়ের কন্যা সাফিয়াসহ অন্যান্যদের বন্দী করে রাসূল (সা.)- এর নিকট উপস্থিত হলেন।

ইবনে আব্বাস বলেন : নবী (সা.) অমুককে (হযরত আবু বকর) মক্কাবাসীদের জন্য সূরা তওবা পাঠ করে শুনানোর জন্য প্রেরণ করলেন এবং তারপর আলীকে তাঁর নিকট হতে তা গ্রহণ করতে বললেন ও ঘোষণা করলেন : এমন ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে যে আমা হতে এবং আমি তার হতে।

ইবনে আব্বাস বলেন : নবী (সা.) তাঁর সকল চাচা ও চাচার পুত্রদের প্রতি আহবান জানালেন দুনিয়া আখেরাতে তাঁর সহযোগী হতে কিন্তু তারা তা করতে সম্মত না হলে আলী দাঁড়িয়ে বললেন: আমি দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার সহযোগী হব। রাসূল (সা.) বললেন : তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার বন্ধু, আমার সহযোগী। অতঃপর পুনরায় তাদের প্রতি এ আহবান জানালেন। তবুও তারা কেউ সম্মত হলো না, শুধু আলী দাঁড়িয়ে সাড়া দিলেন। আর রাসূল বললেন : তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার সহযোগী ও বন্ধু।

ইবনে আব্বাস বলেন : আলী হযরত খাদিজাহর পর রাসূলের ওপর ঈমান আনয়নকারী প্রথম ব্যক্তি।

তিনি আরো বলেন : রাসূল (সা.) নিজ চাদরকে আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইনের ওপর বিছিয়ে দিলেন ও বললেন : হে আহলে বাইত! আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছেন তোমাদের হতে সকল পাপ- পঙ্কিলতা দূর করতে ও তোমাদের পবিত্র করতে।[২৩৪]

ইবনে আব্বাস বলেন : আলী নিজের জীবনকে বিপন্ন করে রাসূল (সা.)- এর ঘুমানোর স্থানে তাঁর পোষাক পড়ে শুয়েছিলেন, রাসূলের জন্য তাঁর জীবনকে আল্লাহর নিকট বিক্রয় করেছিলেন, তখন কাফেররা তাঁর প্রতি পাথর বর্ষণ করছিল।

তিনি বলেন : নবী তাবুকের যু র জন্য যাত্রা করলেন, মদীনায় লোকেরাও তাঁর সঙ্গে মদীনা হতে বের হলো। আলী তাঁকে বললেন : আমিও আপনার সঙ্গে যাব। রাসূল (সা.) বললেন : না। আলী কেঁদে ফেললেন। নবী তাঁকে বললেন : তুমি কি এতে খুশী নও, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কে হারুন ও মূসার মধ্যকার সম্পর্কের মত হোক? তবে পার্থক্য এই, আমার পর কোন নবী নেই। এটি ঠিক হবে না যে, আমি চলে যাব অথচ তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হবে না।

নবী (সা.) তাঁকে (আলীকে) বলেছেন : أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي و مؤمنة অর্থাৎ তুমি আমার পর সকল মুমিন পুরুষ ও নারীর অভিভাবক।

ইবনে আব্বাস আরো বলেন : নবী মসজিদের মধ্যে অতিক্রমকারী সকল দ্বার বন্ধ করে দেন শুধু আলীর দ্বার ব্যতীত। আলী অপবিত্র (জুনুব) অবস্থায়ও মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং ঐ দ্বার ব্যতীত বাইরে যাবার অন্য কোন পথও ছিল না। নবী (সা.) বলেছেন : আমি যার মাওলা (অভিভাবক) আলীও তার মাওলা।

উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করে হাকিম বলেছেন, “এ হাদীস সনদের দিক থেকে সঠিক, তদুপরি বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেন নি।” ত প যাহাবীও তাঁর ‘তালখিস’ গ্রন্থে হাদীসটিকে বিশু   বলেছেন।

২। এ হাদীসের মধ্যে যে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে তা কারো নিকট গোপন নেই। এ হাদীস এটিই প্রমাণ করে যে, হযরত আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত।

আপনি কি এখানে লক্ষ্য করেছেন রাসূল (সা.) কিরূপে আলী (আ.)- কে দুনিয়া ও আখেরাতের মাওলা বা অভিভাবক হিসেবে অভিহিত করে তাঁকে তাঁর অন্যান্য আত্মীয়- স্বজনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি তাঁদের সম্পর্ককে হারুন ও মূসার মত বলেছেন শুধু এ পার্থক্য ব্যতীত যে, তাঁর পর কেউ নবী নেই অর্থাৎ নবুওয়াতের মর্যাদা ব্যতীত রাসূল (সা.)- এর অন্য সকল মর্যাদা আলী (আ.)- এরও রয়েছে।

আপনি সম্যক জ্ঞাত, হযরত হারুন ও মূসা (আ.)- এর মধ্যে সম্পর্কের ধরন কিরূপ ছিল। হযরত হারুন (আ.) মূসা (আ.)- এর সঙ্গে নবুওয়াতের ক্ষেত্রে অংশীদার ছিলেন। তাছাড়া তিনি তাঁর

সহযোগী, পরামর্শদাতা, খলীফা ও প্রতিনিধিও ছিলেন। তাই হযরত মূসা (আ.)- এর মত হযরত হারুনের অনুসরণ সকল উম্মতের জন্য অপরিহার্য বা ওয়াজিব ছিল। এজন্যই হযরত মূসা (আ.) দোয়া করেছিলেন, "আমার আহল (পরিবার) হতে একজনকে আমার সহযোগী কর, আমার ভাই হারুনকে ও তার মাধ্যমে আমার কোমরকে মজবুত কর ও তাকে আমার কাজের অংশীদার কর।" (সূরা ত্বাহা : ২৯)

হযরত মূসা (আ.) হারুনকে বললেন, "আমার জাতির মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত হও। তাদেরকে সংশোধন কর ও অন্যায়কারীদের পথ অবলম্বন কর না।"[২৩৫] আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ.)- কে বললেন, "তুমি আমার নিকট যা চেয়েছিলে তা তোমাকে দেয়া হলো।"[২৩৬]

সুতরাং এ হাদীস অনুযায়ী আলী (আ.) এ জাতির মধ্যে রাসূল (সা.)- এর খলীফা, তাঁর পরিবারের মধ্যে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও তাঁর কাজে (খেলাফতের বিষয়ে, নবুওয়াতের বিষয়ে নয়) অংশীদার। তাই আলী (আ.) রাসূলের উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তাঁর আনুগত্য সর্বাবস্থায় হযরত হারুনের মত যাঁর আনুগত্য মূসা (আ.)- এর উম্মতের ওপর অপরিহার্য ছিল। বিষয়টি দিবালোকের মত স্পষ্ট।

যে কেউ এ হাদীসটি ('মানযিলাত'- এর হাদীস) বণ করবে আলী সম্পর্কে এসব মর্যাদা তার স্মরণে আসবে এবং এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। নবীও তাই এ বিষয়টি সকলের জন্য সুস্পষ্ট করে বলেছেন, "এটি ঠিক হবে না, তোমাকে আমার স্থলভিষিক্ত না করেই আমি চলে যাব।"

এটি আলী (আ.)- এর খেলাফতের পক্ষে স্পষ্ট দলিল যে, আলীকে নিজের খলীফা মনোনীত না করে যাওয়াকে রাসূল (সা.) সঠিক মনে করেন নি। রাসূল (সা.) তাঁর এ কাজটি আল্লাহর নির্দেশেই করেছিলেন, যেমনটি নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরে এসেছে-

(يا أَيُّهَا الرَّسُوْل بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّك وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)

হে নবী! যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দিন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে তাঁর রেসালতের কিছুই আপনি পৌঁছান নি।[২৩৭]

যদি কেউ এ আয়াতের ‘আপনি তাঁর রেসালতের কিছুই পৌঁছান নি’ অংশটি লক্ষ্য করেন এবং এর সঙ্গে রাসূলের এ কথাটি ‘নিশ্চয়ই এটি সঠিক হবে না, তোমাকে খলীফা নিযুক্ত না করেই চলে যাব’ মিলিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন দু’টি বাণীই একটি লক্ষ্যকে অনুসরণ করছে।

আমাদের রাসূল (সা.)- এর এ বাণীটি কখনোই ভুলে গেলে চলবে না, “তুমি আমার পর সকল মুমিনদের অভিভাবক।” এটি অকাট্য দলিল হিসেবে হাদীসে এসেছে যে, আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর স্থলাভিষিক্ত। প্রসি কবি কুমাইত (আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করুন) যেমনটি বলেছেন-

কত সুন্দর অভিভাবক তিনি সেই ে ষ্ঠ অভিভাবকের পর, যিনি তাকওয়ার কেন্দ্র ও আদবের শিক্ষকের পর মনোনীত হয়েছেন।

ওয়াসসালাম

শ

সাতাশতম পত্র

১৮ জিলহজ ১৩২৯ হিঃ

'মানযিলাত'- এর হাদীসের বিষয়ে সন্দেহ।

'মানযিলাত'- এর হাদীসটি সহীহ ও মুস্তাফিয (খবরে ওয়াহেদের চেয়ে বহুল প্রচারিত) কিন্তু বিশিষ্ট হাদীসবিদ আমেদী এ হাদীসের সনদের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। তাই আপনাদের অনেক শত্রুরই দ্বিধান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। আপনি কিরূপে তাদের নিকট এটি প্রমাণ করবেন। উত্তর জানিয়ে বাধিত করুন।

ওয়াসসালাম

স

আটাশতম পত্র

১৯ জিলহজ ১৩২৯ হিঃ

১। ‘মানযিলাত’- এর হাদীস প্রসি হাদীসসমূহের অন্যতম।

২। এ সত্যের সপক্ষে প্রমাণ।

৩। আহলে সুন্নাহর যে সকল রাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪। এ হাদীসটির বিষয়ে আমেদীর সন্দেহ পোষণের কারণ।

১। আমেদী এ সন্দেহের মাধ্যমে নিজের ওপরই জুলুম করেছেন। কারণ ‘মানযিলাত’- এর হাদীসটি সবচেয়ে বিশু ও প্রসি হাদীসসমূহের একটি।

২। এ হাদীসের সনদের বিশু তার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হাদীসটি সম্পর্কে দ্বে র কোন অবকাশ নেই এবং এর প্রামাণিকতার বিষয়ে কেউ প্রশ্ন উঠাতে পারেন না, এমন কি যাহাবী অত্যন্ত কঠোরতা স ও ‘মুসতাদরাক’ গ্রন্থের সারসংক্ষেপে হাদীসটির সহীহ হবার কথা স্বীকার করেছেন।[৩৩৮] ইবনে হাজার হাইসামী বিভিন্ন বিষয়ে আক্রমণাত্মক ভূমিকা স ও তাঁর ‘সাওয়ায়েক’ গ্রন্থের দ্বাদশ পর্বে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন ও এর বিশু তার বিষয়টি প্রসি হাদীস বিশারদদের (এ বিষয়ে যাঁদের প্রতি রুজু করা উচিত) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৩৩৯] আপনি এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করুন। যদি হাদীসটি এতটা প্রমাণ্য না হত তাহলে বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে তা উল্লেখ করতেন না। কারণ বুখারী হযরত আলীর বৈশিষ্ট্য, ফজীলত ও মর্যাদা বর্ণনায় যথেষ্ট সতর্ক ও পারতঃপক্ষে বিরত থাকতেন ও এ বিষয়ে তিনি নিজের ওপর জুলুম করেছেন। মুয়াবিয়া যিনি আলীর বিরু যু কারী ও সব সময় তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করতেন, এমন কি মিম্বারে আলীর ওপর লানত পড়ার জন্য নির্দেশ জারী করেছিলেন তদুপরি তিনি ‘মানযিলাত’- এর হাদীসটি অস্বীকার করেন নি। মুসলিমের[৩৪০] সূত্রে উ ৃত হয়েছে : একবার মুয়াবিয়া সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে বললেন : কি কারণে আবু তোরাবের (আলী [আ.]- এর) নিন্দা কর না?

সা’দ জবাবে বললেন : মহানবী (সা.) তাঁর বিষয়ে তিনটি কথা বলেছেন সেগুলো মনে হওয়ায় এ কাজ হতে আমি বিরত হলাম। ঐ তিনটি বৈশিষ্ট্যের যদি একটিও আমার থাকত তাহলে আরবের ে ষ্ঠ সম্পদ হতেও তা আমার নিকট প্রিয়তর বলে গণ্য হত। নবী (সা.) কোন কোন যুে র সময় তাঁকে মদীনায় রেখে যেতেন ও বলতেন : তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক মূসা ও হারুনের মত হোক তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও? শুধু পার্থক্য এটিই আমার পর তুমি নবী নও।[২৪১] মুয়াবিয়া একথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন ও সা’দকে আলীর প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা হতে বিরত থাকার অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন।

আরো বাড়িয়ে বললে বলা যায় স্বয়ং মুয়াবিয়া ‘মানযিলাত’- এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার তাঁর ‘সাওয়ায়েক’[২৪২] গ্রন্থে বলেছেন, “আহমাদ বর্ণনা করেছেন : এক ব্যক্তি কোন একটি বিষয়ে মুয়াবিয়াকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : আলী এ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞাত, তাকে প্রশ্ন কর। লোকটি বলল : আলী অপেক্ষা তোমার উত্তর আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। মুয়াবিয়া বললেন : মন্দ কথা বলেছ, এমন ব্যক্তি হতে তুমি বীত যাঁকে রাসূল (সা.) জ্ঞানের ক্ষেত্রে উ ল মুখ মনে করতেন ও তাঁকে বলেছেন :

أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِن مُوْسى إِلّا أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي

তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক মূসা ও হারুনের মত, শুধু এ পার্থক্য ব্যতীত যে, আমার পর কোন নবী নেই।”

যখনই হযরত উমরের জন্য কোন সমস্যা দেখা দিত, তিনি আলী (আ.)- কে ডাকতেন।

সুতরাং ‘মানযিলাত’- এর হাদীসটি এমন একটি বিষয় যাতে মুসলমানদের সকল মাজহাব ও দল ঐকমত্য পোষণ করে, হাদীসটির বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

৩। ‘আল জাম বাইনাস্ সিহাহ আস সিত্তাহ্’[২৪৩] ও ‘আল জাম বাইনাস্ সহীহাইন’[২২৪] গ্রন্থের লেখকদ্বয়ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারীতে তাবুকের যুে র[২৪৫] বর্ণনায় হাদীসটি রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে[২৪৬] 'হযরত আলীর ফাজায়েল' অধ্যায়ে হাদীসটি এসেছে। এছাড়া সুনানে ইবনে মাজাহেতে[২৪৭] নবী (সা.)- এর 'সাহাবীদের ফাজায়েল' অধ্যায়ে ও 'মুসতাদরাকে হাকিম'- এ 'হযরত আলীর মানাকিব'[২৪৮] বা বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় এ হাদীসটি আনা হয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস হতে কয়েকটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন[২৪৯]।

আহমাদ তাঁর মুসনাদে ইবনে আব্বাস[২৫০], আসমা বিনতে উমাইস[২৫১], আবু সাঈদ খুদরী[২৫২] এবং মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান[২৫৩] ও আরো কয়েকটি সূত্রে অন্যান্য সাহাবী হতেও হাদীসটি নকল করেছেন।

তাবরানী এ হাদীসটি আসমা বিনতে উমাইস, উম্মে সালামাহ্, হাবিশ ইবনে জুনাদাহ্, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে সামুরাহ্, যায়েদ ইবনে আরকাম, বাররাহ্ ইবনে আযেব এবং আলী ইবনে আবি তালিব ও অন্যান্যদের হতে বর্ণনা করেছেন।

বাযযার তাঁর মুসনাদে ও তিরমিযী তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরী হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবদুল বার তাঁর 'ইসতিয়াব' গ্রন্থে হযরত আলী (আ.)- এর পরিচিতি পর্বে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, "হাদীসটি বিশু তম ও সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠিত হাদীস যা সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন।" তিনি আরো বলেন, "সা'দ হতে এত অধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে আবি খাইসামাহ্ ও অন্যরাও তা বর্ণনা করেছেন।" ইবনে আবদুল বারের মতে হাদীসটির অন্যান্য বর্ণনাকারীরা হলেন ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ খুদরী, উম্মে সালামাহ্, আসমা বিনতে উমাইস, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ অনসারী ও আরো কয়েকজন সাহাবী।

যে সকল মুহাদ্দিস, সীরাহ্ লেখক ও হাদীস বর্ণনাকারী তাবুকের যু র ঘটনা বর্ণনা করেছেন তাঁরা এ হাদীসটি তাঁদের বর্ণনায় এনেছেন।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের সকল রিজাল লেখকই (শিয়া- সুন্নী নির্বিশেষে) হযরত আলী (আ.)- এর পরিচিতি বর্ণনায় এ হাদীসটি এনেছেন।

আহলে বাইতের মানাকিব (বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা) বর্ণনাকারী ব্যক্তিরা যেমন আহমাদ ইবনে হাম্বল ও তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটি এমন এক হাদীস যা সকল যুগেই প্রতিষ্ঠিত হাদীসগুলোর একটি বলে পরিগণিত হত।

৪। অতএব, আমেদীর সন্দেহ (হাদীসটির বিষয়ে) এ ক্ষেত্রে কোন মূল্যই রাখে না, বরং বলা যায় তিনি কোন হাদীসবেত্তা নন ও এ বিষয়ে তাঁর কোন জ্ঞান নেই। উসূলশাস্ত্রের জ্ঞান দিয়ে হাদীসের সনদ ও সূত্র পর্যালোচনা সম্ভব নয়। তাই সুস্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হাদীসের সনদে সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

ওয়াসসালাম

শ

উনত্রিংশতম পত্র

২০ জিলহজ ১৩২৯ হিঃ

১। হাদীসটির সনদের বিশু তার সত্যায়ন।

২। হাদীসটির সার্বিকতার বিষয়ে সন্দেহ।

৩। হাদীসের প্রামাণিকতার (প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনের উপযোগিতার) বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন।

১। হাদীসটি ('মানযিলাত'- এর হাদীস) যে সুপ্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে আপনার বর্ণনায় আমার সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে আমেদী যে ভুল করেছেন এর কারণ হাদীসশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের অভাব। আমি তাঁর বিশ্বাস ও মত উপস্থাপন করে আপনাকে কষ্টে ফেলেছি তাতে আপনি বাধ্য হয়েছেন এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতে। এ ভুলের জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি বিষয়টিকে ক্ষমার চোখে দেখবেন।

২। আপনাদের বিরোধীদের মধ্যে আমেদী ছাড়াও অনেকেই মনে করেছেন 'মানযিলাত'- এর হাদীসটি সর্বজনীন নয়, বরং তা বিশেষভাবে তাবুকের যু র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সে সময়ের জন্যই তিনি রাসূলের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। এর প্রমাণ হিসেবে তাঁরা এ হাদীসের প্রেক্ষাপট যেখানে রাসূল (সা.) আলীকে মদীনায় তাঁর স্থানে রেখে যাচ্ছেন তার উল্লেখ করেন। ইমাম আলী (আ.) যখন রাসূল (সা.)- কে বললেন, "আমাকে কি মহিলা ও শিশুদের মাঝে রেখে যাচ্ছেন?" তখন নবী (সা.) তাঁকে বললেন, "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে মূসার স্থলাভিষিক্ত হারুনের মত তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হও এ পার্থক্য সহ যে আমার পর কোন নবী নেই?" বাহ্যিকভাবে রাসূলের উদ্দেশ্য ছিল এটিই বলা, রাসূলের সাথে আলীর সম্পর্ক মূসা (আ.)- এর সঙ্গে হারুন (আ.)- এর সম্পর্কের ন্যায়। কারণ হযরত মূসা (আ.) তুর পর্বতে যাবার সময় নিজের জাতির মধ্যে হারুন (আ.)- কে স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রেখে যান।

সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় রাসূল (সা.) বলতে চেয়েছেন তাবুকের যু র সময় তাঁর অনুপস্থিতিতে আলী তাঁর স্থলাভিষিক্ত যেমনভাবে মূসা ইবাদতের জন্য তুর পর্বতে যাবায় সময় হারুনকে স্থলাভিষিক্ত করে যান।

৩। তাছাড়া হাদীসটি এক্ষেত্রে প্রমাণ্য না হবারও সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ যদিও হাদীসটি সর্বজনীন তবুও নবুওয়াতের বিষয়টি বাদ যাওয়ায় বাক্যটির বাকী অংশ সর্বজনীনতা হারিয়েছে। তাই হাদীসটি এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনের যোগ্যতা রাখে না।

ওয়াসসালাম

স

ত্রিশতম পত্র

২২ জিলহ ১৩২৯ হিঃ

১। আরব ভাষাভাষীরা এ হাদীস হতে সর্বজনীনতাই বুঝেন।

২। 'হাদীসটি বিশেষ সময় ও প্রেক্ষাপটের জন্য প্রযোজ্য' কথাটির অসারতা।

৩। 'হাদীসটি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনের যোগ্য নয়' কথাটি অযৌক্তিক।

১। 'হাদীসটি সর্বজনীন নয়' এ কথাটির জবাব দানের দায়িত্ব আমরা আরব ভাষাভাষী ও হাদীসটির সাধারণ ও বাহ্যিক অর্থের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি এবং আপনিও আরব হিসেবে এর সাক্ষী। আপনি কি মনে করেন আপনার স্বভাষীরা এ হাদীসের সর্বজনীনতার বিষয়ে সন্দেহ করেন? কখনোই নয়। আমি বিশ্বাস করি না আপনার মত কেউ হাদীসটিতে যে ইসমে জিনস্ মুদ্বাফ (সম্বন্ধবোধক জাতিবাচক বিশে) রয়েছে তা থেকে এ সংশ্লিষ্ট সকল বাস্তব ক্ষেত্র যে এর অন্তর্ভুক্ত তা বোঝেন না।

উদাহরণস্বরূপ যদি আপনি বলেন, منحتكم انصافي অর্থাৎ আমার ইনসাফকে আপনাদেরকে দিলাম, এ বাক্যে ইনসাফের বিষয়টি কি কিছু কিছু বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে নাকি সকল বিষয়ে? ইনসাফের সকল প্রেক্ষাপট এর অন্তর্ভুক্ত নয় কি? আল্লাহ্ না করুন আপনি এ থেকে বাহ্যিক অর্থে সর্বজনীনতা ও সর্বঅন্তর্ভুক্তি ভিন্ন অন্য কিছু বোঝেন।

প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের কোন খলীফা যদি তাঁর কোন বন্ধুকে বলেন, جعلت لك ولايتي على الناس অর্থাৎ আমি জনগণের ওপর নিজ বেলায়েত ও অভিভাবকত্বের বিষয়টি তোমার ওপর অর্পণ করলাম অথবা বলেন 'তোমাকে আমার সাম্রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে আমার স্থলাভিষিক্ত করলাম' কথা দু'টি হতে সর্বজনীনতা ভিন্ন অন্য কিছু আপনার চিন্তায় প্রথমেই আসে কি? কেউ যদি এ দাবী করে, বিষয়টি কোন কোন বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য তবে তাকে কি বিদ্রোহী

বলা হবে না? যদি তিনি তাঁর কোন উপদেষ্টাকে বলেন, ‘তোমার অবস্থান আমার শাসন কার্যে হযরত আবু বকরের খেলাফতে উমরের ন্যায় শুধু পার্থক্য এটি যে, তুমি রাসূল (সা.)- এর সাহাবা নও।’ তবে তাঁর এ মর্যাদা কি বিশেষ কিছু বিষয়ে হবে নাকি সকল বিষয়ে অর্থাৎ সর্বজনীন বলে পরিগণিত হবে। নিঃসন্দেহে আপনি এটিকে সর্বজনীন বলবেন। আমার বিশ্বাস আপনি রাসূলের এ হাদীস انت مني بمنزلة هارون من موسى যে সর্বজনীনতার প্রতি ইঙ্গিত করে তাই মনে করেন কারণ বাক্যটির শাব্দিক ও সাধারণ অর্থ এটিই। বিশেষত যখন হাদীসটিতে নবুওয়াতের বিষয়টিকে ব্যতিক্রম ধরেই সর্বজনীনতার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে সকল আরবকেই প্রশ্ন করতে পারেন।

২। কিন্তু বিরোধীদের এ দাবী ‘হাদীসটি শুধু ঐ প্রেক্ষাপটের জন্যই প্রযোজ্য’ তা দু’টি কারণে অগ্রহণীয়।

প্রথমত হাদীসটি নিজে থেকেই সর্বজনীন তাই বিশেষ প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে বলে তার সর্বজনীনতা ক্ষুন্ন হয় না কারণ প্রেক্ষাপট বিষয়টিকে বিশেষায়িত করে না আর উসূলশাস্ত্রের ভাষায় বললে প্রেক্ষাপট বিশেষায়ক নয়। যেমন কোন অপবিত্র ব্যক্তি (জুনুব) আয়াতুল কুরসী স্পর্শ করলে আপনি যদি তাকে বলেন ‘অপবিত্র ব্যক্তি বা মুহদেস (যার ওজু বা গোসল নেই) কোরআন স্পর্শ করতে পারবে না’ কথাটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং এরূপ ব্যক্তি কোরআনের যে কোন স্থান স্পর্শ করলেই হারাম কাজ করেছে কেননা ‘মুহদেস ব্যক্তি কোরআন স্পর্শ করতে পারবে না’ কথাটি আয়াতুল কুরসীর মধ্যে সীমাব নয়। কেউই এ থেকে ভিন্ন কিছু বুঝবে না। ত প কোন চিকিৎসক যদি তার কোন রোগীকে খেজুর খেতে দেখে বলেন, ‘আপনি মিষ্টি খাবেন না’ সাধারণভাবে এটি থেকে কি খেজুর না খাওয়া বুঝায় নাকি যত ধরনের মিষ্টি আছে তা বুঝায়? আল্লাহর শপথ করে বলতে পারি আমার মনে হয় না এরূপ বিষয়ে কেউ বিশেষত্ব বুঝবে যদি না সে উসূল, ব্যাকরণশাস্ত্র ও সাধারণ বাক্যজ্ঞান বিবর্জিত হয়। তেমনি যে ব্যক্তি ‘মানযিলাত’- এর হাদীসটিকে শুধু তাবুকের যু র প্রেক্ষাপটে বলে মনে করেন তিনিও এরূপ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত যে প্রেক্ষাপটে এ হাদীসটি মহানবী (সা.)- এর মুখ হতে নিঃসৃত হয়েছে তা আলী (আ.)- এর খেলাফতকে (প্রতিনিধিত্বকে) শুধু তাবুক যু র জন্য নির্দিষ্ট করে না কারণ আহলে বাইতের ইমামদের হতে প্রচুর সহীহ হাদীস রয়েছে যা প্রমাণ করে বিভিন্ন সময় রাসূল (সা.) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আলোচক ও গবেষকরা এ বিষয়ে পর্যালোচনা করে দেখতে পারেন। আহলে সুন্নাহর রেওয়ায়েতগুলোও এ সত্যের সপক্ষে প্রমাণ।

সুতরাং হাদীসটির প্রেক্ষাপট হতে বিষয়টি বিশেষভাবে তাবুকের যু র জন্য প্রযোজ্য কথাটি নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক।

৩। কিন্তু সর্বজনীনতা বিশেষায়িত বা পৃথককৃত হবার কারণে 'বাকী অংশ দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়' কথাটি যে ভুল তা সুস্পষ্ট। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে কি কেউ এরূপ কথা বলেছেন? যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে বল প্রয়োগ ও গায়ের জোরে কিছু প্রতিষ্ঠা করতে চায় ও এক ধরনের মস্তিষ্ক বিকৃতির স্বীকার হয়েছেন তিনিই কেবল এরূপ কথা বলতে পারেন। এমন ব্যক্তির উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মত যে অন্ধকার রাত্রিতে কোন অন্ধ প্রাণীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে তার লক্ষ্যের দিকে রওয়ানা হয়েছে। মূর্খতা ও অজ্ঞতা হতে আল্লাহর আ য় চাই এবং এগুলো হতে মুক্তি লাভের জন্য তাঁর প্রশংসা করছি। সর্বজনীন বিষয় যে বাক্যের দ্বারা বিশেষায়িত হয় তা যদি অস্পষ্ট না হয় তবে মূল বাক্যটি প্রামাণিকতা হারায় না। বিশেষভাবে যদি বিশেষায়ক অংশটি যুক্ত- বিশেষায়ক[২৫৪] হয়। বিষয়টি বোঝার জন্য উদাহরণ পেশ করছি। ধরি, কোন মনিব তার গোলামকে বলল, 'আজ যাইদ ব্যতীত যে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তাকে সম্মান কর।' এখন যদি গোলাম যাইদ ব্যতীত অন্য ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে তবে সাধারণভাবে সবাই বলবে সে অন্যায় ও ভুল করেছে কারণ তার মনিবের কথামত কাজ করে নি। তাই এ থেকে বিজ্ঞ ব্যক্তি মত দেবেন গোলাম নির্দেশ অমান্যের কারণে অপরাধী ও নিন্দার যোগ্য এবং তার নির্দেশ অমান্যের মাত্রানুযায়ী শাস্তি হওয়া উচিত। শরীয়ত ও বু বৃত্তি দু'টিই তাই নির্দেশ করে। সাধারণভাবে কেউ এ কথা মানবেন না যে, যেহেতু সর্বজনীনতা বিশেষায়িত হয়েছে সেহেতু বাকী অংশ প্রামাণিকতা রাখে না, বরং এরূপ কথা কঠিন অপরাধ বলে পরিগণিত।

প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সর্বজনীনতা বিশেষায়িত হলে তার প্রামাণিকতা হারায় না। আর এ বিষয়টি সকলের নিকট সুস্পষ্ট।

তাছাড়া আপনি জানেন, মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে এ রীতি প্রচলিত যে, তারা শর্তযুক্ত সর্বজনীনতাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। সাহাবী, তাবেয়ীন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের সকলেই এ প তিকে গ্রহণ করেছেন। আহলে বাইতের ইমামগণ এবং মুসলমানদের ধর্মীয় নেতারা এ প তি অবলম্বন করতেন। তাই এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এগুলো সর্বজনীনতা বিশেষায়িত হবার পরও দলিল হবার সপক্ষে প্রমাণ। যদি এটি দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য না হতো তাহলে চার মাজহাবের ইমামগণ ও মুজতাহিদদের জন্য শরীয়ত ও শরীয়ত বহির্ভূত সকল বিষয়ে ব্যাখ্যার পথ বন্ধ হয়ে যেতো। কারণ ইজতিহাদী বিষয়ে শরীয়তের বিধানসমূহ সর্বজনীন নিয়মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এবং এমন কোন সর্বজনীন নিয়ম নেই যা শর্তযুক্ত বা বিশেষায়িত হয় নি। এজন্যই সর্বজনীনতার প্রামাণিকতার পথ রু হলে জ্ঞানের পথই রু হবে। এরূপ অবস্থা হতে আল্লাহর পানাহ্ চাই।

ওয়াসসালাম

শ

একত্রিশতম পত্র

২২ জিলহজ   ১৩২৯ হিঃ

অন্যান্য প্রেক্ষাপটে এরূপ হাদীসের অস্তিত্বের নমুনা আহবান

তাবুকের যু   ব্যতীত অন্য সময়েও যে এরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা আপনি বর্ণনা করেন নি। এরূপ হাদীস শোনার জন্য আমি উদগ্রীব। আমাকে এমন উৎসের সন্ধান দেবেন কি?

ওয়াসসালাম

স

বত্রিশতম পত্র

২৪ জিলহজ ১৩২৯ হিঃ

১। উম্মে সালিমের সাক্ষাতে এরূপ বর্ণনার অস্তিত্ব।

২। হযরত হামযাহর কন্যার উপস্থিতিতে।

৩। নবী (সা.) যখন আলী (আ.)- এর ওপর ভর করে বসেছিলেন।

৪। প্রথম ভ্রাতৃবন্ধনের দিন।

৫। দ্বিতীয় ভ্রাতৃবন্ধনের ঘটনা।

৬। মসজিদের দিকে অবস্থিত সকল দ্বার বন্ধ করার দিন।

৭। নবী আলী ও হারুন (আ.)- কে দু'টি নক্ষত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন যারা একসঙ্গে থাকে।

১। একদিন নবী (সা.) উম্মে সালিমের[২৫৫] নিকট হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে এরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

উম্মে সালিম ইসলামের অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত ও তীক্ষ্ণ জ্ঞান- বুি সম্পন্ন ছিলেন। ইসলামের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতা, ইখলাস, ধৈর্যশীলতা ও ত্যাগের কারণে রাসূলের নিকট তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল।

নবী (সা.) তাঁদের ঘরে যেতেন ও তাঁর জন্য হাদীস বর্ণনা করতেন। একদিন তিনি তাঁকে বলেন, "হে উম্মে সালিম! আলীর রক্ত ও মাংস আমার রক্ত ও মাংস হতে। সে আমার কাছে মূসার নিকট হারুনের মত।" এ হাদীসটি 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠায় ২৫৫৪ নং হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। 'মুনতাখাবে কানয' গ্রন্থেও হাদীসটি এসেছে। এজন্য 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৩১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দেখতে পারেন। আমাদের বর্ণিত সূত্রের হুবহু সেখানে এসেছে।

আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এ হাদীসটি নবী (সা.) কোন বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে বলেন নি, বরং আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত দায়িত্ব পালন এবং তাঁর বাণীর প্রচার ও উপদেশ দানের লক্ষ্যেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির শান ও মর্যাদা এভাবে বর্ণনা করেছেন। এটি তাই তাবুক যু র সঙ্গেই শুধু সংশ্লিষ্ট নয়।

২। হযরত হামযাহর কন্যা সম্পর্কে হযরত আলী, জা'ফর ও যাইদের মধ্যে যে আলোচনা হচ্ছিল সে সর্ম্পকিত বর্ণনায় অনুরূপ হাদীস এসেছে যেখানে রাসূল (সা.) বলেছেন, "হে আলী! তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক মূসা ও হারুনের মত।"[২৫৬]

৩। ত প একদিন হযরত আবু বকর, উমর ও আবু উবাইদা জাররাহ্ রাসূলের সামনে বসেছিলেন। হযরত রাসূল (সা.) আলীর ওপর ভর করে বসেছিলেন এমতাবস্থায় নিজের হাত আলী (আ.)- এর কাঁধে রেখে বললেন, "হে আলী! তুমি মুমিনদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যে আমার প্রতি ঈমান এনেছ ও ইসলাম গ্রহণ করেছ, তুমি আমার কাছে মূসার নিকট হারুনের মত।"[২৫৭]

৪। প্রথম ভ্রাতৃবন্ধন স্থাপনের দিন যা মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল সেদিন রাসূল এরূপ কথা বলেছেন। হিজরতের পূর্বে রাসূল (সা.) বিশেষত মক্কার মুহাজিরদের মধ্যে দু'জন দু'জন করে ভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন সৃষ্টি করেন (আকদের মাধ্যমে) সেখানে তিনি এরূপ কথা বলেন।

৫। ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের দ্বিতীয় চুক্তির দিন যা হিজরতের পঞ্চম মাসে মদীনায় অনুষ্ঠিত হয় এবং রাসূল (সা.) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়ে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) আলীকে নিজের ভাই হিসেবে মনোনীত করেন ও অন্যদের ওপর তাঁর ে ষ্ঠত্বের কারণে অন্য কাউকে নিজের ভাই হিসেবে ঘোষণা করেন নি[২৫৮] এবং আলীর প্রতি নির্দেশ করে বলেন, "তুমি আমার কাছে মূসার নিকট হারুনের মত তবে আমার পর কোন নবী নেই।"

নবী করিম (সা.)- এর পবিত্র বংশধরদের হতে এ বিষয়ে মুতাওয়াতির সূত্রে হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। আহলে বাইতের বাইরে প্রথম ভ্রাতৃবন্ধন সম্পর্কে যায়েদ ইবনে আবি আওফী যা বলেছেন আপনার জন্য সেটিই যথেষ্ট বলে মনে করছি। এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর

‘মানাকিবে আলী’, ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে, বাগাভী ও তাবরানী তাঁদের মাজমায়, বারুদী তাঁর ‘কিতাবুল মারেফাত’ গ্রন্থে এবং ইবনে আদী [২৫৯] ও অন্যরাও বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি বেশ দীর্ঘ। এতে ভ্রাতৃত্বের আকদ পাঠের প্রক্রিয়াও বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির শেষে এভাবে এসেছে- আলী (আ.) রাসূলকে বললেন, “হে রাসূল (সা.)! আমার যেন মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে, আত্মা বের হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, আমাকে ছাড়াই আপনি সাহাবীদের নিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়েছেন। যদি আপনি কোন বিষয়ে আমার ওপর রাগান্বিত হয়ে থাকেন তাহলে আমি আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আপনি আপনার দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা তা ক্ষমা করে দিন।” রাসূল (সা.) বললেন, “সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আমাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমার প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন কারণে তোমাকে বাদ দেই নি এবং তুমি আমার কাছে মূসার নিকট হারুনের মত এ পার্থক্য ব্যতীত যে, আমার পর কোন নবী নেই। তুমি আমার ভাই ও আমার উত্তরাধিকারী।” আলী বললেন, “আপনার নিকট হতে আমি উত্তরাধিকার সূত্রে কি লাভ করব?” তিনি বললেন, “পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণ যা ইতোপূর্বে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যেতেন আর তা ছিল তাঁদের প্রভুর গ্রন্থ ও তাঁদের নবীর সুন্নাহ্। তুমি আমার কন্যা ফাতিমাসহ বেহেশতে আমার প্রাসাদে থাকবে। তুমি আমার ভাই ও বন্ধু।” অতঃপর রাসূল (সা.) নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন اخوانا على سرر متقابلين সেখানে তারা পরস্পর ভাই হিসেবে মুখোমুখি বসে থাকবে।[২৬০] অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালবাসার কারণে বেহেশতে অবস্থান করবেন এবং পরস্পরকে লক্ষ্য করবেন।

এছাড়া দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্ববন্ধনের দিন সম্পর্কিত হাদীসটি তাবরানী তাঁর ‘কাবীর’ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস হতে এভাবে এনেছেন- নবী (সা.) আলীকে বললেন, “যখন তুমি লক্ষ্য করলে আমি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দিলাম কিন্তু তোমাকে কারো ভাই হিসেবে ঘোষণা করলাম না তখন কি তুমি আমার প্রতি অভিমান করেছ? তুমি কি এতে সন্তুষ্ট

নও, তোমার অবস্থান আমার কাছে মূসার নিকট হারুনের অবস্থানের ন্যায় হোক এ পার্থক্য ব্যতীত যে, আমার পরে কোন নবী আসবে না?”[২৬১]

৬। যেদিন রাসূল আলী (আ.)- এর দ্বার ব্যতীত মসজিদে নববীর দিকে উন্মুক্ত সকল দ্বারকে বন্ধ করার ঘোষণা দেন সেদিনের ঘটনা বর্ণনা করে জাবের বিন আবদুল্লাহ্ আনসারী[২৬২] হতে বর্ণিত হাদীসটি লক্ষণীয়। তিনি বলেন, “নবী (সা.) বলেছেন : হে আলী! মসজিদে আমার জন্য যা কিছু হালাল তোমার জন্যও ত প। তুমি আমার কাছে মূসার নিকট হারুনের মত এ পার্থক্য ব্যতীত যে, আমার পর কোন নবী নেই।”

হুজাইফা ইবনে উসাইদ গাফফারী[২৬৩] বলেন, “যেদিন রাসূল মসজিদের দিকে উন্মুক্ত সকল দ্বার বন্ধ করে দেন সেদিন দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশ্যে খুতবা পাঠ করে বলেন : কোন কোন ব্যক্তির মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে আমি আলীকে মসজিদে স্থান দিয়ে অন্য সকলকে বের করে দিয়েছি, না বরং খোদার শপথ, তিনিই আলীকে মসজিদে স্থান দিয়ে অন্যদের মসজিদ হতে বের করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ ওহী প্রেরণ করে মূসাকে তাঁর ও তাঁর ভ্রাতার জন্য মিশরে গৃহ নির্বাচন, ঐ গৃহকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ এবং সেখানে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।” হাদীসটির শেষে রাসূল (সা.) বললেন, “আলীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক মূসা ও হারুনের মত। সে আমার ভ্রাতা। সে ব্যতীত কারো জন্য জায়েয নেই মসজিদে জুনুব (যৌন কারণে অপবিত্র) অবস্থায় প্রবেশ করবে।”

এরূপ অসংখ্য নমুনা রয়েছে যা এ সংক্ষিপ্ত সময়ে এখানে উপস্থাপন সম্ভব নয়। অবশ্য ‘হাদীসে মানযিলাত’ যে শুধু তাবুকের যু র সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নয় তা প্রমাণের জন্য আমরা যতটুকু আলোচনা করেছি ততটুকুই যথেষ্ট মনে করছি। তাই বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে হাদীসটির বর্ণনা এর গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে।

৭। যে কেউ নবী (সা.)- এর জীবনী ও ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করলে দেখতে পাবেন তিনি আলী ও হারুন (আ.)- কে উত্তর আকাশের (বিশেষ) নক্ষত্রদ্বয়ের মত একই ধাঁচের বলে মনে করতেন এবং কোন বিষয়ে তাঁদের একজনকে অপরের ওপর ে ষ্ঠত্ব দিতেন না যা হাদীসটির

সর্বজনীনতার সপক্ষে দলিল। পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করলেও শুধু হাদীসের শাব্দিক অর্থ থেকেও এই সর্বজনীনতা সুস্পষ্ট।

ওয়াসসালাম

শ

তেত্রিশতম পত্র

২৫ জিলহজ   ১৩২৯ হিঃ

কখন ও কোথায় আলী (আ.) ও হারুন (আ.) দু'টি উ   ল নক্ষত্র বলে পরিচিত হয়েছেন?

আপনার পত্রের শেষ অংশে আপনি বলেছেন যে, রাসূল (সা.)আলী ও হারুনকে সম আলোকের দু'টি উ   ল নক্ষত্র হিসেবে পরিচিত করিয়েছেন। কোথায় ও কখন করেছেন তা আমার বোধগম্য নয়।

ওয়াসসালাম

স

চৌত্রিশতম পত্র

২৭ জিলহ   ১৩২৯ হিঃ

১। যেদিন আলী (আ.)- এর পুত্রদের শাব্বার, শাব্বির ও মুশবির বলেছেন।

২। ভ্রাতৃবন্ধনের দিন।

৩। মসজিদের দিকে উন্মুক্ত দ্বারসমূহ রু   করার দিন।

রাসূল (সা.)- এর জীবনী অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করলে দেখবেন তিনি আলী ও হারুন (আ.)- কে আসমানের দুই যুগ্ম তারকা ও মানবদেহের দুই চোখের সাথে তুলনা করেছেন। এ দুই উম্মতের মধ্যে তাঁদের থেকে অন্য কেউই ে ষ্ঠ ছিলেন না।

১। আর এজন্যই তিনি চান নি আলী (আ.)- এর সন্তানদের নাম হারুনের সন্তানদের হতে ভিন্ন কিছু হোক। এজন্য তাঁদের হাসান, হুসাইন ও মুহসিন[২৬৪] নাম রেখেছেন ও বলেছেন, "তাদের নাম হারুনের সন্তানদের সহনামে রাখলাম কারণ তাদের (হারুনের সন্তানদের নাম) শাব্বার, শাব্বির ও মুশবির ছিল।" রাসূল (সা.) তাঁর এই কর্মের মাধ্যমে এ দুই হারুনের মধ্যের মিলকে তুলে ধরে সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে তাঁদের ে ষ্ঠত্বকে সর্বজনীনতা দান করতে চেয়েছিলেন।

২। এজন্যই আলী (আ.)- কে নিজের ভাই হিসেবে মনোনীত করে অন্যদের ওপর হারুনের প্রাধান্যের সর্বজনীনতার বিষয়টিকে উল্লেখ করার মাধ্যমে বিষয়টিকে তাকীদ দিয়েছেন। যে দু'বার ভ্রাতৃত্বের আকদ পাঠ করা হয় দু'বারই তিনি আগ্রহী ছিলেন তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করুক। এজন্য প্রথম আকদের সময় সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু বকরকে হযরত উমরের সাথে, হযরত উসমানকে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধন সৃষ্টি করলেও দ্বিতীয় আকদের সময় হযরত আবু বকরকে খারাজা ইবনে যাইদের ভ্রাতা এবং হযরত উমরকে উতবান ইবনে মালিকের ভ্রাতা মনোনীত করেন। অথচ উভয়

আকদেই আলীকে নিজের ভ্রাতা বলে মনোনীত ও ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে (যার অধিকাংশই সহীহ) তার উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়।

এজন্য ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, যাইদ ইবনে আরকাম, যাইদ ইবনে আবি আউফি, আনাস ইবনে মালিক, হুজাইফা ইবনে ইয়ামান, মুখদাজ ইবনে ইয়াযীদ, উমর ইবনে খাত্তাব, বাররা ইবনে আযেব, আলী ইবনে আবি তালিব ও অন্যান্যদের হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ লক্ষ্য করুন।

মহানবী (সা.) হযরত আলীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, أنت أخي في الدّنيا و الآخرة অর্থাৎ তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার ভাই।[২৬৫] আমরা আমাদের বিংশতম পত্রে বর্ণনা করেছি রাসূল (সা.) আলীর স্কন্ধে হাত রেখে বললেন, "এ আমার ভাই, আমার স্থলাভিষিক্ত ও তোমাদের মাঝে আমার প্রতিনিধি, তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে।"

একদিন রাসূল (সা.) হাস্যো   ল মুখে সাহাবীদের সামনে উপস্থিত হলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাসূলকে তাঁর আনন্দের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। রাসূল উত্তরে বললেন, "আমার ভাই ও পিতৃব্যপুত্র এবং আমার কন্যার ব্যাপার আমার প্রভুর পক্ষ হতে আমার নিকট সুসংবাদ এসেছে যে, মহান আল্লাহ্ ফাতিমাকে আলীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আব   করেছেন...।" সাওয়ায়েক গ্রন্থের ১০৩ পৃষ্ঠায় আবু বকর খাওয়ারেজমী সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

যখন নারীকুল শিরোমণি হযরত ফাতিমার সঙ্গে ে ষ্ঠ পুরুষ আলী (আ.)- এর বিবাহ সম্পন্ন হলো তখন নবী (সা.) উম্মে আইমানকে বললেন, "আমার ভ্রাতাকে ডাক।" উম্মে আইমান বললেন, "তিনি আপনার ভ্রাতা এবং আপনি তাঁকে নিজ কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিচ্ছেন?" রাসূল (সা.) বললেন, "হ্যাঁ, উম্মে আইমান।" অতঃপর তিনি আলীকে ডেকে আনলেন।[২৬৬]

মহানবী (সা.) বারবার আলীর প্রতি ইশারা করে বলতেন,

هذا أخي و ابن عمّي و صهري و أبو ولدي

অর্থাৎ এ আমার ভাই, আমার চাচার পুত্র, আমার জামাতা ও আমার সন্তানদের পিতা।[২৬৭]

একদিন রাসূল (সা.) আলীর সঙ্গে আলোচনা করার সময় বললেন, "তুমি আমার ভাই ও বন্ধু।"[২৬৮]

অন্য একবার তিনি বলেন, "তুমি আমার ভ্রাতা এবং বেহেশতে বন্ধু হিসেবে আমার সঙ্গে

থাকবে।”[২৬৯] অন্য একদিন আলী, তদীয় ভ্রাতা জা’ফর এবং যাইদ ইবনে হারিসার মধ্যে কোন একটি ঘটনায় তাঁকে লক্ষ্য করে রাসূল (সা.) বলেন, “হে আলী! তুমি আমার ভ্রাতা, আমার বংশধরদের পিতা, তুমি আমার হতে এবং আমার প্রতিই তোমার প্রত্যাবর্তন।”[২৭০]

অনুরূপ এক দিন আলীকে উপদেশ দিয়ে বললেন, “তুমি আমার ভাই, আমার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আমার ঋণ পরিশোধ করবে, আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে, আমার ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালন করবে।”[২৭১] যখন তাঁর (আমার মাতাপিতা তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত) মৃত্যুকাল উপস্থিত হলো তখন মহানবী বললেন, “আমার ভাইকে ডাক।” হযরত আলী (আ.) আসলে বললেন, “আমার নিকটে আস।” তিনি তাঁর নিকটবর্তী হয়ে তাঁর পবিত্র মাথা নিজের বুকের ওপর টেনে নিলেন। এমতাবস্থায় রাসূল (সা.) তাঁকে অনেক কথা বললেন এবং কথা বলতে বলতেই তাঁর পবিত্র আত্মা দেহ হতে উর্ধ্বে যাত্রা করল[২৭২] এবং তাঁর বর্ণিত কথাগুলোর একটি হলো : বেহেশতের দ্বারে নিম্নোক্ত কথাটি লেখা রয়েছে-

لا إله إلّا الله مُحمّد رّسول الله عليّ أخو رسول الله

অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই মুহাম্মদ তাঁর রাসূল আলী রাসূলের ভ্রাতা।[২৭৩]

মহান আল্লাহ্ ‘লাইলাতুল মাবি’তে (অর্থাৎ হিজরতের রাত্রি যে রাত্রিতে হযরত আলী রাসূলের বিছানায় তাঁর স্থানে রাসূলের প্রাণ রক্ষার জন্য শয়ন করেছিলেন) হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ.)- কে বললেন, “আমি তোমাদের দু’জনের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করলাম এবং তোমাদের একজনকে অন্যজন অপেক্ষা দীর্ঘজীবন দান করতে চাই। তোমাদের মধ্যে কে রাজী আছো তার জীবন সংক্ষিপ্ত ও অন্যজনের জীবন দীর্ঘ হোক।” তাঁরা দু’জনই নিজ জীবনের দীর্ঘতা চাইলেন। তখন মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে ওহী প্রেরণ করে বললেন, “তোমরা আলী ইবনে আবি তালিবের মত হতে পারবে না। আমি মুহাম্মদ ও আলীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছি। আলী মুহাম্মদের বিছানায় শয়ন করেছে যাতে নিজেকে তার জন্য উৎসর্গ করতে পারে এবং এভাবে তার জীবনকে নিজের জীবনের ওপর প্রাধান্য দিয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। তোমরা পৃথিবীতে নেমে যাও এবং তার জীবন রক্ষা কর।” তাঁরা পৃথিবীতে অবতরণ করলেন এবং

জিবরাঈল ও মিকাঈল যথাক্রমে হযরত আলী (আ.)- এর মাথা ও পায়ের নিকট অবস্থান নিলেন। হযরত জিবরাঈল আহবান করে বললেন, "বাহ! বাহ! হে আবু তালিবের পুত্র! তোমাকে নিয়ে আল্লাহ্ ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করছেন।" এ ঘটনার পটভূমিতেই নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে-

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ)

এবং মানুষের মাঝে এমন লোক আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের জীবনকে বাজী রাখে আর মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।[২৭৪] (সূরা বাকারা : ২০৭)

হযরত আলী (আ.) সব সময় বলতেন, "আমি আল্লাহর বান্দা, রাসূল (সা.)- এর ভ্রাতা এবং আমিই সিদ্দীকে আকবর। আমি ব্যতীত অন্য কেউ এ দাবী করলে সে মিথ্যাবাদী বৈ কিছু নয়।"[২৭৫]

হযরত আলী (আ.) আরো বলেছেন, "আল্লাহর শপথ, আমি রাসূলের ভ্রাতা, তাঁর চাচার সন্তান ও তাঁর জ্ঞানের উত্তরাধিকারী, তাই তাঁর কাছে আমা হতে কে অধিকতর যোগ্য?"[২৭৬] তৃতীয় খলীফা নির্বাচনের দিন শুরার সদস্য উসমান, আবদুর রহমান, সা'দ ও যুবাইরের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের কসম দিয়ে বলছি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের দিন রাসূল (সা.) আমাকে ব্যতীত তোমাদের মধ্য হতে কাউকেই কি নিজের ভ্রাতা হিসেবে মনোনীত করেছেন?" তাঁরা বললেন, "আল্লাহ্ জানেন, না।"[২৭৭]

বদরের যু যখন আলী (আ.) ওয়ালিদের মুখোমুখি হন তখন ওয়ালিদ তাঁকে প্রশ্ন করে, "কে তুমি?" আলী (আ.) বলেন, "আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূলের ভ্রাতা।"[২৭৮]

অনুরূপ একবার হযরত উমরের খিলাফতের সময় আলী (আ.) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "যদি বনি ইসরাঈলের একজন লোক আপনার নিকট আসে ও তাদের একজন বলে : আমি মূসা (আ.)- এর চাচাত ভাই তবে অন্যান্যদের ওপর তাকে ে ষ্ঠত্ব দান করবেন কি?" হযরত উমর বললেন, "অবশ্যই।" আলী বললেন, "আমি খোদার কসম করে বলছি আমি রাসূলের ভ্রাতা ও চাচাত ভাই।" হযরত উমর নিজের গায়ের চাদর খুলে মাটিতে বিছিয়ে দিলেন ও আল্লাহর শপথ করে বললেন, "আপনি অবশ্যই এর ওপর বসবেন যতক্ষণ না আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হচ্ছি।"

রাসূলের ভ্রাতা ও চাচাত ভাই হবার কারণেই হযরত উমর তাঁর প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন করেন।[২৭৯]

৩। আমার কলম আমার এখতিয়ারের বাইরে চলে গিয়েছিল। যা হোক রাসূল (সা.) মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা এবং অন্যায় ও অপবিত্রতা হতে মসজিদ মুক্ত রাখার নিমিত্তে যেসকল সাহাবীর ঘর মসজিদের দিকে উন্মুক্ত ছিল তা বন্ধ করার নির্দেশ দেন কিন্তু হযরত আলীর ঘরকে পূর্বের মত খোলা রাখেন ও আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশিত হয়ে আলী (আ.)- এর জন্য অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ মুবাহ ঘোষণা করেন যেমনটি হযরত হারুন (আ.)- এর জন্যও ছিল। এ বিষয়েও আলী ও হযরত হারুন (আ.)- এর মধ্যে আমরা সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। ইবনে আব্বাস বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে সকল ঘর মসজিদের দিকে উন্মুক্ত হত সেগুলোকে বন্ধ করে দেন আলীর ঘর ব্যতীত। আলী ঐ পথেই মসজিদে প্রবেশ ও অতিক্রম করতেন। যেহেতু ঐ পথ ব্যতীত অন্য পথ ছিল না তাই অপবিত্র অবস্থাতেও সে পথেই বের হতেন।"[২৮০]

বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ[২৮১] একটি হাদীসানুযায়ী হযরত উমর ইবনে খাত্তাব বলেন, "আলীকে তিনটি বস্তু দান করা হয়েছে, এর একটি যদি আমার হত তবে আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ (লাল চুলের উষ্ট্র) হতে তা আমার নিকট উত্তম বলে পরিগণিত হত। তাঁর স্ত্রী রাসূলের কন্যা। তাঁর ঘর রাসূলের ঘর ও মসজিদ সংলগ্ন ছিল; সেখানে রাসূলের জন্য যা হালাল ছিল তা তাঁর জন্যও হালাল ছিল এবং খায়বারের দিন রাসূল তাঁর হাতেই পতাকা তুলে দেন।" অন্য একটি সহীহ হাদীস মতে একদিন সা'দ ইবনে মালিক আলী (আ.)- এর কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "রাসূল (সা.) তাঁর চাচা আব্বাস ও অন্যান্যদের মসজিদ হতে বাইরে যাবার নির্দেশ দিলে আব্বাস বললেন : আমাদের বের হতে বলছ অথচ আলীকে কাছে রেখেছ? রাসূল বললেন : আমি তোমাদের বের হতে বা তাকে থাকার নির্দেশ দেই নি, বরং আল্লাহ্ তোমাদের বাইরে যেতে ও তাকে এখানে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।"[২৮২]

হযরত যাইদ ইবনে আরকাম বলেন, "রাসূল (সা.)- এর অনেক সাহাবীরই দরজা মসজিদের দিকে উন্মুক্ত ছিল ও তাঁরা সে পথে বাইরে যেতেন। রাসূল (সা.) আলীর গৃহ ব্যতীত অন্য সকল

গৃহের দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা এ বিষয়ে কথা উঠালে রাসূল (সা.) দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে বললেন : আমিই মসজিদের দিকে উন্মুক্ত সকল দ্বারকে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছি আলীর দ্বার ব্যতীত এবং আমি এরূপ করতে নির্দেশিত হয়েই তা করেছি।”[২৮৩]

তাবরানী তাঁর ‘আল কাবীর’ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, “রাসূল (সা.) একদিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন : আমি নিজের ইচ্ছায় তোমাদের মসজিদ হতে বের হবার নির্দেশ দান করি নি এবং তাকে (আলী)- ও অবস্থান করতে বলি নি, বরং আল্লাহ্ তোমাদের বের হতে ও তাকে এখানে অবস্থান করতে বলেছেন। আমি বান্দা হিসেবে তাঁর নির্দেশ পালনকারী মাত্র। ওহীর মাধ্যমে যা আমাকে নির্দেশ দান করা হয় তা ব্যতীত আমি অন্য কিছু করি না।”[২৮৪]

রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, “হে আলী! তুমি ও আমি ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে বৈধ নয় অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা।”[২৮৫]

সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, বাররা ইবনে আজেব, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর ও হুজাইফা ইবনে উসাইদ গাফফারী সকলেই বর্ণনা করেছেন, “নবী (সা.) মসজিদে আসলেন ও বললেন : মহান আল্লাহ্ মূসাকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন : আমার জন্য পবিত্র মসজিদ নির্মাণ কর এবং সেখানে তুমি ও হারুন ব্যতীত কেউ যেন সর্বাবস্থায় অবস্থান না করে। তিনি আমাকেও নির্দেশ দিয়েছেন পবিত্র মসজিদ নির্মাণের সেখানে যেন আমি ও আমার ভাই আলী ব্যতীত অন্য কেউ অবস্থান (সর্বাবস্থায়) না করে।”[২৮৬]

আমাদের এ ক্ষুদ্র লেখায় এ সম্পর্কিত সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত একত্রিত করা সম্ভব নয়। এমন কি নির্ভরযোগ্য যে সকল বর্ণনা ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ খুদরী, যাইদ ইবনে আরকাম, আসমা বিনতে উমাইস, উম্মে সালামাহ্, হুজাইফা ইবনে উসাইদ, সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, বাররা ইবনে আযেব, আলী ইবনে আবি তালিব, উমর ইবনে খাত্তাব, আবু যর, আবু তুফাইল, বুরাইদা আসলামী, আবু রাফে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর কৃতদাস, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী ও অন্যান্যদের হতে এসেছে তাও লিপিব করা অসম্ভব।

রাসূল (সা.) হতে একটি দোয়া বর্ণিত হয়েছে যা এরূপ- হে আল্লাহ! আমার ভ্রাতা মূসা আপনার নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেন : হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষকে প্রসারিত করে দিন ও আমার জন্য আমার কাজকে সহজ করে দিন। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন যাতে করে জনগণ আমার কথা বুঝতে পারে। আমার পরিবার হতে আমার ভ্রাতা হারুনকে আমার সহযোগী মনোনীত করুন। তার মাধ্যমে আমার মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করুন ও আমার কাজে তাকে সহযোগী করুন। আপনি তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করে বলেছিলেন : অতিশীঘ্রই তোমার ভ্রাতার মাধ্যমে তোমার বাহুকে আমি শক্তিশালী করবো ও তোমাদের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দান করবো। হে পরওয়ারদিগার! আমি মুহাম্মদ আপনার বান্দা ও রাসূল। আমার বক্ষকে আপনি প্রসারিত করুন। আমার কর্মকে আমার জন্য সহজ করে দিন। আমার পরিবার হতে আমাকে একজন সহযোগী দান করুন এবং সে হলো আলী।[২৮৭]

বাযযার অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যেখানে নবী (সা.) আলী (আ.)- এর হাত ধরে বললেন, "হযরত মূসা আল্লাহর নিকট চেয়েছিলেন যেন হযরত হারুনের মাধ্যমে তাঁর মসজিদকে পবিত্র রাখেন এবং আমি তাঁর নিকট আলীর মাধ্যমে আমার মসজিদ পবিত্র রাখার প্রার্থনা করছি।" অতঃপর একজনকে হযরত আবু বকরের নিকট পাঠালেন যেন তাঁর মসজিদের দিকে উন্মুক্ত দ্বারটি বন্ধ করে দেন। তিনি বললেন, "শুনলাম ও মেনে নিলাম।" অতঃপর একে একে হযরত উমর, হযরত আব্বাসসহ সকল সাহাবীর নিকট এ নির্দেশ পাঠালেন। অতঃপর বললেন, "আমি তোমাদের দ্বারসমূহ বন্ধ করি নি বা আলীর দ্বার উন্মুক্ত রাখি নি, বরং আল্লাহ্ই আলীর দ্বার উন্মুক্ত করেছেন ও তোমাদের দ্বারসমূহ বন্ধ করেছেন।"[২৮৮]

হযরত আলী (আ.)- এর হযরত হারুনের সঙ্গে সাদৃশ্যের প্রমাণ হিসেবে এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট মনে করছি যেখানে তাঁদের পদমর্যাদা ও সম্মানের সর্বজনীনতা প্রমাণিত হয়েছে।

ওয়াসসালাম

শ

পঁয়ত্রিশতম পত্র

২৭ জিলহজ ১৩২৯ হিঃ

অন্যান্য রেওয়ায়েতগুলোও উল্লেখ করার আহবান।

আল্লাহ্ আপনার পিতাকে রহম করুন। এই আয়াতসমূহ ও হাদীসের দলিলগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট এবং আপনার বর্ণনাও প্রা ল ও সাহিত্য মানসম্পন্ন। তাই অন্যান্য বর্ণনাসমূহও শোনার ও জানার আগ্রহ ব্যক্ত করছি। মুতাওয়াতির[২৮৯] (অবিচ্ছিন্ন) সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলো আনুন। আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করুন।

ওয়াসসালাম

স

ছত্রিশতম পত্র

২৯ জিলহজ ১৩২৯ হিঃ

১। ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীস।

২। ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণিত হাদীস।

৩। বুরাইদাহ্ বর্ণিত হাদীস।

৪। যে হাদীসে আলী (আ.)- এর দশটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

৫। আলী বর্ণিত হাদীস।

৬। ওয়াহাবের হাদীস।

৭। ইবনে আবি আছেমের হাদীস।

১। এ বিষয়ে ‘ইসতিয়াব’ গ্রন্থে হযরত আলীর জীবনীতে আবু দাউদ তাইয়ালেসী সূত্রে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হাদীসটিই যথেষ্ট। ইবনে আব্বাস বলেন, “রাসূল (সা.) আলীকে লক্ষ্য করে বললেন : أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي অর্থাৎ তুমি আমার পর সকল মুমিনের অভিভাবক।”

২। উপরোক্ত হাদীসের মত আরেকটি সহীহ হাদীস ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, “রাসূল (সা.) একদল লোককে যু র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন ও আলীকে সেনানায়ক নিযুক্ত করলেন। যু জয়ের পর আলী (আ.) খুমস হতে একটি ক্রীতদাসী নিজের জন্য গ্রহণ করলে সাধারণ সৈন্যরা এর প্রতিবাদ করল। তাদের চারজন প্রতিশ্রুতিব হলো এ বিষয়ে রাসূলের নিকট অভিযোগ করতে। যু হতে ফিরে আসার পর এ চারজনের একজন রাসূলের নিকট অভিযোগ করে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি শুনেছেন আলী এরূপ এরূপ করেছে? নবী (সা.) তার হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিও দাঁড়িয়ে একই অভিযোগ আনল। নবী তার হতেও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয় ব্যক্তিও প্রথম দু’জনের মত অভিযোগ আনল। নবী তার হতেও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন চতুর্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে চতুর্থবারের মত অভিযোগের পুনরাবৃত্তি

করলে রাসূল (সা.) তাদের দিকে তাকিয়ে রাগত স্বরে বললেন : তোমরা আলী হতে কি চাও? আলী আমা হতে এবং আমি আলী হতে। আলী আমার পর সকল মুমিনের ওয়ালী (অভিভাবক)।”[২৯০]

৩। অনুরূপ বুরাইদাহ্ বর্ণিত হাদীস যা মুসনাদে আহমাদের ৫ম খণ্ডের ৩৫৬ পৃষ্ঠায় এসেছে। সেখানে তিনি বলেছেন, “রাসূল (সা.) ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে দু’দল সেনা প্রেরণ করেন। তাদের একদলের নেতৃত্ব আলী ইবনে আবি তালিবের হাতে ও অন্যদলের নেতৃত্ব খালিদ ইবনে ওয়ালিদের হাতে ন্যস্ত করেন। নবী দু’দলের উদ্দেশ্যে বললেন : যখন তোমরা দু’দল একত্রে মিলিত হবে তখন আলী একক সেনাপতি হবে।[২৯১] আর যদি মিলিত হতে না পার তবে সেনানায়ক ভিন্ন থাকবে।”

বুরাইদাহ্ বলেন, “ইয়েমেনের বনি যুবাইদা গোত্রের সঙ্গে সংঘটিত যু   আমরা জয়ী হই এবং অনেককেই বন্দী করতে সক্ষম হই। আলী তাদের মধ্যে এক নারীকে নিজের জন্য মনোনীত করেন।”

বুরাইদাহ্ বলেন, “খালিদ ইবনে ওয়ালিদ একটি পত্রে ঘটনার বর্ণনা লিখে আমার হাতে দিয়ে রাসূলের নিকট পৌঁছাতে বললেন। যখন পত্রটি নিয়ে রাসূলের নিকট গিয়ে পাঠ করলাম তখন তাঁর চেহারা রাগে পরিবর্তিত হয়ে গেল। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এখানে আ য়ের কেন্দ্র, আমি আপনার আ য় প্রার্থনা করছি। আপনি আমাকে এক ব্যক্তির অধীনে প্রেরণ ও তার নির্দেশ পালন করতে বলেছেন। তাই তার নির্দেশে এ পত্র বহন করে এনেছি। রাসূল (সা.) বললেন : আলীর বিষয়ে মন্দ বলো না। কেননা আলী আমা হতে এবং আমি আলী হতে। সে আমার পর তোমাদের ওপর অভিভাবক ও নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী।”[২৯২]

নাসায়ী তাঁর খাসায়িসুল আলাভীয়া গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় ঠিক এভাবে বর্ণনা করেছেন-

لا تبغضنّ يا بريدة فإنّ عليّا منّي و أنا منه و هو وليّكم بعدي

অর্থাৎ হে বুরাইদাহ্! যাতে আমি আলীর ওপর রাগান্বিত হই এমন কাজ কর না, কারণ আলী আমা হতে এবং আমি আলী হতে। সে আমার পর তোমাদের ওপর অভিভাবক।

ইবনে জারির[২৯৩] বুরাইদাহ্ হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন, "রাসূলের চেহারা অকস্মাৎ রক্তিম হয়ে গেল এবং তিনি বললেন : من كنت وليّه عليّ وليّه অর্থাৎ আমি যার অভিভাবক (ওয়ালী) আলীও তার অভিভাবক।"

বুরাইদাহ্ বলেন, "যা আমার মনে ছিল সব ভুলে গেলাম। মনে মনে বললাম আলীর বিষয়ে আর কখনো মন্দ বলব না।"

তাবরানী এ হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় এসেছে- যখন বুরাইদাহ্ ইয়েমেন হতে ফিরে মসজিদে গেলেন তখন তিনি দেখলেন কিছু সংখ্যক সাহাবী নবী (সা.)- এর ঘরের সামনে বসে রয়েছেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সালাম দিলে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের সফরের খবর কি?" তিনি বললেন, "উত্তম। আল্লাহ্ মুসলমানদের বিজয় দান করেছেন।" তাঁরা বললেন, "কেন অন্যদের পূর্বেই ফিরে এসেছ?" তিনি বললেন, "আলী নিজের জন্য একজন দাসী খুমসের অংশ থেকে নিয়েছে। তাই আমি নবীকে এ খবর দিতে এসেছি যাতে করে সে নবী (সা.)- এর সুনজর হতে বঞ্চিত হয়।" নবী (সা.) ঘরের মধ্য হতে একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বাইরে আসলেন ও বললেন, "কেন একদল আলীর বিষয়ে মন্দ বলে? তাদের উদ্দেশ্য কি? যে কেউ আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে প্রকৃতপক্ষে আমার প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে। যে আলী হতে বিচ্ছিন্ন হয়, সে আমা হতে বিচ্ছিন্ন হয়। আলী আমা হতে, সে আমার মাটি হতেই সৃষ্টি হয়েছে এবং আমি ইবরাহীমের মাটি হতে। আমি ইবরাহীম হতে উত্তম।[২৯৪] আমরা একই বংশের, একজন হতে অপরজনের সৃষ্টি। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। হে বুরাইদাহ্! তুমি কি জান না, আলী যে ক্রীতদাসীটি নিয়েছে তদাপেক্ষা অনেক বেশী গণীমতের অধিকারী? তার এ অধিকার রয়েছে কারণ সে আমার পর তোমাদের ওপর অভিভাবক।[২৯৫]

এই হাদীসটি যে রাসূল হতে বর্ণিত এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এবং বুরাইদাহ্ হতে কয়েকটি সূত্রে তা বর্ণিত হয়েছে যার সবগুলোই নির্ভরযোগ্য।

৪। এরূপ আরেকটি মূল্যবান হাদীস হাকিম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন যেখানে আলী (আ.)- এর দশটি বৈশিষ্ট্য ও ে ষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে নবী (সা.) আলীকে বলেছেন, “আমার পর তুমি সকল মুমিনের অভিভাবক হবে।”[২৯৬]

৫। আরেক স্থানে নবী (সা.) একটি হাদীসে আলী (আ.)- কে বলেছেন, “হে আলী! তোমার জন্য আল্লাহর নিকট পাঁচটি বস্তু চেয়েছিলাম। তন্মধ্যে চারটি তিনি দিয়েছেন ও একটি দেন নি.। যেগুলো দিয়েছেন তার মধ্যে একটি হলো তুমি আমার পর মুমিনদের অভিভাবক হবে।”[২৯৭]

৬। ‘আল ইসাবাহ্’ গ্রন্থে ওয়াহাবের পরিচিতি পর্বে ইবনে সাকান ওয়াহাব ইবনে হামযাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন, “আলীর সঙ্গে সফরে গিয়ে তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে সি ান্ত নিলাম রাসূল (সা.)- এর নিকট তার বিষয়ে অভিযোগ করবো। মদীনায় ফিরে রাসূলের নিকট আলী সম্পর্কে অভিযোগ করলে রাসূল বললেন : আলীর বিষয়ে এরূপ বলো না, সে আমার পর তোমাদের অভিভাবক।”

তাবরানীও তাঁর ‘কাবীর’ গ্রন্থে ওয়াহাব হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে রাসূলের কথাটি এভাবে এসেছে- আলী সম্পর্কে এরূপ বলো না, সে আমার পর তোমাদের ওপর সবচেয়ে বেশী অধিকারী।[২৯৮]

৭। ইবনে আবি আছেম মারফু (অবিচ্ছিন্ন) সূত্রে হযরত আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন : আমি কি মুমিনদের নিজেদের হতে তাদের ওপর অধিক অধিকার রাখি না? সবাই বলল : অবশ্যই। তিনি বললেন : আমি যার অভিভাবক (ওয়ালী) আলীও তার অভিভাবক।”

এ বিষয়ে আহলে বাইতের ইমামদের হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির। এখানে এটুকু বর্ণনাই যথেষ্ট মনে করছি। তদুপরি বেলায়েতের আয়াতটি আমাদের দাবীর সপক্ষে বলিষ্ঠ প্রমাণ। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর।

ওয়াসসালাম

শ

সাঁইত্রিশতম পত্র

২৯ জিলহজ ১৩২৯ হিঃ

‘ওয়ালী’ শব্দটির কয়েকটি সাধারণ অর্থ রয়েছে। আপনার দাবীর সপক্ষে কোরআন ও হাদীসের প্রমাণ কোথায়?

‘ওয়ালী’ শব্দের সাধারণ অর্থ সাহায্যকারী, বন্ধু এবং অভিভাবক যিনি কোন বিষয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, যেমন প্রতিবেশী, সহযোগী, আনুগত্যকারী, পরিবার প্রধান বুঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং যে হাদীস আপনি এনেছেন তার অর্থ বোধ হয় আলী আমার পরবর্তীতে তোমাদের সাহায্যকারী, বন্ধু, ভালবাসার পাত্র ও সহযো া। আপনার দাবীর সপক্ষে কোরআন ও হাদীসের প্রমাণ কোথায়?

ওয়াসসালাম

স

আটত্রিশতম পত্র

৩০ জিলহজ   ১৩২৯ হিঃ

১। ‘ওয়ালী’ শব্দের লক্ষ্য।

২। এ অর্থেই যে ‘ওয়ালী’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার সপক্ষে প্রমাণ।

১। ‘ওয়ালী’ শব্দের অনেকগুলো অর্থের মধ্যে ‘অভিভাবক’ একটি। যিনি কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনিই ‘অভিভাবক’। এই হাদীসেও ‘ওয়ালী’ সর্বাধিক ব্যবহৃত এ অর্থেই এসেছে। যেমন অক্ষম ব্যক্তির ‘ওয়ালী’ হলো তার পিতা, দাদা, তাদের নিযুক্ত অছি এবং শারয়ী হাকীম। কারণ তারা ঐ ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও তার সকল বিষয়ে অধিকার লাভ করেন।

২। হাদীসটিতে ‘ওয়ালী’ যে এ অর্থেই এসেছে তা বুি মান ব্যক্তিদের নিকট গোপন নয়, কারণ রাসূল (সা.) যখন বলেন, “সেই আমার পর তোমাদের অভিভাবক”

(و هو وليّكم بعدي) তখন তা বেলায়েত বা অভিভাবকত্বের অর্থই বুঝায়।[২৯৯] এ হাদীসটিতে ‘ওয়ালী’ শব্দটি অন্য কোন অর্থের সঙ্গে সঙ্গতিশীল নয়, কারণ বন্ধুত্ব, ভালবাসা, সহায়তা প্রভৃতি অর্থ বিশেষ ব্যক্তির জন্য উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় এবং স্বাভাবিকভাবেই মুমিন পুরুষ ও নারী একে অপরের বন্ধু ও সাহায্যকারী।

যদি ‘ওয়ালী’ শব্দের অর্থ এখানে ‘অভিভাবক’ ব্যতীত অন্য কিছু হত তবে তা বিশেষ কোন মর্যাদা বা ে ষ্ঠত্বের বিষয় নয় যে রাসূল তাঁর ভাইয়ের জন্য এমন অবস্থায় তা উল্লেখ করবেন। কি গোপন রহস্য রয়েছে যার কারণে নবী (সা.) এরূপ কষ্ট করে কথাগুলো বলবেন?! রাসূল (সা.) বরং কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পরিষ্কার করার জন্য এরূপ করেছেন।

মহানবী (সা.)- এর সুস্পষ্ট প্রজ্ঞা, তাঁর নি াপত্ব এবং শেষ নবী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব তাই সাধারণ এ সকল ধারণার উর্ধ্বে। তদুপরি হাদীসগুলো থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব নবীর পর শুধু আলী (আ.)- এর জন্যই নির্দিষ্ট। এ কারণেই আমরা ‘ওয়ালী’ শব্দের

উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ করেছি এবং এটি ব্যতীত অন্যান্য অর্থ, যেমন সাহায্যকারী, বন্ধু ও ভালবাসার পাত্র প্রভৃতির সঙ্গে তা সাম স্যপূর্ণ নয়। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, আলী (আ.) যখন কিশোর ছিলেন তখন হতে রাসূলের সান্নিধ্যে প্রশিক্ষিত হয়েছেন। এই রেসালতের ক্রোড়েই তিনি যৌবনে পৌঁছেছেন। সেই কৈশোর হতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মুসলমানদের সাহায্যকারী ছিলেন এবং সকল সময়েই মুসলমানদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ও বন্ধুত্ব ছিল। তাই মুসলমানদের বন্ধু, সাহায্যকারী ও তাদের প্রতি ভালবাসার বৈশিষ্ট্যগুলো নবীর মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই।

অপর যে হাদীসটি আমাদের দাবীর সপক্ষে প্রমাণ তা হলো মুসনাদে আহমাদের ৫ম খণ্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় বুরাইদাহ্ হতে ইবনে আব্বাস ও সাঈদ ইবনে যুবাইর সূত্রে বর্ণিত হাদীস। বুরাইদাহ্ বলেছেন, "ইয়েমেনের যু আলীর সঙ্গে ছিলাম। তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। তাই নবী (সা.)- এর নিকট পৌঁছে তার বিষয়ে অভিযোগ করলে তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং তিনি বললেন :

يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعليٌّ مولاه

হে বুরাইদাহ্! আমি কি মুমিনদের ওপর তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক অধিকার রাখি না? আমি বললাম : অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : আমি যার মাওলা (অভিভাবক) আলীও তার মাওলা।"

হাকিম নিশাবুরী তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১১০ পৃষ্ঠায় হাদীসটি এনেছেন এবং বলেছেন সহীহ মুসলিমের শর্তানুসারে হাদীসটি সহীহ।

যাহাবী তাঁর 'তালখিসে মুসতাদরাক' গ্রন্থে মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটিকে বিশু বলেছেন। আপনি জানেন, 'আমি কি মুমিনদের নিজেদের অপেক্ষা তাদের ওপর অধিক অধিকার রাখি না' বাক্যটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যা আমাদের দাবীর সত্যতাকে সুস্পষ্ট করে।

যে কেউ এ হাদীসগুলোর প্রতি এবং এর পরিবেশ- পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতাকে লক্ষ্য করবে, নিঃসন্দেহে তার নিকট সুস্পষ্ট হবে যে, আমাদের দাবী সত্য। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

ওয়াসসালাম

শ

উনচল্লিশতম পত্র

৩০ জিলহজ   ১৩২৯ হিঃ

বেলায়েতের আয়াত সম্পর্কে আলোচনার আহবান।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আলোচনার ময়দানে আপনি সত্যবাদী, বিতর্কে আপনি দৃঢ়পদ। এ বিষয়ে আপনি এতটা শক্তিশালী যে, আপনার প্রতিপক্ষ আপনার বিরোধিতার শক্তি হারিয়ে ফেলে ময়দানে রণভঙ্গ দিতে বাধ্য হবে।

আমি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে আপনার বর্ণিত হাদীসসমূহের দলিল- প্রমাণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করছি। যদি সাহাবীদের নির্দেশানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব না হত তবে হয়তো আপনার কথা আমি মেনে নিতাম। যেহেতু পূর্ববর্তী সৎ কর্মশীল সাহাবীদের অনুসরণ অপরিহার্য তাই বাহ্যিকভাবে হাদীসগুলোর যে অর্থ আমরা বুঝেছি তা গ্রহণ করতে পারছি না।

আপনি আপনার পত্রের শেষে একটি সুস্পষ্ট আয়াত বর্ণিত হাদীসসমূহের পক্ষে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন কিন্তু আয়াতটি কিরূপে আপনাদের দাবীকে সত্য প্রমাণ করে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি। আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রদান করে তাতে আমাদের চিন্তা করার সুযোগ দিন।

ওয়াসসালাম

স

চল্লিশতম পত্র

২ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

১। বেলায়েতের আয়াত আলী (আ.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

২। আয়াতটির শানে নুযূল (অবতীর্ণ হবার পটভূমি)।

৩। আয়াতটির ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন।

১। আল কোরআনের একটি সুস্পষ্ট আয়াত আপনার অবগতির জন্য পড়ছি। আর এটি হলো সূরা মায়েদাহর ৫৫- ৫৬ নং আয়াত-

(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (৫৫) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ)

তোমাদের ওয়ালী বা অভিভাবক হলেন একমাত্র আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও সেসব ব্যক্তি যারা ঈমান এনেছে, নামায কায়েম করেছে এবং রুকু অবস্থায় যাকাত দিয়েছে। যে কেউ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের ভালবাসে[৩০০] ও সৎ কর্ম করে (সে নিজ দায়িত্ব পালন করেছে) নিশ্চয়ই আল্লাহর দল বিজয়ী হবে।

এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এ আয়াতটি আলী (আ.)- এর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যখন তিনি রুকুরত অবস্থায় ভিক্ষুককে তাঁর আংটি দান করেন।

২। হযরত আলী রুকুরত অবস্থায় ভিক্ষুককে নিজ আংটি দান করলে আল্লাহ্ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। এ সম্পর্কিত হাদীস রাসূল (সা.)- এর আহলে বাইতের ইমামদের হতে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অন্যদের হতে বর্ণিত এ সম্পর্কিত হাদীস (যেমন ইবনে সালাম হতে বর্ণিত হাদীস) মারফু তাই প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনের জন্য তা যথেষ্ট। এজন্য সহীহ নাসায়ী অথবা ‘জাম বাইনা সিহাহ সিত্তাহ্’ গ্রন্থে সূরা মায়েদাহর তাফসীর দেখুন। এছাড়া হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস সূত্রেও এ সম্পর্কিত হাদীস মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস বর্ণিত

হাদীসটি ওয়াহেদীর ‘আসবাবুন নুযূল’ গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে এসেছে। খাতীব বাগদাদী তাঁর ‘আল মুত্তাফিক’[৩০১] গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবু আশশাইল ও ইবনে মারদুইয়া তাঁদের মুসনাদে হযরত আলীর হাদীসটি এনেছেন। এ আয়াতটি যে আলী (আ.)- এর বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে তা সকল মুফাসসিরই স্বীকার করেছেন। এজন্য ‘কানযুল উম্মাল’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪০৫ পৃষ্ঠার ৬১৩৭ নং হাদীসটি দেখুন।

আহলে সুন্নাহর কয়েকজন প্রসি আলেম এ বিষয়ে যে ইজমা রয়েছে তা তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যেমন ইমাম কুশচী তাঁর ‘শারহে তাজরীদ’ গ্রন্থে ইমামতের আলোচনায় তা এনেছেন। ‘গায়াতুল মারাম’ গ্রন্থে অষ্টাদশ অধ্যায়ে উপরোক্ত আয়াতের শানে নুযূলে আমাদের অনুরূপ ২৪টি হাদীস আহলে সুন্নাহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি যদি আকাশের সূর্যের মত সুস্পষ্ট না হত আর আমার লেখাকেও যদি সংক্ষিপ্ত করতে না হত তবে এতদসংক্রান্ত সকল সহীহ হাদীস এখানে লিপিব করতাম। যা হোক, আলহামদুলিল্লাহ্ এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আহলে সুন্নাহর সূত্রে বর্ণিত এরূপ একটি হাদীস যা ইমাম আবু ইসহাক আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম নিশাবুরী সা’লাবী[৩০২] বর্ণনা করেছেন তা এখানে উল্লেখ করছি। তিনি তাঁর ‘তাফসীরে কাবীর’ গ্রন্থে উক্ত আয়াতের স্থানে হযরত আবু যর গিফারী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, “আমার এই দু’কর্ণ দ্বারা রাসূল (সা.)- কে বলতে শুনেছি (যদি না শুনে থাকি তবে তা বধির হোক), আমার এই দু’চোখ দিয়ে আমি দেখেছি (যদি না দেখে থাকি তবে তা অন্ধ হোক), নবী (সা.) বলতেন : আলী সৎ কর্মশীলদের নেতা ও অস্বীকারকারীদের হত্যাকারী। সে- ই সম্মানিত যে আলীকে সাহায্য করবে আর সে- ই লাঞ্ছিত যে আলীকে লাঞ্ছিত করতে চায়। জেনে রাখ, আমি একদিন রাসূলের সঙ্গে মসজিদে নামাযরত ছিলাম। একজন ভিক্ষুক মসজিদে এসে কিছু চাইল। কেউ তাকে সাহায্য না করলে আলী তাঁর কনিষ্ঠা আঙ্গুল (যাতে আংটি ছিল) দ্বারা তাকে ইশারা করলেন। ভিক্ষুক তাঁর নিকটবর্তী হয়ে আংটিটি খুলে নিল। অতঃপর রাসূল (সা.) আল্লাহর দরবারে অনুনয় করে প্রার্থনা করে বললেন : হে আল্লাহ্! আমার ভ্রাতা মূসা আপনার নিকট প্রার্থনা করে বলেছিলেন : আমার বক্ষকে প্রসারিত করে দিন, আমার কাজকে আমার নিকট সহজ করে দিন। আমার জিহ্বার জড়তা

দূর করে দিন যাতে আমার কথা অন্যরা বোঝে। আমার ভাই হারুনকে আমার সহযোগী বানিয়ে দিন। তার মাধ্যমে আমার মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করুন এবং আমার কাজে তাকে অংশীদার করুন যাতে করে আপনার আরো অধিক প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে পারি। আপনি আমাদের ওপর সর্বদ্রষ্টা। হে আল্লাহ্! আপনি মূসাকে বলেছিলেন : তোমার প্রার্থনা আমি গ্রহণ করলাম। তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হলো। হে আল্লাহ্! আমিও আপনার বান্দা ও রাসূল। আমাদের হৃদয়ের প্রসারতা দান করুন। আমার কাজকে সহজ করে দিন। আমার পরিবার হতে আলীকে আমার সহযোগী করুন। তার মাধ্যমে আমার মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করুন।”

হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, “আল্লাহর শপথ, তখনও রাসূলের দোয়া করা শেষ হয় নি, হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে আসলেন-

(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (٥٥) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ)

৩। আপনি (আপনার মাধ্যমে আল্লাহ্ সত্যকে সাহায্য করুন) জানেন যে, এখানে ‘ওয়ালী’ অর্থ ‘অভিভাবক হিসেবে অধিকার লাভ’। যেমন আমরা বলি অমুক ব্যক্তি অমুকের অভিভাবক। আরবী ভাষাবিদরা বলেন, كلّ من ولى أمر أحد فهو وليّه অর্থাৎ যে কেউ কারো কোন বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে সে ঐ ব্যক্তির ওয়ালী।

সুতরাং এ আয়াতের অর্থ হবে একমাত্র যে ব্যক্তি তোমাদের বিভিন্ন বিষয়ে তোমাদের ওপর দায়িত্ব লাভ করেছেন (অভিভাবক হিসেবে অধিকার লাভ করেছেন) তিনি একমাত্র আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আলী (যেহেতু ঈমান আনয়ন, নামায আদায় ও রুকুরত অবস্থায় যাকাত দানের বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু তাঁর মধ্যেই ছিল এবং তাঁর বিষয়েই আল্লাহ্ এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন)।

মহান আল্লাহ্ বেলায়েত ও অভিভাবকত্বের এই অধিকারকে তাঁর নিজের জন্য, তাঁর রাসূল (সা.) ও উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তির (আলীর) জন্য একইভাবে বর্ণনা করে নির্দিষ্ট করেছেন। আপনি জানেন, মহান আল্লাহর বেলায়েত সর্বজনীন। সুতরাং তাঁর রাসূল ও নিয়োজিত ওয়ালীর বেলায়েতও সর্বজনীন ও একই পন্থায় কার্যকর। সুতরাং আমরা এর অর্থ সাহায্যকারী, ভালবাসার

পাত্র, বন্ধু ইত্যাদি করবো তা বৈধ হবে না। তদুপরি বাক্যের প্রথমে إِنَّمَا (একমাত্র) ব্যবহার করায় বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর।

ওয়াসসালাম

শ

একচল্লিশতম পত্র

৩ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

আলোচ্য আয়াতে الّذين آمنوا বহুবচন এসেছে। কিভাবে তা একবচনে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব?

আপনার কথার পরিপ্রেক্ষিতের বলা যায়

(و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلوة و يؤتون الزّكوة و هم راكعون)

বাক্যটিতে সবস্থানেই বহুবচন এসেছে। তাই বহুবচনই এর বাস্তবতা। সেক্ষেত্রে কিভাবে তা হযরত আলী (কাঃ)- এর জন্য প্রযোজ্য হবে। যেহেতু তিনি এক ব্যক্তি। এ বিষয়ে আপনার জবাব কি?

ওয়াসসালাম

স

বিয়াল্লিশতম পত্র

৪ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

১। আরবরা একবচনের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো বহুবচনের ব্যবহার করে।

২। এর সপক্ষে নমুনা উপস্থাপন।

৩। এ বিষয়ে তাবারী যা বলেছেন।

৪। এ বিষয়ে যামাখশারী যা বলেছেন।

৫। আমি যা মনে করি।

১। আরবরা একবচনের জন্যও বহুবচন ব্যবহার করে থাকে। পরিস্থিতির এরূপ দাবীর কারণেই এমনটি করা হয়।

২। এ কথার সপক্ষে দলিল হিসেবে সূরা আলে ইমরানের ১৭৩ নম্বর আয়াতকে আমরা উল্লেখ করতে পারি যেখানে বলা হয়েছে-

(الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)

যাদেরকে লোকেরা বলেছে তোমাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে (বহু সাজ- সর ামসহ), তাদের ভয় কর, তখন তাদের বিশ্বাস (ঈমান) আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, কতই না উত্তম সংরক্ষণকারী তিনি!

আমরা জানি এখানে বক্তা এক ব্যক্তি, সে হলো নাঈম ইবনে মাসউদ আশজাঈ (মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও হাদীসবেত্তাগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন)।

মহান আল্লাহ্ এখানে এক ব্যক্তিকে বোঝাতে 'আন্- নাস' শব্দ ব্যবহার করেছেন যা বহুবচন। এখানে বহুবচন ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো যে সকল ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির অসত্য ও ভিত্তিহীন কথায় কর্ণপাত করেন নি তাঁদের সম্মানিত করা। কথিত আছে, আবু সুফিয়ান ঐ ব্যক্তিকে দশটি উট দান করে যাতে সে এরূপ গুজবের মাধ্যমে মুসলমানদের ভীত ও দুর্বল করতে চেষ্টা চালায়। তাই সে

এ কাজ করে। সে মুসলমানদের নিকট এসে বলে, “হে লোকসকল! মুশরিকদের যো ারা তোমাদের বিরুে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, তাদের হতে ভীত হও।” মুসলমানদের অধিকাংশই এ কথা শুনে আবু সুফিয়ানের বিরুে যু করতে দ্বিধা-দ্বে পতিত হলে রাসূল (সা.) সত্তর জন অশ্বারোহী নিয়ে সেদিকে যাত্রা করেন। এ আয়াত এই সত্তর জন ব্যক্তির শানে অবতীর্ণ হয়েছিল যাঁরা ঐ গুজবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ ও কর্ণপাত করেন নি।

সুতরাং এখানে ‘আন্‌- নাস’ একবচনের স্থানে ব্যবহার একটি সম্মানের বিষয়। যেহেতু যে সত্তর জন ব্যক্তি রাসূলের সঙ্গে যাত্রা করেন তাঁদের জন্য অলঙ্কারিকভাবে অধিকতর উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা উচিত সেজন্য সেখানে الّذين قال لهم رجل إنّ النّاس قد جمعوا ‘যাদেরকে একজন ব্যক্তি বলেছিল’ না বলে الّذين قال لهم النّاس ‘তাদেরকে লোকসকল বলেছিল’ বলা হয়েছে।

এরূপ বিষয় আল্লাহর বাণীতে, রাসূলের হাদীসে এবং আরবদের কথায় প্রচুর লক্ষ্য করা যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ)

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল তখন তিনি তাদের হস্ত তোমাদের হতে প্রতিহত করে দিলেন।”

এখানে উল্লেখ্য, উপরোক্ত আয়াতে সম্প্রদায় বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে ঘটনা হলো বনি মাহারেব গোত্রের গুরাস নামক এক ব্যক্তি বনি নাজির গোত্রের আমর ইবনে জাহাশের নির্দেশে অস্ত্রধারণ করতঃ রাসূলের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করে। তখন আল্লাহ্ রাসূলকে তা অবহিত করার মাধ্যমে রক্ষা করেন। এ ঘটনাটি মুফাসসির ও হাদীসবিদগণ উল্লেখ করেছেন। ইবনে হিশাম তাঁর সিরাত গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে ‘জাতুর রিকাহ্’ নামক যু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ কওম বা সম্প্রদায় শব্দটি বহুবচন হওয়া সে ও এই এক ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করেছেন কারণ এ ঘটনায় রাসূলের জীবন রক্ষা পায় যা মুসলমানদের প্রতি বিশেষ রহমত বলে গণ্য।

তেমনি মুবাহিলার আয়াতে 'আবনা', 'নিসা' ও 'আনফুস' শব্দগুলো সর্বজনীন হওয়া স ে ও ইমাম হাসান ভ্রাতৃদ্বয়, হযরত ফাতিমা ও হযরত আলীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এটি সর্বসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার কারণেই তা করা হয়েছে।

এ উদাহরণসমূহ একবচনের স্থানে বহুবচন ব্যবহারকে অদূষণীয়, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে অলঙ্কারশাস্ত্রের জন্য অপরিহার্য বলে প্রমাণ করে।

৩। ইমাম তাবারসী তাঁর 'মাজমাউল বায়ান' গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতের (বেলায়েতের আয়াত) তাফসীরে বলেছেন, "এখানে বহুবচন বাচক শব্দ হযরত আলীর জন্য ব্যবহার তাঁর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের নিমিত্তে করা হয়েছে। কারণ ভাষাবিদগণ একবচনের স্থলে বহুবচনের ব্যবহার এ উদ্দেশ্যেই করে থাকেন। এটি এতটা প্রসি রীতি যে, দলিল- প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়ে না।

৪। যামাখশারী তাঁর 'তাফসীরে কাশশাফ' গ্রন্থে বলেছেন, "যদি প্রশ্ন করা হয় বহুবচন সূচক শব্দ কিরূপে হযরত আলীর জন্য ব্যবহার করা হলো, তার উত্তরে বলব যদিও একের অধিক ব্যক্তি এরূপ কাজ সম্পাদন করে নি তদুপরি যাতে মানুষ এরূপ কাজের প্রতি উৎসাহিত হয় এবং ত প সম্মান লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালায় সেজন্যই এখানে বহুবচন সূচক শব্দ একবচনের স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলমানদের অপরিহার্যরূপে দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি সাহায্যের ক্ষেত্রে আগ্রহী করে তোলার জন্য নামাযের মধ্যেও তা বিলম্বিত না করার শিক্ষা এখানে দেয়া হয়েছে।"

৫। একবচনের স্থলে বহুবচনের ব্যবহারের বিষয়টি আমার দৃষ্টিতে এসব হতেও সূক্ষ্ম একটি বিষয় এবং এটি অধিকাংশ মানুষের জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমতের ফলশ্রুতিতে দান করা হয়েছে। কারণ হযরত আলী ও বনি হাশিমের প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা ও শত্রুতা পোষণকারী মুনাফিকরা ও অন্যদের মধ্যে যারা তাঁর হতে অগ্রগামী হবার ইচ্ছা পোষণ করত তারা একবচনের মাধ্যমে বিষয়টি হযরত আলীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়াকে কোন ক্রমেই মেনে নিতে পারত না। যেহেতু তখন সত্যকে আড়াল করার সরাসরি কোন সুযোগ তারা পেত না তাই সম্ভাবনা ছিল তা করতে ব্যর্থ হয়ে তারা এমন কর্মে লিপ্ত হত যার ফলশ্রুতিতে ইসলামই বিপন্ন হয়ে পড়ত। এখানে একবচনের

স্থানে বহুবচন ব্যবহারের মাধ্যমে সে পথ বন্ধ করা হয়েছে এবং রাসূল (সা.) হতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হাদীসসমূহের মাধ্যমে বেলায়েতের বিষয়টিকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। রাসূলের মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হবার প্রক্রিয়া সেদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল যেদিন দীনকে পূর্ণাঙ্গ ও নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করেন। যে বিষয়টি গ্রহণে জনসাধারণ কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয় সে বিষয়ের প্রচারে এরূপ প্রজ্ঞাপূর্ণ পদক্ষেপেরই প্রয়োজন। নতুবা একবচনের মাধ্যমে বিষয়টি নির্দিষ্ট হলে তারা একগুঁয়েমীবশত সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করত।

এ গুরুত্বপূর্ণ দিকটি শুধু এ আয়াতের জন্য নয়, বরং কোরআনের যে সকল আয়াত আলী (আ.) ও আহলে বাইতের শানে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর জন্যও প্রযোজ্য এবং বিষয়টি সুস্পষ্ট। এই বিষয়টিকে আমি আমার 'সাবিলুল মুমিনীন ওয়া তানযিলুল আয়াত' গ্রন্থে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণসহ উপস্থাপন ও স্পষ্ট করেছি। হেদায়েত ও তৌফিকের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করছি।

ওয়াসসালাম

শ

তেতাল্লিশতম পত্র

৪ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

আয়াতের ধরন ও প্রেক্ষাপট থেকে বোঝা যায় যে, এখানে ‘ওয়ালী’ বলতে ‘বন্ধু’ বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহ্ আপনার পিতাকে পুরস্কৃত করুন। আপনি আমার মন হতে সন্দেহ দূর করেছেন ও সত্যকে আমার নিকট প্রকাশ করেছেন। তবে একটি বিষয় আমার নিকট পরিষ্কার নয়, তা হলো আয়াতটি কাফেরদের বন্ধু ও ওয়ালী হিসেবে গ্রহণের বিরোধিতার ধারাবাহিকতায় এসেছে কারণ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াত হতে তাই বোঝা যায়। এটি এর সপক্ষে অন্যতম দলিল যে আয়াতে ‘ওয়ালী’র উদ্দেশ্য ‘সাহায্যকারী’, ‘বন্ধু’ ও ‘ভালবাসার পাত্র হিসেবে গ্রহণ’। অনুগ্রহপূর্বক ব্যাখ্যা দান করুন।

ওয়াসসালাম

স

চুয়াল্লিশতম পত্র

৫ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

১। আয়াতের ধরন ও বর্ণনাভঙ্গী হতে বন্ধু ও সাহায্যকারীর অর্থ প্রমাণিত হয় না।

২। সুস্পষ্ট হাদীস ও বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য দেখা দিলে হাদীস অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

১। আয়াতটি এর পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ যেখানে কাফেরদের বন্ধু (ওয়ালী) হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা হতে ভিন্ন। এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতা হতে পৃথক হয়ে হযরত আলীর প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ এ আয়াতে হযরত আলী ও তাঁর বংশধরদের ইমামত ও নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর বিরোধীদের এ বিষয়ে বিরোধিতা হতে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। তার প্রমাণ হলো নিম্নোক্ত আয়াত-

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)

হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দীন হতে ফিরে যাবে অচিরেই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি বিনয়ী ও নম্র হবে ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না।[৩০৩]

এই আয়াত হযরত আলীর জন্যই প্রযোজ্য এবং অন্যদেরকে তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের ক্ষমতা ও শক্তি হতে ভীতি প্রদর্শন করছে। এ বিষয়টি হযরত আলী (আ.) জামালের যু সকলকে স্মরণ করিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। ইমাম সাদিক ও বাকির (আ.)- ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সা'লাবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামাহ্ তাবারসী তাঁর 'মাজমায়ুল বায়ান' গ্রন্থে

হযরত আম্মার, হুজাইফা ও ইবনে আব্বাস হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শিয়া আলেমদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে।

আহলে বাইতের ইমামদের হতে সহীহ ও মুতাওয়াতির সূত্রে এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং বেলায়েতের আয়াতটি ইমামতের অপরিহার্যতা ও হযরত আলীর নেতৃত্বের গুরুত্ব বর্ণনার পর (পূর্ববর্তী আয়াতে) তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। তাই কিরূপে আমরা বলতে পারি আয়াতটি কাফিরদের বন্ধুত্ব প্রত্যাখানের আয়াতের ধারাবাহিকতায় অবতীর্ণ হয়েছে?

২। দ্বিতীয়ত রাসূল (সা.) আহলে বাইতের ইমামদের কোরআনের সমমর্যাদায় স্থান দিয়েছেন ও ঘোষণা করেছেন এরা একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন হবে না। সুতরাং তাঁরা কোরআনের সমওজনের ভারী বস্তু (ثقل) যাঁদের মাধ্যমে সঠিক পথের পরিচয় পাওয়া যাবে। আমরা দেখি, তাঁদের হতে মুতাওয়াতির সূত্রে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে তাঁরা উক্ত আয়াত হযরত আলীর বেলায়েত ও খেলাফতের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং 'ওয়ালী' শব্দের আমরা যে অর্থ করেছি সে অর্থই গ্রহণ করেছেন। কোরআনের আয়াতের ধারাবাহিকতা ও পারিপার্শ্বিকতা কেন্দ্রিক অর্থ সুস্পষ্ট হাদীসের বিরোধী হলে তা অগ্রহণযোগ্য যেহেতু সকল মুসলমানই এ বিষয়ে একমত যে, সহীহ হাদীসের পারিপার্শ্বিকতাকেন্দ্রিক অর্থের ওপর প্রাধান্য রয়েছে। তাই এ দু'য়ের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিলে হাদীসকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ এটি নিশ্চিত নয় যে, আয়াতটি ঐ ধারাবাহিকতা ও পারিপার্শ্বিকতাতেই অবতীর্ণ হয়েছে আর এ বিষয়েও সকল মুসলমান একমত যে, কোরআন সংকলন যে ধারাবাহিকতায় হয়েছে তা অবতীর্ণ হবার ধারাবাহিকতায় নয়। কোরআনে এরূপ প্রচুর আয়াত রয়েছে যেখানে নাযিলের ধারাবাহিকতায় সংকলিত হয় নি, যেমন আয়াতে তাতহীর মহানবী (সা.)- এর স্ত্রীদের আলোচনার ধারাবাহিকতায় এসেছে যদিও তা ভিন্ন সময় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে, আয়াতে তাতহীর আহলে বাইতের পাঁচ জনের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তদুপরি আয়াতের ধারাবাহিকতা ও পারিপার্শ্বিকতা কেন্দ্রিক অর্থ গ্রহণ না করলে তা কোরআনের অলঙ্কারশাস্ত্রের মু'জিযা হবার ক্ষেত্রে কোন

নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না। তাই যখন অকাট্য দলিল হাতে রয়েছে তখন ধারাবাহিকতা ও পারিপার্শ্বিকতাকে অগ্রাহ্য করায় কোন অপরাধ নেই।

ওয়াসসালাম

শ

পঁয়তাল্লিশতম পত্র

৬ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

পূর্ববর্তীদের কার্যাবলীর সি তা প্রমাণের জন্য এরূপ অর্থকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে আমরা বাধ্য।

যদি খোলাফায়ে রাশেদীনের সকল কর্মকাণ্ড স্বতঃসি বলে বিশ্বাস না করতাম তবে এরূপ আয়াতের ব্যাখ্যায় আপনার যুক্তি ও বিশ্বাসকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু যেহেতু তাঁদের খেলাফতের বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই সেহেতু তাঁদের কর্মের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য ভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করতে আমরা বাধ্য।

ওয়াসসালাম

স

ছেচল্লিশতম পত্র

৬ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

১। পূর্ববর্তীদের কর্মের স্বতঃসি তা আয়াতের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যার অপরিহার্যতা প্রমাণ করে না।

২। ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা অসম্ভব।

আপনি যে খলীফাদের কথা বলছেন খোদ তাঁদের তিনজনের বিষয়ে পৃথক মৌলিক আলোচনা হওয়া উচিত। সুতরাং তাঁদেরকে সুস্পষ্ট হাদীসের মোকাবিলায় আনয়ন অযৌক্তিক। আমরা পরবর্তীতে ঐ বিষয়ের যুক্তিসি তা নিয়ে আলোচনা করবো।

১। সুতরাং তাঁদের কর্মকাণ্ড এবং অন্যরা তাঁদের হাতে বাইয়াত করার বিষয়টি হাদীসকে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যার কারণ হতে পারে না। যদি সুযোগ হয় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আশা রাখি।

২। আপনার জন্য যে হাদীসটি বর্ণনা করেছি এবং ত   প অন্যান্য হাদীস, যেমন গাদীরের হাদীস ও ওসিয়তের হাদীসসমূহকে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। বিশেষত এই সকল হাদীসের সহযোগী হাদীসসমূহও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য যা সুস্পষ্ট এ সকল হাদীস হতে গুরুত্বের দিক থেকে কম নয়। তাই যে কেউ এ হাদীসগুলোকে ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবে সে এগুলোকেই অকাট্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে পাবে।

ওয়াসসালাম

শ

সাতচল্লিশতম পত্র

৭ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

ভাল হত যদি আপনি এর সমর্থনকারী হাদীসসমূহ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করতেন। কেন পূর্বে আলোচনার ঐ স্থানেই তা আনলেন না?

ওয়াসসালাম

স

আটচল্লিশতম পত্র

৮ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

হাদীসটির সমর্থনে চল্লিশটি হাদীস।

এ সম্পর্কিত চল্লিশটি হাদীস আপনার জন্য যথেষ্ট মনে করছি।

১। রাসূল (সা.) আলী (আ.)- এর কাঁধে হাত রেখে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেন,

هذا إمام البررة قاتل الفجرة منصور من نصره,مخذول من خذله

"এই আলী সৎ কর্মশীলদের ইমাম, অন্যায়কারীদের হন্তা, যে তাকে সাহায্য করবে সে সাফল্য লাভ করবে (সাহায্য প্রাপ্ত হবে) এবং যে তাকে হীন করার চেষ্টা করবে সে নিজেই হীন হবে।" হাদীসটি হাকিম নিশাবুরী তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২৯ পৃষ্ঠায় জাবের বিন আবদুল্লাহ্ আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন।[৩০৪] অতঃপর তিনি বলেছেন, "এই হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে তদুপরি বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেন নি।"

২। নবী (সা.) বলেছেন, "আলী সম্পর্কে আমার প্রতি তিনটি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে :

إِنَّهٌ سيّد الْمسلمين و إمام الْمتّقين و قائد الغرّ الْمُحجّلين

নিশ্চয়ই সে মুসলমানদের নেতা, মুত্তাকীদের ইমাম এবং নূরানী ও শুভ্র মুখমণ্ডলের অধিকারীদের সর্দার।"

হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠায় হাদীসটি এনেছেন[৩০৫] ও বলেছেন, "হাদীসটি সনদের দিক হতে বিশু কিন্তু বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেন নি।"

৩। নবী (সা.) বলেছেন, "আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে যে, আলী মুসলমানদের নেতা, মুত্তাকীদের অভিভাবক এবং শুভ্র ও উ ল কপালের অধিকারীদের (সৌভাগ্যবানদের) সর্দার।" ইবনে নাজ্জার[৩০৬] ও অন্যান্য সুনান লেখকগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪। নবী হযরত আলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

مرحبا بسيّد المسلمين و إمام المتقين

“হে মুসলমানদের নেতা ও মুত্তাকীদের ইমাম! তোমাকে সাধুবাদ।” আবু নাঈম তাঁর ‘হুলইয়াতুল আউলিয়া’[৩০৭] গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

৫। একদিন রাসূল (সা.) ঘোষণা করলেন, “প্রথম যে ব্যক্তি এ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে সে মুত্তাকীদের ইমাম, মুসলমানদের নেতা, দীনের মধুমক্ষিকা (সংরক্ষণকারী), সর্বশেষ নবীর প্রতিনিধি ও উ ল মুখমণ্ডলের অধিকারীদের সর্দার।” তখন আলী ঐ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলে নবী (সা.) তাঁকে এ সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করলেন ও তাঁর কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, “তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করবে, আমার বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেবে, যে বিষয়ে তারা মতদ্বৈততা করবে তুমি তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবে।[৩০৮]

৬। নবী (সা.) বলেছেন, “আল্লাহ্ আমার নিকট আলীকে এভাবে বর্ণনা করেছেন- আলী হেদায়েতের ধ্বজাধারী, আমার আউলিয়া অর্থাৎ বন্ধুদের ইমাম, আমার আনুগত্যকারীদের আলোকবর্তিকা এবং সে এমন এক আদর্শ মুত্তাকীদের উচিত অপরিহার্যরূপে যার পদাঙ্কনুবর্তী হওয়া।”[৩০৯]

লক্ষ্য করুন এই ছয়টি সহীহ হাদীস তাঁর ইমামত ও আনুগত্যের অপরিহার্যতাকে কিরূপে সুস্পষ্ট করছে! তাঁর ওপর সালাম বর্ষিত হোক।

৭। নবী (সা.) আলীর প্রতি ইশারা করে বলেন, “এই প্রথম ব্যক্তি যে আমার প্রতি ঈমান এনেছে ও প্রথম ব্যক্তি হিসেবে সে কিয়ামতে আমার সঙ্গে হাত মিলাবে, সে সিদ্দীকে আকবর ও ফারুক (এই উম্মতের সত্যপন্থী ও অসত্যপন্থীদের মধ্যে পার্থক্যকারী), সে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সীমারেখা টানবে এবং সে মুমিনদের সংরক্ষণকারী।”[৩১০]

৮। নবী বলেছেন, “হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি চাও তোমাদের আমি এমন বিষয়ের প্রতি নির্দেশনা দেব যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো গোমরাহ ও বিপথগামী হবে না? সেটি হলো আলী। আমাকে তোমরা যেরূপ ভালবাস তাকেও সেরূপ ভালবাস। আমাকে যেরূপ া কর তাকেও সেরূপ া ও সম্মান কর এবং আমি তোমাদের যা বলছি তা আল্লাহ্ জিবরাঈলের মাধ্যমে আমাকে বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।”[৩১১]

৯। নবী (সা.) বলেছেন,

أنا مدينة العلم و عليّ بابُها فمن أراد المدينة فليأت الباب

"আমি জ্ঞানের শহর ও আলী তার দ্বার এবং যে কেউ শহরে প্রবেশ করতে চাইলে দ্বার দিয়েই প্রবেশ করবে।"[৩১২]

১০। নবী (সা.) বলেছেন, أنا دار الحكمة و عليّ بابُها "আমি প্রজ্ঞার ঘর আলী তার দরজা।"[৩১৩]

১১। নবী (সা.) বলেছেন, "আলী আমার জ্ঞানের প্রবেশ দ্বার ও আমি যে বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি আমার পরে আমার উম্মতের জন্য সে তার ব্যাখ্যাকারী। তার ভালবাসা ও বন্ধুত্বই ঈমান এবং তার শত্রুতাই নিফাক।"[৩১৪]

১২। নবী (সা.) আলীকে বলেন, "তুমি আমার পর উম্মত যে বিষয়ে দ্বিধাদ্বে পতিত হবে সে বিষয়ে ব্যাখ্যাদানকারী।"

হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায় আনাস ইবনে মালিক হতে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন[৩১৫] যে, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে হাদীসটি বিশু তদুপরি তাঁরা তা বর্ণনা করেন নি।

আমার মতে যে কেউ এই হাদীস এবং এর অনুরূপ অন্যান্য হাদীস নিয়ে চিন্তা করলে দেখবেন (বুঝবেন), আলী (আ.)- এর সঙ্গে রাসূলের সম্পর্ক রাসূলের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্কের ন্যায়। কারণ নবীকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি আপনার প্রতি এ জন্যই গ্রন্থ নাযিল করেছি যাতে আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্য যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে সে বিষয় পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন এবং এই কোরআন মুমিনদের জন্য রহমত ও হেদায়েতের উপকরণ।"[৩১৬] নবীও আলীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তুমি আমার পর যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করবে সে বিষয়ে ব্যাখ্যাদানকারী (তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে তা বর্ণনাকারী)।"

১৩। নবী (সা.) হতে আরেকটি হাদীস যা মারফু (অবিচ্ছিন্ন) সূত্রে ইবনে সাম্মাক আবু বকর হতে বর্ণনা করেছেন, عليّ منّي بِمَنْزِلتي من ربِّي অর্থাৎ আলীর স্থান আমার নিকট আমার প্রতিপালকের নিকট আমার স্থান ও মর্যাদার ন্যায়।[৩১৭]

১৪। দারে কুতনী তাঁর 'কিতাবুল আফরাদ' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস সূত্রে রাসূল হতে বর্ণনা করেছেন, "আলী ইবনে আবি তালিব ক্ষমার দ্বার। যে কেউ এ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে সে মুমিন, আর কেউ তা হতে বের হয়ে গেলে সে কাফের।"[৩১৮]

১৫। নবী (সা.) বিদায় হজ্বের সময় আরাফাতের ময়দানে বলেন, "আলী আমা হতে এবং আমি আলী হতে। আমার পক্ষ হতে ঐশী বাণী পৌঁছানোর অধিকার কারো নেই একমাত্র আলী ব্যতীত।"[৩১৯]

এই হলো সম্মানিত রাসূলের কথা যিনি শক্তিমান ও আরশের অধিপতির নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে যেমনটি বলেছেন, তিনি বিশ্বস্ত, তোমাদের নবী উন্মাদ নন, তিনি প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কিছু বলেন না, বরং তিনি তাই বলেন যা তাঁর প্রতি ওহী হিসেবে অবতীর্ণ হয়। যেহেতু এটি অস্বীকার করার উপায় নেই সেহেতু এই সহীহ হাদীস সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? এ বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ আছে কি? যদি আল্লাহর মহান বাণী প্রচারের এই গুরু দায়িত্বের বিষয়ে আপনি চিন্তা করেন এবং বড় হজ্বের সময়ে তা বর্ণনার পেছনে যে হেকমত লুকিয়ে রয়েছে সে বিষয়ে যথাযথ দৃষ্টি দেন তাহলে সত্য আপনার নিকট তার প্রকৃতরূপে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

যদি এই বাণীর শব্দগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেন, দেখবেন বাণীটি কতটা অর্থবহ এবং উন্নত ও গভীর। কারণ রাসূল (সা.) সবদিক বিবেচনা করে দেখেছেন বিষয়টির গুরুত্বের কারণে আলী ব্যতীত অন্য কেউ সঠিকভাবে এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয় এবং নবীর পক্ষ হতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি, খলীফা ও প্রশাসনিক দায়িত্বসম্পন্ন একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি তিনি ব্যতীত অন্য কেউ নন।

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি আমাদের হেদায়েত করেছেন এবং তিনি হেদায়েত না করলে আমরা কখনো হেদায়েত পেতাম না।

১৬। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "যে আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো, আর যে আমার বিরোধিতা করলো সে আল্লাহরই বিরোধিতা করলো। আর যে আলীর আনুগত্য করেছে সে যেন আমারই আনুগত্য করেছে, আর যে তার বিরোধিতা করেছে সে আমারই বিরোধিতা করেছে।" হাকিম নিশাবুরী তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২১ পৃষ্ঠায় এবং যাহাবী তাঁর 'তালখিসে মুসতাদরাক'- এ হাদীসটি এনে বলেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে হাদীসটি সহীহ।

১৭। নবী (সা.) বলেছেন, "হে আলী! যে আমা হতে বিচ্ছিন্ন হলো সে আল্লাহ্ হতেই বিচ্ছিন্ন হলো আর যে আলী হতে বিচ্ছিন্ন হলো সে আমা হতেই বিচ্ছিন্ন হলো।"

হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাকুস্ সহীহাইন' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন যদিও হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে তদুপরি বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেননি।

১৮। উম্মে সালামাহ্ রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, "যে কেউ আলীকে মন্দ নামে সম্বোধন করলো সে যেন আমাকেই মন্দ নামে সম্বোধন করলো।"

হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২১ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে হাদীসটি বিশু বলেছেন। যাহাবীও তাঁর 'তালখিস' গ্রন্থে হাদীসটি বিশু বলে স্বীকার করেছেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩২৩ পৃষ্ঠায় এবং নাসায়ী তাঁর 'খাসায়েসুল আলাভীয়া' গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় উম্মে সালামাহ্ হতে এবং অন্যান্য হাদীসবিদগণও এটি বর্ণনা করেছেন। এরূপ অপর একটি হাদীস যা আমর ইবনে শাশ নবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন তা হলো : যে কেউ আলীকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল।[৩২০]

১৯। নবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আলীকে ভালবাসে সে যেন আমাকেই ভালবেসেছে, আর যে আলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে সে আমার সঙ্গেই শত্রুতা পোষণ করেছে।"

হাকিম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৩০ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ বলেছেন। যাহাবীও তাঁর ‘তালখিস’ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে বিশু   বলেছেন।

আলী নিজেও বলেছেন, “সেই সত্তার শপথ, যিনি বীজ অঙ্কুরিত এবং মানুষের আত্মাকে সৃষ্টি করেন, উম্মী নবী (সা.) এই কথা বলেছেন যে, মুমিন ব্যতীত আমাকে (আলীকে) কেউ ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ব্যতীত কেউ আমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে না।”[৩২১]

২০। নবী (সা.) হযরত আলী (আ.)- কে বলেন,

يا عليّ أنت سيّد في الدّنيا و سيّد في الآخرة,حبيبك حِبيِي و حبيِي حبيب الله و عدوّك عدوّي و عدوّي عدوّ الله و الويل لمن أبغضك بعدي

“হে আলী! তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে নেতা, তোমার বন্ধু আমার বন্ধু এবং আমার বন্ধু আল্লাহর বন্ধু। তোমার শত্রু আমার শত্রু এবং আমার শত্রু আল্লাহর শত্রু। ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যে আমার পর তোমার সঙ্গে শত্রুতা করবে।”

হাকিম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২৮ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে হাদীসটি সহীহ বলেছেন।[৩২২]

২১। নবী (সা.) বলেছেন, “হে আলী! সৌভাগ্য সেই ব্যক্তির যে তোমাকে ভালবাসে ও তোমার বিষয়ে সত্য বলে এবং দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির যে তোমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে ও তোমার নামে মিথ্যা ছড়ায়।”

হাকিম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৩৫ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন যদিও হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত তবুও বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেন নি।

২২। নবী (সা.) বলেছেন,

من أراد أن يحيي حياتي و يموت ميتتي و يسكن جنّة الخلد الّتي وعدني ربّي فليتول عليّ بن أبي طالب فإنّه لن يخرجكم من هدى و لن يدخلكم في ضلالة

“যে চায় তার জীবন আমার জীবনের মত ও মুত্যু আমার মৃত্যুর মত হোক এবং চায় যে চিরস্থায়ী বেহেশতের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন সেখানে থাকতে, তার উচিত আলী ইবনে আবি তালিবের অভিভাবকত্বকে মেনে নেয়া। সে তাকে কখনোই হেদায়েতের পথ হতে বিচ্যুত করবে না এবং গোমরাহীর পথেও নিয়ে যাবে না।”[৩২৩]

২৩। নবী (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান এনেছে ও আমাকে সত্যায়ন করেছে তার প্রতি আমার উপদেশ হলো সে যেন আলীর অভিভাবকত্বকে গ্রহণ করে। যে কেউ তার বেলায়েতকে গ্রহণ করবে সে প্রকৃতপক্ষে আমার অভিভাবকত্বকেই মেনে নিল। আর যে আমার অভিভাবকত্ব মেনে নিল সে আল্লাহরই অভিভাবকত্বকে গ্রহণ করে নিল। যে ব্যক্তি তাকে ভালবাসল সে যেন আমাকেই ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল সে আল্লাহকেই ভালবাসল। যে ব্যক্তি তার প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে সে মূলত আমার প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে আর যে আমার প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে সে আল্লাহর প্রতিই শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে।”[৩২৪]

২৪। নবী (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আশা করে আমার ন্যায় জীবন যাপন ও আমার ন্যায় মৃত্যুবরণ করার এবং সেই চিরস্থায়ী বেহেশতে বসবাসের আকাঙ্ক্ষী হয় যার বৃক্ষসমূহকে আমার প্রতিপালক বপন করেছেন, সে যেন আমার পর আলীর অভিভাবকত্বকে গ্রহণ করে ও তার উত্তরাধিকারীর বেলায়েতকেও মেনে নেয়। সে যেন আমার পর আমার আহলে বাইতের অনুসরণ করে কারণ তারা আমার ইতরাত (রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়) ও আমা হতেই তাদের সৃষ্টি। আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আল্লাহ্ তাদের রিযিক হিসেবে দিয়েছেন। দুর্ভাগ্য আমার উম্মতের সেই লোকদের যারা তাদের (ষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে এবং আমার ও তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে। আল্লাহর শাফায়াত হতে তারা বঞ্চিত।”

২৫। নবী (সা.) বলেছেন, “যে কেউ পছন্দ করে আমার মত জীবন যাপন করতে ও আমার ন্যায় মৃত্যুবরণ করতে এবং সেই চিরস্থায়ী বেহেশত যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন তার অধিবাসী হতে সে যেন আমার পর আলী ও তার বংশধরদের অভিভাবকত্বকে মেনে নেয়। তারা

তোমাদেরকে হেদায়েতের দ্বার হতে বহিষ্কার করবে না এবং গোমরাহীর পথেও পরিচালিত করবে না।"[৩২৫]

২৬। নবী (সা.) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে বলেন, "হে আম্মার! যখন দেখবে আলী এক পথে চলছে আর লোকেরা অন্য পথে। আলীর সঙ্গে যাও ও অন্যদের ত্যাগ কর। কারণ সে তোমাকে পতনের পথে পরিচালিত করবে না এবং হেদায়েতের পথ হতেও বের করে দেবে না।"[৩২৬]

২৭। রাসূল (সা.) হতে হযরত আবু বকর বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা.) বলেছেন : আমার ও আলীর হাত ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সমান।"[৩২৭]

২৮। নবী (সা.) ফাতিমা (আ.)- কে বলেন, "হে ফাতিমা! তুমি এই বিয়েতে (আলীর সাথে) সন্তুষ্ট কি? (জেনে রাখ) আল্লাহ্ পৃথিবীবাসীদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং দু'ব্যক্তিকে তাদের হতে মনোনীত করলেন, যার একজন তোমার পিতা, অন্যজন তোমার স্বামী।"[৩২৮]

২৯। নবী (সা.) বলেছেন,

أنا المنذر و عليّ الهاد وبك يا عليّ يهتدي المهتدون من بعدي

"আমি ভয়প্রদর্শনকারী এবং আলী হেদায়েতকারী। হে আলী! আমার পর তোমার মাধ্যমেই হেদায়েতপ্রাপ্তগণ হেদায়েত পাবে।"[৩২৯]

৩০। নবী (সা.) বলেছেন,

يا عليّ لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد غيري و غيرك

"হে আলী! আমি ও তুমি ব্যতীত মসজিদে কারো অপবিত্র হওয়া জায়েয হবে না।"[৩৩০]

অনুরূপ একটি হাদীস যা তাবরানী হযরত উম্মে সালামাহ্ এবং সা'দের সূত্রে নবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, "আমি ও আলী ব্যতীত এ মসজিদে কারো অপবিত্র হওয়া বৈধ হবে না।"[৩৩১]

৩১। নবী (সা.) বলেছেন,

أنا و هذا يعني عليّا حجة على أمّتي يوم القيامة

"আমি ও এই ব্যক্তি (আলী) কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের জন্য দলিল।"

খাতীব বাগদাদী হযরত আনাস হতে হাদীসটি বর্ণনা করছেন।[৩৩২] কিরূপে সম্ভব যে, আবুল হাসান আলী ইবনে আবি তালিব রাসূলের মত উম্মতের জন্য দলিল হবেন অথচ তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও অভিভাবক হিসেবে উম্মতের পরিচালক ও নির্দেশক হবেন না?

৩২। নবী (সা.) বলেছেন, "বেহেশতের দ্বারে লেখা রয়েছে :

لا إله إلّا الله محمّد رّسول الله عليّ أخو رسول الله

আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই, মুহাম্মদ তাঁর রাসূল এবং আলী রাসূলের ভ্রাতা।"[৩৩৩]

৩৩। নবী (সা.) বলেছেন, "আরশের পাদদেশে লেখা রয়েছে আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁকে আমি আলীর মাধ্যমে সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়েছি।"[৩৩৪]

৩৪। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নূহের লক্ষ্যের দৃঢ়তা, আদমের জ্ঞানের গভীরতা, ইবরাহীমের সহিষ্ণুতা, মূসার বু মত্তা ও ঈসার আত্মসংযম (দুনিয়া বিমুখতা) দেখতে চায় সে যেন আলীর প্রতি লক্ষ্য করে।" ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে এবং বায়হাকী তাঁর 'সহীহ'তে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৩৩৫]

৩৫। রাসূল (সা.) আলীকে বলেছেন, "হে আলী! তোমার মধ্যে ঈসার নিদর্শনসমূহ রয়েছে, যে নিদর্শনের কারণে ইহুদীরা তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করতঃ তাঁর মাতাকে অপবাদ দিয়েছে ও নাসারারা তাঁর প্রতি ভালবাসার বশবর্তী হয়ে তাঁকে আল্লাহর স্থানে বসিয়েছে।"[৩৩৬]

৩৬। নবী (সা.) বলেছেন,

السّبق ثلاثة السّابق إلى موسى يوشع بن نون و السّابق إلى عيسى صاحب ياسين و السّابق إلى محمّد عليّ بن أبي طالب

"অগ্রগামীরা তিন ব্যক্তি : মূসার অনুগামীদের মধ্যে অগ্রগামী হলেন ইউশা ইবনে নূন, ঈসার অনুগামীদের মধ্যে অগ্রগামী হলেন ইয়াসীনের অধিকারী এবং মুহাম্মদের অগ্রগামীদের প্রধান হলো আলী ইবনে আবি তালিব।"[৩৩৭]

৩৭। নবী বলেছেন, "তিন ব্যক্তি সিদ্দীক : হাবীব নাজ্জার (আলে ইয়াসীনের মুমিন ব্যক্তি) যিনি বলেছিলেন : হে আমার জাতি! আল্লাহর রাসূলদের আনুগত্য কর; হিযকীল (ফিরআউন বংশের

মুমিন ব্যক্তি) যিনি বলেছিলেন : ঐ ব্যক্তিকে এ কারণেই কি তোমরা হত্যা করতে চাও যে, সে বলে : আমার প্রভু একমাত্র আল্লাহ্ এবং আলী ইবনে আবি তালিব যে তাঁদের সকল হতে উত্তম ও ে ষ্ঠ।"[৩৩৮]

৩৮। নবী (সা.) আলীকে বলেন, "আমার উম্মত অচিরেই তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে যদিও তখন তুমি আমার বিধানের ওপর জীবন যাপন করবে ও আমার সুন্নাহর ওপর মৃত্যুবরণ করবে। যে কেউ তোমাকে ভালবাসবে সে যেন আমাকেই ভালবাসল আর যে তোমার সঙ্গে শত্রুতা করবে সে যেন আমার সঙ্গেই শত্রুতা করল। আমি দেখতে পাচ্ছি খুব নিকটেই তোমার শ্রু তোমার মস্তকের রক্তে র ি ত হবে।"[৩৩৯] হযরত আলী (আ.) বলেন, "নবী (সা.) আমাকে যেসব বিষয়ে অবহিত করেন তার অন্যতম হলো এ উম্মত তাঁর পর আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।"[৩৪০]

ইবনে আব্বাস বলেন, "নবী (সা.) আলীকে বলেছেন : আমার পর খুব নিকটেই তুমি দুঃখ- কষ্টে পতিত হবে। আলী প্রশ্ন করলেন : তখন কি আমি দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব? রাসূল (সা.) বললেন : হ্যাঁ, তখন তুমি সঠিক দীনের ওপরই থাকবে।"

৩৯। নবী (সা.) একদিন সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে কোরআনের ব্যাখ্যার জন্য যু করবে যেমনটি আমি এর অবতীর্ণ হবার জন্য যু ও প্রচেষ্টা চালিয়েছি।" হযরত আবু বকর ও উমরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই ঘাড় সজাগ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। হযরত আবু বকর বললেন, "আমি কি সেই ব্যক্তি?" রাসূল (সা.) বললেন, "না।" হযরত উমর বললেন, "আমি কি?" তিনি বললেন, "না, বরং সেই ব্যক্তি যে এখন তার জুতায় তালি দিচ্ছে (তখন আলী [আঃ] তাঁর জুতা সেলাই করছিলেন)।"

আবু সাঈদ খুদরী বলেন, "আলীর নিকট গিয়ে এ সুসংবাদ দিলাম। তিনি তাঁর মাথা নীচু করেই রইলেন যেন তিনি রাসূল (সা.) হতে অসংখ্যবার একথা শুনেছেন।"[৩৪১]

অনুরূপ হাদীস আবু আইউব আনসারী খলীফা হযরত উমরের সময়[৩৪২] বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আলীকে 'নাকেসীন' (প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী), 'মারেকীন' (ধর্মচ্যুত) এবং 'কাসেতীন'দের

(সীমালঙ্ঘনকারী ও বিদ্রোহী) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ও তাদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।"(* ২১)

তদ্রূপ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের হাদীসটিও। তিনি বলেন, "রাসূল (সা.) বলেছেন :

يا عليّ ستقاتلك الفئة الباغية و أنت على الحق فمن لم ينصرك يومئذ ليس منّي

হে আলী! শীঘ্রই একদল সীমালঙ্ঘনকারী (বিদ্রোহী) তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে যদিও তখন তুমি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যে ব্যক্তি তখন তোমাকে সাহায্য করবে না সে আমার অনুসারী নয়।"[৩৪৩]

অনুরূপ একটি হাদীস হযরত আবু যর রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, "সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ, তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে আমার পরে কোরআনের ব্যাখ্যার জন্য যুদ্ধ করবে যেমন আমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে তা অবতীর্ণ হবার জন্য যুদ্ধ করেছি।"[৩৪৪]

মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবি রাফে তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা আবু রাফে হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "আমার পর একদল আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ঈমানী দায়িত্ব হিসেবে সবার ওপর বাধ্যতামূলক। যে ব্যক্তি অস্ত্র হাতে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে অক্ষম সে যেন জিহ্বার দ্বারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাতেও অক্ষম হলে সে যেন অন্তর দ্বারা (ঘৃণার মাধ্যমে) যুদ্ধ করে।"[৩৪৫]

আখদ্বার আনসারী বলেন, "নবী করিম (সা.) বলেছেন : আমি কোরআন অবতীর্ণ হবার জন্য যুদ্ধ করেছি এবং আলী এর ব্যাখ্যার জন্য যুদ্ধ করবে।"[৩৪৬]

৪০। নবী (সা.) বলেছেন,

يا عليّ أخصمك بالنّبوّة فلا نبوّة بعدي و تخصم النّاس بسبع أنت أوّلهم إيمانا بالله و أوفاهم بعهد الله و أقسمهم بالسّويّة و أعدلهم في الرّعيّة و أعظمهم عند الله مزية

"হে আলী, তোমার ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব হলো নবুওয়াতের কারণে এবং আমার পরে কোন নবী ও রাসূল নেই। আর সকল মানুষের ওপর তোমর সাতটি শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, তুমি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে

ঈমান এনেছ, তুমি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রক্ষার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে অগ্রগামী, তুমি সকল মানুষ হতে প্রত্যয়ী এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে সবার হতে অগ্রগামী, বায়তুল মাল বণ্টনে সর্বাধিক সমতা রক্ষাকারী, বিচার ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সকল হতে ন্যায় বিচারক, আল্লাহর নিকট সম্মানের ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে নৈকট্যের অধিকারী।”[৩৪৭]

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, “রাসূল (সা.) বলেছেন : হে আলী! সাতটি বৈশিষ্ট্যের কারণে তুমি অন্যদের হতে ে ষ্ঠ, তুমি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী, তাঁর প্রতি প্রতিশ্রুতি পালনকারী, তাঁর নির্দেশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক দৃঢ়, জনগণের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু, বিচারের ক্ষেত্রে পারদর্শী এবং জ্ঞান, বিদ্যা, দয়া, উদারতা ও সাহসিকতা ইত্যাদি যাবতীয় সৎ গুণের ক্ষেত্রে অন্য সকলের চেয়ে ে ষ্ঠ ও উত্তম।”

আপনার নিকট এ সম্পর্কিত চল্লিশটি হাদীস বর্ণনার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেগুলো এখানে লিপিব করেছি। এ হাদীসগুলো ছাড়াও সমার্থক ও সমমর্যাদার প্রচুর হাদীস রয়েছে (যেগুলো বর্ণনার সুযোগ এখানে নেই) যেগুলো থেকে বোঝা যায় এই উম্মতের মধ্যে রাসূলের পর ে ষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আলী ইবনে আবি তালিব এবং এ উম্মতের নেতৃত্বের দায়িত্ব রাসূলের পর একইভাবে আলীর ওপর অর্পিত হয়েছে।

তাই শব্দগতভাবে সব হাদীস একই রকম না হলেও অর্থের দিক থেকে তা সমার্থক ও মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। সুতরাং বিষয়টি আপনার নিকট অকাট্যরূপে প্রতিভাত হয়েছে বলে মনে করছি।

ওয়াসসালাম

শ

উনপঞ্চাশতম পত্র

১১ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

১। আলীর ফজীলত ও ে ষ্ঠত্বকে স্বীকার।

২। তাঁর ে ষ্ঠত্ব খেলাফতের বিষয়ে রাসূল (সা.)- এর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়াকে অপরিহার্য করে না।

১। ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন, "রাসূল (সা.) হতে আলী ইবনে আবি তালিবের মত কোন সাহাবীর বিষয়েই এত অধিক ফজীলতসম্পন্ন হাদীস বর্ণিত হয় নি।"[৩৪৮]

ইবনে আব্বাস বলেন, "আলীর মত অন্য কারো ক্ষেত্রেই কোরআনের এত অধিক আয়াত অবতীর্ণ হয় নি।"[৩৪৯] অন্যস্থানে তিনি বলেছেন, "আলী সম্পর্কে কোরআনে তিন শ' আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।"[৩৫০] তিনি আরো বলেছেন, "কোরআনের যে স্থানেই يا ايها الذين آمنوا অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ বলা হয়েছে আলী (আ.) তাঁদের মধ্যে প্রধান ও নেতা।"[৩৫১] আল্লাহ্ অসংখ্য আয়াতে সাহাবীদের সমালোচনা করলেও কোথাও আলীকে প্রশংসা ব্যতীত স্মরণ করেন নি।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আইয়াশ ইবনে আবি রাবিয়া বলেন, "আলী (আ.)- এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে যা কিছুই বলতে চাও দৃঢ়তার সাথে তা বর্ণনা করতে পার। তাঁর ইসলামের অতীত উ ল ও ভাস্বর এবং তিনি রাসূল (সা.)- এর জামাতা। হাদীসে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, যু সাহসিকতা, বীরত্ব ও জয় এবং দানের ক্ষেত্রে তাঁর উদারতা নজীরবিহীন।"[৩৫২]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে হযরত আলী (আ.) এবং মুয়াবিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বললেন, [৩৫৩] "আলীর প্রচুর শত্রু ছিল। তাঁর শত্রুরা তাঁকে ক্ষুদ্র ও ছোট করার জন্য সব সময় তাঁর ত্রুটি অন্বেষণে ব্যস্ত থাকত, তদুপরি এরূপ কিছু পায় নি। ফলে তারা আলীর শত্রুদের (যারা তাঁর সঙ্গে যু করেছে) প্রশংসা করার মাধ্যমে তাঁকে কষ্ট দেয়ার প তি অবলম্বন করত।"

কাজী ইসমাঈল, নাসায়ী, আবু আলী নিশাবুরী ও অন্যান্যরা বলেছেন, “আলীর মত কোন সাহাবীর পক্ষেই সহীহ সনদে এত অধিক ফাজায়েল ও মানাকিব বর্ণিত হয় নি।”[৩৫৪]

২। এ বিষয়গুলোতে কোন প্রতিবাদ ও সমালোচনার সুযোগ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো নবী (সা.) তাঁর খেলাফতের বিষয়ে সরাসরি বলেছেন নাকি বলেন নি? আপনি যে হাদীস ও সুন্নাহগুলো বর্ণনা করেছেন তা বিভিন্ন অবস্থা ও প্রেক্ষাপটে আলী (আ.)- এর বিশেষত্ব ও ে ষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে। আমরাও বিশ্বাস করি তিনি এ সকল বিষয়ে অন্যদের হতে ে ষ্ঠত্ব রাখেন এবং আপনি যা বর্ণনা করেছেন তার হতে অধিক সংখ্যায় এ সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসগুলো তাঁর ইমামতের প্রতি ইঙ্গিত করলেও রাসূল (সা.)- এর পর তাঁর স্থলাভিষিক্তের বিষয়টি প্রকাশ করে না।

ওয়াসসালাম

স

পঞ্চাশতম পত্র

১৩ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

নেতার (ইমামের) বৈশিষ্ট্য বর্ণনা হতেই তাঁর নেতৃত্বের (ইমামতের) বিষয়টি প্রমাণিত হয়

আপনার মত উ ল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, বক্তব্যের প্রেক্ষাপট ও উৎস সম্পর্কে সচেতন এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি যিনি শেষ নবী হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর প্রজ্ঞা, তাঁর কথা ও কর্মের পরিমাপ ও তাঁর কোন কথাই যে প্রবৃত্তির অনুগত নয় সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী তাঁর নিকট এ সকল হাদীসের বু বৃত্তিক ও সাধারণ অর্থ অস্পষ্ট ও আবরিত নয় এবং এগুলো বর্ণনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও অজ্ঞাত নয়। আপনি জন্মগত প্রতিষ্ঠিত আরব হিসেবে এটি উপলব্ধি করেন যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষে সম্ভব নয় তাঁদের দীনের রক্ষাকারী প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করে কথা বলবেন। তাই এ হাদীসগুলো হতে বোঝা যায় আলী বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী এবং সেগুলো সরাসরি খেলাফতের প্রমাণ না দিলেও সেদিকে ইঙ্গিতকারী হিসেবে অপরিহার্য প্রমাণ বলে গণ্য। কারণ নবীকুল শিরোমণি ও ে ষ্ঠ রাসূল (সা.) খেলাফতের এইরূপ উচ্চমর্যাদা তাঁর মত নেতৃত্ব ও পদমর্যাদার ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো হাতে স্থানান্তর করতে পারেন না।

তদুপরি আলী সম্পর্কিত বিশেষ হাদীসগুলো যদি কেউ ইনসাফের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে এবং যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে তাহলে দেখতে পাবে সেগুলোর অধিকাংশই ইমামতের দিকেই নির্দেশনা দান করে। হয় তা গাদীরের[৩৫৫] প্রতিশ্রুতি গ্রহণের হাদীসের মত সরাসরি ইমামতের পূর্ণ প্রমাণ দেয় নতুবা আটচল্লিশতম পত্রের হাদীসগুলোর মত ইমামতের অপরিহার্যতার প্রতি ইঙ্গিত দান করে। যেমন এ হাদীসটি “আলী কোরআনের সঙ্গে এবং কোরআন আলীর সঙ্গে এবং এরা একে অপর হতে কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না ও এ অবস্থায়ই হাউজে কাওসারে আমার সঙ্গে মিলিত হবে।”[৩৫৬]

অনুরূপ রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত একটি হাদীস, “আলীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আমার দেহের সঙ্গে আমার মাথার সম্পর্কের ন্যায়।”[৩৫৭]

আবদুর রহমান ইবনে আওফ[৩৫৮] বলেন, “রাসূল (সা.) আমাদের ভয় প্রদর্শন করে বললেন : সেই মহান সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ নিব , তোমরা অবশ্যই নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে নতুবা তোমাদের প্রতি এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবো যে আমা হতে এবং আমার প্রাণস্বরূপ।” হাদীসটির শেষে এসেছে অতঃপর রাসূল (সা.) আলীর হাত ধারণ করে বললেন, “এই সে ব্যক্তি।”

এছাড়াও এ সম্পর্কিত আরো হাদীস বিদ্যমান।

যে ব্যক্তি সত্যের সমুদ্রে অবগাহনে আকাঙ্ক্ষী, বু বৃত্তিক সমস্যা ও অস্পষ্টতাকে দূর করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত তাকে আমি এ মূল্যবান হাদীসগুলোর প্রতি দৃষ্টি দানের আহবান জানাব। সত্যের অনুসন্ধানে ও গবেষণায় ব্যাপৃত ব্যক্তি সত্য উদঘাটন ব্যতীত যার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই তার উচিত ব্যক্তিগত আবেগ ও প্রবণতাকে দূরে ঠেলে এই আলোচনার প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টি দান।

ওয়াসসালাম

শ

একা তম পত্র

১৪ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

এই প্রমাণসমূহের বিপরীতেও দলিল রয়েছে। আপনার বিরোধীরা প্রথম তিন খলীফার ফজীলতে বর্ণিত হাদীসসমূহ আপনার বিপক্ষে দলিল বলে মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে অগ্রগামীদের মধ্যে ৫ ষ্টত্বের বিষয়ে তাঁরা আলী হতে অগ্রগামী। তাই আপনার প্রমাণ অগ্রহণযোগ্য। আপনার বক্তব্য কি?

ওয়াসসালাম

স

বায়া তম পত্র

১৫ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

তাঁদের দাবীর বিপক্ষে জবাব

আমরা মুহাজির ও আনসারদের অগ্রগামী ব্যক্তিবর্গের ফজীলত ও মর্যাদাকে স্বীকার করি। তাঁদের ে ষ্ঠত্বের বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করা যায় না। তাঁদের ে ষ্ঠত্বের জন্য কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত বাণীসমূহই যথেষ্ট। আমরা উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করে এমন কিছু পাই নি যাতে করে বলা যায় সেগুলো আলীর ে ষ্ঠত্বের বিপক্ষে দলিল, এমন কি তাঁর মধ্যে ইমামতের জন্য প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক দলিলও নেই।

অবশ্য আমাদের বিরোধীরা নিজেদের হতে তাঁদের অনেকের ফজীলত বর্ণনা করে হাদীস বলেছেন যা আমাদের নিকট প্রমাণিত নয়। সুতরাং সেগুলো আমাদের বর্ণিত রেওয়ায়েতের বিপরীতে অগ্রহণযোগ্য এবং অযথা তর্ককারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো কাছে তা আশা করা যায় না। কারণ আমরা তাঁদের মত ঐ হাদীসগুলোকে নির্ভরযোগ্য মনে করতে পারি না। আমাদের সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহকে তাঁদের বিপরীতে এনে প্রমাণ করতে যাওয়া যেমন যুক্তিযুক্ত নয় তেমনি ঐ হাদীসসমূহকে এ হাদীসগুলোর (হযরত আলীর ে ষ্ঠত্ব ও ফজীলত বর্ণনাকারী হাদীসসমূহ) বিপরীতে দাঁড় করানোও অযৌক্তিক। তাই আমরা আমাদের বিরোধীদের বর্ণনা হতেই আলীর ে ষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বের বিষয়টি আলোচনা করছি (আমাদের সূত্রে নয়) যেমন গাদীরের হাদীস ও অন্যান্য হাদীস।

এগুলো বাদ দিলেও আমাদের বিরোধীরা তাঁদের ফজীলত বর্ণনা করে যে হাদীসসমূহ এনেছেন তা আমাদের বর্ণিত হাদীসের বিরোধীও যেমন নয় তেমনি তা তাঁদের খেলাফতের বিষয়টিকেও প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণ করে না। এ কারণে কেউই সেগুলো তাঁদের খেলাফতের জন্য প্রমাণ হিসেবে আনেন নি, এমন কি তাঁরা নিজেরাও সাকীফায়[৩৫৯] বা খলীফা নির্বাচনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিজেদের ে ষ্ঠত্ব বর্ণনায় উপরোক্ত হাদীসসমূহের ওপর নির্ভর করেন নি[৩৬০]।

ওয়াসসালাম

শ

তেপা তম পত্র

১৬ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

হাদীসে গাদীরের বিবরণ পেশের আহবান।

আপনি অনেক স্থানেই গাদীরের হাদীসের কথা উল্লেখ করেছেন। আহলে সুন্নাহর সূত্রে হাদীসটি আমার জন্য বর্ণনা করুন যাতে বিষয়টি নিয়ে আমি চিন্তা করতে পারি।

ওয়াসসালাম

স

ছুয়া তম পত্র

১৮ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

গাদীরের হাদীসের কিছু অংশের প্রতি ইঙ্গিত

তাবরানী ও অনেকেই যাইদ ইবনে আরকাম হতে বর্ণিত এ হাদীসটির বিশু তার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[৩৬১] তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী করিম (সা.) 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে একটি বৃক্ষের নীচে একটি খুতবা পাঠ করেন যা এরূপ : হে লোকসকল! খুব শীঘ্রই আমি আমার প্রভুর পক্ষ হতে দাওয়াত পাব এবং আমি তা গ্রহণ করবো[৩৬২]। আমি দায়িত্বশীল এবং এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হব[৩৬৩] এবং তোমরাও দায়িত্বশীল ও তোমাদের দায়িত্বের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে[৩৬৪] তখন তোমরা আমার বিষয়ে কি বলবে? সকলে বলল, "আপনি আপনার ওপর আরোপিত রেসালতের দায়িত্ব পালন করেছেন, জিহাদ করেছেন, উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।" রাসূল (সা.) বললেন, "তোমরা কি এ সাক্ষ্য প্রদান কর না, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই ও মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, বেহেশত-দোযখ, মৃত্যু, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সবই সত্য? তোমরা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ও কিয়ামতের বিষয়ে কি বিশ্বাস স্থাপন কর নি? তারা বলল, "হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।"[৩৬৫]

অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, "হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন।" অতঃপর তিনি ঘোষণা করেন, "হে লোকসকল! আল্লাহ্ আমার মাওলা ও অভিভাবক এবং আমি মুমিনদের অভিভাবক হিসেবে তাদের নিজেদের অপেক্ষা তাদের ওপর অধিক অধিকার রাখি।"[৩৬৬]

فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعنى عليّا اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه

সুতরাং জেনে রাখ আমি যার মাওলা বা অভিভাবক এই ব্যক্তি (আলীও) তার মাওলা বা অভিভাবক। হে আল্লাহ্! আপনি তাকে ভালবাসুন যে আলীকে ভালবাসে আর তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করুন যে আলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে।"

হে লোকসকল! আমি তোমাদের পূর্বেই হাউজে কাওসারে উপস্থিত হব তোমরা হাউজের নিকট আমাকে পাবে। এ হাউজ বসরা হতে সানআ'র দূরত্ব হতেও দীর্ঘ এবং এর তীরে আকাশের তারকারাজির সংখ্যার মত রৌপ্য পাত্রসমূহ থাকবে। যখন তোমরা এ হাউজে আমার নিকট আসবে তোমাদের আমি দু'টি ভারী বস্তু (কোরআন ও আমার আহলে বাইত) সম্পর্কে প্রশ্ন করব যে, এ দু'য়ের সাথে তোমরা কিরূপ আচরণ করেছ। প্রথম ভারী বস্তু আল্লাহর কিতাব যার এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে এবং অপর প্রান্ত তোমাদের হাতে যা দ্বারা এটি আঁকড়ে ধরবে যাতে করে বিচ্যুত এবং পরিবর্তিত (আমার পরে) না হয়ে যাও এবং দ্বিতীয় ভারী বস্তু আমার রক্ত সম্পর্কীয় আহলে বাইত যাদের সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শী পরম জ্ঞানী আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন এ দু'টি ভারী বস্তু হাউজে আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।"[৩৬৭]

হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১০৯ পৃষ্ঠায় হযরত আলী (আ.)- এর মানাকিব বর্ণনায় যাইদ ইবনে আরকাম হতে দু'টি সূত্রে (যা বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ বলে পরিগণিত) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, "যখন রাসূল (সা.) বিদায় হ হতে ফিরে আসছিলেন তখন 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে থামলেন। একটি বৃক্ষের নীচে উঁচু মঞ্চ প্রস্তুত করা হলো। তিনি তার ওপর দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বললেন : আমি আমার প্রভুর পক্ষ হতে আহবায়িত হয়েছি এবং তা গ্রহণ করেছি। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি যার একটি অপরটি হতে বৃহৎ, তার একটি হলো আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি আমার আহলে বাইত। এ দু'বস্তুর সঙ্গে তোমরা কিরূপ আচরণ করবে? এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না হাউজে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। আল্লাহ্ আমার মাওলা ও অভিভাবক এবং আমি মুমিনদের মাওলা। অতঃপর রাসূল (সা.) আলীর হাত ধরে ঘোষণা করলেন : من كنت مولاه فهذا وليّه আমি যার মাওলা এও (আলীও) তার মাওলা। হে আল্লাহ্! আপনি তাকে ভালবাসুন যে আলীকে ভালবাসে এবং তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করুন যে আলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে।"

হাদীসটি বেশ দীর্ঘ হওয়া স ও হাকিম পুরোটিই বর্ণনা করেছেন কিন্তু যাহাবী তাঁর ‘তালখিস’ গ্রন্থে শেষ অংশ বর্ণনা করেন নি। হাকিম উক্ত গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৫৩৩ পৃষ্ঠায় যাইদ ইবনে আরকাম হতে দ্বিতীয় বারের মত হাদীসটি বর্ণনা করে একে বিশু বলেছেন। যাহাবী তাঁর ‘তালখিস’ গ্রন্থেও এ সত্যটি স্বীকার করেছেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল যাইদ ইবনে আরকাম[৩৬৮] হতে বর্ণনা করেছেন, “আমরা রাসূলের সঙ্গে এক উপত্যকায় উপস্থিত হলাম যাকে ‘গাদীরে খুম’ বলা হত। সেখানে একটি বৃক্ষের সঙ্গে কাপড় ঝুলিয়ে ছায়া সৃষ্টি করা হলে নবী তার নীচে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিলেন : তোমরা কি জান না এবং সাক্ষ্য দিবে না, আমি মুমিনদের ওপর তাদের হতে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী? সবাই বলল : হ্যাঁ। অতএব, আমি যার ওপর ক্ষমতার অধিকারী (মাওলা) আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ্! আপনি তাকে ভালবাসুন যে আলীকে ভালবাসে এবং তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করুন যে আলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে।

নাসায়ী যাইদ ইবনে আরকাম[৩৬৯] হতে বর্ণনা করেছেন, “যখন নবী (সা.) বিদায় হ হতে ফিরে আসছিলেন তখন ‘গাদীরে খুম’ নামক স্থানে অবতরণ করলেন ও একটি বৃক্ষের তলা পরিষ্কার করার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন : আমি আল্লাহর পক্ষ হতে দাওয়াত পেয়ে তা গ্রহণ করেছি। আমি তোমাদের মাঝে দু’টি মূল্যবান ও ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি যার একটি অপরটি হতে বৃহৎ; আল্লাহর কিতাব এবং আমার রক্ত সম্পর্কীয় আহলে বাইত। আমার আহলে বাইতের সঙ্গে আচরণের বিষয়ে সতর্ক হও কারণ তারা একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। অতঃপর বললেন : আল্লাহ্ আমার মাওলা (অভিভাবক) ও আমি মুমিনদেরও মাওলা (অভিভাবক) এবং আলীর হাত (উঁচু করে) ধরে বললেন : আমি যার মাওলা এই আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ্! আপনি তাকে ভালবাসুন যে আলীকে ভালবাসে এবং শত্রুতা করুন তার সঙ্গে যে আলীর সঙ্গে শত্রুতা করে।”

আবু তুফাইল বলেন, “আমি যাইদকে প্রশ্ন করলাম : আপনি কি রাসূল (সা.) হতে এটি শুনেছেন?[৩৭০] তিনি বললেন : ঐ বৃক্ষের নীচে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যে তার চক্ষু দিয়ে তা দেখে নি এবং কর্ণ দিয়ে তা বণ করে নি।”

এ হাদীসটি মুসলিম তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে যাইদ ইবনে আরকাম হতে কয়েকটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন কিন্তু আহলে সুন্নাহর অন্যান্য হাদীসবেত্তার মত হাদীসটির শেষ অংশ কেটে বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত করেছেন।[৩৭১]

আহমাদ ইবনে হাম্বল বাররা ইবনে আযেব[৩৭২] হতে দু’টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন, “আমরা নবী (সা.)- এর সঙ্গে হ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় ‘গাদীরে খুমে’ যাত্রা বিরতি করলাম। আহবানকারী আহবান করে জানাল : নামাযের জামায়াত। নবী (সা.)- এর জন্য বৃক্ষের নীচে ব্যবস্থা করা হলে তিনি যোহর নামায পড়ালেন ও অতঃপর আলীর হাত ধারণ করে ঘোষণা করলেন : তোমরা কি অবগত নও আমি মুমিনদের নিজেদের হতে তাদের ওপর অধিক অধিকার রাখি। সকলে বলল : হ্যাঁ। অতঃপর আলীর হাত উঁচু করে ধরে বললেন : আমি যার মাওলা এই আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ্! আপনি তাকে ভালবাসুন যে আলীকে ভালবাসে এবং তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করুন যে আলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে। তখন হযরত উমর আলীর নিকট এসে বললেন : মোবারকবাদ হে আলী ইবনে আবি তালিব! এখন হতে আপনি সকল মুমিন পুরুষ ও নারীর অভিভাবক হলেন।”

নাসায়ী আয়েশা বিনতে সা’দ[৩৭৩] হতে বর্ণনা করেছেন, “আমার পিতা হতে শুনেছি জোহফার দিনে নবী (সা.) আলীর হস্তধারণ করতঃ নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করেন যাতে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে তিনি বলেন : হে লোকসকল! আমি কি তোমাদের অভিভাবক? লোকেরা বলল : অবশ্যই। অতঃপর আলীর হাত উঁচু করে ধরে বললেন : সে আমার স্থলাভিষিক্ত, সে আমার ঋণ পরিশোধ করবে। আমি তার বন্ধুদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করি ও তার শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করি।”

নাসায়ী তাঁর ‘খাসায়েস’ গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় সা’দ হতে বর্ণনা করেছেন, “আমরা রাসূল (সা.)- এর সঙ্গে ছিলাম। যখন ‘গাদীরে খুমে’ পৌঁছলাম তিনি যাত্রা বিরতির নির্দেশ দিয়ে বললেন : যারা

আগে চলে গিয়েছে তাদের এখানে প্রত্যাবর্তন করতে বল। যখন পশ্চাতগামীরা এসে মিলিত হলো তখন তিনি প্রশ্ন করলেন (জনতার উদ্দেশ্যে) : তোমাদের নেতা কে? সকলে বলল : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল। তিনি তখন আলীর হাত ধরে দাঁড় করিয়ে ঘোষণা করলেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যার নেতা ও অভিভাবক এই আলীও তার নেতা ও অভিভাবক। হে আল্লাহ্! আপনি আলীর প্রতি ভালবাসা পোষণকারীকে ভালবাসুন এবং তার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করুন।”

এ বিষয়ে এত অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে তা এখানে উল্লেখের সুযোগ নেই। এ হাদীসগুলোতে সুস্পষ্টরূপে আলীর স্থলাভিষিক্ত হবার বিষয়টি ঘোষিত হয়েছে। তাই আলী-ই মুসলমানদের ওপর রাসূল (সা.)- এর পর দায়িত্বশীল যেমনটি ফযল ইবনে আব্বাস ইবনে আবু লাহাব বলেছেন,

و كان وليّ العهد بعد محمّد

عليّ و في كلّ المواطن صاحبه

মুহাম্মদের পর স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি

আলী, রাসূলের সার্বক্ষণিক সহযোগী ছিলেন যিনি।[৩৭৪]

ওয়াসসালাম

শ

পঞ্চা তম পত্র

১৯ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

মুতাওয়াতির না হলে কিরূপে ঐ হাদীসকে এর দলিল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে?

স্বয়ং শিয়ারা বিশ্বাস করে ইমামত প্রমাণের জন্য অবশ্যই হাদীস মুতাওয়াতির হতে হবে কারণ তাদের মতে ইমামত উসূলে দীন বা ধর্মের মৌল বিষয়ের অন্তর্গত। হাদীসটি যেহেতু আহলে সুন্নাহর নিকট মুতাওয়াতির নয় সুতরাং প্রমাণ হিসেবে এ হাদীসের উপস্থাপন গ্রহণযোগ্য নয় যদিও তার সনদ সহীহ হয়ে থাকে।

ওয়াসসালাম

স

ছা া তম পত্র

২২ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

১। প্রাকৃতিক নিয়মেই গাদীরের হাদীস মুতাওয়াতির।

২। হাদীসটি বর্ণনার পশ্চাতে আল্লাহর বিশেষ দৃষ্টি ও অনুগ্রহও বিদ্যমান।

৩। রাসূল (সা.) স্বয়ং এটি বর্ণনায় বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন।

৪। আলী (আ.)- ও ত প হাদীসটিকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন।

৫। ইমাম হুসাইন (আ.) এটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

৬। ইমাম হুসাইনের বংশধারার নয়জন ইমামই এ হাদীসকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছেন।

৭। শিয়ারা এ হাদীসকে বিশেষ গুরুত্ব দান করে।

৮। এমন কি আহলে সুন্নাহর সূত্রেও গাদীরের হাদীস মুতাওয়াতির।

২৪ নং পত্রে এ সম্পর্কে যে দলিল- প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করেছি তা এখানেও প্রযোজ্য।

১। তদুপরি স্বাভাবিকভাবেই গাদীরের হাদীস মুতাওয়াতির হতে বাধ্য। কারণ এমন পরিবেশে মহান আল্লাহ্ তা বর্ণনার নির্দেশ দিয়েছেন যে, অন্যান্য ঐতিহাসিক স্মরণীয় ঘটনার মত সেখানেও হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল যাঁরা বিভিন্ন স্থান হতে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন যাতে করে এ খবর তাঁদের মাধ্যমে সকল মানুষের কাছে পৌঁছে যায় এবং এ ঘটনা ঐ বংশধারার ব্যক্তিদের বিশেষ দৃষ্টিতে ছিল বলেই তাঁদের বন্ধুদের মাধ্যমে তা সকল যুগে ও সকল স্থানে পৌঁছেছে। তাই এ হাদীসটি মুতাওয়াতির না হয়ে পারে কি? না, কখনোই নয়। তাই এটি জলে-স্থলে সকল স্থানে প্রচারিত হয়েছিল আল্লাহর সেই নিয়মে যাতে কোন পরিবর্তন নেই-

و لن تجد لسنّة الله تحويلا (এবং তোমরা আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না)।

২। গাদীরের হাদীস মহান আল্লাহ্ বিশেষ দৃষ্টিতে ছিল বলেই তাঁর নবীর প্রতি ওহী হিসেবে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ করে এর ঘোষণা দিয়েছেন যা মুসলমানরা দিবারাত্রি কখনো নিভৃতে, কখনো প্রকাশ্যে, কখনো নামায ও প্রার্থনায়, কখনো মিম্বারে, কখনো মসজিদে, কখনো উপাসনার স্থানে (জায়নামাযে) তেলাওয়াত করে। আয়াতটি হলো :

(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)

হে নবী! যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দিন। যদি আপনি তা না করেন তবে রেসালতের কোন দায়িত্বই আপনি পালন করেন নি। আল্লাহ্ আপনাকে লোকদের হতে রক্ষা করবেন।[৩৭৫]

অতঃপর যখন রাসূল (সা.) আলী (আ.)- এর ইমামত ও খেলাফত ঘোষণার রেসালতী দায়িত্ব সম্পাদন করলেন তখন আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন-

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

এই দিন তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করলাম এবং আমার নিয়ামতকে তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করলাম ও ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।[৩৭৬]

তাই এটি আল্লাহর বিশেষ রহমত যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। যে কেউ এ আয়াতটির বিষয়ে চিন্তা করবে সে আল্লাহর এ বিশেষ দৃষ্টি ও অনুগ্রহের প্রতি অনুগত হবে।

৩। যখন দেখা যাচ্ছে বিষয়টির প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে তখন তাঁর নবীরও এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকা স্বাভাবিক। এজন্যই যখন তিনি তাঁর ওফাত নিকটবর্তী হবার খবর বণ করেছেন তখনই আল্লাহর নির্দেশে বড় হে র সময় সকলের সম্মুখে আলীর বেলায়েত ও নেতৃত্বের ঘোষণা দিয়েছেন।

রাসূল (সা.) 'ইয়াওমুদ্দার'- এ যেদিন প্রথমবারের মত নিকটাত্মীয়দের ভীতি প্রদর্শন করেন সেদিন হতে আলীর নেতৃত্বের বিষয়ে একের পর এক হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু সেগুলোকে যথেষ্ট মনে করেন নি, বরং বিষয়টির গুরুত্ব চিন্তা করে হে র মৌসুমের পূর্বেই ঘোষণা করেছেন এটি তাঁর শেষ হ । তাই ইসলামী সাম্রাজ্যের সকল স্থান হতে মুসলমানরা রাসূলের সঙ্গে মদীনায়

মিলিত হন এবং এক লক্ষ লোকসহ তিনি হ র উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে যাত্রা করেন[৩৭৭] ও তাদের সম্মুখে এ ঐতিহাসিক বক্তব্য রাখেন।

অতঃপর আরাফাতে পৌঁছার পর রাসূল (সা.) ঘোষণা করলেন,

عليّ منّي و أنا من عليّ ولا يودي عنّي إلّا أنا و عليّ

"আলী আমা হতে এবং আমি আলী হতে। আমার পক্ষ হতে আমি এবং আলী ব্যতীত কেউ কিছু ঘোষণা করতে পারবে না।"[৩৭৮]

যখন রাসূলুল্লাহর কাফেলা প্রত্যাবর্তন শুরু করে 'গাদীরে খুম' উপত্যকায় পৌঁছে তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) সূরা মায়েদাহর ৬৭ নং আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন। রাসূল (সা.) তা প্রচারের নির্দেশ পেয়ে যাত্রা বিরতি করেন এবং অগ্রবর্তীদের ফিরে আসার ও পশ্চাদবর্তীদের জন্য অপেক্ষার নির্দেশ দেন। যখন সকলেই সমবেত হলেন তখন তিনি ফরয নামায আদায় করলেন এবং আলীর নেতৃত্বের ঘোষণা দিয়ে খুতবা পড়লেন যার কিছু অংশ আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি যা আপনার জন্য যথেষ্ট মনে করি। যদিও বাকী অংশও সুস্পষ্ট ও নির্ভুল তদুপরি এর বর্ণনা দেয়া এখানে সম্ভব নয়।

ঐ দিন যাঁরাই নবী (সা.)- এর সঙ্গে ছিলেন তাঁরা এ বাণী অন্যদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাঁদের সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশী ছিল ও বিভিন্ন স্থান হতে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। তাই আল্লাহর নিয়মের স্বাভাবিক রীতিতেই হাদীসটি মুতাওয়াতির হয়েছে (যদিও তা বর্ণনার পথে অনেক বাধা ছিল)। এছাড়া আহলে বাইতের ইমামগণ এ হাদীসটি প্রচারের জন্য যে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছিলেন তা ঐ লক্ষ্যকেই অন্বেষণ করছিল।

৪। স্বয়ং আলী তাঁর খেলাফতের সময়কালে একদিন কুফার রাহবা নামক স্থানে বক্তব্যে বলেন, "আপনাদের প্রতি কসম দিয়ে বলছি যাঁরা গাদীরে খুমে রাসূল (সা.) হতে আমার বিষয়ে শুনেছেন তাঁরা দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিন। কিন্তু যাঁরা নিজের চোখে রাসূলকে বলতে দেখেন নি বা কর্ণ দিয়ে শুনেন নি তাঁদের দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই।" বদর যু অংশগ্রহণকারী ১২ জন সাহাবীসহ ৩০ জন সাহাবী দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, নবী (সা.) আলীর হাত ধরে বলেছেন,

“হে লোকসকল! তোমরা কি জান না আমি মুমিনদের ওপর তাদের হতে অধিকার রাখি?” সকলে বলল, “হ্যাঁ।” তখন রাসূল (সা.) বললেন, “আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ্! যে আলীকে ভালবাসে তুমি তাকে ভালবাস আর যে তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে তুমিও তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ কর।”

আপনার নিকট বিষয়টি স্পষ্ট যে ত্রিশজন সাহাবীর পক্ষে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এরূপ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা সম্ভব নয়। তাই বু বৃত্তিকভাবেই তাঁদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে ঘটনাটি মুতাওয়াতির হয়ে যায় এবং এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। সেদিন যে সকল ব্যক্তি রাহবায় ছিলেন তাঁরাও বিষয়টি শুনেছেন এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবার পর তা অন্যদের নিকট প্রচার করেছেন।

রাহবার ঘটনাটি আলী (আ.)- এর খেলাফতের সময় অর্থাৎ ৩৫ হিজরীর পর ঘটেছিল। এ ঘটনাটি হতেও বোঝা যায় আলীর নেতৃত্বের ঘোষণা বিদায় হজ্জের পর গাদীরে খুমে ঘটেছিল এবং গাদীর ও রাহবার দিনের মধ্যে কমপক্ষে ২৫ বছরের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে অনেক যু , বিজয়, মহামারী ও অন্যান্য ঘটনায় গাদীরে উপস্থিত অনেক ব্যক্তিই মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং সেদিনের যুবক ও মুজাহিদদের অনেকেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তাঁর রাসূলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁরাও বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করতেন। তাই কেবল যাঁরা আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)- এর সঙ্গে ইরাকে বসবাস করতেন তাঁদের একটি অংশ সেদিন রাহবায় ছিলেন ও গাদীরের ঘটনার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে বার জন বদর যু অংশগ্রহণকারী (বদরী) সাহাবী ছিলেন। অবশ্য গাদীরে উপস্থিত কিছু ব্যক্তি সেদিন সেখানে উপস্থিত থাকলেও সাক্ষ্য দান করেন নি যেমন আনাস ইবনে মালিক।[৩৭৯]

যদি সেদিন আলীর পক্ষে সকল জীবিত সাহাবীর (পুরুষ ও নারীসহ) রাহবায় একত্রিত করে সাক্ষ্য গ্রহণ সম্ভব হত তবে তার সংখ্যা ঐ ত্রিশের কয়েক গুণ হত। আর যদি এর পঁচিশ বছর পূর্বে এই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হত তবে তাদের সংখ্যা কিরূপ হত একটু চিন্তা করুন। যদি এ সত্যকে অনুধাবন

করতে সক্ষম হন তবে গাদীরের হাদীস মুতাওয়াতির হবার সপক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হাতে পেয়েছেন।

রাহবার ঘটনা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩৭০ পৃষ্ঠায় আবু তুফাইল হতে যাইদ ইবনে আরকাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আলী রাহবায় সকলকে সমবেত করে বলেন : আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, এখানে উপস্থিত সেই সকল মুসলমান যাঁরা গাদীরের দিবসে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের আহবান করে বলছি তাঁরা দাঁড়িয়ে রাসূল (সা.) হতে যা শুনেছেন তা বলুন। ত্রিশ ব্যক্তি দাঁড়ালেন।" কিন্তু আবু নাঈম বলেছেন, "অনেকেই দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন রাসূল (সা.) আলীর হাত ধরে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন : তোমরা কি জানো আমি মুমিনদের ওপর তাদের অপেক্ষা অধিক অধিকার রাখি? তারা বলল : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন তিনি বললেন : আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ্! তুমি আলীর বন্ধুকে ভালবাস ও তার শত্রুকে শত্রু গণ্য কর।"

আবু তুফাইল বলেন, "আমি যখন রাহবা হতে বের হয়ে আসি তখন আমার মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল কিরূপে এ উম্মতের অধিকাংশ মানুষ রাসূলের এ নির্দেশের ওপর আমল করে নি? তাই যাইদ ইবনে আরকামের নিকট গিয়ে বললাম : আলী এরূপ বলছিল ও দাবী করছিল। যাইদ বললেন : এতে অস্বীকার করার কিছু নেই, আমি নিজেও নবী (সা.) হতে তা শুনেছি।"

যদি এই ত্রিশ ব্যক্তির সঙ্গে স্বয়ং আলী ও যাইদ ইবনে আরকামকে যোগ করেন তবে মোট রাবীর সংখ্যা দাঁড়ায় বত্রিশ জন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১১৯ পৃষ্ঠায় আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলা হতে ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, "রাহবার ঘটনার দিন আলীকে দেখলাম লোকদের কসম দিয়ে বলছেন কেবল তারাই দাঁড়াও ও সাক্ষ্য দাও যারা রাসূলকে সে অবস্থায় দেখেছে।"

আবদুর রহমান বলেন, "বদর যুে অংশগ্রহণকারী বার জন সাহাবী দাঁড়ালেন, যেন আমি এখনও তাঁদের বলতে দেখছি : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি গাদীরে খুমে ঐ দিন নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আমি কি মুমিনদের ওপর তাদের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা রাখি না? সবাই বলল : হ্যাঁ।

রাসূল বললেন : আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা। হে আল্লাহ্! আলীর বন্ধুদের প্রতি আপনি ভালবাসা ও তার শত্রুদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করুন।”

ইমাম আহমাদ একই পৃষ্ঠায় অপর একটি সূত্রে উল্লেখ করেছেন, “রাসূল (সা.) বলেছেন : হে আল্লাহ্! তুমি তার প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের ভালবাস এবং শত্রুতা পোষণকারীদের শত্রু গণ্য কর। তার সাহায্যকারীদের তুমি সাহায্য কর এবং বিরোধীদের হতাশ ও লাঞ্ছিত কর।” উক্ত সাহাবীরা রাসূলের উ ৃ তি দিয়ে এটি বলেন এবং তিন ব্যক্তি গাদীরে খুমে উপস্থিত থাকা স ে ও না দাঁড়ানোর কারণে আলী তাদের অভিসম্পাত করেন ও তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। বার জন বদরী সাহাবীর সঙ্গে বদরী সাহাবী হিসেবে আলী এবং যাইদ ইবনে আরকামকে যোগ করলে তাঁদের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় চৌদ্দ জন অর্থাৎ চৌদ্দ জন বদরী সাহাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। রাহবার হাদীসটির বিষয়ে কেউ চিন্তা করলে বুঝতে পারবে হাদীসটি প্রচারের জন্য আলী (আ.) কিরূপ প্রজ্ঞাজনোচিত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

৫। শহীদদের নেতা আবু আবদুল্লাহ্ আল হুসাইন (আ.) মুয়াবিয়ার শাসনামলে তাঁর পিতার রাহবার ঘটনার মত আরাফার ময়দানে হ ে র সময় লোকদের সমবেত করেন ও প্রথমে তাঁর নানা, পিতা- মাতা ও ভ্রাতার প্রশংসা করার পর গাদীরের হাদীস বর্ণনা করে অন্যদের হতে স্বীকৃতি নেন। তাঁর মত একজন বাগ্মী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি যাঁর কথা মানুষের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়কে আবেশিত করে অন্যকে নিজের অধীন করে, জনতা ইতোপূর্বে তা প্রত্যক্ষ করে নি। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রয়োজনীয় যুক্তি প্রদর্শন করে অন্যদের হৃদয়ে তা প্রতিস্থাপন করে গাদীর দিবসের হক্ব আদায় করেন। এরূপ স্থানে গাদীরের হাদীস বর্ণনার প্রভাব খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল।

৬। ইমাম হুসাইন (আ.)- এর বংশধারার নয়জন প্রসি   ইমামও এ হাদীসের প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। আপনি আপনার বু ি বৃত্তি ও সমগ্র সত্তা দিয়ে তা অনুভব করতে পারবেন যে, এই মহান ব্যক্তিবর্গ প্রতি বছর ১৮ জিলহ (গাদীর দিবসে) আনন্দ করতেন, সবাইকে মোবারকবাদ জানাতেন এবং ঈদ হিসেবে পালন করতেন। এ দিনে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখতেন, নফল নামায ও দোয়া পড়তেন। এ দিন মহান আল্লাহ্

তাঁদের যে নিয়ামত দান করেছেন তাঁরা সে নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা এভাবে আদায় করতেন। কারণ এ দিনেই নবী (সা.)- এর মুখনিসৃত পবিত্র বাণীর মাধ্যমে আলী (আ.)- এর ইমামত ও খেলাফত ঘোষিত হয়েছিল। এছাড়া এ দিনে তাঁরা নিকটাত্মীয়দের অধিক খোঁজ- খবর নিতেন ও তাদের বিভিন্ন উপহার দিতেন। তাঁদের অনুসারীদেরও ত প করার উপদেশ দিতেন। এভাবেই গাদীরের ঘটনা বংশ পরম্পরায় টিকে রয়েছে।

৭। এর ওপর ভিত্তি করেই শিয়ারা সকল যুগে সকল গ্রাম- শহর, দেশ ও স্থানে ১৮ জিলহ ঈদ পালন করে আসছে।[৩৮০] এ দিন শিয়ারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে (এজন্য যে আল্লাহ্ আমীরুল মুমিনীন আলীর ইমামতের ঘোষণার মাধ্যমে দীনকে পূর্ণতা দান এবং নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছেন) মসজিদসমূহে নফল নামায ও কোরআন তেলাওয়াতের জন্য সমবেত হন। এ দিন তাঁরা আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং পাড়া- প্রতিবেশী ও দরিদ্রদের খাদ্যদানের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টায় ব্রত হন। সম্ভব হলে প্রতি বছর এই দিন হযরত আলী (আ.)- এর মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে নাজাফে তাঁর কবরে যান। ১৮ জিলহ হযরত আলীর কবর যিয়ারতকারীর সংখ্যা লক্ষাধিক হয়ে থাকে। অনেকেই এ দিনে মুস্তাহাব রোযা রাখেন। যিয়ারতকারীরা সেখানে সাদকা, নজর প্রভৃতি দান করেন এবং ইমামদের হতে নির্দেশিত যিয়ারতসমূহ সেখানে পাঠ করেন। এ যিয়ারতসমূহে আলীর বিভিন্ন ফজীলত যেমন দীনের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতা, দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অসীম কষ্ট স্বীকার, ে ষ্ঠ রাসূলের সেবায় তাঁর আত্মনিয়োগ ও আত্মত্যাগের বিবরণ, রাসূলের পক্ষ হতে তাঁকে মনোনয়নের হাদীসসমূহ বিশেষত গাদীরে খুমের হাদীস প্রভৃতি বিষয় উ ৃত করা হয়। বক্তারা এ দিনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন (মুরসাল) সূত্রে বর্ণিত গাদীরের হাদীস এবং এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে রচিত কবিতাসমূহ[৩৮১] পাঠ করে থাকেন। এভাবেই যুগ যুগ ধরে গাদীর শিয়াদের মাঝে পালিত হয়ে আসছে।

সুতরাং আহলে বাইত ও শিয়া সূত্রে গাদীরে খুমের হাদীসটি মুতাওয়াতির হবার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এর দাবীদারদের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি নবী (সা.)- এর বাণীর প্রতিটি শব্দ

যথাযথ সংরক্ষণে ভূমিকা রেখেছিল। এই সত্যকে যাচাই করতে চাইলে আপনি শিয়াদের নির্ভরযোগ্য বলে পরিচিত চারটি গ্রন্থে তা দেখতে পারেন। তদুপরি শিয়া আলেমদের সংকলিত মুসনাদসমূহে এ হাদীস মুত্তাছিল[৩৮২] ও মারফু[৩৮৩] সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কেউ এ বিষয়ে অধ্যয়ন করলে হাদীসটি শিয়া সূত্রে মুতাওয়াতির হবার বিষয়টি তার নিকট সুস্পষ্ট হবে।

৮। এমন কি প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতিতেই আহলে সুন্নাহর সূত্রেও হাদীসটি মুতাওয়াতির বলে গণ্য হয়েছে।

আল্লাহর সৃষ্টির নীতিতে কোন পরিবর্তন নেই এবং তাঁর দীন অপরিবর্তনীয় (যদিও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না)। এ বাণীর ফলশ্রুতিতে বলা যায় গাদীরের হাদীস এ কারণেই সুন্নী সূত্রেও মুতাওয়াতির হয়েছে। 'ফাতওয়া আল হামিদিয়া' গ্রন্থের লেখক তাঁর 'আস্ সালাওয়াতুল ফাখিরাহ্ ফিল আহাদিনিল মুতাওয়াতিরাহ্' নামক প্রবন্ধে এ হাদীসটিকে মুতাওয়াতির বলেছেন (তাঁর কট্টর মনোভাব স ও)। আল্লামাহ্ সুয়ূতী ও তাঁর মত অনেকেই হুযাইফাহ্ হতে হাদীসটি বর্ণনা করে সহীহ বলেছেন। মুহাম্মদ ইবনে জারির তাবারী (মুফাসসির ও ঐতিহাসিক), আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে উকদা ও মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে ওসমান যাহাবী বিভিন্ন সূত্র হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কিত গ্রন্থও রচনা করেছেন।

ইবনে জারির তাঁর বইয়ে পঁচাত্তরটি সূত্রে এবং ইবনে উকদা[৩৮৪] ১০৫টি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যাহাবী তাঁর কট্টর মনোভাব স ও এ সকল সূত্রকে বিশু ও সহীহ বলতে বাধ্য হয়েছেন।[৩৮৫]

'গায়াতুল মারাম' গ্রন্থের ১৬ অধ্যায়ে আহলে সুন্নাহ্ হতে ৮৯টি সূত্রে গাদীরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বিশেষত এ গ্রন্থে হাদীসটি তিরমিযী, নাসায়ী, তাবরানী, বাযযার ইবনে ইয়ালী ও অন্যদের হতে উ ৃত করেছেন।

সুয়ূতী তাঁর 'তারিখুল খুলাফা' গ্রন্থে হযরত আলী (আ.)- এর জীবনীতে তিরমিযী হতে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, "আহমাদ হাদীসটি আলী, আবু আইয়ুব আনসারী, যাইদ ইবনে আরকাম, উমর ও যিমার হতে বর্ণনা করেছেন।"

তিনি আরো বলেছেন, "আবু হুরাইরা হতে আবু ইয়ালী এবং ইবনে উমর, মালিক ইবনে হুয়াইরিস, হাবশ ইবনে জুনাদা, জারির ইবনে আবদুল্লাহ্, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আবু সাঈদ খুদরী ও আনাস ইবনে মালিক হতে তাবরানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া বাযযার, ইবনে আব্বাস, বুরাইদাহ্ ও আম্মারাহ্ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসের পক্ষে আরেকটি দলিল হলো এ বর্ণনাটি যা ইমাম আহমাদ তাঁর 'মুসনাদ'[৩৮৬] গ্রন্থে রিয়াহ ইবনে হারিস হতে দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন- "একদল লোক আলীর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : হে আমাদের মাওলা! আপনার ওপর সালাম! হযরত আলী তাদেরকে প্রশ্ন করলেন : তোমরা কারা? তারা বলল : হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা আপনার অনুগত ব্যক্তি। হযরত আলী বললেন : আমি তোমাদের মাওলা কিরূপে হলাম, তোমরা তো আরব। তারা বলল : গাদীরের দিনে আমরা রাসূল (সা.)- কে বলতে শুনেছি : আমি যার মাওলা এই আলীও তার মাওলা।"

রিয়াহ বলেন, "যখন তারা ফিরে যাচ্ছিল তখন আমি তাদের অনুসরণ করলাম ও তাদের প্রশ্ন করলাম : আপনারা কারা? তারা বলল : আমরা মদীনার আনসার। তাদের মধ্যে আবু আইয়ুব আনসারীও ছিলেন।"

হাদীসটি মুতাওয়াতির হবার পক্ষে অপর দলিল হলো এ হাদীস যা আবু ইসাহাক সা'লাবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সূরা মাআরিজের তাফসীরে দু'টি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "রাসূল (সা.) গাদীরের দিনে যখন জনগণকে সমবেত করে আলীর হাত ধরে ঘোষণা করলেন :

من كنت مولاه فعليّ مولاه তখন এ খবরটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। হারিস ইবনে নোমান ফিহরী তা শুনে উটে আরোহণ করে রাসূলের নিকট আসল। উটকে বেঁধে রাসূলকে লক্ষ্য করে বলল : হে মুহাম্মদ! তুমি একদিন নির্দেশ দিয়েছিলে এক আল্লাহয় বিশ্বাস করতে ও তোমাকে তাঁর নবী হিসেবে স্বীকার করতে, আমরা তা করেছি। পরবর্তীতে বললে দিনে পাঁচবার নামায পড়, তাও মানলাম, আবার বললে যাকাত দাও, তাও করলাম, পরে রমযান মাসের রোযা রাখার নির্দেশ

দিলে তাও শুনলাম, হ   করার নির্দেশও পালন করলাম। এতকিছুতেও তোমার সন্তুষ্টি আসল না, অবশেষে নিজের চাচাত ভাইয়ের হাত ধরে তাকে আমাদের ওপর ৫ ষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছ : আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা-   এ কথাটি তোমার নিজের পক্ষ হতে নাকি আল্লাহর পক্ষ হতে? নবী (সা.) বললেন : যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি। হারিস তার বাহনের দিকে ফিরে যেতে যেতে বলল : হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ যা বলছে তা যদি সত্য হয় তবে আমাদের ওপর আসমান হতে পাথর বর্ষণ করুন অথবা কোন কঠিন আজাব প্রেরণ করুন। তখনও সে তার বাহনের নিকট পৌঁছে নি, আকাশ হতে একটি বড় পাথর তার মাথার ওপর আপতিত হয়ে তাকে ধ্বংস করল এবং মহান আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াত রাসূলের ওপর অবতীর্ণ করলেন-

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾

এক ব্যক্তি চাইল, সেই আজাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত কাফিরদের জন্য। যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই তা এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী।" হাদীসটি আমরা হুবহু বর্ণনা করলাম।[৩৮৭] আহলে সুন্নাহর একদল হাদীসবেত্তা হাদীসটি বিনাবাক্যে গ্রহণ করেছেন।[৩৮৮]

ওয়াসসালাম

শ

সাতা তম পত্র

২৫ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

১। হাদীসে গাদীরের ব্যাখ্যা।

২। এরূপ ব্যাখ্যার সপক্ষে দলিল।

১। সাহাবীদের আমলের কারণে আমরা গাদীরের হাদীসকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য, হোক তা মুতাওয়াতির বা অমুতাওয়াতির। তাই আহলে সুন্নাহর আলেমগণ বলেন, 'মাওলা' শব্দটি কোরআনে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা হাদীদের ১৫ নং আয়াতে 'সঙ্গী' অর্থে এসেছে যেখানে কাফিরদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে-

(مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ) অর্থাৎ জাহান্নাম হচ্ছে তোমাদের আবাসস্থল ও তোমাদের উপযুক্ত সঙ্গী।

আবার সূরা মুহাম্মদের ১১ নং আয়াতে 'সাহায্যকারী' অর্থে এসেছে ও বলা হয়েছে-

(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ) অর্থাৎ এটি এজন্য যে, আল্লাহ্ সে সকল ব্যক্তির সাহায্যকারী যারা ঈমান এনেছে এবং কাফিরদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

কখনো 'উত্তরাধিকারী' অর্থে 'মাওলা' ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন সূরা নিসার ৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে- (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ)অর্থাৎ সকলের জন্যই আমরা উত্তরাধিকারী করেছি যা তাদের পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রা ত্যাগ করে যায় এবং হযরত যাকারিয়া (আ.)- এর উ্তি দিয়ে কোরআনে বলছে, (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي) "আমি আমার পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের (স্বগোত্রের) ভয় পাই" (সূরা মারইয়াম : ৫)। 'মাওলা' কখনো বা 'বন্ধু' অর্থে এসেছে, যেমন (يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا) "সেদিন কোন বন্ধু অপর বন্ধুর কাজে আসবে না" (সূরা দুখান : ৪১)। অবশ্য 'ওয়ালী' (ولی) শব্দটি 'ক্ষমতার অধিকারী' বা 'দায়িত্বশীল'

অর্থেও আসে, যেমন فلان وليّ القاصر অমুক ব্যক্তি অক্ষম বা বু হীন ব্যক্তির ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত। তেমনি 'প্রিয়' অর্থেও 'ওয়ালী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আহলে সুন্নাহর চিন্তায় নবীর বক্তব্যের অর্থ হলো : আমি যার সাহায্যকারী, বন্ধু বা প্রিয় আলী তার বন্ধু, সাহায্যকারী ও প্রিয় এবং এ অর্থই পুণ্যবান খলীফা (রা.) ও সাহাবীদের মতের অনুরূপ (من كنت ناصره أو صديقه أو حبيبه فإنّ عليّا كذلك)।

২। হাদীসও আমাদের যুক্তির সপক্ষে বলিষ্ঠ দলিল। হাদীসে এসেছে- যে ব্যক্তিবর্গ আলীর সঙ্গে ইয়েমেনে ছিলেন তাঁদের ওপর আলী আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইসলামী বিধানের কঠোরতা আরোপ করতেন। এজন্য তাঁরা আলীর বিরু রাসূলের নিকট প্রতিবাদ করেন। এর জবাবেই রাসূল (সা.) গাদীরের দিনে আলীর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেছেন যাতে যে সকল ব্যক্তি তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন তাঁদের ভুল ভেঙ্গে যায়। প্রথমে রাসূল আলীর মর্যাদা ও পরে তাঁর আহলে বাইতের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন যাতে তাঁদের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হয়।

এজন্য প্রথমে বলেছেন, "আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু"(من كنت وليّه فعليّ وليّه)। অতঃপর বলেছেন, "আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী ও মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি, আল্লাহর কিতাব ও আমার আহলে বাইত" (إنّي تارك فيكم الثّقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي)।

যেহেতু রাসূলের নিজের সম্মান আলীর সম্মানের সঙ্গে বিশেষভাবে এবং তাঁর পরিবারের সম্মানের সঙ্গে সাধারণভাবে জড়িত সেহেতু রাসূল সকল মানুষের উদ্দেশ্যে সেই সম্মান ও মর্যাদা সংরক্ষণের উপদেশ দিয়েছেন। তাই আহলে সুন্নাহ্ মনে করে এই হাদীসের মধ্যে খেলাফত বা নেতৃত্বের কোন নির্দেশনা নেই।

ওয়াসসালাম

স

আটা তম পত্র

২৭ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

১।	গাদীরের হাদীসের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যার অবকাশ নেই।

২।	যে হাদীসটি গাদীরের ঘটনার প্রেক্ষাপটরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটি মিথ্যা ও ঘটনাকে বিকৃত করার প্রয়াস ছাড়া কিছু নয়।

১। আপনি ব্যাখ্যা হিসেবে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন আমার বিশ্বাস আপনার মন সেটিকে সায় দেয় না বা বিশ্বাসও করে না। যেহেতু রাসূল (সা.)- এর শান ও মর্যাদা আপনি অবগত সেহেতু আপনি অন্তর হতে তা গ্রহণ করতে পারেন না। রাসূলের প্রজ্ঞা, নি াপত্ব ও সর্বশেষ নবী হিসেবে তাঁর পদক্ষেপ এ সকল বিষয়ের ঊর্ধ্বে। নবীকুল শিরোমণি ও নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘোষণাকারী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন- তিনি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কিছুই বলেন না। তিনি যা বলেন তা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ বৈ কিছু নয়। তাঁকে একজন শক্তিশালী ফেরেশতা শিক্ষা দান করেন

(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى)।

সুতরাং অন্য ধর্মের অনুসারী কোন দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি আপনাকে প্রশ্ন করে কেন আপনাদের নবী (সা.) সেদিন সহস্র মানুষের যাত্রা বিরতি করালেন? কেন গ্রীষ্মের ঐ প্রচণ্ড দাবদাহে ঊষর মরুভূমিতে তাদের থামার নির্দেশ দিলেন? কেন তিনি অগ্রগামীদের ফিরিয়ে আনার ও পশ্চাদগামীদের জন্য অপেক্ষা করার নির্দেশ দান করলেন? উ দহীন ও পানিশূন্য ঐ মরুভূমিতেই বা তাঁর এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য কি? বিভক্তির ঐ পথের (গাদীর এমন একটি স্থান যেখান হতে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা পরস্পর বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ পথে যাত্রা করত) মাথায় দাঁড়িয়ে নিজের মৃত্যুর সংবাদ দান করার ও অনুপস্থিতদের নিকট এ বক্তব্য পৌঁছানোর আহবানই

বা কোন্ উদ্দেশ্যে? তাঁর বিদায়ের সংবাদের সঙ্গে তাঁর দায়িত্বশীলতার বিষয়ের উল্লেখ করে কেনই বা বলেছেন : আমি এ বাণী সঠিকভাবে তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি কিনা সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হব? উম্মতই বা কোন্ বিষয়ে আনুগত্যের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে? কেনই বা একে একে আল্লাহর একত্বের, নিজের নবুওয়াতের, বেহেশত, দোযখ, মৃত্যু, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও কিয়ামতের বিষয়ে তাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন? সকলের নিকট এগুলোর স্বীকারোক্তি গ্রহণের প তিই বা কেন তিনি বেছে নিলেন? কেনই বা এসব প্রশ্নের পর আলীর হাত ধরে (এতটা উঁচু করলেন যে, তাঁর শুভ্র বগল দৃষ্টিগোচর হলো) ঘোষণা করলেন, 'হে লোকসকল! আল্লাহ্ আমার অভিভাবক আর আমি মুমিনদের অভিভাবক' এবং 'মাওলা' শব্দের ব্যাখ্যার জন্য মুমিনদের ওপর তাঁর অধিকারের বিষয়টিকে টেনে আনলেন ও বললেন 'আমি কি মুমিনদের ওপর তাদের নিজেদের হতে অধিকতর অধিকার রাখি না?' এরূপ ব্যাখ্যার পরেই বা কেন বললেন 'আমি যার মাওলা এই আলী তার মাওলা' (من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه) এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন 'যে আলীকে ভালবাসে তাকে তুমি ভালবাস আর যে তার সঙ্গে শত্রুতা করে তুমিও তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ কর। যে তাকে সাহায্য করে তুমি তাকে সাহায্য কর আর যে তাকে অপদস্থ করে তুমিও তাকে অপদস্থ কর।'

কেন তিনি যে দোয়া কেবল আল্লাহর খলীফা ও ইমামদের জন্য প্রযোজ্য সেই দোয়া আলীর জন্য করলেন? কেনই বা মুমিনদের ওপর তাঁর নিজ অধিকারের বিষয়টি আনার পর তাদের স্বীকৃতি নিয়ে ঘোষণা করলেন : আমি যার মাওলা এই আলী তার মাওলা' এবং কি ভিত্তিতেই বা আহলে বাইতকে কোরআনের সমকক্ষ বললেন এবং আলী (আ.) ও আহলে বাইতের অভিভাবকত্বের বিষয়টিকে এর মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহতের ঘোষণা দিলেন? প্রজ্ঞাবান এ নবীর এ বিষয়ে এত গুরুত্ব আরোপের কারণই বা কি? এরূপ বৃহৎ সমাবেশের আয়োজনের উদ্দেশ্যই বা কি?

(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)

(হে রাসূল! আপনার ওপর আপনার প্রভুর পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন, যদি তা না করেন তাহলে আপনি তাঁর রেসালতের কিছুই প্রচার করেন নি) এ আয়াতের মাধ্যমে মহান

আল্লাহ্ই বা কোন্ বাণী ঘোষণার নির্দেশ দিয়েছেন যা পালন না করলে রাসূল (সা.) রেসালতের কোন দায়িত্বই পালন করেন নি বলা হয়েছে? কেনই বা তিনি তাঁর রাসূলকে এ বিষয়ে এতটা উদ্বু করেছেন যা অনেকটা ভীতি প্রদর্শনের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে? এটি কিরূপ দায়িত্ব ছিল যা পালনে রাসূল (সা.) ফিতনার ভয় পাচ্ছিলেন? আর এ কারণেই কি মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে মুনাফিকদের হতে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করেছেন?

অন্য মতবাদের কোন দার্শনিক আপনাকে উপরোক্ত প্রশ্নগুলো করলে আপনি কি এ জবাব দেবেন, মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মুসলমানদের সমবেত করেছিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি ঘোষণা করবেন আলী তাঁদের সহযোগী ও বন্ধু। আমার বিশ্বাস হয় না আপনি এ জবাবে সন্তুষ্ট হবেন এবং এরূপ একটি সাদামাটা কর্মের দায়িত্ব মহান আল্লাহ্ যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং তাঁর নবী যিনি অন্য সকল নবীর নেতা ও প্রজ্ঞাবানদের সর্দার তাঁদের ওপর আরোপ করাকে যথেষ্ট মনে করবেন। আপনি এসবের ঊর্ধ্বে যে রাসূলের প্রতি এমন ধারণা পোষণ করবেন যে, তিনি তাঁর সমগ্র প্রচেষ্টাকে এমন কর্মে নিয়োজিত করবেন যা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই এবং সবার নিকট স্পষ্ট। নিঃসন্দেহে আপনি বিশ্বাস করেন রাসূলের যে কোন কর্ম প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে না এবং তাঁদের পক্ষে তাঁর কর্মের ভুল ধরাও অসম্ভব। বরং নবীর বাক্য ও কর্ম প্রজ্ঞাজনোচিত ও ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে বলে তাঁকে আপনি নি াপ মনে করেন। স্বয়ং আল্লাহ্ সূরা তাকভীরে বলেছেন, "নিশ্চয় এটি সম্মানিত রাসূলের বাণী। যিনি শক্তিশালী আরশের অধিপতির নিকট মর্যাদাশীল। সবার মান্যবর, বিশ্বাসভাজন এবং তোমাদের এ সঙ্গী (রাসূল) উম্মাদ নন।" মহান আল্লাহর এরূপ সুস্পষ্ট বর্ণনার পর তাঁকে কোন ত্রুটির অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় কি বা তাঁর কর্মকে অসংলগ্ন প্রতিজ্ঞা ও যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যার সুযোগ থাকে কি? এমন সব প্রতিজ্ঞা ও যুক্তি যার মূল ঘটনার সঙ্গে কোন সংশ্লিষ্টতাই নেই। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এরূপ বিষয়ের ঊর্ধ্বে। গাদীর দিবসে ঊষর ও উত্তপ্ত মরু প্রান্তরে নবীর বাক্য ও কর্মের একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালনের নিমিত্তে অর্থাৎ তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও খলীফা মনোনয়নের ঘোষণা দানের জন্যই এরূপ করেছিলেন। গাদীরের হাদীসের শাব্দিক ও

বু বৃত্তিক সংশ্লিষ্টতা হতেও এটি স্পষ্ট যে, নবী (সা.) তাঁর পরবর্তী নেতা হিসেবে আলীকে ঘোষণা করার জন্যই এমন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সুতরাং এ হাদীস এর পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও প্রেক্ষাপটের কারণে আলী (আ.)- এর খেলাফতের পক্ষে অকাট্য দলিল যা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যার সুযোগ নেই। যে ব্যক্তি বু বৃত্তিকে কর্মে নিয়োজিত করবে এবং কর্ণ ও চক্ষুকে উন্মুক্ত করবে সে দেখতে পাবে এরূপ ব্যাখ্যা হতে প্রত্যাবর্তনের কোন পথ নেই।

২। কিন্তু হাদীসটিকে ব্যাখ্যার জন্য সহযোগী যে হাদীসের আ য় গ্রহণ করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন এবং সত্যকে গোপন ও মিথ্যার সঙ্গে মি ণের মাধ্যমে একে বিকৃতির পোষাক পরানোর প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ রাসূল (সা.) আলী (আ.)- কে দু'বার ইয়েমেনে প্রেরণ করেন। প্রথম বার অষ্টম হিজরীতে এবং এবারই নিন্দুকেরা আলীর বিরু অপপ্রচার চালায় ও মদীনায় ফিরে রাসূলের নিকট অভিযোগ করে। নবী (সা.) এতে তাদের ওপর এতটা ক্ষুব্ধ হন যে, তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়[৩৮৯] এবং তারা আলীর বিষয়ে এরূপ কথা আর বলে নি।

দ্বিতীয়বার যখন রাসূল (সা.) আলীকে ইয়েমেন প্রেরণ করেন (দশম হিজরীতে) তখন তিনি স্বয়ং আলীর হাতে পতাকা তুলে দেন ও নিজের পাগড়ী খুলে আলীর মাথায় বেঁধে দিয়ে বলেন, "যাত্রা কর। অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দিও না।" আলী (আ.) রাসূলের নির্দেশমত সকল দায়িত্ব পালন করে ফিরে বিদায় হ রাসূলের সঙ্গী হন ও তাঁর সঙ্গে হ র নিয়ত করে ইহরামের পোষাক পড়েন এবং হ র সকল দায়িত্ব একসঙ্গে সম্পাদন করেন। এমন কি রাসূল (সা.) তাঁর কুরবানীতে আলীকে শরীক করেন।

এইবার কেউই রাসূলের নিকট আলীর বিষয়ে অভিযোগ করে নি। সুতরাং কিরূপে আমরা বলতে পারি গাদীরের হাদীস আলীর বিরু অভিযোগের ফলশ্রুতিতে বলা হয়েছে?

তদুপরি তাঁর বিরু অভিযোগের কারণে নবী (সা.) সকলকেই যাত্রাবিরতি করিয়ে উটের পিঠে বসার সামগ্রীগুলো নামিয়ে মিম্বার তৈরী করার নির্দেশ দেবেন ও দীর্ঘক্ষণ তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবেন এরূপ কথা তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী বলেই গণ্য হবে। এরূপ বিশ্বাস হতে আল্লাহর আ য় চাই যে, আমরা রাসূলের কাজকে অযথা ও অতিরি ত মনে করবো, কারণ তাঁর

প্রজ্ঞা এ কর্মের অনুমতি দেয় না। মহান আল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রাসূল কর্তৃক আনীত এবং এটি কোন কবির বাণী নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস কর এবং এটি কোন অতীন্দ্রীয়বাদীর কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর। এটি বিশ্ব পালনকর্তার নিকট হতে অবতীর্ণ।”[৩৯০] যদি রাসূল (সা.) চাইতেন (বিরোধীদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে) শুধু আলী (আ.)- এর মর্যাদা বর্ণনা করতে তবে তা এভাবে বলতে পারতেন-

هذا ابن عمّي و صهري و أبو ولدي و سيّد أهل بيتي فلا تؤذوني فيه অর্থাৎ সে (আলী) আমার চাচাতো ভাই, জামাতা, আমার সন্তানদের (দৌহিত্র) পিতা এবং আমার আহলে বাইতের নেতা সুতরাং তাকে কষ্ট দান কর না।

অথবা এরূপ কোন বাক্য যা রাসূলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও মর্যাদা নির্দেশ করে। কিন্তু তা তিনি করেন নি, বরং হাদীসের শুরু এবং শেষে এমন কথা বলেছেন যা তাঁর নেতৃত্বের দিকেই ইঙ্গিত করে বলে আমাদের বৃ বৃত্তি সর্বপ্রথম বলে।

এখন এরূপ বক্তব্য উপস্থাপনের কারণ যা- ই হোক বক্তব্যের শব্দ ও বাচনভঙ্গীর প্রতি আমাদের অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে।

তাছাড়া গাদীরের হাদীসে আহলে বাইতের স্মরণ আমাদের কথাকেই সমর্থন করে, কারণ আহলে বাইতকে তিনি কোরআনের সমকক্ষ ঘোষণা করে জ্ঞানবানদের ইমাম বলে তাঁদের পরিচিত করিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

إنّي تارك فيكم الثّقلين ما إن تَمسّكتم به لن تضلّوا كتاب الله و عترتي أهل بيتي “আমি তোমাদের মাঝে দু’টি মূল্যবান ও ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধর তাহলে কখনো বিচ্যুত হবে না, তা হলো আল্লাহর কিতাব এবং আমার রক্ত সম্পর্কীয় আহলে বাইত।”

তিনি এরূপ করেছেন যাতে উম্মত জানতে ও বুঝতে পারে রাসূলের পর দীনের জন্য এ দু’য়ের ওপরই নির্ভর করতে হবে ও এ দু’য়ের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাই আহলে বাইতের পবিত্র ইমামদের অনুসরণের অপরিহার্যতা প্রমাণের জন্য এটিই যথেষ্ট যে, তাঁদেরকে সেই

কোরআনের সমকক্ষ ঘোষণা করা হয়েছে যাতে কোনক্রমেই বিচ্যুতি প্রবেশ করতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থী নির্দেশের অনুসরণ যেমন বৈধ নয় তেমনি এমন কোন নেতা বা নেতৃত্বের অনুসরণও বৈধ নয় যারা আহলে বাইতের ইমামদের নির্দেশের পরিপন্থী নির্দেশ দান করে।

তাই রাসূলের এ কথা فإنّهما لن ينقضيا أو لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض অর্থাৎ 'এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার সঙ্গে মিলিত হবে'- এ হতে সুস্পষ্ট যে, রাসূলের ওফাতের পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত কখনোই পৃথিবী কোরআনের সমকক্ষ আহলে বাইতের মধ্য হতে কোন ইমামবিহীন হবে না। এ হাদীস হতে আরো বোঝা যায় খেলাফতও আহলে বাইতের বাইরে হতে পারবে না। এর সপক্ষে যুক্তি হিসেবে মুসনাদে আহমাদের ৫ম খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি লক্ষণীয়।

হযরত যাইদ ইবনে সাবিত রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন,

إنّي تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل محدود من السّماء إلى الأرض و عترتي أهل بيتي فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض

"আমি তোমাদের মাঝে দুই খলীফা (প্রতিনিধি) রেখে যাচ্ছি আল্লাহর কিতাব যা আসমান হতে যমীন পর্যন্ত বিস্তৃত এক রজ্জু এবং আমার আহলে বাইত। এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না হাউজে আমার সঙ্গে মিলিত হবে।"

এ হাদীসটিও আহলে বাইতের ইমামদের খেলাফতের সপক্ষে একটি অকাট্য দলিল। আপনি অবগত যে, আহলে বাইতের অনুসরণের অপরিহার্যতার দলিল হযরত আলীর অনুসরণের অপরিহার্যতা দান করে, কারণ আলী (আ.) নিঃসন্দেহে রাসূলের আহলে বাইতের প্রধান।

তাই গাদীর ও অনুরূপ অন্যান্য হাদীস হতে বোঝা যায় এর কোনটিতে হযরত আলী আহলে বাইতের প্রধান হিসেবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)- এর পক্ষ হতে কোরআনের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত আবার কোনটিতে নিজের ব্যক্তিত্বের কারণে রাসূলের মত মুমিনদের নেতা হিসেবে তাঁদের পক্ষ হতে ঘোষিত।

ওয়াসসালাম

শ

উনষাটতম পত্র

২৮ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

১। সত্য প্রকাশিত হয়েছে বলে স্বীকারোক্তি।

২। অন্যভাবে সত্যকে পাশ কাটানোর প্রচেষ্টা।

১। আমি ইতোপূর্বে আপনার মত কোমল বাক্য ব্যবহারকারী এবং যুক্তি উপস্থাপনে শক্তিশালী কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করি নি। হাদীসটির সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রমাণ ও পারিপার্শ্বিকতাকে আপনি যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে অস্পষ্টতার আবরণ আমার সম্মুখ হতে অপসারিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে 'ওয়ালী' ও 'মাওলা' বলতে গাদীরের হাদীসে 'নেতৃত্বের অধিকার' বা 'ক্ষমতা'ই বোঝানো হয়েছে। যদি 'ওয়ালী' অর্থ 'সাহায্যকারী' বা 'বন্ধু' জাতীয় কিছু হত তবে ঐ ব্যক্তির আহ্বানের কারণে আজাব অবতীর্ণ হত না। তাই আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস এ যুক্তির ভিত্তিতে সঠিক।

২। কিন্তু হায়! যদি আপনি উপরোক্ত হাদীসের যে ব্যাখ্যা ইবনে হাজার তাঁর 'সাওয়ায়েক' গ্রন্থে বা হালাবী তাঁর সীরাতে প্রদান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট হতেন। তাঁরা বলেছেন, "এটি সঠিক যে, আলী নেতৃত্বের অধিকার রাখেন কিন্তু তা তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন মুসলমানরা তাঁর হাতে বাইয়াত করবে। যদি তা না হয় তাহলে আলী (রা.) রাসূল (সা.)- এর জীবদ্দশায়ই ইমাম ও নেতা হয়ে যান।" তাই যেহেতু হাদীসটিতে আলী (রা.)- এর নেতৃত্বের সময়কাল উল্লিখিত হয় নি সেহেতু আমরা ধরে নেব যখন তাঁর বাইয়াত অনুষ্ঠিত হবে তখন থেকে তিনি নেতৃত্বের অধিকারী হবেন। এতে এটি প্রথম তিন খলীফার তাঁর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাসের বিরোধী হবে না এবং তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার ধারাবাহিকতাও রক্ষা হয়।

ওয়াসসালাম

স

ষাটতম পত্র

৩০ মুহররম ১৩৩০ হিঃ

সত্যকে পাশ কাটানোর উত্তরের জবাব

আল্লাহ্ আপনার মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ করুন। আপনি চেয়েছেন আমরা গাদীরের হাদীসের এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হব যে, আলী (আ.) তখনই ইমাম বা নেতা ও অভিভাবক হবেন যখন মুসলমানরা তাঁকে নির্বাচিত করে তাঁর হাতে বাইয়াত করবে। তাই তাঁর নেতৃত্বের যে ঘোষণা গাদীর দিবসে দেয়া হয়েছে তা ঐ দিন হতে প্রযোজ্য নয়, বরং তাঁর নির্বাচনের দিন হতে প্রযোজ্য। অন্যভাবে বললে তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতা থাকলেও এর কার্যকারিতা ছিল না। যদি এটি আমরা গ্রহণ করি তবে প্রথম তিন খলীফার খেলাফতের বিষয়টি প্রশ্নের সম্মুখীন হয় না।

আমি আপনাকে সত্যের আলো, ন্যায়, ইনসাফ ও সম্মানের মর্যাদার শপথ দিয়ে বলছি, আপনি কি এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট? যদি তা হয় তবে আমরাও আপনার অনুসরণ করবো। আপনি কি রাজী হবেন এরূপ কোন ব্যাখ্যা আপনার নামে প্রচলিত হোক? আমার মনে হয় না আপনি এতে রাজী ও সন্তুষ্ট হবেন?

আপনি নিশ্চিত জানুন আপনিও সেইসব ব্যক্তিদের এ কর্মে আশ্চর্যান্বিত হবেন যাঁরা এ ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কারণ হাদীসটি শাব্দিকভাবেও এরূপ অর্থ বহন করে না এবং কেউই এ থেকে এমন কিছু বুঝবে না। এটি যেমন একদিকে নবী (সা.)- এর প্রজ্ঞার পরিপন্থী, অন্যদিকে তাঁর অন্য কোন বক্তব্য ও কর্মের সঙ্গেও সাম স্যশীল নয়। তদুপরি আমরা এতদসংশ্লিষ্ট অকাট্য যে সকল প্রমাণের প্রতি ইশারা করেছি এ ব্যাখ্যা তার সঙ্গেও সাম স্যশীল নয়। যেমন হারিস ইবনে নো'মান ফাহরী এ হাদীস হতে যা বুঝেছেন তা আপনার যুক্তির বিরু ে ই বুঝেছেন। সুতরাং আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের উদ্দেশ্যও তাই ছিল যা আমরা বলেছি।

এগুলো বাদ দিলেও আলী (আ.)- এর নেতৃত্বের বিষয়টি হাদীসের সর্বজনীনতার কারণে আপনার ব্যাখ্যার সঙ্গে সংগতিশীল নয়। কারণ হাদীসটি হতে বোঝা যায় আলী এমন কি প্রথম তিন

খলীফাসহ সকল মুসলমানদের ওপর নেতা। যদি তা না হয় তবে তা রাসূলের নিম্নোক্ত কথার পরিপন্থী হবে- ‘আমি কি মুমিনদের ওপর তাদের হতে অধিকতর অধিকার রাখি না।’ সকলে বলল, “হ্যাঁ।” তখন তিনি বলেন, من كنت مولاه অর্থাৎ আমি যেরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির নেতা, فعليّ مولاهঅর্থাৎ সেরূপ আলীও (কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই) তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির নেতা। এমন কি হযরত আবু বকর এবং উমরও গাদীর দিবসে রাসূল (সা.) হতে এ বক্তব্য শোনার পর আলীকে বলেন, أمسيت يا بن ابى طالب مولى كل مؤمن و مؤمنةঅর্থাৎ হে আবু তালিবের পুত্র! আপনি প্রতিটি মুমিন পুরুষ ও নারীর নেতা মনোনীত হয়েছেন। যেহেতু এই দুই ব্যক্তিও এটি স্বীকার করেছেন যে, আলী সকল মুমিন পুরুষ ও নারীর নেতা সেহেতু গাদীরের দিন হতেই আলী সকল মুমিনের ওপর নেতা।[৩৯১]

বর্ণিত হয়েছে হযরত উমরকে প্রশ্ন করা হলো : আলীর প্রতি আপনি যেরূপ আচরণ করেন রাসূলের অন্য কোন সাহাবীর সঙ্গে কেন সেরূপ আচরণ করেন না?[৩৯২] হযরত উমর বলেন, “তিনি আমার মাওলা ও নেতা।” এখানে লক্ষ্য করুন যখন আলী খলীফা হিসেবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন নি, তাঁর বাইয়াত সংঘটিত হয় নি তখনও খলীফা উমর তাঁকে নিজের মাওলা ও নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আলী (আ.) যে সকল সময়ের জন্যই মুমিনদের নেতা তা এ বর্ণনা হতে বোঝা যায়। তাই যখন রাসূল (সা.) গাদীর দিবসে আলীর নেতৃত্বের ঘোষণা দান করেন তখন হতেই তিনি সকল মুমিন পুরুষ ও নারীর মাওলা বলে পরিগণিত।

এ সম্পর্কিত অন্য একটি ঘটনা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। একবার দু’জন আরব তাদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার জন্য হযরত উমরের নিকট আসলে হযরত উমর আলী (আ.)- কে তাদের মধ্যে বিচার করার আহবান জানান। তারা দু’জন বলে, “কেন এই ব্যক্তি আমাদের মধ্যে মীমাংসা করবে?” হযরত উমর দু’হাতে তাদের দু’জনের গলা চেপে ধরে[৩৯৩] বলেন, “হে হতভাগারা! জানিস না এ ব্যক্তি কে? এ তোদের ও সকল মুমিনের নেতা। যে কেউ এ ব্যক্তিকে মাওলা ও নেতা হিসেবে গ্রহণ না করবে সে মুমিন নয়।”

এ সম্পর্কিত হাদীস ও ঘটনা অসংখ্য। আপনি ভালভাবেই অবগত আছেন, যদি ইবনে হাজার ও তাঁর অনুসারীদের মনগড়া এ সকল যুক্তি সঠিক হত তবে রাসূল (সা.)- কে একজন উদ্দেশ্যহীন ও নিষ্ফল কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি বলতে হবে যিনি তাঁর বাক্য ও কর্মে প্রজ্ঞাবান নন (আল্লাহর নিকট তাঁর ওপর এরূপ অপবাদ আরোপ হতে আ য় চাই), কারণ তাঁদের যুক্তিতে মহানবী (সা.)- এর গাদীরের সেই বৃহৎ ও আশ্চর্যজনক সমাবেশ আয়োজনের পেছনে কোন গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল না। তিনি শুধু চেয়েছিলেন এটি বলতে- আমার মৃত্যুর অনেক দিন পর যখন আলীকে তোমরা খেলাফতের জন্য নির্বাচিত করবে তখন আলী তোমাদের ওপর নেতৃত্বের অধিকারী হবে। এ সকল বিশেষজ্ঞের এরূপ ব্যাখ্যা শুনে উম্মাদরাও হাসতে শুরু করবে। বুি বৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের কথা না হয় বাদই দিলাম।

তাদের এরূপ অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হলো যাতে আলী (আ.)- এর আর কোন ে ষ্ঠত্ব না থাকে। কারণ যে কোন মুসলমানেরই বাইয়াত করা হবে সে নেতৃত্বের অধিকারী হবে, সেক্ষেত্রে আলী (আ.), অন্যান্য সাহাবী আর সকল মুসলমান সমান হয়ে পড়বে। তাহলে প্রশ্ন হলো গাদীর দিবসে রাসূল (সা.) কোন্ বিষয়ে আলীকে ইসলামে অগ্রগামীদের থেকেও ে ষ্ঠ বলে ঘোষণা করতে চেয়েছেন? সেই ে ষ্ঠত্বটি কি? হে মুসলিম সমাজ! এই অপব্যাখ্যাকারীদের উত্তর দান সম্পন্ন হলে আপনারা জবাব দিন।

আপনার শেষ যুক্তিটিতে আপনি বলেছেন যদি আলীর ইমামত ও নেতৃত্বের বিষয়টি ভবি তের জন্য না হয় তবে তিনি রাসূলের উপস্থিতিতেই ইমাম বলে পরিগণিত হবেন। এ যুক্তিটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ও বিচ্যুত। এটি রাসূল (সা.)- এর নির্দেশকে অবজ্ঞার শামিল এবং তাঁর মনোনীত খলীফা, প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত নেতার সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গের নামান্তর। এটি রাসূলের উ ৃত এ সম্পর্কিত অন্যান্য হাদীস, যেমন 'মানযিলাত'- এর হাদীসের প্রতি নিজেদের অজ্ঞতার ভান বৈ কিছু নয়, কারণ সেখানে রাসূল (সা.) বলেছেন, أنت منّي بِمَنْزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبِيّ بعدي

অর্থাৎ হে আলী! তোমার স্থান আমার কাছে মূসার নিকট হারুনের ন্যায় শুধু পার্থক্য এটি, আমার পর কোন নবী নেই।

হাদীসে ‘ইনযার’ বা ‘ইয়াওমুদ্দার’- কেও এর মাধ্যমে তাঁরা অস্বীকার করেছেন যেখানে রাসূল (সা.) বলেছেন, “তোমরা তার (আলীর) কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে।” এরূপ অন্যান্য সহযোগী হাদীসগুলোও উপেক্ষিত হয়েছে যাতে রাসূল আলী (আ.)- এর ইমামত ও নেতৃত্বের বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছিলেন।

তদুপরি যদিও রাসূলের উপস্থিতিতে আলী (আ.)- এর নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্বের বিষয়টি বাস্তব নমুনা হিসেবে বিদ্যমান ছিল না কিন্তু রাসূলের ওফাতের পর পরই বিষয়টিকে বাস্তব রূপ দান এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ এ বিধিটি সবাই স্বীকার করেন যে, যদি বাক্যের অর্থ প্রচলিত ও প্রকৃত অর্থে ব্যবহার সম্ভব না হয় তবে তা নিকটতম রূপক ও সম্ভাব্য অর্থে ব্যবহার করতে হবে। বিষয়টি চিন্তা করে দেখুন।

আপনার কথামত এ হাদীসটির ব্যাখ্যা না করলেও অগ্রবর্তী পুণ্যবান সাহাবীদের সম্মান ও মর্যাদা সংরক্ষিত রাখা সম্ভব যা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ্।

ওয়াসসালাম

শ

একষট্টিতম পত্র

১ সফর ১৩৩০ হিঃ

এ বিষয়ে শিয়া সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ বর্ণনার আহবান

যদি মহান ও পুণ্যবান পূর্ববর্তী সৎ কর্মশীল সাহাবীদের অবস্থান সংরক্ষিত থাকে তাহলে গাদীর ও অন্যান্য যে কোন হাদীস বিশেষভাবে হযরত আলীর জন্য প্রযোজ্য হলে অসুবিধা নেই। এজন্য সেগুলোকে ভিন্নরূপ ব্যাখ্যারও প্রয়োজন নেই।

এ বিষয়ে শিয়া সূত্রে বর্ণিত যে সকল হাদীস রয়েছে এবং যেগুলো সম্পর্কে আহলে সুন্নাহ্ অনবহিত যদি অনুগ্রহপূর্বক সে বিষয়ে আমাকে অবহিত করেন।

ওয়াসসালাম

স

বাষট্টিতম পত্র

২ সফর ১৩৩০ হিঃ

চল্লিশ হাদীস

হ্যাঁ, আমাদের নিকট রাসূল (সা.)- এর পবিত্র আহলে বাইত হতে সহীহ ও মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত কিছু হাদীস রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আহলে সুন্নাহ্ অবগত নয়। আমরা সেখান হতে আপনার জন্য চল্লিশটি হাদীস[৩৯৪] এখানে উল্লেখ করছি :

১। মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে মূসা ইবনে বাবাওয়াইহ্ কুমী (শেখ সাদুক) তাঁর 'ইকমালুদ্দীন ও ইতমামুন নিয়ামাহ্' গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইবনে সামুরা সূত্রে রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন,

يا بن سمرة إذا اختلفت الأهواء و تفرّقت الآراء فعليكم بعليّ بن أبي طالب فإنّه إمام أمّتي و خليفتي عليهم من بعدي

"হে সামুরাহর পুত্র! যখন ইচ্ছা ও মত বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়বে তখন তোমরা আলীর সাথে থাকবে। কারণ সে উম্মতের ইমাম ও তাদের ওপর আমার পরে আমার পক্ষ হতে স্থলাভিষিক্ত (খলীফা)।"

২। সাদুক তাঁর একই গ্রন্থে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা.) বলেছেন :

إنّ الله تبارك و تعالى اطّلع إلى أهل الأرض اطلاعة فاختارني منها فجعلني نبيّا ثمّ اطّلع الثانية فاختار عليا فجعله إماما ثمّ أمرني أن اتّخذه أخا و وليّا و وصيّا و خليفة و وزيرا

মহান আল্লাহ্ পৃথিবীবাসীদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ও আমাকে মনোনীত করে তাঁর নবী করলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বারের মত পৃথিবীবাসীদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আলীকে গ্রহণ করে ইমাম মনোনীত করলেন ও আমাকে নির্দেশ দিলেন যেন তাকে আমি ভাই, সহযোগী, প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত ও পরামর্শদাতা হিসেবে গ্রহণ করি।"

৩। সাদুক নিজ সূত্রে ইমাম সাদিক (আ.) হতে এবং তিনি তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা.) বলেছেন : জিবরাঈল আল্লাহর পক্ষ হতে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, আল্লাহ্ বলেছেন : যে কেউ এ সাক্ষ্য দিবে যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ আমার বান্দা ও রাসূল, আলী ইবনে আবি তালিব আমার খলীফা ও তার সন্তানেরা আমার হুজ্জাত (আমার পক্ষ হতে নিদর্শন) তাকে আমি বেহেশতে প্রবেশ করাবো।"

৪। পুনরায় সাদুক তাঁর 'ইকমালুদ্দীন ওয়া ইতমামুন নিয়ামাহ্' গ্রন্থে ইমাম সাদিক (আ.) হতে তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা.) বলেছেন : আমার পর নেতার (ইমাম) সংখ্যা বারজন। তাদের প্রথম হলো আলী এবং শেষ হলো মাহদী। তারা আমার খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত।"

৫। সাদুক আসবাগ ইবনে নুবাতাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "একদিন আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) আমাদের নিকট আসলেন, সে সময় তিনি তাঁর পুত্র হাসানের হাত ধরেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি আমাদেরকে বললেন : একদিন রাসূল (সা.) তাঁর ঘর হতে বের হলেন তখন আমার হাত তাঁর হাতে ধরা ছিল এবং তিনি বলছিলেন : সর্বোত্তম মানুষদের নেতা ও ইমাম আমার পর আমার এই ভাই আলী, সে সকল মুসলমানের ইমাম ও নেতা যখন আমি মৃত্যুবরণ করবো।"

৬। সাদুক তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থে ইমাম রেযা (আ.) হতে তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা.) বলেছেন : যে কেউ পছন্দ করে আমার দীনকে আঁকড়ে ধরতে ও মুক্তির তরণীতে আরোহণ করতে সে যেন আলী ইবনে আবি তালিবের অনুসরণ করে। সে আমার জীবদ্দশায় ও আমার মৃত্যুর পরে আমার খলীফা ও আমার উম্মতের ওপর আমার স্থলাভিষিক্ত।"

৭। সাদুক ইমাম রেযা (আ.) হতে একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "আমি ও আলী এ উম্মতের দু'জন পিতা ও শিক্ষক। যে ব্যক্তি আমাদের চিনবে সে আল্লাহকেই চিনল, আর যে আমাদের না চিনবে ও স্বীকার না করবে সে যেন আল্লাহকেই না চিনে অস্বীকার করল। আলী হতে এ উম্মতের যুবকদের দু'জন নেতার জন্ম হয়েছে, হাসান ও হুসাইন এবং হুসাইনের বংশ

হতে নয় ব্যক্তির জন্ম হবে যাদের আনুগত্য আমারই আনুগত্য এবং তাদের নাফরমানি ও নির্দেশ অমান্য করা আমার নির্দেশ অমান্য করার শামিল। তাদের নবম ব্যক্তি হলো মাহদী।"(* ২২)

৮। সাদুক তাঁর একই গ্রন্থে ইমাম হাসান আসকারী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর পিতা ও পিতামহ হতে এবং তিনি তাঁর পিতা ও পিতামহ হতে, এভাবে রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, "তিনি ইবনে মাসউদকে লক্ষ্য করে বলেন :

يا بن مسعود عليّ بن أبي طالب إمامكم بعدي و خليفتي عليكم

হে ইবনে মাসউদ! আলী আমার পরে তোমাদের ওপর আমার খলীফা ও তোমাদের নেতা।"

৯। সাদুক হযরত সালমান ফারসী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "নবী (সা.)- এর ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম হুসাইন ইবনে আলী তাঁর কোলে বসে রয়েছে এবং নবী (সা.) তাঁর ঠোঁটে চুমু খেয়ে তাকে বলছেন : তুমি নেতা ও নেতার পুত্র, তুমি ইমাম ও ইমামের পুত্র ও ভ্রাতা, তুমি ইমামদের পিতা, তুমি আল্লাহর নিদর্শন এবং তোমার সন্তানদের মধ্য হতে নয়জন আল্লাহ্ মনোনীত নেতা ও হুজ্জাত রয়েছে। তাদের নবম ও শেষ ব্যক্তি হলো মাহদী।"

১০। সাদুক 'ইকমালুদ্দীন' গ্রন্থে হযরত সালমান ফারসী হতে আরেকটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা.) হযরত ফাতিমা (আ.)- কে বলেন : হে ফাতিমা! তুমি কি জান আল্লাহ্ আমাদের পরিবারের জন্য দুনিয়ার ওপর আখেরাতকে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ্ পৃথিবীর আধিবাসীদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে প্রথমে আমাকে মনোনীত করেন, অতঃপর দ্বিতীয় দৃষ্টিতে তোমার স্বামীকে মনোনীত করে আমাকে প্রত্যাদেশ দেন তোমাকে তার বিবাহ বন্ধনে আব করার এবং আমার পরামর্শদাতা ও আমার উম্মতের জন্য খলীফা ঘোষণা করার। তাই তোমার পিতা সর্বে ষ্ঠ নবী ও তোমার স্বামী সর্বে ষ্ঠ প্রতিনিধি। কিয়ামতে সর্বপ্রথম ব্যক্তি হিসেবে তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হবে।"

১১। সাদুক তাঁর 'ইকমালুদ্দীন' গ্রন্থে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন এবং এতে তিনি উল্লেখ করেছেন হযরত উসমানের সময় মুহাজির ও আনসার হতে দুইশ লোক মসজিদে সমবেত হয়ে ফিকাহ্ ও ইসলামী জ্ঞানের বিষয়ে মতামত পেশ করে পরস্পরের ওপর নিজের ে ষ্ঠত্ব প্রকাশ

করছিল। কিন্তু হযরত আলী (আ.) তাদের মাঝে উপস্থিত থাকলেও নীরব ছিলেন। তারা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলল, “হে আবুল হাসান! আপনি কেন নীরব হয়ে রয়েছেন?” আলী তখন তাদের রাসূলের একটি উক্তির প্রতি ইশারা করলেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন,

عليّ أخي و وزيري و وارثي و وصيّي و خليفتي في أمّتي و وليّ كلّ مؤمن بعدي فأقرّوا له بذلك

“আলী আমার ভাই, পরামর্শদাতা, সহযোগী, উত্তরাধিকারী, খলীফা ও আমার উম্মতের ওপর আমার স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি এবং সে মুমিনদের ওপর আমার পর নেতা। তোমরা অবশ্যই তাকে মেনে নেবে।”

১২। অপর একটি হাদীসে সাদুক আবদুল্লাহ্ ইবনে জা’ফর (রা.), ইমাম হাসান (আ.), ইমাম হুসাইন (আ.), আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, উমর ইবনে আবি সালামাহ্, উসামা ইবনে যাইদ, সালমান ফারসী, আবু যর ও মিকদাদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা সকলেই বলেছেন, “নবী (সা.)- কে বলতে শুনেছি :

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثمّ أخي عليّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم

আমি মুমিনদের নিজেদের চেয়ে তাদের ওপর অধিক অধিকারপ্রাপ্ত তেমনি আমার পর আলী মুমিনদের নিজেদের চেয়ে তাদের ওপর অধিক অধিকারপ্রাপ্ত।”

১৩। একই গ্রন্থে সাদুক আসবাগ ইবনে নুবাতাহ্ সূত্রে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী (সা.)- কে বলতে শুনেছেন : আমি, আলী, হাসান, হুসাইন ও হুসাইনের বংশধর হতে তার নয়জন সন্তান পবিত্র (মাসূম)।

১৪। সাদুক আবাইয়াহ্ ইবনে বিবঈর সূত্রে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, “আমি নবীদের নেতা এবং আলী নবীদের স্থলাভিষিক্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও তাদের নেতা।”

১৫। সাদুক ‘ইকমালুদ্দীন’ নামক উপরোক্ত গ্রন্থে ইমাম সাদিক হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর পিতামহ হতে এবং তিনি তাঁর পিতা ও পিতামহের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ নবীদের মধ্য হতে আমাকে এবং আমার মাধ্যমে আলীকে সকল নবীর

প্রতিনিধিদের মধ্য হতে শ্রে ষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি আলীর মাধ্যমে তার সন্তান হাসান ও হুসাইনকে এবং হুসাইনের সন্তানদের মধ্য হতে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেছেন যাতে করে সীমা লঙ্ঘনকারী ও বিচ্যুতরা দীনকে বিকৃত করতে না পারে।

১৬। সাদুক ঐ গ্রন্থে হযরত আলী হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "আমার পর নেতার সংখ্যা হবে বার জন, তাদের প্রথম হলো তুমি ও শেষ ব্যক্তি মাহদী, তার হাতে আল্লাহ্ পূর্ব ও পশ্চিমে দীনকে প্রসারিত (বিজয়ী) করবেন।"[৩৯৫]

১৭। সাদুক তাঁর 'আমালী' গ্রন্থে ইমাম সাদিক (আ.) সূত্রে তাঁর পিতা পিতামহদের মাধ্যমে রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, "আলী আমা হতে ও আমি আলী হতে, সে আমার মাটি হতেই সৃষ্ট হয়েছে, সুন্নাহর যে সকল বিষয়ে মানুষ দ্বিমত ও বিভেদ পোষণ করবে সে তার ব্যাখ্যা দান করবে, সে মুমিনদের নেতা, আলোকিত ও উ ল মুখের অধিকারীদের ইমাম এবং নবীদের প্রতিনিধিদের মধ্যে শ্রে ষ্ঠ।"

১৮। সাদুক তাঁর 'আমালী' গ্রন্থে হযরত আলীর সূত্রে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন যেখানে রাসূল (সা.) বলেছেন, "আলী মুমিনদের ইমাম (নেতা), আল্লাহ্ তাঁর ইমামতের সাক্ষ্য আরশে গ্রহণ করেছেন এবং ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী রেখেছেন যে, সে পৃথিবীতে আল্লাহর হুজ্জাত (নিদর্শন), দলিল ও মুসলমানদের ইমাম।"

১৯। সাদুক তাঁর 'আমালী' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) আলীকে বলেছেন, "হে আলী! তুমি মুসলমানদের নেতা, মুমিনদের ইমাম, উ ল মুখ ব্যক্তিদের প্রধান, আল্লাহর পক্ষ হতে আমার পরবর্তী ঐশী নিদর্শন এবং নবীগণের প্রতিনিধিদের নেতা।"

২০। সাদুক তাঁর 'আমালী' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস হতে আরেকটি বর্ণনায় বলেছেন, রাসূল (সা.) আলীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "হে আলী! তুমি আমার উম্মতের মধ্যে আমার পক্ষ হতে প্রতিনিধি ও খলীফা, তোমার সম্পর্ক আমার সঙ্গে আদমের সঙ্গে শীসের সম্পর্কের ন্যায়।"

২১। সাদুক তাঁর 'আমালী' গ্রন্থে হযরত আবু যর হতে বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা.) একদিন মসজিদে নববীতে বলেন : এখন এই দ্বার দিয়ে যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে সে মুসলমানদের ইমাম

ও মুমিনদের নেতা। তখনই আলী প্রবেশ করলেন। অতঃপর রাসূল (সা.) তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন : এ ব্যক্তি আমার পর তোমাদের ওপর ইমাম ও নেতা।”

২২। সাদুক তাঁর ‘আমালী’ গ্রন্থে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, “আলী ইবনে আবি তালিব ইসলামে সবচেয়ে অগ্রসর ও জ্ঞানে সবার হতে ে ষ্ঠ এবং আমার পর খলীফা ও ইমাম।”

২৩। সাদুক তাঁর ‘আমালী’ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, “হে লোকসকল! আল্লাহ্ হতে কে অধিক সত্যবাদী হতে পারে? মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি ঘোষণা করি আলী হেদায়েতের ধ্বজাধারী, সে ইমাম, খলীফা ও আমার স্থলাভিষিক্ত। তাকে আমি ভাই ও পরামর্শদাতা হিসেবে গ্রহণ করতে আদিষ্ট হয়েছি।”

২৪। ইবনে আব্বাস হতে সাদুক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, “রাসূল (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা পাঠ করেন যাতে তিনি বলেন : আমার চাচাতো ভাই আলী আমার সহযোগী, খলীফা ও আমার পক্ষ হতে নির্দেশ প্রচারকারী।”

২৫। সাদুক তাঁর ‘আমালী’ গন্থে আমীরুল মুমিনীন আলী হতে বর্ণনা করেছেন, “নবী (সা.) একদিন আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়ে বললেন : হে লোকসকল! আল্লাহর মাস তোমাদের নিকট এসেছে। অতঃপর রমযান মাসের ফজীলত বর্ণনা করে খুতবা দিলেন। আমি রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করলাম : হে আল্লাহর রাসূল! এ মাসের সর্বোত্তম আমল কি? নবী (সা.) বললেন : আল্লাহর নির্দেশিত গুনাহসমূহ হতে দূরে থাকা ও তাকওয়া অবলম্বন করা। অতঃপর রাসূল (সা.) ক্রন্দন করলেন। আমি প্রশ্ন করলাম : হে আল্লাহর রাসূল কেন আপনি ক্রন্দন করছেন? জবাবে বললেন : এ মাসেই তোমার রক্তপাতকে একদল হালাল ও বৈধ মনে করবে। অতঃপর বললেন :

يا عليّ أنت وصيّي و أبو ولدي و خليفتي على أمّتي في حياتي و بعد موتي أمرك أمري و نَهيك نَهيي

হে আলী! তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত এবং আমার সন্তানদের পিতা, আমার উম্মতের মধ্যে আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর আমার খলীফা ও প্রতিনিধি। তোমার আদেশ আমারই আদেশ এবং তোমার নিষেধ আমারই নিষেধ।”

২৬। সাদুক তাঁর ‘আমালী’ গ্রন্থে হযরত আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) বলেছেন, “হে আলী! তুমি আমার ভাই এবং আমিও তোমার ভাই। আল্লাহ্ আমাকে নবুওয়াতের জন্য নির্বাচন করেছেন ও তোমাকে ইমামতের জন্য। আমাকে কোরআন অবতীর্ণের জন্য ও তোমাকে তার ব্যাখ্যার জন্য মনোনীত করা হয়েছে। তুমি আমার উম্মতের শিক্ষক ও পিতা। হে আলী! তুমি আমার উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত, খলীফা, প্রতিনিধি, পরামর্শদাতা এবং আমার সন্তানদের পিতা।”

২৭। সাদুক তাঁর ‘আমালী’ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, “নবী (সা.) একদিন মসজিদে কোবাতে আনসারদের সমাবেশে আলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন : হে আলী! তুমি আমার ভ্রাতা যেমনভাবে আমি তোমার ভ্রাতা, তুমি আমার পরে আমার স্থলাভিষিক্ত ও আমার উম্মতের জন্য ইমাম ও আমার প্রতিনিধি (খলীফা)। আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন যে তোমাকে ভালবাসে এবং যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে শত্রুতা করে তার সঙ্গে তিনি শত্রুতা পোষণ করেন।”

২৮। সাদুক তাঁর ‘আমালী’ গ্রন্থে উম্মে সালামাহ্ হতে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন যেখানে রাসূল (সা.) বলেছেন, “হে উম্মে সালামাহ্! তুমি শোন এবং সাক্ষী থাক, আলী ইবনে আবি তালিব আমার স্থলাভিষিক্ত ও আমার পর খলীফা, সে আমার প্রতিশ্রুতি পূরণকারী এবং আমার লক্ষ্যসমূহের চারপাশ থেকে শত্রুদের বিতারণকারী।”

২৯। সাদুক তাঁর ‘আমালী’ গ্রন্থে সালমান ফারসী হতে বর্ণনা করেছেন, “রাসূল (সা.) বলেছেন : হে মুহাজির ও আনসারগণ! তোমাদের কি আমি এমন কিছুর দিক নির্দেশনা দেব আমার পরে যাকে আঁকড়ে ধরলে কখনো বিচ্যুত হবে না? তারা বলল : হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ। রাসূল (সা.) বললেন : এই আলী আমার ভ্রাতা, পরামর্শদাতা, স্থলাভিষিক্ত, উত্তরাধিকারী, খলীফা ও প্রতিনিধি এবং তোমাদের ইমাম। তোমরা আমাকে যেরূপ ভালবাস তাকেও ত প ভালবাস। আমাকে

যেমন সম্মান কর তাকেও তেমন সম্মান কর। জিবরাঈল আমার প্রতি এ সত্যসমূহ তোমাদের নিকট প্রকাশ করার নির্দেশ এনেছেন।”

৩০। সাদুক তাঁর ‘আমালী’ গ্রন্থে যাইদ ইবনে আরকাম হতে বর্ণনা করেছেন, “নবী (সা.) বলেছেন : তোমাদের কি আমি এমন বিষয়ের দিকে নির্দেশনা দেব যাকে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো বিচ্যুত ও ধ্বংস হবে না? অতঃপর বললেন : আলী তোমাদের ইমাম ও অভিভাবক। তাকে তোমরা সহযোগিতা করবে, তাকে সত্যায়ন করবে ও তার কল্যাণকামী হবে। জিবরাঈল এটি প্রচারের জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।”

৩১। সাদুক তাঁর ‘আমালী’ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, يا عليّ أنت إمام أمّتي و خليفتي عليها بعدي “হে আলী! তুমি আমার উম্মতের ইমাম এবং আমার পর তাদের ওপর আমার খলীফা।”

৩২। সাদুক তাঁর ‘আমালী’ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, “রাসূল বলেছেন : আল্লাহ্ আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য হতে কোন এক ব্যক্তিকে আমার ভাই, উত্তরাধিকারী, খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মনোনীত করবেন। আমি প্রশ্ন করলাম সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন : সে তোমার উম্মতের নেতা এবং তোমার পর আমার হুজ্জাত বা ঐশী নিদর্শন। আমি বললাম : হে প্রতিপালক! কে সেই ব্যক্তি? ওহীর মাধ্যমে (আমাকে) বলা হলো : সে আলী ইবনে আবি তালিব। আমি তাকে পছন্দ করি এবং সেও আমাকে পছন্দ করে।”

৩৩। সাদুক তাঁর ‘আমালী’ গ্রন্থে সাদিক (আ.) সূত্রে তাঁর পিতামহের মাধ্যমে রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, “যখন আমি মিরাজে গিয়েছিলাম আল্লাহ্ আলী সম্পর্কে আমাকে বলেন যে, সে সৎ কর্মশীলদের (মুত্তাকীদের) ইমাম, আলোকিত মুখাবয়বদের নেতা ও মুমিনদের বাদশাহ।”(* ২৩)

৩৪। সাদুক তাঁর ‘আমালী’ গ্রন্থে ইমাম রেয়া (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) বলেছেন, “আলী আমা হতে এবং আমি আলী হতে, আলীর হত্যাকারীকে আল্লাহ্ হত্যা করুন, আলী আমার পর আমার উম্মতের নেতা।”

৩৫। শায়খুত তায়িফা আবু জা’ফর মুহাম্মদ ইবনে হাসান তুসী তাঁর ‘আমালী’ গ্রন্থে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) আলীকে বলেন, “তোমাকে আল্লাহ্ এমন একটি সৌন্দর্য দিয়ে সাজিয়েছেন যা আল্লাহর নিকট সবচেযে প্রিয় এবং অন্য কাউকে তা তিনি দান করেন নি। তোমাকে আল্লাহ্ যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতার সৌন্দর্য দ্বারা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, দুনিয়া থেকে যেমন তুমি কোন লাভ পাবে না তেমনি সেও তোমার দ্বারা লাভবান হবে না। আল্লাহ্ তোমার হৃদয়ে হতদরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি ভালবাসা এমনভাবে দিয়েছেন যে, তুমি তাদের আনুগত্যে এবং তারা তোমার নেতৃত্বে সন্তুষ্ট। সৌভাগ্য সেই ব্যক্তির যে তোমাকে ভালবাসে ও সততার সাথে তোমার আনুগত্য করে এবং দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির যে তোমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে ও তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে।”

৩৬। শেখ তুসী তাঁর ‘আমালী’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (আ.) কুফার মিম্বারে বলেছেন, “আমি রাসূল (সা.) হতে দশটি বৈশিষ্ট্য লাভ করেছি যা আমার নিকট পৃথিবীর সব কিছু হতে প্রিয়। তিনি আমাকে বলেছেন : হে আলী! তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার ভাই, পুনরুত্থান দিবসে তুমি আমার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি, বেহেশতে তোমার ঘর আমার ঘরের মুখোমুখি হবে, তুমি আমার বংশের উত্তরাধিকারী, আমার প্রতিশ্রুতি পূরণকারী, আমার অনুপস্থিতিতে আমার পরিবারের সংরক্ষণকারী, তুমি আমার উম্মতের নেতা ও তাদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী, তুমি আমার খলীফা এবং আমার খলীফা আল্লাহরই খলীফা। তোমার শত্রু আমারই শত্রু এবং আমার শত্রু আল্লাহরই শত্রু।”

৩৭। সাদুক তাঁর ‘আন্নুসুস আলাল আইম্মা’ গ্রন্থে ইমাম হাসান ইবনে আলী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, “আলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূল (সা.)- কে বলতে শুনেছি : তুমি আমার জ্ঞানের উত্তরাধিকারী, প্রজ্ঞার খনি এবং আমার পর নেতা।”

৩৮। একই গ্রন্থে সাদুক ইমরান ইবনে হুসাইন হতে বর্ণনা করেছেন, “আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি : হে আলী! তুমি আমার পর ইমাম ও খলীফা।”

৩৯। ঐ গ্রন্থেই সাদুক আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, “হে আলী! আমার আহলে বাইতের যারা দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে চলে গেছে তাদের ওপর আমার প্রতিনিধি এবং আমার উম্মতের জীবিতদের ওপর নেতৃত্বদানকারী ও খলীফা।”

৪০। সাদুক ইমাম হুসাইন ইবনে আলী হতে বর্ণনা করেছেন, “যখন আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন (و أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) ‘আল্লাহর কিতাবে নিকটাত্মীয়দের কেউ কেউ অপরদের হতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত’ তখন আমি রাসূল (সা.)- এর কাছে এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : তোমরাই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত নিকটাত্মীয়, আমার মৃত্যুর পর তোমার পিতা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, তারপর তোমার ভ্রাতা হাসান অতঃপর তুমি।”

এ সম্পর্কিত শেষ হাদীস হিসেবে এটি বর্ণনা করলাম। এখানে বর্ণিত হাদীসসমূহ অসংখ্য হাদীসের মধ্যে একটি শাখার ফুলের মত যা সমগ্র বাগান হতে নেয়া হয়েছে বা সমুদ্রের এক ফোঁটা পানির মত। অবশ্য আপনার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এগুলোই যথেষ্ট মনে করছি।

ওয়াসসালাম

শ

তেষট্টিতম পত্র

৩ সফর ১৩৩০ হিঃ

১। শীয়া সূত্রে বর্ণিত হাদীস দলিল হতে পারে না।

২। কেন শীয়া সূত্র ব্যতীত অন্য সূত্রে এ হাদীসসমূহ বর্ণিত হয় নি?

৩। অন্য সূত্রে বর্ণিত এরূপ হাদীস আনয়ন করুন।

১। এই হাদীসসমূহ আহলে সুন্নাহর নিকট গ্রহণীয় নয় কারণ তাদের নিকট প্রামাণ্য নয়। তাই এগুলোর ওপর ভিত্তি করে প্রমাণ উপস্থাপন সম্ভব নয়।

২। যদি এগুলো গ্রহণযোগ্য হত তাহলে অন্য সূত্রেও তা বর্ণিত হত। অথচ তাঁরা তা বর্ণনা করেন নি।

৩। অনুগ্রহপূর্বক এ বিষয়ে আহলে সুন্নাহ্ হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করুন।

ওয়াসসালাম

স

চৌষট্টিতম পত্র

৪ সফর ১৩৩০ হিঃ

১। আমরা ঐ হাদীসগুলো আপনার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করেছিলাম।

২। আমাদের দলিল এখানে আহলে সুন্নাহর সহীহ হাদীসসমূহ।

৩। আহলে সুন্নাহর বর্ণনাকারীরা কেন এ হাদীসগুলো বর্ণনা করেন নি তার কারণ।

৪। আলীর উত্তরাধিকারিত্বের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ 'ওয়ারাসাতের' হাদীস (উত্তরাধিকার ও উত্তরসূরীর হাদীস)।

১। আমরা পূর্ববর্তী পত্রের হাদীসগুলো আপনার আহ্বানেই বর্ণনা করেছিলাম যাতে এ বিষয়টির ওপর আপনার মোটামুটি ধারণা অর্জিত হয়।

২। আপনার প্রশ্নের বিপরীতে আমাদের উপস্থাপিত দলিল আহলে সুন্নাহরই হাদীসসমূহ যা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

৩। কিন্তু আহলে সুন্নাহর মুহাদ্দিস ও আলেমরা কেন এ হাদীসগুলো বর্ণনা করেন নি তার কারণ সুস্পষ্ট। একদল ব্যক্তি রাসূলের আহলে বাইতের প্রতি তাদের মনে শত্রুতা পুষে রেখেছিল। প্রথম যুগেই এই অহংকারী ও ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী গোষ্ঠী আহলে বাইতের ফজীলত গোপন করে এই নূরকে প্রশমিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। হাদীসের প্রচার রু করার মাধ্যমে তারা মানুষকে আহলে বাইতের ফজীলত ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত হাদীস প্রচারে বাধা দান করে। কখনো কখনো তারা এ উদ্দেশ্যে অর্থের বিনিময়ে লোভ দেখিয়ে, কখনো বা তাদের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ব্যবহারের মাধ্যমে তরবারী ও চাবুকের ভীতি প্রদর্শন করে এ পন্থা অব্যাহত রাখে। যারা আহলে বাইতের ফজীলত বর্ণনা করত তাদের তারা নির্বাসন দিত অথবা হত্যা করত এর বিপরীতে আহলে বাইতের ফজীলত অস্বীকারকারীদের আ য় দিত ও পৃষ্ঠপোষকতা করত।

আপনি এ বিষয়ে ভালভাবেই অবগত যে, ইমামত ও খেলাফতের দলিল- প্রমাণ, প্রতিশ্রুতি ও চুক্তিসমূহ এমন একটি বিষয় যা হতে এই অত্যাচারীরা ভীত ছিল। কারণ তাদের অত্যাচার ও শাসনের প্রাসাদ এতে ভূলুি ত এবং সাম্রাজ্যের ভিত্তি মূলোৎপাটিত হত। তাই এ সকল শাসক ও তাদের পক্ষের নিকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা তাদের প্রভুদের নৈকট্য ও সন্তুষ্টির জন্য কাজ করত তাদের হতে অক্ষতাবস্থায় বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসসমূহ আমাদের নিকট পৌঁছা সত্যিই আল্লাহর নিদর্শন ও মু'জিযা ব্যতীত সম্ভব নয়। আপনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন আহলে বাইতের পদ ও মর্যাদার অবৈধ দখলদাররা আহলে বাইত এবং তাদের বন্ধু ও অনুসারীদের ওপর চরম অত্যাচার চালাত, তাদের শ্রু মুণ্ডিত করে অপমানের উদ্দেশ্যে বাজারে বাজারে ঘুরাত, তাদের সকল অধিকার হতে বঞ্চিত করত, এ প্রক্রিয়া ততক্ষণ চলত যতক্ষণ না তারা দুর্বল এবং শাসকদের ন্যায় বিচারের আশা হতে নিস্পৃহ হত।[৩৯৬]

যে কেউ আলী (আ.)- কে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করত তাকে প্রত্যাখ্যান করা হত এবং তার ওপর সব ধরণের মুসিবত নেমে আসত, তার ধন- সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হত, কখনো কখনো আলীর ফজীলত বর্ণনাকারীর জিহ্বা কর্তন করা হত, আলীর প্রতি নত চক্ষুসমূহকে উৎপাটন করা হত। কত হাত আলীর সঙ্গে থাকার কারণে কাটা হয়েছে! কত পা তাঁর নিকট গমনের কারণে শরীর হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে! কত লোককে তাঁর অনুসারী হবার কারণে হত্যা করা হয়েছে! তাঁদের ঘরে আগুন দেয়া হয়েছে, তাঁদের শস্যক্ষেত্র ও খেজুর বাগান ধ্বংস করা হয়েছে, তাঁদের নির্বাসন দেয়া হয়েছে- এ সবের ইয়ত্তা নেই। তাই তাঁর অনুসারীরা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে হাদীসের হাফিয ও সংরক্ষণকারীদের অনেকেই এক অর্থে এ সকল অত্যাচারী শাসক ও তাদের কর্মচারীদের উপাসনা করত; আল্লাহকে নয়, বরং তাদের সামনেই মাথা নত বা রুকু করত। তাদের সব ধরনের বিকৃত কর্মকে সমর্থন দিত ও অন্যায় কর্মগুলোকে সংস্কার বলে চালানোর প্রয়াস পেত। এখনও যেমন আমরা দেখি চাটুকার ও তোষামোদকারী আলেম ও বিভ্রান্ত বিচারকরা (কাজী) শাসকদের মনঃতুষ্টির জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, তাদের ন্যায়- অন্যায় সকল নির্দেশকে জায়েয বলে ঘোষণা দেয়। শাসকরা কখনোই চায় না নিজেদের

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ফতোয়া প্রচলিত হোক, বরং তারা চায় বিচারকরা এমন ফতোয়া দান করুন যা তাদের নির্দেশকে জায়েয ও শত্রুদের নিয়ন্ত্রণকে সহজ করে দেয়। এতে তাদের মাথা ব্যথা নেই যে, এ নির্দেশ কোরআন, সুন্নাহ্ ও উম্মতের ইজমার পরিপন্থী হলো কি না। কারণ তারা সম্মান ও পদলোভী। এই আলেমরা কখনো পদচ্যুতির ভয়ে, কখনো পদোন্নতির আশায় এরূপ অন্যায় কাজ করত। পদলিপ্সাহীন পবিত্র ব্যক্তিবর্গ যাঁরা স্বৈরাচারী শাসকের অনুগত নন তাঁদের সঙ্গে এ সকল দুনিয়ালোভী আলেমদের পার্থক্য অনেক। চরিত্রহীন এ আলেমদেরই প্রয়োজন ছিল শাসকগোষ্ঠীর। কারণ সৎ ও ন্যায়বান আলেমদের মোকাবিলায় ঐ গোষ্ঠীভূত আলেমরা তাদের ফতোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরু   যু   করত। এই নিকৃষ্ট আলেমরা শাসকগোষ্ঠীর নিকট বিশেষ মর্যাদার কারণে সম্পদের অধিকারী হয়েছিল। তাই শাসকদের অনুকূলে হযরত আলী ও আহলে বাইতের শান ও ফজীলত বর্ণনা হতে বিরত থাকত এবং এ বিষয়ে চরম বিরোধিতা প্রদর্শন করত। এতদুদ্দেশ্যে তারা এ সম্পর্কিত সহীহ হাদীসগুলোকে অস্বীকার করত এবং বিভিন্ন অজুহাতে সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা কমানোর চেষ্টা করত। যেমন বলত এ সকল হাদীসের বর্ণনাকারীরা রাফেযী তাই গ্রহণ করা যাবে না এবং রাফেযীরা তাদের নিকট সবচেয়ে নিন্দনীয় গোষ্ঠী ছিল।

আলী (আ.) সম্পর্কিত যে সকল হাদীস হতে শিয়ারা দলিল আনত তারা এভাবে সেগুলোকে অস্বীকার করতে চাইত। এই সকল দরবারী চাটুকার আলেম বহ্যিকভাবে দুনিয়াবিমুখ ও আবেদ কোন ব্যক্তির মুখে এ সকল সহীহ হাদীসের বিপরীতে কিছু শুনত তাদের কথাকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করে এ সহীহ হাদীসগুলোর বিরু   সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার চালাত। শাসকদের পক্ষ হতে সকল শহরে এর প্রচার চালাত এবং এটি তাদের একটি মৌল নীতি ছিল।

সে সময় আরেকদল রাবী ছিলেন যাঁরা আলী (আ.) ও আহলে বাইতের শানে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করতে ভয় পেতেন কারণ এই অসহায় ব্যক্তিরা ঐ তোষামোদকারীদের প্রত্যাখ্যাত সহীহ হাদীসগুলো (আহলে বাইত ও আলীর শানে বর্ণিত) সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করলে প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন। এজন্য তাঁরা সাধারণের বিশ্বাসের পরিপন্থী কিন্তু সঠিক এ চিন্তাকে প্রকাশের জন্য

ইশারা ও ইঙ্গিতের আ য় নিতেন যাতে কোন অপ্রত্যাশিত ফিতনার সৃষ্টি না হয় এবং তোষামোদকারীদের রোষ হতে বাঁচা যায়। অজ্ঞ সাধারণ লোকজন কোন চিন্তা ও গবেষণা ছাড়াই ঐ সকল তোষামোদকারী ও চাটুকার দরবারী আলেমের কথায় হৈ চৈ শুরু করত। শাসকগোষ্ঠী জনসাধারণকে হযরত আলীর ওপর লানত করার নির্দেশ দিত। এজন্য ঐ সকল রাবীর ওপর কঠোরতা আরোপ করা হত। কখনো অর্থের লোভ দেখিয়ে, কখনো ভয় দেখিয়ে আলী (আ.)- এর মিথ্যা দোষ- ত্রুটি বর্ণনা করতে বলা হত। শাসক ও তাদের পৃষ্ঠপোষক দরবারী আলেমরা আলীকে জনগণের নিকট এমনভাবে পরিচিত করাত যেন মানুষের মনে তাঁর সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এমন কিছু বলা হত যা শুনলে যে কেউ তাঁর প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠবে। ঈদ ও জুমআর খুতবায় আলীর ওপর লানত করা বাধ্যতামূলক ছিল এবং এটি মুসলমানদের নীতিতে পরিণত হয়েছিল। যদি এভাবে আল্লাহর নূরকে প্রশমিত করার অপচেষ্টা না চলত তবে তাঁর আউলিয়াদের (আহলে বাইত ও আলীর) ফজীলত ও গুণাবলী এরূপ গোপন থাকত না এবং সুন্নী ও শিয়া উভয় সূত্রে খেলাফতের বিষয়ে সহীহ ও সুস্পষ্ট হাদীসসমূহ আমাদের নিকট পৌঁছাত ও আরো অধিক মুতাওয়াতির হাদীস এ বিষয়ে আমরা পেতাম। আল্লাহর শপথ, আমি আশ্চর্যান্বিত এ ভেবে যে, আল্লাহর রাসূলের ভ্রাতা আলীর ফজীলত তারপরও গোপন থাকে নি এবং তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি তাঁর রহমত প্রকাশ করেছেন, অন্ধকারের পর্দা উন্মোচন ও প্রবল স্রোতকে প্রতিরোধ করে সত্যের সূর্যকে বের করে এনে পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন।

৪। এ সকল অকাট্য দলিলের পাশাপাশি আপনাদের সূত্রেই বর্ণিত ‘হাদীসে ওয়ারাসাত’ এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট দলিল হিসেবে বিদ্যমান।

ওয়াসসালাম

শ

পঁয়ষট্টিতম পত্র

৫ সফর ১৩৩০ হিঃ

অনুগ্রহপূর্বক আহলে সন্নাহর সূত্রে 'ওয়ারাসাত'- এর হাদীসটি বর্ণনা করুন।

ওয়াসসালাম

স

ছেষট্টিতম পত্র

৫ সফর ১৩৩০ হিঃ

আলী (আ.) নবী (সা.)- এর উত্তরাধিকারী

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূল (সা.) আলীর জন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গিয়েছেন। অন্যান্য নবীদের মত রাসূলও তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে তাঁর ইলমের (জ্ঞানের) উত্তরাধিকারী করেছেন। তিনি বলেছেন,

أنا مدينة العلم و عليّ بابُها فمن أراد العلم فاليأت الباب

"আমি জ্ঞানের শহর আর আলী তার দ্বার। যে কেউ জ্ঞান অর্জন করতে চায় তাকে অবশ্যই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে হবে।"[৩৯৭]

রাসূল (সা.) কখনো আবার বলেছেন, "আমি জ্ঞানের ঘর আলী তার দ্বার।" তাঁর হতে আরো বর্ণিত হয়েছে, "আমার পর জ্ঞানের দ্বার হলো আলী। আমি আমার উম্মতের ওপর রেসালতের যে বিষয়গুলো বর্ণনার দায়িত্বপ্রাপ্ত আলী তার ব্যাখ্যা প্রদান করবে। তার সঙ্গে বন্ধুত্বই ঈমান এবং তার সঙ্গে শত্রুতাই নিফাক (কপটতা)।"

যাইদ ইবনে আবি আউফি[৩৯৮] সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- রাসূল (সা.) আলী (আ.)- কে বলেছেন, "তুমি আমার ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী।" আলী প্রশ্ন করলেন, "আপনার হতে কি উত্তরাধিকার লাভ করবো?" তিনি বললেন, "যা কিছু আমার পূর্ববর্তী নবী উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গিয়েছেন।"

বুরাইদাহর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- আলী ইবনে আবি তালিব রাসূলের উত্তরাধিকারী।[৩৯৯] এ বিষয়ে ভীতি প্রদর্শনের দিন বর্ণিত হাদীসটিও লক্ষণীয়।[৪০০] আলী (আ.) রাসূলের জীবদ্দশায় প্রায়ই বলতেন, "আল্লাহর শপথ, আমি রাসূলের ভ্রাতা, চাচার পুত্র, স্থলাভিষিক্ত ও জ্ঞানের উত্তরাধিকারী। তাই কে আমার চেয়ে তাঁর নিকটবর্তী হবার অধিকতর যোগ্য?"[৪০১]

একদিন আলীকে প্রশ্ন করা হলো : কিরূপে তুমি চাচার পুত্র হতে উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত হলে অথচ চাচা হতে উত্তরাধিকার পাও নি। আলী জবাবে বললেন, "রাসূল (সা.) আবদুল মুত্তালিবের

সন্তানদের (পুত্র- প্রপৌত্র সকলকেই) দাওয়াত দিয়ে একত্রিত করেছিলেন। তারা সকলেই যখন খাদ্য গ্রহণে ব্যস্ত ছিলো তখন (রাসূল স্বল্প খাদ্যে তাদের খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, তদুপরি খাদ্য অবশিষ্ট ছিল যেন খাদ্য গ্রহণই করা হয় নি)। রাসূল (সা.) তাদের আহবান করে বললেন : হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা! আমি বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এবং সাধারণভাবে সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে আল্লাহর পক্ষ হতে মনোনীত হয়েছি। তোমাদের মধ্যে কে আমার হাতে বাইয়াত করে আমার ভ্রাতা, সাহায্যকারী ও উত্তরাধিকারী হতে রাজী আছ? কেউই সাড়া দিল না। আমি যদিও বয়সে ছোট ছিলাম, তদুপরি দাঁড়িয়ে বললাম : আমি রাজী আছি। তিনি আমাকে বসার নির্দেশ দিলেন। এরূপ তিনবার তিনি আহবান জানালে আমি ব্যতীত কেউই তাঁর ডাকে সাড়া দিল না। তখন তিনি আমার দু'হাত ধরে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাকে ঘোষণা করলেন। এ কারণেই আমি আমার চাচা হতে উত্তরাধিকার লাভ না করলেও চাচার পুত্র হতে লাভ করবো।"[৪০২]

কাসেম ইবনে আব্বাস সূত্রে হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক'[৪০৩] গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে প্রশ্ন করা হলো : আলী কিরূপে রাসূলের উত্তরাধিকার লাভ করেন অথচ তোমরা বঞ্চিত হও? তিনি বলেন, "কারণ তিনি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে আমাদের মধ্যে রাসূলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং এ পথে সবচেয়ে দৃঢ় ছিলেন।"

আমার মতে সাধারণ মানুষরা ভালভাবেই জানত রাসূলের একমাত্র উত্তরাধিকারী আলী (আ.) এবং এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিলো যে তাঁর চাচা আব্বাস বা বনি হাশিমের অন্য কেউ এ উত্তরাধিকার পান নি। কিন্তু তারা জানত না কেন আব্বাস বা রাসূলের অন্যান্য চাচার সন্তানরা এ অধিকার পান নি? বা কেন আলী এ অধিকার প্রাপ্ত হয়েছেন এ বিষয়ে তারা অজ্ঞ ছিলো। এ কারণেই তারা কখনো হযরত আলী, কখনো বা কাসেম বা অন্য কাউকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করত। তার দু'টি নমুনা আলী (আ.) ও কাসেম ইবনে আব্বাসের উপরোল্লিখিত জবাবসমূহ। তবে প্রকৃত উত্তর হলো এটি যে, মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং তন্মধ্যে মুহাম্মদ

(সা.)- কে মনোনীত করে রাসূল করলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বারের দৃষ্টিতে আলীকে মনোনীত করে তাঁকে রাসূলের সহযোগী ও উত্তরাধিকারী করলেন ও এ বিষয়ে নবীকে অবহিত করলেন।

হাকিম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২৫ পৃষ্ঠায় কাসেম ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনার পর বলেছেন, “প্রধানকাজী (বিচারপতি) আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে সালেহ হাশিমী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবু উমর কাজী কাসেম ইবনে আব্বাসের উ ৃতিটি ইসমাঈল ইবনে ইসহাক কাজীর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন : উত্তরাধিকারীরা হয় আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে নতুবা মনোনয়নের মাধ্যমে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, চাচার জীবিতাবস্থায় চাচাদের সন্তানরা উত্তরাধিকার পাবে না। কিন্তু আলী রাসূলের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত হবার মাধ্যমে তাঁর জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হয়েছেন এবং এ বিষয়ে অন্য কারো অংশীদারিত্ব নেই। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহও মুতাওয়াতির। বিশেষত পবিত্র আহলে বাইতের ইমামদের সূত্রে বর্ণিত এ সম্পর্কিত হাদীস উত্তরাধিকারের বিষয়টিকে পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট।

ওয়াসসালাম

শ

সাতষট্টিতম পত্র

৬ সফর ১৩৩০ হিঃ

স্থলাভিষিক্তের আলোচনা

আহলে সুন্নাহ্ আলী (রা.)- এর স্থলাভিষিক্তের বিষয়টি গ্রহণ করে না। তারা এ সম্পর্কিত হাদীস সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। অনুগ্রহপুর্বক এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করুন। ধন্যবাদ।

ওয়াসসালাম

স

আটষট্টিতম পত্র

৯ সফর ১৩৩০ হিঃ

স্থলাভিষিক্তের হাদীস

স্থলাভিষিক্তের হাদীস নবী (সা.)- এর পবিত্র আহলে বাইত হতে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অন্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলো আমরা বিংশতম পত্রে উল্লেখ করেছি যার অন্যতম এই হাদীসটি- রাসূল (সা.) আলী (আ.)- এর পৃষ্ঠে হাত রেখে বললেন,

هذا أخي و وصيّي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و أطيعوا

"এ আমার ভাই, স্থলাভিষিক্ত ও তোমাদের ওপর আমার প্রতিনিধি। সুতরাং তোমরা তার কথা শোন ও আনুগত্য কর।"

মুহাম্মদ ইবনে হামিদ রাযী সালামাহ্ আবরাশ হতে, তিনি ইবনে ইসহাক হতে, তিনি আবু রাবীয়াহ্ আইয়াদি হতে, তিনি ইবনে বুরাইদাহ্ হতে এবং ইবনে বুরাইদাহ্ তাঁর পিতা বুরাইদাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক নবীই স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী রেখে গেছেন, আমি আমার স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী হিসেবে আলী ইবনে আবি তালিবকে রেখে যাচ্ছি।"[৪০৪]

তাবরানী তাঁর 'আল কাবীর' গ্রন্থে হযরত সালমান ফারসী হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "আমার স্থলাভিষিক্ত, আমার গোপন রহস্যের কেন্দ্র যে আমার পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে ও আমার দীনকে রক্ষা করবে সে আলী ইবনে আবি তালিব।"[৪০৫] এ হাদীসটিতে সুস্পষ্টরূপে আলী রাসূলের স্থলাভিষিক্ত ও রাসূলের পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন। রাসূলের খলীফা হিসেবে আলীর আনুগত্য যে অপরিহার্য তা কারো নিকট অস্পষ্ট নয়।

হাফিয আবু নাঈম(২৪*) তাঁর 'হুলইয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে আনাস ইবনে মালিক হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "রাসূল (সা.) আমাকে বলেছেন : হে আনাস! সর্বপ্রথম ব্যক্তি হিসেবে এ

দ্বার দিয়ে যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে সে মুত্তাকীদের ইমাম, মুসলমানদের নেতা, দীনের সর্দার, নবীদের সরাসরি স্থলাভিষিক্তদের সর্বশেষ ব্যক্তি ও উ ল মুখাবয়ববিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রধান।”

আনাস বলেন, “আলী তখন প্রবেশ করলেন ও রাসূল দাঁড়িয়ে তাঁকে সুসংবাদ দিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন : তুমি আমার ঋণ পরিশোধকারী, মানুষের নিকট আমার বাণীকে পৌঁছাবার দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং আমার পর তাদের মধ্যকার মতবিরোধে ব্যাখ্যা প্রদানকারী।”

তাবরানী তাঁর ‘আল কাবীর’ গ্রন্থে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, “হে ফাতিমা! তুমি কি জান না মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং এর অধিবাসীদের মধ্য হতে তোমার পিতাকে নবুওয়াতের জন্য মনোনীত করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তোমার স্বামীকে মনোনীত করলেন এবং আমার প্রতি ওহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করলেন যেন তাকে তোমার বিবাহ বন্ধনে আব করি ও আমার স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করি।”[৪০৬]

লক্ষ্য করুন, মহান আল্লাহ্ কিরূপে পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্য থেকে শেষ নবীকে মনোনীত করার পর আলীকে মনোনীত করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, নবী মনোনয়নের বিষয়ের মত তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনয়নের বিষয়টিও আল্লাহর ইচ্ছাধীন। নিজ কন্যাকে আলীর বিবাহ বন্ধনে আব করা ও তাঁকে স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করার জন্য আল্লাহর ওহী প্রেরণের বিষয়টিও লক্ষ্য করুন। পূর্ববর্তী নবীগণের স্থলাভিষিক্তরা তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন কি? সুতরাং যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন এবং তাঁর সর্বে ষ্ঠ নবীর প্রতিনিধি বানিয়েছেন তাঁকে উপেক্ষা করে অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া ঠিক হবে কি? অন্য কোন ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী হবার যোগ্যতা রাখে কি? মানুষ যে ব্যক্তিকে শাসক হিসেবে নির্বাচিত করেছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মনোনীত ব্যক্তির ওপর তাকে প্রাধান্য দিয়ে তার আনুগত্যকে ওয়াজিব মনে করা যুক্তিসংগত কি? এটি কিরূপে সম্ভব যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মনোনীত ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে আমরা নিজেরা অন্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করি? অথচ কোরআন

বলছে, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দানের পর কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর এ বিষয়ে কোন এখতিয়ার নেই। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করবে সে স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হবে।" (সূরা আহযাব : ৩৬)

এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরস্পর সহায়ক হাদীস এসেছে যে, যখন রাসূল (সা.) হযরত মারিয়মের উত্তরসূরী এবং বেহেশতের নারীদের নেত্রী হযরত ফাতিমাকে আলীর বিবাহ বন্ধনে আব করার সি ান্ত নিলেন তখন সেই সকল ব্যক্তি যাঁরা এ সৌভাগ্যের অধিকারী হতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন তাঁরা অসন্তুষ্ট হলেন ও হিংসা করতে লাগলেন। কারণ এতে হযরত আলীর ে ষ্ঠত্ব প্রকাশিত হলো এবং এ মর্যাদায় পৌঁছার আর কারো অবকাশ রইল না।[৪০৭] তাই তাঁরা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কুৎসা রটনাকারীদের দাওয়াত দিয়ে আনলেন এবং আলীর বিরু কুৎসা রটানোর জন্য হযরত ফাতিমার কাছে তাদের পাঠালেন, যাতে করে তিনি হযরত আলীর প্রতি বিতৃষ্ণ হন। তারা নবী কন্যার নিকট গিয়ে বলল, "আলী নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তি তার কোন সম্পদ নেই।" কিন্তু তাঁদের এ চক্রান্ত ও অসৎ উদ্দেশ্য হযরত ফাতিমার ওপর কোন প্রভাব ফেলল না এবং তিনি কোন অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করলেন না। অবশেষে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটল। কিন্তু হযরত ফাতিমা আমীরুল মুমিনীন আলীর ফজীলত ও মর্যাদা প্রকাশের মাধ্যমে শত্রুদের মুখ বন্ধ করার জন্য রাসূল (সা.)- কে প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কি এমন ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে আব করছেন যে কোন সম্পদের অধিকারী নয়?" রাসূল (সা.) যে জবাব দিয়েছিলেন তা পূর্বে উল্লেখ করেছি (যে হাদীসটি বেশ কয়েক লাইন পূর্বে তাবরানী সূত্রে আবু আইয়ুব আনসারী হতে বর্ণিত হয়েছে)। এখানে কবিদের ভাষায় বলতে চাই- যখনই আল্লাহ্ চান কোন ব্যক্তির খ্যাতি প্রচার করতে তখনই হিংসুক ও পরনিন্দা চর্চাকারীদের এজন্য (তাঁর খ্যাতি প্রচারের জন্য) ব্যবহার করেন।

খাতীব বাগদাদী তাঁর 'আল মুত্তাফিক' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, যখন রাসূল (সা.) হযরত ফাতিমাকে হযরত আলীর বিবাহ বন্ধনে আব করেন তখন হযরত ফাতিমা প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একজন দরিদ্র ব্যক্তির স্ত্রী করলেন?" রাসূল (সা.)

বললেন, “তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও, মহান আল্লাহ্ পৃথিবীবাসীদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দু’ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন যার একজন তোমার পিতা আর দ্বিতীয় জন তোমার স্বামী।”[৪০৮]

হাকিম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২৯ পৃষ্ঠায় হযরত আলীর প্রশংসা বর্ণনায় সারীজ ইবনে ইউনুস হতে এবং তিনি আবু হাফস আবার হতে, তিনি আ’মাশ হতে, তিনি আবু সালেহ হতে, তিনি আবু হুরাইরা হতে বর্ণনা করেছেন, “হযরত ফাতিমা রাসূল (সা.)- কে প্রশ্ন করলেন : হে আল্লাহর নবী! আমাকে আলীর বিবাহ বন্ধনে আব করেছেন অথচ সে দরিদ্র এবং তার কোন সম্পদ নেই। রাসূল বললেন : তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে মহান আল্লাহ্ পৃথিবীবাসীদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দু’ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন যার একজন তোমার পিতা এবং অপর জন তোমার স্বামী।”

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করা হয়েছে তখন রাসূল (সা.) ফাতিমাকে বলেন, “তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও, তোমাকে এমন ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে আব করছি যে সর্বপ্রথম মুসলমান, সকল মুসলমান হতে জ্ঞানী আর তুমি আমার উম্মতের নারীদের নেত্রী যেমন মরিয়ম তাঁর সময়ের নারীদের নেত্রী ছিলেন। হে ফাতিমা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও, মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং এর অধিবাসীদের মধ্য হতে দু’ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন যার একজন তোমার পিতা আর অপর জন তোমার স্বামী।”[৪০৯]

এরপর হতে বিশ্ব নারীনেত্রী হযরত ফাতিমার ওপর যে কোন বিপদ ও মুসিবতই আপতিত হত রাসূল (সা.) তাঁকে আল্লাহ্ প্রদত্ত এই নিয়ামতের (তাঁর উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ) কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিতেন।

এরূপ একটি ঘটনা আহমাদ তাঁর ‘মুসনাদ’ গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ২৬ পৃষ্ঠায় মা’কাল ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণনা করেছেন, “নবী (সা.) একবার হযরত ফাতিমার অসুস্থতার সময় তাঁকে দেখতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : কেমন আছ? তিনি জবাব দিলেন : আল্লাহর শপথ, প্রচণ্ড দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত আছি। আমার অসুস্থতা দীর্ঘ ও কষ্ট শেষ সীমায় পৌঁছেছে। নবী (সা.) বললেন : তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে আমি তোমাকে ইসলাম গ্রহণে সকল মুসলমানের অগ্রগামী, সর্বাধিক জ্ঞানী এবং ধৈর্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ধৈর্যবান ও সহিষ্ণু ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে আব করেছি?”

এ সম্পর্কিত হাদীস এত অধিক যে এ পত্রে তার উল্লেখ সম্ভব নয়।

ওয়াসসালাম

শ

উনসত্তরতম পত্র

১০ সফর ১৩৩০ হিঃ

স্থলাভিষিক্তের হাদীস অস্বীকারকারীদের দলিল।

আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াত স্থলাভিষিক্তের হাদীসকে নিম্নোক্ত দলিলে অস্বীকার করে : বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে আসওয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশার নিকট রাসূল (সা.) কর্তৃক আলীকে স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ঘোষণার বিষয়ে[৪১০] প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "কে এ কথা বলেছে? নবী (সা.) আমার বক্ষে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তিনি একটি বোল (পাত্র) চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল। রাসূল পৃথিবী হতে বিদায় নিলেন অথচ আমি জানলাম না তিনি কিরূপে আলীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি ঘোষণা করলেন!"[৪১১]

বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে কয়েকটি সূত্রে হযরত আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা.) আমার বক্ষের ওপর ও কোলে মাথা রেখে ইন্তেকাল করেন।" এবং তিনি গর্ব করে বলতেন, "আমার বক্ষে মাথা রাখা অবস্থায় রাসূল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।" কখনো বলতেন, "মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁর ওপর আপতিত হয় যখন তাঁর মাথা আমার ঊরুর ওপর ছিল।"[৪১২] সুতরাং যদি রাসূল (সা.) আলীকে ওসিয়ত করে যেতেন তাহলে তাঁর নিকট তা গোপন থাকত না।

সহীহ মুসলিমে আয়েশা হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) না কোন দিরহাম, না দিনার, না ভেড়া, না উট কিছুই রেখে যান নি, তিনি কাউকেই ওসিয়ত করে যান নি।[৪১৩]

দুই সহীহতেই তালহা ইবনে মুসরেফ হতে বর্ণিত হয়েছে, "আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি আউফিকে প্রশ্ন করলাম : নবী কি কোন ওসিয়ত করে গিয়েছেন? তিনি বললেন : না। বললাম : কিরূপে তিনি অন্যদের জন্য ওসিয়তকে ওয়াজিব বলে মনে করেন অথচ নিজে তা ত্যাগ করেন? তিনি বললেন : আল্লাহর কিতাবকে ওসিয়ত করে গেছেন (অর্থাৎ কোরআনের ব্যাপারে বলে গিয়েছেন)।"[৪১৪]

এ হাদীসগুলো আপনার বর্ণিত হাদীসসমূহ হতে অধিকতর সহীহ কারণ দু'টি সহীহ গ্রন্থেই হাদীসগুলো এসেছে। সুতরাং এ দু'ধরনের হাদীসের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা দিলে এ হাদীসগুলোই বিশ্বস্ত ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

ওয়াসসালাম

স

সত্তরতম পত্র

১১ সফর ১৩৩০ হিঃ

১। রাসূল (সা.)- এর ওসিয়তকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

২। ওসিয়তকে অস্বীকার করার কারণ।

৩। অস্বীকারকারীদের বর্ণিত দলিলসমূহ প্রামাণ্য নয়।

৪। বিবেক ও বু বৃত্তি ওসিয়তের সপক্ষে রায় দান করে।

১। রাসূল যে আলীকে প্রতিনিধিত্বের ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন নিম্নবর্ণিত দলিলে তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই :

রাসূল তাঁকে তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছেন[১], তাঁকে ওসিয়ত করে গিয়েছেন দাফন- কাফনের[২], তাঁর ঋণ পরিশোধের, তাঁর প্রতিশ্রুতিসমূহ পূরণের এবং তাঁর ওপর আরোপিত অসমাপ্ত দায়িত্ব পালনের।[৩] তিনি তাঁকে আরো ওসিয়ত করেছেন তাঁর পর মানুষের মধ্যে সৃষ্ট অনৈক্যের সময় সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের[৪], আর উম্মতের প্রতি ওসিয়ত করে জানিয়ে গেছেন যে, আলী (আ.) উম্মতের ওপর রাসূলের পর নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী[৫], তিনি রাসূল (সা.)- এর ভ্রাতা[৬] ও সন্তানদের পিতা[৭], তাঁর পরামর্শদাতা[৮] ও গোপনীয় রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত একমাত্র ব্যক্তি[৯], তাঁর প্রতিনিধি[১০] ও স্থলাভিষিক্ত[১১], জ্ঞান নগরীর দ্বার[১২], প্রজ্ঞা গৃহের প্রবেশদ্বার[১৩], তাঁর উম্মতের রক্ষাফটক[১৪], নিরাপত্তা ও মুক্তির তরণি[১৫]। তাই রাসূলের মত তাঁর আনুগত্যও উম্মতের ওপর ওয়াজিব এবং তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা কাবীরা গুনাহ যেহেতু তা নবীর নির্দেশের বিরোধিতার শামিল[১৬]। তাঁর অনুসরণ নবীরই অনুসরণ, তাঁর হতে বিচ্ছিন্নতা নবী হতেই বিচ্ছিন্নতা[১৭], নবী (সা.) সেই ব্যক্তির সাথে সন্ধি ও শান্তি স্থাপন করেন যে আলীর সাথে সন্ধি করে ও তার সাথে যু   করেন যে আলীর সাথে যু   করে[১৮], যে আলীকে ভালবাসে রাসূল (সা.) তাকে

ভালবাসেন ও যে আলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে তার সাথে শত্রুতা পোষণ করেন[১৯], যে আলীকে ভালবাসল সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকেই ভালবাসল, যে আলীর বিষয়ে মনে বিদ্বেষ পোষণ করে সে প্রকৃতপক্ষে তার মনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে[২০], যে আলীকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করল সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করল এবং যে আলীকে অস্বীকার করল সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করল[২১], যে আলীকে কষ্ট দিল সে তাঁদেরকে কষ্ট দিল[২২], যে আলীকে গালি দিল সে তাঁদের দু'জনকেই গালি দিল[২৩], তিনি পুণ্যবানদের নেতা, অন্যায়কারীদের হন্তা, যে ব্যক্তি তাঁকে সহযোগিতা করবে সে জয়ী হবে এবং যে তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা করবে সে অপমানিত হবে[২৪], তিনি মুসলমানদের নেতা, মুত্তাকীদের ইমাম এবং উ ল মুখাবয়বদের (সৎ কর্মশীল) প্রধান[২৫], তিনি হেদায়েতের ধ্বজা ও আল্লাহর আউলিয়াদের শীর্ষ ব্যক্তি, আল্লাহর আনুগত্য ও তাকওয়ার যে পথ অবলম্বনকে তাঁর বান্দার ওপর অপরিহার্য করা হয়েছে তিনি সে পথের প্র লিত নূর[২৬], তিনি সিদ্দীকে আকবর এবং এই উম্মতের ফারুক ও মুমিনদের প্রধান[২৭], তাঁর অবস্থান সত্যমিথ্যার পার্থক্যকারী ও প্রজ্ঞাময় স্মরণ (পবিত্র কোরআন)- এর সমপর্যায়ে[২৮], রাসূলের নিকট তাঁর স্থান মূসার নিকট হারুনের ন্যায়[২৯], তাঁর স্থান রাসূলের নিকট আল্লাহর নিকট রাসূলের স্থানের ন্যায়[৩০], দেহের জন্য মাথার গুরুত্ব যেরূপ রাসূলের নিকট আলীর গুরুত্ব অনুরূপ[৩১], তিনি রাসূলের প্রাণের মত[৩২], মহান আল্লাহ্ পৃথিবীবাসীদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এ দু'ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন[৩৩], তিনি আরো বলেছেন (বিদায় হে আরাফাতে) যে, আলী ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর পক্ষ হতে নির্দেশ দান করতে পারবে না[৩৪], এই সকল বিশেষত্ব আলী ব্যতীত অন্য কারো ছিল না এবং কেবল তিনিই এ সব কিছুর অধিকারী হিসেবে নবীর স্থলাভিষিক্তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা রাখেন। এখন প্রশ্ন ওঠা উচিত যে, কোন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য এ সকল ওসিয়তকে অস্বীকার করা সম্ভব কি? কোন দূরভিসন্ধি না থাকলে কেউ এ বিষয়গুলোর বিরোধিতা করতে পারে না। ওসিয়ত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া ভিন্ন অন্য কিছু কি?

২। প্রথম তিন খলীফার খেলাফতের সঙ্গে সাম স্যশীল নয় বিধায় চার মাজহাবের অনুসারীরা এই ওসিয়তগুলোকে অস্বীকার করেছেন।

৩। আমাদের আহলে সুন্নাহর ভাইয়েরা আমাদের যুক্তির বিপরীতে কোন প্রমাণ উপস্থাপনে সক্ষম নন। বুখারী ও অন্যান্যরা তালহা ইবনে মুসরেফ হতে যে বর্ণনাটি করেছেন, "আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি আউফিকে প্রশ্ন করলাম : নবী কি কোন ওসিয়ত করে গিয়েছেন? উত্তর দিলেন : না। আমি বললাম : কিরূপে তিনি অন্যদের ওপর ওসিয়ত করাকে ওয়াজিব করেন অথচ নিজের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে ত্যাগ করেন? তিনি বললেন : আল্লাহর কিতাবকে আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন।" এ বর্ণনাটি আমাদের যুক্তির বিপরীতে দলিল হতে পারে না। কারণ এ হাদীসটি আমাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত নয়। তদুপরি এটি শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। নবী (সা.)- এর আহলে বাইত হতে ওসিয়তের বিষয়ে সহীহ হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। সুতরাং যে কোন হাদীস এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে তা গ্রহণযোগ্য নয় ও প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনের অযোগ্য বিবেচিত হয়।

৪। এ সকল কথা বাদ দিলেও ওসিয়তের জন্য কোন যুক্তি ও দলিল উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়ে না। কারণ আকল বা বিবেক তার প্রতি নির্দেশ করে।[৩৫] কবির ভাষায়- যে শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। সূর্যের উ   লতার বর্ণনা দান বৃথা বৈ কিছু নয়।

কিন্তু বুখারী ইবনে আবি আউফি সূত্রে নবী (সা.) হতে যে বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি আল্লাহর কিতাব অনুসরণের ওসিয়ত করে গিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন, কথাটি সত্য। কিন্তু তিনি নবীর সমগ্র ওসিয়ত বর্ণনা করেন নি। কারণ নবী (সা.) আল্লাহর কিতাবের সঙ্গে দ্বিতীয় মূল্যবান ভারী বস্তু আহলে বাইতের অনুসরণের কথাও বলেছেন এবং তাঁর উম্মতকে উভয় ভারী বস্তুকে আঁকড়ে ধরার ওসিয়ত করেছেন এবং যদি তারা উভয়টিকে আঁকড়ে না ধরে তাহলে বিপথগামী হবে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, এ দু'টি পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে নবীর সঙ্গে মিলিত হবে।[৩৬]

নবী (সা.)- এর পবিত্র আহলে বাইত সূত্রে এ সম্পর্কিত সহীহ হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত অন্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ আট এবং চুয়ান্ন নম্বর পত্রে আমরা উল্লেখ করেছি।

ওয়াসসালাম

শ

পাদটিকা

১।	রাসূল (সা.) আলী (আ.) -এর জন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গিয়েছেন। ৬৬ নম্বর পত্রে তা লক্ষ্য করুন।

২।	ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের তৃতীয়াংশে ৬১ পৃষ্ঠায় হযরত আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "নবী (সা.) ওসিয়ত করেছেন আমি ছাড়া অন্য কেউ যেন তাঁকে গোসল না দেয়।" 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৫৪ পৃষ্ঠায় আবু শাইখ ও ইবনে নাজ্জার হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী বলেছেন, "নবী (সা.) আমাকে ওসিয়ত করেছেন : যখন আমি মৃত্যুবরণ করবো তখন আমাকে সাত মশক পানি দিয়ে গোসল দিও।" ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২য় অংশে ৬৩ পৃষ্ঠায় রাসূল (সা.)- এর গোসলের আলোচনায় আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আওয়ানা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) যে অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করেন তার পূর্বে হযরত আলীকে বলেন, "হে আলী! যখন আমি মৃত্যুবরণ করবো, আমাকে গোসল দিও।" এবং আলী বলেন, "আমি তাঁকে গোসল দিলাম। যে অঙ্গই আমি গোসল দিতে মনস্থ করতাম তাঁর সে অঙ্গ স্বেচ্ছায় আমার দিকে ঘুরে যেত।" হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৫৯ পৃষ্ঠায় এবং যাহাবী মুসতাদরাকের তালখিসে হযরত আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, "আমি নবীকে মৃত্যুর পর গোসল দেই। কিন্তু অন্যান্য মৃতদেহের ক্ষেত্রে যা দেখা যায় নবী (সা.)- এর ক্ষেত্রে তা দেখি নি, বরং তাঁর দেহ সম্পূর্ণ পাক ও পবিত্র যেমন তিনি জীবিতাবস্থায় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ছিলেন।" তাঁরা উভয়েই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এ হাদীসটি সাঈদ ইবনে মানসুর, ইবনে মানিই এবং ইবনে আবি শাইবা তাঁদের সুনানে, মারওয়াজী তাঁর জানাঈর এবং আবু দাউদ তাঁর মারাসিলে বর্ণনা করেছেন। কানযুল উম্মালের ৪র্থ খণ্ডের ৫৪ পৃষ্ঠায় ১০৯৪ নম্বর হাদীস হিসেবে এটি বর্ণিত হয়েছে। বায়হাকী তাঁর সুনান গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইবনে হারেস হতে বর্ণনা করেছেন, "আলী নবী (সা.)- কে পোষাক পড়া অবস্থায় গোসল দিয়েছেন।" হাদীসটি কানযুল উম্মালের ৪র্থ খণ্ডের ৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ১১০৪ নম্বর হাদীস। বায়হাকী ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, "আলী এমন চারটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী অন্য কেউ যার অধিকারী নয় : তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূলের সঙ্গে নামায আদায় করেছেন। তিনি সকল স্থানেই রাসূলের পক্ষ হতে পতাকা বহন করেছেন, তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাঁর সমগ্র প্রতিরোধশক্তি নবীর পক্ষে ব্যয় করেছেন যেদিন সকলেই তাঁকে ত্যাগ করে পালিয়েছিল। তিনি নবীকে গোসল দেয়ার অধিকারী ও নবীকে কবরে স্থাপনকারী (সর্বশেষ ব্যক্তি হিসেবে তাঁর কবরে অবস্থানকারী)। ইবনে আবদুল বার তাঁর 'ইসতিয়াব' গ্রন্থে হযরত আলীর জীবনীতে এবং হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১১১ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) বলেছেন, "হে আলী! তুমি আমাকে গোসল

দেবে, আমার ঋণ পরিশোধ করবে ও আমাকে কবরে আবৃত করবে।” দায়লামী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ‘কানযুল উম্মাল’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় ২৫৮৩ নম্বর হাদীস হিসেবে এসেছে। এ সম্পর্কিত উমর ইবনে খাত্তাব হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) হযরত আলীকে বলেন, “তুমি আমাকে গোসল দানকারী ও দাফনকারী।” হাদীসটি কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে এবং মুসনাদে আহমাদের ৫ম খণ্ডের ৪৫ পৃষ্ঠায় প্রান্ত লেখনিতেও এসেছে।

হযরত আলী (আ.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, “রাসূল (সা.)- কে বলতে শুনেছি : আলীকে আমার জন্য আল্লাহ্ পাঁচটি বিশেষত্ব দিয়েছেন যা অন্য কোন নবীকে দেয়া হয় নি। প্রথমত সে আমার ঋণ পরিশোধ করবে, দ্বিতীয়ত সে আমাকে কবরে শায়িত করাবে.।”- কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা।

যখন নবী (সা.)- এর পবিত্র দেহকে খাটিয়ায় স্থাপন করা হলো তখন সকলে তাঁর জানাযার নামায পড়ার জন্য সমবেত হলে হযরত আলী (আ.) বললেন, “রাসূল (সা.) জীবিত ও মৃত সকল অবস্থায় তোমাদের ইমাম তাই কেউ তাঁর নামাযে ইমামতি করবে না।” লোকেরা দলে দলে এসে সারিব ভাবে নামায পড়ছিল কোন ব্যক্তির ইমামতি ছাড়াই। তারা সম্মিলিতভাবে তাকবীর বলছিল এবং আলী (আ.) রাসূলের পাশে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, “আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। হে আল্লাহ্! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আপনার নবীর ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন তিনি তা যথাযথভাবে পালন করেছেন, তাঁর উম্মতের কাছে তা পৌঁছিয়ে উপদেশ দিয়েছেন, আপনার পথে জিহাদ করেছেন এবং আপনি আপনার দীনকে সম্মানিত ও শক্তিশালী করেছেন, তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তাঁর ওপর অবতীর্ণ বিধানের অনুসারী করুন ও এ পথে দৃঢ় রাখুন, আমাদের কিয়ামত দিবসে তাঁর সহগামী করুন।” সকলেই সমস্বরে আমীন বললেন। পুরুষদের নামায শেষ হলে নারীরা নামায পড়লেন। অতঃপর বালক ও শিশুরা।

উপরোক্ত বর্ণনাটি ইবনে সা’দের ‘তাবাকাত’ গ্রন্থের নবীর গোসলের অধ্যায়ের আলোচনায় এসেছে। সেদিন সর্বপ্রথম বনি হাশিম, অতঃপর মুহাজিরগণ, তারপর আনসার, তারপর অন্যান্যরা নামায আদায় করেন। প্রথম ব্যক্তি হিসেবে আলী (আ.) ও হযরত আব্বাস পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পাঁচ তাকবীরের মাধ্যমে নামায আদায় করেন।

৩। এ সম্পর্কিত হাদীস আহলে বাইত হতে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আপনার জন্য এখানে তাবরানীর ‘আল কাবীর’- এ ইবনে উমর হতে ও আবু ইয়ালীর মুসনাদে হযরত আলী হতে যে বর্ণনা এসেছে তা উল্লেখ করছি। প্রথম সূত্র মতে নবী (সা.) বলেছেন, “হে আলী! তুমি আমার ভ্রাতা ও সহযোগী, আমার ঋণ পরিশোধকারী, আমার প্রতিশ্রুতিসমূহ পূরণকারী ও আমার দায়িত্বের বোঝা অপসারণকারী।” এ হাদীসটি ‘কানযুল উম্মাল’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায় ইবনে উমর হতে এবং ৪০৪ পৃষ্ঠায় হযরত আলী (আ.) হতে

বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বুসাইরী (بوصيري) সূত্রে বলা হয়েছে যে, এ হাদীসটির রাবীরা সকলেই বিশ্বস্ত। একই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠাতেই দাইলামী ও ইবনে মারদুইয়া সূত্রে হযরত সালমান ফারসী হতে বর্ণিত হয়েছে রাসূল (সা.) বলেছেন, "আলী ইবনে আবি তালিব আমার প্রতিশ্রুতিসমূহ পূরণ করবে ও আমার ঋণ পরিশোধ করবে।" কানযুল উম্মালের উপরোক্ত খণ্ডের ১৫৩ পৃষ্ঠায় বাযযারের সূত্রে আনাস ইবনে মালিক হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১৬৪ পৃষ্ঠায় হুবশী ইবনে যুনাদাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন, "নবী (সা.)- কে বলতে শুনেছি : আমার ঋণ আমি ও আলী ব্যতীত অন্য কেউ পরিশোধ করবে না।" কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪০১ পৃষ্ঠায় ইবনে মারদুইয়া সূত্রে আলী (আ.) হতে বর্ণিত হয়েছে, "যখন و أنذر عشيرتك الأقربين 'তোমার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন কর' আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূল (সা.) বললেন : আলী আমার ঋণ পরিশোধ ও আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে।" একই স্থানে সা'দ হতে বর্ণিত হয়েছে, "রাসূল (সা.) জুহফার দিনে আলীর হাত ধারণ করে খুতবা দান করলেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর বললেন : হে লোকসকল! আমি কি তোমাদের নেতা ও অভিভাবক নই? তারা বলল : হে রাসূলে খোদা! আপনি সত্যই বলেছেন। তখন নবী (সা.) আলী (আ.)- এর হাত উঁচু করে ধরে বললেন : সে আমার প্রতিনিধি ও আমার ঋণ পরিশোধকারী।" চুয়ান্নতম পত্রের শেষে হাদীসটি দেখুন। আবদুর রাজ্জাক তাঁর জামে' গ্রন্থে মুয়াম্মার সূত্রে হযরত কাতাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আলী (আ.) রাসূলের পুরো ঋণ পরিশোধ করেন যার পরিমাণ পাঁচ লক্ষ দিরহাম ছিল। আবদুর রাজ্জাককে প্রশ্ন করা হলো : নবী (সা.) কি তাঁকে এজন্য ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন? তিনি বলেন, "নিঃসন্দেহে নবী (সা.) এ বিষয়ে তাঁকে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন নতুবা তাঁকে এটি পরিশোধের সুযোগ দেয়া হত না।" এটি কানযুল উম্মালের ৪র্থ খণ্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ১১৭০ নম্বর হাদীস।

৪। নবী (সা.) হতে বহু সূত্রে সুস্পষ্ট হাদীস এসেছে যে, তিনি হযরত আলীকে তাঁর উম্মতের মতপার্থক্য ও বিভ্রান্তির বিষয়গুলোতে ব্যাখ্যা প্রদানের ওসিয়ত করে গিয়েছেন। আটচল্লিশতম পত্রের একাদশ ও দ্বাদশ নম্বর হাদীস দু'টি দেখুন। হাদীসগুলো বেশ প্রসি ।

৫। ৩৬, ৪০, ৫৪ ও ৫৬ নম্বর পত্রে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি।

৬। নবী (সা.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কটি মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত যা আমরা ৩২ ও ৩৪ নম্বর পত্রে উল্লেখ করেছি।

৭। বুি বৃত্তিকভাবেই আমাদের নিকট এটি পরিষ্কার কিরূপে আলী (আ.) নবী (সা.)- এর সন্তানদের পিতা হন। তদুপরি নবী (সা.) আলীকে বলেছেন, "তুমি আমার ভাই, আমার সন্তানদের পিতা এবং আমার দীনের পথে জিহাদকারী।" কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪০৪ পৃষ্ঠায় হাদীসটি মুসনাদে আবু ইয়ালীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। বুসাইরী এ হাদীসের রাবীদের বিশ্বস্ত বলেছেন। আহমাদ তাঁর 'মানাকিব' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইবনে হাজার তাঁর 'সাওয়ায়েকুল মুহরাকাহ্'র ৯ম অধ্যায়ের দ্বিতীয়াংশে ৭৫ পৃষ্ঠায় তা উল্লেখ করেছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, "মহান আল্লাহ্ সকল নবীর বংশধরদের তাঁদের ঔরষে রেখেছেন কিন্তু আমার বংশধরদের আলীর ঔরষে স্থাপন করেছেন।" এ হাদীসটি তাবরানী তাঁর 'কাবীর' গ্রন্থে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। খাতীব বাগদাদী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) বলেছেন, "সকল নারীর সন্তানদের তাদের পুরুষদের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় শুধু ফাতিমা ব্যতীত। ফাতিমার সন্তানদের আমার প্রতি সম্পর্কিত করা হয়েছে (অর্থাৎ তারা আমার সন্তান)।" হাদীসটি কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫২ পৃষ্ঠার ২৫১০ নম্বর হাদীস। এছাড়া তাবরানীর সূত্রে হাদীসটি হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.) হতে বর্ণিত হয়েছে যা ইবনে হাজার তাঁর 'সাওয়ায়েক' গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয়াংশে ১১২ পৃষ্ঠায় ২২ নম্বর হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 'সাওয়ায়েক' গ্রন্থের একই পৃষ্ঠায় তাবরানী সূত্রে ইবনে উমর হতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হাকিম নিশাবুরী তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৬৪ পৃষ্ঠায় জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন যে, হাদীসটি সহীহ কিন্তু বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেন নি।

অপর একটি হাদীস যা হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে এবং যাহাবী তাঁর তালখিসুল মুসতাদরাকে উল্লেখ করে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ বলেছেন তা হলো নবী (সা.) বলেছেন, "হে আলী! তুমি আমার ভ্রাতা এবং আমার সন্তানদের পিতা যারা আমার সঙ্গে সম্পর্কিত হবে।" এ সম্পর্কিত অসংখ্য হাদীস রয়েছে।

৮। আলী (আ.)- এর প্রতিনিধিত্ব ও স্থলাভিষিক্তের পক্ষে দলিল হিসেবে এ হাদীসটি আপনার জন্য পূর্বেই ২৬ নম্বর পত্রে উল্লেখ করেছি- أنت منّي بمَنْزلة هارون من موسى إلّا أنه لا نبِيّ بعدي "তোমার অবস্থান আমার নিকট মূসার নিকট হারুনের অবস্থানের ন্যায় শুধু পার্থক্য এই যে, আমার পরে কোন নবী নেই।" তাছাড়া নিকটাত্মীয়দের ভীতি প্রদর্শনের দিনের হাদীস যেখানে রাসূল (সা.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে কে রাজী আছ আমার সহযোগী হতে?" আলী (আ.) বলেছিলেন, "হে নবী! আমি রাজী আছি।" তখন রাসূল (সা.) বলেছিলেন, "তুমি আমার ভাই, সহযোগী, খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি.।" ইমাম আবু সাইরী তাঁর 'হামযাহ্ ছন্দ'- এর কবিতায় বলেছেন,

و وزير بن عمّه في المعالى

তাঁর (নবীর) সহযোগী তাঁর চাচাতো ভাই যাঁর মর্যাদা সমুচ্চ,

و من الأهل تسعد الوزراء

তাঁর বংশ হতেই উজীররা সম্মান ও মর্যাদার শীর্ষে উঠতে পারে।

لم يزده كشف الغطاء يقينا

পর্দা অপসারণের মাধ্যমে তাঁর (আলী) দৃঢ় বিশ্বাস বৃ ি র সুযোগ নেই,

بل هو الشمس ما عليه غطاء

কারণ তিনি এক সূর্য যাঁর সামনে কোন পর্দাই নেই।

৯। মুসলিম উম্মাহ্ এ বিষয়ে একমত যে, কোরআনে এমন একটি আয়াত রয়েছে যার ওপর আলী (আ.) ব্যতীত অন্য কেউ আমল করেন নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত কারো এর ওপর আমল করার সুযোগ নেই। আয়াতটি সূরা মুজাদালার ‘نجوى’ র আয়াত। তাঁর শত্রু- মিত্র সবাই এটি স্বীকার করে। এ সম্পর্কিত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ। এটি জানার জন্য মুসতাদরাকে হাকিমের ২য় খণ্ডের ৪৮২ পৃষ্ঠায় এবং যাহাবীর তালখিসুল মুসতাদরাকের একই পৃষ্ঠায় দেখুন। উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জানার জন্য সা’লাবী, তাবারী, সুয়ূতী, যামাখশারী ও ফাখরে রাযী প্রমুখের তাফসীর গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করুন। চুয়াত্তর নম্বর পত্রে আমরা উম্মে সালামাহ্ ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর সূত্রে তায়েফের দিন ও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রাসূল (সা.)- এর সঙ্গে আলী (আ.)- এর গোপন কথনের বর্ণনা দান করেছি। সেখানে রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, “আমি আলীকে গোপনে কথা বলার জন্য আহবান করি নি, বরং আল্লাহ্ তাকে এজন্য মনোনীত করেছেন।” হযরত আয়েশার বিষয়েও রাসূল (সা.) আলী (আ.)- এর সঙ্গে গোপনে কথোপকথন করেছেন।

১০। ৩৬ নম্বর পত্রে আমরা আলীর প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে রাসূলের হাদীস ইবনে আরকাম সূত্রে বর্ণনা করেছি যে, তিনি আলীকে বলেছেন, أنت وليّي في الدنيا و الآخرة “তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার পক্ষ হতে প্রতিনিধি ও উম্মতের অভিভাবক।”

১১। আটষট্টি নম্বর পত্রে স্থলাভিষিক্তের হাদীসগুলো দেখুন।

১২। আটচল্লিশ নম্বর পত্রের ৯ নম্বর হাদীস ও এর ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করুন।

১৩। আটচল্লিশ নম্বর পত্রের ১০ নম্বর হাদীস দেখতে পারেন।

১৪। আটচল্লিশ নম্বর পত্রের ১৪ নম্বর হাদীস দেখুন।

১৫। আট নম্বর পত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ অধ্যয়ন করুন।

১৬। আটচল্লিশ নম্বর পত্রের ১৬ নম্বর হাদীস দেখুন।

১৭। আটচল্লিশ নম্বর পত্রের ১৭ নম্বর হাদীস দেখুন।

১৮। ইমাম আহমাদ তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪৪২ পৃষ্ঠায় আবু হুরাইরা হতে বর্ণনা করেছেন, "নবী (সা.) হযরত আলী, ফাতিমা, ইমাম হাসান ও হুসাইনের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : যারা তোমাদের সঙ্গে যু করে আমিও তাদের সঙ্গে যু করি ও যারা তোমাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে আমিও তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করি এবং তোমাদের শত্রু আমারই শত্রু।" তাছাড়া সহীহ হাদীস মতে যেদিন তাঁদেরকে চাদর দ্বারা আবৃত করে সম্মানিত করেন সেদিনও তিনি এ কথা বলেছেন।

এ হাদীসটি ইবনে হাজার তাঁর 'সাওয়ায়েক' গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম অংশে আয়াতের তাফসীরে তাঁদের প্রশংসায় বর্ণনা করেছেন। 'আলীর সঙ্গে যু আমার সঙ্গেই যু ও তার সঙ্গে সন্ধি আমার সঙ্গেই সন্ধি' রাসূলের এ হাদীস মুস্তাফিয সূত্রে বর্ণিত।

১৯। আটচল্লিশতম পত্রের ২০ নম্বর হাদীসে দেখুন। হাদীসটির এ বাক্যটি اللهم وال من والاه و عاد من عاداه মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। ছত্রিশতম পত্রে বুরাইদাহর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, من أبغض عليا فقد أبغضني و من فارق عليا فارقني "যে আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল এবং যে আলী হতে বিচ্ছিন্ন হলো সে আমা হতেই বিচ্ছিন্ন হলো।" "হে আলী! তোমাকে মুমিন ব্যতীত কেউ ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ব্যতীত তোমার প্রতি কেউ বিদ্বেষ পোষণ করবে না।"- হাদীসটি মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। এ সবগুলোই উম্মী নবী (সা.)- এর ওসিয়ত নয় কি?

২০। আটচল্লিশতম পত্রের ১৯, ২০ ও ২১ নম্বর হাদীস দেখুন।

২১। আটচল্লিশতম পত্রের ২৩ নম্বর হাদীস যেখানে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- اللهم وال من والاه و عاد من عاداه। তাছাড়া পূর্বোল্লিখিত ছত্রিশ নম্বর পত্রের বুরাইদাহর হাদীসও মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। এ হাদীসটি যেখানে রাসূল (সা.) বলেছেন, لا يحبه إلّا مؤمن و لا يبغضه إلّا منافق "তাকে মুমিন ব্যতীত কেউ ভালবাসবে না আর মুনাফিক ব্যতীত কেউ ঘৃণা করবে না।" আল্লাহর শপথ, এগুলো নবীর ওসিয়ত।

২২। আমর ইবনে শাশ বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে আলীকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল।” আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ৪৮৩ পৃষ্ঠায়, হাকিম তাঁর ‘মুসতাদরাক’- এর ৩য় খণ্ডের ১২৩ পৃষ্ঠায়, যাহাবী তাঁর তালখিসে মুসতাদরাকের একই পৃষ্ঠায় হাদীসটি উল্লেখ করে সহীহ বলেছেন। বুখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে, ইবনে সা’দ তাঁর তাবাকাতে, ইবনে আবি শাইবা তাঁর মুসনাদে, তাবরানী তাঁর আল কাবীর গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪০০ পৃষ্ঠায় হাদীসটি এসেছে।

২৩। আটচল্লিশতম পত্রের ১৮ নম্বর হাদীস অনুযায়ী।

২৪। আটচল্লিশতম পত্রের ১৮ নম্বর হাদীসের বর্ণনানুসারে।

২৫। প্রাগুক্ত।

২৬। আটচল্লিশতম পত্রের ২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বর হাদীস অনুসারে।

২৭। একই পত্রের ৬ নম্বর হাদীস অনুসারে।

২৮। একই পত্রের ৭ নম্বর হাদীস অনুসারে।

২৯। এ বিষয়ে অষ্টম পত্রের ‘সাকালাইন’ সম্পর্কিত সহীহ বর্ণনাসমূহ ও পঞ্চাশতম পত্রের

إنَّ عَلَيّاً مع القرآن و القرآن مع عليّ لا يفترقان

৩০। ছাব্বিশ, আটাশ, ত্রিশ, বত্রিশ ও চৌত্রিশতম পত্রগুলো বিষয়টি পরিষ্কার করে।

৩১। আটচল্লিশতম পত্রের ১৩ নম্বর হাদীস ও অন্যান্য হাদীস।

৩২। পঞ্চাশতম পত্রের বর্ণনানুসারে।

৩৩। মুবাহিলার আয়াত ও ইবনে আওফের বর্ণিত হাদীস যা পঞ্চাশতম পত্রে এসেছে।

৩৪। আটষট্টিতম পত্রে বর্ণিত সুস্পষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ।

৩৫। আটচল্লিশতম পত্রের ১৫ নম্বর হাদীস ও তার ব্যাখ্যানুসারে।

৩৬। আমাদের বিবেক নবীর জন্য এ কর্মটি অসম্ভব মনে করে যে, তিনি অন্যদের ওসিয়ত করার জন্য নির্দেশ দিবেন ও এজন্য কঠোরতা আরোপ করবেন অথচ যে মুহূর্তে তাঁর উম্মত তাঁর ওসিয়তের চরম মুখাপেক্ষী তখন তাদের ত্যাগ করবেন। যখন তারা নেতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে তখন তাদের অভিভাবকহীন ইয়াতীমের ন্যায় অসহায় রেখে যাবেন। এটি আরো অযৌক্তিক যে, তিনি মহামূল্যবান শরীয়তের আহকামসমূহ যা সর্বোত্তম উত্তরাধিকার সেটিকে পরিত্যক্ত রেখে যাবেন যার ফলে পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত জগতের অধিবাসীরা অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে এবং আল্লাহর নিদর্শন ও হুজ্জাত (প্রমাণ) যাঁরা খোদায়ী নিয়ামতের পূর্ণতাদানকারী তাঁদের ছাড়াই এ জনগোষ্ঠী কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

তদুপরি আমাদের যুক্তি বলে নবী (সা.) আলী (আ.)- কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রশাসনিক প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন, তাঁকে নিজ মৃত্যুর পর গোসল, হুনুত, দাফন, দায়ব তা হতে মুক্তি দান ও দীনের ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব পালনের ওসিয়ত করে গিয়েছেন এবং যে সকল বিষয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ হবে তাতে আলী (আ.)- কে সঠিক পথ প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়ে তাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ ও তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য উম্মতকে ওসিয়ত করেছেন। এ পত্রে তার প্রতি ইশারা করেছি।

একাত্তরতম পত্র

১০ সফর ১৩৩০ হিঃ

আপনি কেন উম্মুল মুমিনীন ও নবী (সা.)- এর স্ত্রীদের মধ্যে সর্বোত্তম হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন? এর কারণ কি?

আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি কেন 'উম্মুল মুমিনীন' ও নবী (সা.)- এর স্ত্রীদের মধ্যে সর্বোত্তম নারীর বিষয়ে ভিন্ন অবস্থান নিয়ে তাঁর কথার প্রতিবাদ করছেন? তাঁর হাদীস তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন? আপনি কেন তাঁর হাদীসকে ভুলে যাচ্ছেন? অথচ তাঁর কথা সি ান্ত-নির্ধারক ও তাঁর ফয়সালাই ন্যায়। তদুপরি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের প্রতি আমি অসম্মান করি না। তাই আপনার কথার সপক্ষে যুক্তি পেশ করুন যাতে করে আমি চিন্তা করতে পারি।

ওয়াসসালাম

স

বাহাত্তরতম পত্র

১২ সফর ১৩২০ হিঃ

১। তিনি রাসূল (সা.)- এর স্ত্রীদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন না।

২। বরং তাঁদের সর্বোত্তম হলেন হযরত খাদিজাহ্ (আ.)।

৩। হযরত আয়েশার হাদীস গ্রহণ না করার কারণের প্রতি ইশারা।

১। যদিও উম্মুল মুমিনীন হিসেবে হযরত আয়েশার অবস্থান ও মর্যাদা তাঁর স্থানে সংরক্ষিত, তদুপরি তিনি নবী (সা.)- এর স্ত্রীদের মধ্যে সর্বোত্তম নন। তিনি নবীর স্ত্রীদের মধ্যে সর্বোত্তম নন কারণ তাঁর নিজের বর্ণিত সহীহ হাদীস এরূপ- "একদা রাসূল (সা.) হযরত খাদিজাহকে স্মরণ করলে আমি তাঁর সমালোচনা করে বললাম : তিনি একজন এমন ও এমন বৃ া মহিলা ছিলেন এবং আল্লাহ্ তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী আপনাকে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) বললেন : মহান আল্লাহ্ তার হতে উত্তম স্ত্রী আমাকে দান করেন নি, সে আমার ওপর এমন অবস্থায় ঈমান এনেছিল যখন অন্যরা কাফির ছিল; অন্যরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তখন সে আমাকে সত্য বলে মেনেছিল; সে আমাকে তার সম্পদে অংশীদার করেছিল যখন অন্যরা আমাকে বঞ্চিত করেছিল; আল্লাহ্ তার মাধ্যমে আমাকে সন্তান দান করেছেন, অন্যদের হতে নয়।[৪১৫]

অন্যত্র হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত হয়েছে, ''এমন দিন ছিল না যে রাসূল (সা.) ঘর হতে বের হবার সময় খাদিজাহকে স্মরণ ও তাঁর ওপর দরূদ পড়তেন না। একদিন তিনি তাঁকে স্মরণ করলে আমার নারীসুলভ ঈর্ষা জেগে উঠল ও আমি বললাম : তিনি কি এক বৃ া রমনী বৈ আর কিছু ছিলেন? আল্লাহ্ তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী আপনাকে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) এতে এতটা রাগান্বিত হলেন যে, ক্রোধের কারণে তাঁর কপালের সম্মুখভাগের চুলগুলো কেঁপে উঠছিল। অতঃপর তিনি বললেন : না, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ্ তার চেয়ে উত্তম স্ত্রী কাউকে দেন নি। সে এমন অবস্থায় আমার প্রতি ঈমান এনেছিল যখন সবাই কাফির ছিল; যখন অন্যরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন

করেছিল তখন সে আমাকে সত্যায়ন করেছিল; অন্যরা যখন আমাকে বঞ্চিত করেছিল তখন সে আমাকে তার সম্পদে অধিকার দান করেছিল; তার হতেই মহান আল্লাহ্ আমাকে সন্তান দান করেছিলেন যখন অন্য স্ত্রীরা আমাকে তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।”

২। সুতরাং নবী (সা.)- এর সর্বোত্তম স্ত্রী ছিলেন এ উম্মতের সত্যবাদিনী হযরত খাদিজাহ্ কুবরা যিনি ঈমান গ্রহণকারী সর্বপ্রথম নারী, আল্লাহর কিতাবকে সত্যায়নকারী ও নবীকে তাঁর সম্পদে অংশীদারকারিনী। এ কারণেই আল্লাহ্ নবীকে তাঁর বিষয়ে সুসংবাদ দিয়েছেন মনি- মুক্তা খচিত বেহেশতের[৪১৬] এবং নবীর অন্যান্য স্ত্রীদের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে বলেছেন,

أَفْضَلُ نِساء أهلِ الجنَّةِ خديجة بِنْت خَويلد و فاطمة بنت محمد، آسية بنت مزاحم و مريم بنت عمران

“বেহেশতের নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো খুওয়াইলিদের কন্যা খাদিজাহ্, মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা, মুযাহিমের কন্যা আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারিয়াম।

তিনি আরো বলেছেন, ‘‘বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নারী চারজন।” অন্যত্র তাঁদের নাম উল্লেখ করে বলেছেন, ‘‘বিশ্বের নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারিয়াম, খুওয়াইলিদের কন্যা খাদিজাহ্, মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা এবং ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়াকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্মরণ করা যায়।’’ এ বিষয়ে নবুওয়াতের সাক্ষী হিসেবে সহীহ ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৪১৭]

হযরত খাদিজাহকে বাদ দিলেও নবী (সা.)- এর অন্যান্য স্ত্রীদের হতেও আয়েশা উত্তম নন। রাসূল (সা.) হতে এ সম্পর্কিত সুন্নাহ্ ও হাদীসসমূহ এর সপক্ষে প্রমাণ যা কোন জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটই অজ্ঞাত নয়। অবশ্য স্বয়ং হযরত আয়েশা এরূপ চিন্তা করতেন যে, তিনি অন্যদের হতে শ্রেষ্ঠ কিন্তু নবী (সা.) তা সমর্থন করেন নি। এটি হযরত আয়েশা ও উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া বিনতে হুয়াই- এর মধ্যে সংঘটিত ঘটনা হতে বোঝা যায়। ঘটনাটি এরূপ- একদিন নবী (সা.) হযরত সাফিয়ার ঘরে গিয়ে দেখলেন যে, তিনি ক্রন্দন করছেন। রাসূল (সা.) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, “কেন ক্রন্দন করছ?” তিনি জবাব দিলেন, ‘‘আমি জেনেছি হযরত আয়েশা ও হাফসা আমার ত্রুটি আলোচনা করে বলেন তাঁরা আমা হতে উত্তম।” রাসূল (সা.) বললেন, “তুমি তাদের প্রশ্ন কর নি

কিরূপে তারা তোমার চেয়ে উত্তম হতে পারে যখন তোমার পিতা হারুন, তোমার চাচা মূসা ও স্বামী মুহাম্মদ!"[৪১৮]

যদি কেউ উম্মুল মুমিনীন আয়েশার কথা ও কর্মকে বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখেন তবে তাঁরাও আমাদের মতই তাঁর বিষয়ে চিন্তা করবেন।

৩। কিন্তু আমরা হযরত আয়েশার হাদীস দলিল বা হুজ্জাত না হবার কারণেই তা প্রত্যাখ্যান করেছি। আমার অনুরোধ এ বিষয়ে আপনি জানতে চাইবেন না।

ওয়াসসালাম

শ

তিয়াত্তরতম পত্র

১৩ সফর ১৩৩০ হিঃ

হযরত আয়েশার হাদীস প্রত্যাখ্যানের কারণ।

আপনি এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র করেন না, যুক্তি ব্যতীত কারো ওপর কিছু আরোপ করেন না ও প্রকৃত ঘটনা ব্যতীত অন্য কিছু বর্ণনা করেন না। আপনার মর্যাদা ও অবস্থানের কারণে আপনি অসত্যের অনুসরণ ও মন্দ ধারণা হতে অনেক দূরে এবং কারো ওপর অপবাদ আরোপ হতেও সতর্ক।

আল্লাহর ইচ্ছায় আমিও প্রতারক, ধূর্ত ও ছিদ্রান্বেষী নই যে, অন্যদের ত্রুটি অন্বেষণে লিপ্ত বা মানুষের গোপন বিষয় অনুসন্ধানে নিয়োজিত হই, বরং সত্য আমার হারানো সম্পদ এবং আমি তার সন্ধানে লিপ্ত। তাই আলোচিত বিষয়ের ব্যাখ্যা চাওয়া আমার নিকট উপেক্ষা করার মত কোন বিষয় নয় এবং আমার এ আহবান প্রত্যাখ্যান ও কোন আপত্তি উপস্থাপনের কোন সুযোগ আপনার নেই। কবির ভাষায়-

নিজের কর্ম শুরু করতে কোন সঙ্কোচ ও দোষ নেই
তাই এর মাধ্যমে নিজের চোখকে উ   ল করার সুসংবাদ দাও।

আমার এ বিষয়ে জানতে চাওয়ার পেছনে যুক্তি হলো কোরআনের এ আয়াত-

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ)

নিশ্চয়ই যারা গোপন করে আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য ও হেদায়েতের কথা অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সকল লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও। (সূরা বাকারা : ১৫৯)

ওয়াসসালাম

স

চুয়াত্তরতম পত্র

১৫ সফর ১৩৩০ হিঃ

১। হযরত আয়েশার হাদীস প্রত্যাখ্যানের কারণ ব্যাখ্যা।

২। বু িবৃত্তি ওসিয়তের পক্ষে হুকুম করে (ফয়সালা দেয়)।

৩। উম্মুল মুমিনীনের এ দাবী যে, রাসূল (সা.) তাঁর পার্শ্বে মৃত্যুবরণ করেছেন এ বর্ণনার বিপরীত হাদীসও রয়েছে।

১। আল্লাহ্ আপনাকে সহায়তা করুন। আপনি আলোচ্য বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে অনুনয়ের মাধ্যমে আমাকে কিছু বলতে বাধ্য করেছেন। অথচ আপনি এ বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের তেমন মুখাপেক্ষী নন এবং আপনি জানেন ইতোপূর্বে আমরা যা বর্ণনা করেছি তার শুরু এখান হতেই। সুস্পষ্ট দলিল অগ্রাহ্যের মাধ্যমে ওসিয়তের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে এখানেই। খুমস, উত্তরাধিকার, দান ও হেবার বিধানসমূহ এখানেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ফিতনা এখান হতেই[৪১৯]। সব শহরের অধিবাসীদের আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর বিরু সংগঠিত করা হয়েছিল। কবির কথায়-

যা সংঘটিত হয়েছিল তা আর স্মরণ করবো না।

তোমরাও এ বিষয়ে ভাল ধারণা পোষণ কর ও এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন কর না।

সুতরাং হযরত আয়েশার কথায় ওসিয়তের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করা কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির নিকট কাঙ্ক্ষিত নয়, কারণ তিনি হযরত আলীর প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ পোষণ করতেন। শুধু এ স্থানে নয় অনেক স্থানেই তিনি হযরত আলীর বিরু শত্রুতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আপনার নিকট প্রশ্ন রাসূলের ওসিয়তকে অস্বীকার করা অধিকতর সহজ, নাকি হযরত আলীর বিরু উষ্ট্রের যু (‘জঙ্গে জামালে আসগর’) নেতৃত্ব দান করা অধিকতর সহজ, নাকি ‘জঙ্গে জামালে আকবার’[৪২০] -এর জন্ম দান? এ দুই যু তিনি তাঁর অন্তরে যা লুক্কায়িত ছিল তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অথচ যু দু’টি নমুনা হিসেবে তাঁর সাথে আলীর সম্পর্ককে আমাদের নিকট পরিষ্কার করে। যু র পূর্বে

নিজ ওয়ালী বা অভিভাবক ও রাসূলের ওয়াসি বা মনোনীত নির্বাহী প্রতিনিধির সাথে তাঁর আচরণ এবং যু পরবর্তীতে আলী (আ.)- এর শাহাদাতের খবর শুনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সিজদা আদায়ের পর তাঁর পঠিত নিম্নোক্ত এ দু'টি চরণ তাঁর আলীবিদ্বেষী মনোভাবকেই আমাদের নিকট প্রকাশিত করে-

فالقت عصاها و استقرت بها النوى

লাঠি ভূলু ত হয়ে তার ঘাড়ে স্থান নিল

كما قرّ عينا بالاياب المسافر

যেরূপ মুসাফিরের ঘরে ফেরার আনন্দে চক্ষু উ ল হয়ে ওঠে।[৪২১]

যদি চান তাহলে হযরত আয়েশার জীবনী হতে এ ধরনের আরো কিছু নমুনা আপনার জন্য বর্ণনা করবো যাতে আপনার নিকট তাঁর সঙ্গে আলীর দূরত্বের বিষয়টি পরিষ্কার হয়। এতে আপনি বুঝতে পারবেন রাসূলের স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হিসেবে আলীর মনোনয়নের বিষয়টি তাঁর নিকট কতটা কষ্টের ছিল![৪২২]

হযরত আয়েশা বলেন, ''রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অসুস্থ হলে তাঁর ব্যথা তীব্র হলো এ অবস্থায় তিনি ঘর থেকে বের হলেন। দু'ব্যক্তি তাঁর বাহুর নীচে হাত দিয়ে ধরেছিল ও তাঁর পা মাটিতে টেনে চলছিল। ঐ দুই ব্যক্তির একজন হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও অন্যজন অপর এক ব্যক্তি।" উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ যিনি এ হাদীসটি হযরত আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, "ইবনে আব্বাস আমাকে বলেন : ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি যাঁর নাম আয়েশা বলেন নি, তুমি কি জান তিনি কে? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : ঐ ব্যক্তি আলী ইবনে আবি তালিব। অতঃপর তিনি বলেন : হযরত আয়েশা আলীকে পছন্দ করতেন না, এ কারণে কখনোই ভালভাবে আলীকে স্মরণ করতেন না।"[৪২৩]

যখন হযরত আয়েশা কল্যাণের (ভালভাবে) সঙ্গে আলীর নাম স্মরণ করতে পছন্দ করতেন না এবং এতটুকুও উল্লেখ করতে রাজী নন যে, তিনি রাসূলের বাহু ধরে কয়েক ধাপ অতিক্রম

করেছেন তখন কিরূপে সম্ভব ওসিয়তের মত বিষয় যা পূর্ণ কল্যাণের সঙ্গে আলীর স্মরণ তা তিনি স্বীকার ও উল্লেখ করবেন?

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠায় আতা বিন ইয়াসার হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন এক ব্যক্তি হযরত আয়েশার নিকট এসে হযরত আলী ও আম্মার ইবনে ইয়াসির সম্পর্কে মন্দ কথা বলল। আয়েশা বললেন, ‘‘আলী সম্পর্কে আমি কিছুই তোমাকে বলব না কিন্তু আম্মার সম্পর্কে রাসূল (সা.) হতে শুনেছি। তিনি আম্মার সম্পর্কে বলেছেন : যদি আম্মারকে দু’টি বস্তুর মধ্য থেকে একটিকে গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হয় তবে সে যার মধ্যে অধিকতর কল্যাণ ও হেদায়েত রয়েছে সেটিকেই গ্রহণ করবে।”

আফসোস! উম্মুল মুমিনীন আম্মারের কুৎসা হতে বিরত হতে বলছেন কারণ রাসূল (সা.) হতে শুনেছেন যে, দু’টি বস্তুর মধ্যে স্বাধীনতা দেয়া হলে আম্মার যেদিকে অধিকতর হেদায়েত ও কল্যাণ রয়েছে সেটিকেই গ্রহণ করবেন। অথচ রাসূলের হারুনরূপ ভ্রাতা, প্রতিনিধি, অন্তরঙ্গ সাথী, উম্মতের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও সর্বে ষ্ঠ বিচারক, তাঁর জ্ঞানের দ্বার, যাঁকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন এবং তিনিও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন, প্রথম মুসলমান, ঈমানের ক্ষেত্রে সবার চেয়ে অগ্রগামী, ফজীলত ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সবার ওপরে তাঁর সম্পর্কে কৎসা রটনা করা উম্মুল মুমিনীনের নিকট অপরাধ নয়।

তাঁর আচরণে মনে হয় তিনি আল্লাহর নিকট আলীর মর্যাদা ও রাসূলের অন্তরে আলীর অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞাত। ইসলামে আলীর মর্যাদা ও আল্লাহর পথে যে কষ্ট ও মুসিবত আলী সহ্য করেছেন উম্মুল মুমিনীন তা যেন কখনোই শোনেন নি এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের কথায় যেন আলী সম্পর্কে এমন কিছুই বলা হয় নি যাতে করে অন্তত আম্মারের মর্যাদায় আলীকে স্থান দিতে পারতেন।

‘নবী আমার বুকে মাথা রেখে পাত্র চাইলেন এমতাবস্থায় তাঁর শরীর দুর্বল ও ফ্যাকাশে হয়ে পড়ল এবং তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। অথচ আমিই বুঝলাম না রাসূল (সা.) আলীকে নিজের ওয়াসি বা স্থলাভিষিক্ত, নির্বাহী প্রতিনিধি মনোনীত করে গেলেন?’ আল্লাহর কসম, উম্মুল মুমিনীনের এ

কথা আমার চিত্তকে দ্বিধাগ্রস্ত ও আমার সমগ্র অস্তিত্বকে হতবিহ্বল করেছে। যেহেতু কয়েকভাবে তাঁর এ কথার সমালোচনা করা যায় তাই বুঝতে পারছি না তাঁর মন্তব্যের অসারতার কোন্ দিকটি উল্লেখ করবো। হযরত আয়েশা যেরূপে রাসূলের মৃত্যুঘটনা বর্ণনা করেছেন তা কিরূপে রাসূলের ওসিয়ত করার বিপক্ষে যুক্তি হতে পারে তা আমার বোধগম্য নয়। উম্মুল মুমিনীনের মতে কি শুধু মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে ওসিয়ত করা চাই, অন্যথায় নয়? অবশ্যই এরূপ নয়। তাই সুস্পষ্ট যে কেউ সত্যের মোকাবিলায় দাঁড়ায় তার যুক্তি হীন ও অসার। মহান আল্লাহ্ কি তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে কোরআনে বলেন নি,

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ)

"তোমাদের ওপর ওসিয়তকে ফরয করা হলো যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় ও তার কোন সম্পদ অবশিষ্ট থাকে।" (সূরা বাকারা : ১৮০)

উম্মুল মুমিনীন কি মনে করতেন রাসূল (সা.) আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করেছেন? তাঁর নির্দেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন? এরূপ কথা হতে আল্লাহর আ য় চাই কারণ কখনো তা হতে পারে না। অবশ্যই উম্মুল মুমিনীন বিশ্বাস করতেন রাসূল (সা.) তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ কোরআনের নির্দেশ মত গ্রহণ করতেন। তিনি এর সূরা ও আয়াতগুলোর ওপর আমল করতেন এবং এর আদেশ ও নিষেধের বিষয়ে অন্য সকলের চেয়ে অধিক পালনকারী ছিলেন, এমন কি এর নির্দেশাবলী মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। সন্দেহাতীতভাবে হযরত আয়েশা রাসূল (সা.) হতে এ হাদীসটি শুনেছেন যে, যে মুসলমানের ওসিয়ত করার মত কোন বস্তু রয়েছে সে যেন দু'রাত্রিও ওসিয়ত ব্যতীত না ঘুমায়। সুতরাং ওসিয়তের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর কঠোর নির্দেশসমূহের বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নবী (সা.) ও অন্য কোন নবীর জন্যই বৈধ নয় কোন বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন অথচ নিজে তা সম্পাদন করেন না অথবা কোন বিষয়ে নিষেধ করেন অথচ নিজেই তা হতে বিরত থাকেন না। মহান আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে নবী হিসেবে মনোনীত বা প্রেরণ করতে পারেন না।

মুসলিম ও অন্যান্যরা আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) কোন দিরহাম, দিনার, দুম্বা, উট কিছুই রেখে যান নি এবং কোন কিছুই ওসিয়ত করে যান নি। তাঁর পূর্ববর্তী কথাগুলোর মত এটিও ভিত্তিহীন এবং এও সঠিক নয় যে, তিনি বাস্তবিকই কোন কিছু রেখে যান নি এবং সব কিছুই শূন্যাবস্থায় রেখে প্রস্থান করেছেন। অবশ্য যেহেতু তিনি পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুনিয়াবিমুখ ছিলেন তাই এ জগতের বিধানুযায়ী তাঁর অবস্থানের ব্যক্তিরা যেরূপ সম্পদ রেখে যান তেমন কোন সম্পদ তিনি রেখে যান নি। তদুপরি ইন্তেকালের সময় তাঁর কিছু ঋণ ছিল[৪২৪], তাঁর নিকট কিছু আমানতও ছিল এবং তিনি কিছু প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। এসব বিষয়ে তাঁর ওসিয়ত করা অপরিহার্য ছিল। কারণ তাঁর মালিকানাধীন সম্পদ যা তিনি রেখে গিয়েছিলেন তা দিয়ে তাঁর ঋণ পরিশোধ করার পর স্বল্প হলেও উত্তরাধিকার হিসেবে কিছু ছিল। সহীহ হাদীস সূত্রে প্রমাণিত হয় হযরত যাহরা (আ.) তাঁর উত্তরাধিকার দাবী করেছিলেন।[৪২৫]

২। সব কিছু বাদ দিলেও রাসূল (সা.) এমন এক বস্তু রেখে গিয়েছিলেন যা অন্য কেউ রেখে যান নি ও যার জন্য ওসিয়ত করা অপরিহার্য ছিল। আর তা হলো আল্লাহর অবিচল দীন যা তখন বৃি ও বিকাশের প্রথম পর্যায়ে ছিল এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, বাড়ী, বাগান, কৃষিক্ষেত্র, গৃহপালিত পশু ও অন্যান্য সম্পদ থেকে অধিকতর ওসিয়তের মুখাপেক্ষী ছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর উম্মত ইয়াতিম ও অভিভাবকহীন হয়ে পড়ায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত, নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী এক অভিভাবকের মুখাপেক্ষিতা তাঁর উম্মতকে চিন্তান্বিত করার কথা যে তারা কিভাবে তাদের দীন ও দুনিয়ার জীবনকে রাসূলের মহান লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করবে। তাই এটি রাসূলের জন্য অসম্ভব, যে দীন তার বিকাশের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে তা মানুষের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির ওপর ছেড়ে দিয়ে সে দীনের শরীয়ত, আহকাম ও বিধি- বিধানকে সংরক্ষণের জন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের ওপর নির্ভর করবেন এবং এ উম্মতের দীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ের দিক- নির্দেশনা দানকারী কোন নির্ভরযোগ্য সর্বজনীন অভিভাবক মনোনীত না করেই চলে যাবেন। তিনি তার ইয়াতিম উম্মতকে ঝড়- ঝঞ্ঝাময় অন্ধকার রাত্রিতে চালকবিহীন ও রাখালহীন একদল

মেষপালকের ন্যায় অভিভাবকহীন অবস্থায় রেখে যাবেন তা অচিন্তনীয়। আল্লাহ্ তাঁকে ওহী মারফত ওসিয়ত করার নির্দেশ দান করলে তিনি এ বিষয়ে উম্মতের ওপর কঠোরতা আরোপ করে অবশ্যই ওসিয়ত করার কথা বলবেন অথচ নিজেই তা করবেন না এরূপ কর্ম হতে আল্লাহ্ তাঁকে মুক্ত রেখেছেন। সুতরাং আমাদের বিবেক ওসিয়তকে অস্বীকার করতে পারে না। যদিও কোন বড় ব্যক্তিত্ব তা অস্বীকার করে থাকেন। আমরা দেখি নবুওয়াতী দাওয়াতের শুরুতেই মক্কায় যখন ইসলাম তেমন পরিচিতি পায় নি এবং প্রকাশিতও হয় নি তখনই রাসূল (সা.) কোরআনের এ আয়াতটি و أنزر عشيرتك الأقربين(আর তোমার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন কর) অবতীর্ণ হবার মুহূর্তে আলী (আ.)- কে নিজের ওয়াসি বা স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করেছেন যা বিশতম পত্রে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ ঘটনার পরও রাসূল (সা.) প্রায়ই এ বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করতেন। এ রকম কয়েকটি ঘটনার প্রতি আমরা পূর্বে ইশারা করেছি। এমন কি তাঁর ওফাতের পূর্বেও তিনি (আমার পিতামাতা তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত হোক) চেয়েছিলেন আলীর স্থলাভিষিক্তের বিষয়টি লিপিব করে যাবেন যাতে করে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী মজবুত ও দৃঢ়তর হয়। এজন্যই বলেছিলেন ايتونى اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدهُ أبدًا 'আনো (কালি ও কলম), আমি তোমাদের জন্য এমন লেখা লিখে দিয়ে যাব যাতে তোমরা কখনোই বিপথগামী হবে না।' অথচ কেউ কেউ তাঁর শয়নকক্ষে বাক- বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছিলেন (যদিও তাঁর সম্মুখে এরূপ কর্মে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়) ও বলেছিলেন 'নবী প্রলাপ বকছেন' (নাউযুবিল্লাহ্)।[৪২৬]

নবী (সা.) জানতেন যে, তাঁর বিষয়ে এরূপ মন্তব্যের পর তাঁর লিখিত বক্তব্যের কোন মূল্য থাকে না ও তা ফিতনা ব্যতীত অন্য কিছুর জন্ম দেবে না। এ কারণেই তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'বেড়িয়ে যাও' এবং মৌখিক ঘোষণা দিয়েই শেষ করেছিলেন। এ অবস্থাতেও তিনি তিনটি বিষয়ে ওসিয়ত করেছিলেন। প্রথমত, আলীকে উম্মতের স্থলাভিষিক্ত অভিভাবক হিসেবে ঘোষণা; দ্বিতীয়ত, মুশরিকদের মদীনা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দান এবং তৃতীয়ত, বিভিন্ন গোত্র ও দল হতে মদীনায় আগত নও মুসলিমদের পুরস্কৃত করা যেমনটি তিনি করতেন। কিন্তু

তৎকালীন ক্ষমতাসীন ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মুহাদ্দিসদের এ হাদীসটির প্রথম অংশ বর্ণনা হতে নিবৃত্ত রেখেছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন তাতে এ কথাগুলো হারিয়ে যাবে। বুখারী যে হাদীসটির শেষে 'রাসূল (সা.) প্রলাপ বকছেন' অংশটি উ ৃত করেছেন সেখানে বলেছেন রাসূল (সা.) তাঁর মৃত্যুর সময় তিনটি বিষয়ে ওসিয়ত করেছিলেন। প্রথমত, আরব উপদ্বীপ হতে মুশরিকদের বহিষ্কার; দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন গোত্র থেকে যে সকল ব্যক্তি (ইসলাম শিক্ষার উদ্দেশ্যে) মদীনায় আসবে তাদের পূর্বের ন্যায় পুরস্কৃত করা। অতঃপর উল্লেখ করেছেন তৃতীয় বিষয়টি কারোরই মনে নেই। মুসলিম এবং অন্যান্য সুনান ও মুসনাদ লেখকগণও এমনটি করেছেন।

৩। কিন্তু উম্মুল মুমিনীন আয়েশা যে দাবি করেছেন রাসূল (সা.) তাঁর বুকে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন তা প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন হাদীস ও রেওয়ায়েতের বিরোধী। কারণ সেগুলোতে বলা হয়েছে রাসূল (সা.) তাঁর ভ্রাতা ও স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি আলী (আ.)- এর কোলে মাথা রেখে তাঁর প্রিয় ও ে ষ্ঠ বন্ধুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ বিষয়ে সহীহ ও মুতাওয়াতির সূত্রে নবীর আহলে বাইত হতে এবং সহীহ সূত্রে আহলে সুন্নাহর রেওয়ায়েতসমূহে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীস বিশারদগণ এ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ওয়াসসালাম

শ

পঁচাত্তরতম পত্র

১৭ সফর ১৩৩০ হিঃ

১। উম্মুল মুমিনীন আবেগতাড়িত হয়ে কিছু করতেন না।

২। আকল (বিবেক) ভাল- মন্দের নির্ণায়ক নয়।

৩। উম্মুল মুমিনীনের সাক্ষ্যের বিপরীতে কোন হাদীস বর্ণিত হয় নি।

১। আপনার আলোচনায় উম্মুল মুমিনীনের সুস্পষ্ট ঐ হাদীসে ওসিয়ত অস্বীকার করার বিষয়টিকে দু'টি দৃষ্টিতে সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, আপনি মনে করেছেন ইমামের পথ থেকে বিচ্যুতির কারণে তিনি ওসিয়তকে অস্বীকার করেছেন।

কিন্তু উম্মুল মুমিনীনের জীবনী হতে বোঝা যায় যে, তিনি রাসূলের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভালবাসা, হিংসা, দ্বেষ ও আবেগ দ্বারা তাড়িত হতেন না। সুতরাং রাসূল হতে যখন তিনি কোন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তাঁকে অভিযুক্ত করা যাবে না এ বলে যে, অমুক ব্যক্তিকে তিনি পছন্দ করতেন বা অমুক ব্যক্তিকে তিনি পছন্দ করতেন না তাই এমনটি বলেছেন। আল্লাহ্ না করুন তিনি রাসূল হতে অসত্য কোন হাদীস বর্ণনা করে সত্যের ওপর নিজ প্রবৃত্তি ও প্রবণতার প্রাধান্য দিয়ে থাকবেন, তা হতে পারে না।

২। দ্বিতীয়ত, আপনি মনে করেছেন আকলের ওপর নির্ভর করে এ হাদীসটির সত্যতা অস্বীকার করা যায়। যেহেতু আকল হাদীসটির বিষয়বস্তুকে অসম্ভব বলে মনে করে এ যুক্তিতে যে, রাসূল (সা.) আল্লাহর দীনকে এর বিকাশের প্রথম পর্যায়ে যখন এর অনুসারীরা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে এ অবস্থায় স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি ব্যতীত রেখে যেতে পারেন না।

আপনার এ যুক্তিকে আমরা তখনই গ্রহণ করতে পারি যখন আকলকে ভাল- মন্দ নির্ণায়ক হিসেবে গ্রহণ করবো। কিন্তু আহলে সুন্নাহ্ আকলের ভাল- মন্দ পার্থক্য জ্ঞানকে গ্রহণ করে না। কারণ আকল কোন বিষয়ের ভাল- মন্দকে যথার্থরূপে অনুধাবনে সক্ষম নয় যাতে করে সে বলতে

পারে এটি ভাল বা ঐটি মন্দ। সুতরাং উম্মতকে অভিভাবকহীন রেখে যাওয়া আল্লাহর জন্য ভাল কি মন্দ তা মূল্যায়নের দায়িত্ব আকলের নয়, বরং শরীয়ত আমাদের সকল কর্মের ভাল- মন্দ নির্ণয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এজন্য শরীয়ত যা ভাল বলে তাই ভাল আর যাকে মন্দ বলে তাই মন্দ এবং আকল এ বিষয়ে মোটেই বিশ্বস্ত নয়।

৩। চুয়াত্তর নম্বর পত্রের শেষে আপনি উল্লেখ করেছেন উম্মুল মুমিনীনের বুকে মাথা রেখে রাসূল (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁর এ দাবীর বিপরীতে সহীহ হাদীস রয়েছে, আমার জানা মতে আহলে সুন্নাহ্ হতে এরূপ একটি হাদীসও বর্ণিত হয় নি। আপনার নিকট যদি এরূপ কোন হাদীস থাকে তাহলে তা বর্ণনা করুন।

ওয়াসসালাম

স

ছিয়াত্তরতম পত্র

১৯ সফর ১৩৩০ হিঃ

১। তিনি প্রায়ই আবেগতাড়িত হতেন।

২। আকলের ভাল- মন্দ নির্ণয়ের ক্ষমতা রয়েছে।

৩। উম্মুল মুমিনীনের দাবীর বিপক্ষে বর্ণিত সহীহ্ হাদীসসমূহ।

৪। উম্মে সালামাহর হাদীস হযরত আয়েশার হাদীসের ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

১। আমার আলোচনার জবাবে আপনি বলেছেন প্রসি ইতিহাসবিদদের লেখা হতে উম্মুল মুমিনীন সম্পর্ক যা জানা যায় তা হলো তিনি আবেগতাড়িত হয়ে কিছু করতেন না এবং হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিউদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কিছু বলতেন না। আমি আপনাকে আহবান জানাব আপনি নিজে আবেগতাড়িত হয়ে অন্ধ অনুকরণ না করে তাঁর জীবনী সম্পর্কিত ইতিহাস নতুন করে পাঠ করুন এবং যাদের প্রতি তাঁর ভালাবাসা ও যাদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল তাদের সাথে তাঁর আচরণ ও মন্তব্য গভীরভাবে চিন্তা ও নতুনভাবে মূল্যায়ন করুন। তাহলে দেখতে পাবেন তাঁর জীবনে আবেগ কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে! বিশেষত তিনি তাঁর কথা ও কাজের দ্বারা হযরত উসমানের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন তা ভুলে যাবেন না। বাস্তবে হযরত আলী, ফাতিমা, ইমাম হাসান ও হুসাইন (আ.)- এর সাথে তাঁর গোপন ও প্রকাশ্য বিভিন্ন আচরণ, নবী (সা.)- এর অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে তাঁর ব্যবহার, এমন কি স্বয়ং রাসূলের সঙ্গে তাঁর আচরণকে আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন সেখানে তাঁর আবেগ ও উদ্দেশ্য কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে! উদাহরণস্বরূপ মিথ্যাবাদীরা হযরত মারিয়া ও তাঁর পুত্র ইবরাহীমের ওপর যে অপবাদ আরোপ করে উম্মুল মুমিনীন তাতে সায় দেন। অবশেষে মহান আল্লাহ্ তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর মাধ্যমে সে অপবাদ থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালোভাবে মুক্তি দেন।[৪২৭] মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে বলেছেন, ‘‘যারা কাফির হয়ে গিয়েছে

আল্লাহ্ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা তাদের নিজ ক্রোধানলে প্র   লিত হচ্ছে এবং কোন কল্যাণই লাভ করতে পারে নি।'' আপনি এ ঘটনায় তাঁর ব্যক্তিস্বার্থ ও আবেগতাড়িত হবার বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারবেন। তাঁর আবেগতাড়িত হয়ে কথা বলার দলিল হিসেবে দেখুন তিনি রাসূল (সা.)- কে বলেছেন, ''আমি আপনার থেকে মাগাফিরের গন্ধ পাচ্ছি।''[৪২৮] এ কথা বলার মধ্যমে তিনি চেষ্টা করেছেন রাসূল (সা.)- কে উম্মুল মুমিনীন যায়নাব থেকে ফিরিয়ে রাখতে।

যখন মূল্যহীন এক ক্ষুদ্র স্বার্থ তাঁকে রাসূল (সা.)- এর প্রতি অশোভন ও অসত্য মন্তব্য করতে উৎসাহিত করে তখন কিভাবে হযরত আলী সম্পর্কিত ওসিয়তের বিষয় অস্বীকারকারী তাঁর হাদীস আমরা গ্রহণ করবো?

আসমা বিনতে নোমানের বিবাহের ঘটনায় তাঁর আবেগতাড়িত মন্তব্যের কথা আপনি ভুলে যাবেন না যখন তাঁর সাথে রাসূল (সা.)- এর বিবাহের রাত্রে তিনি আসমাকে বলেন রাসূল (সা.) সেই নারীকে পছন্দ করেন যে তাঁকে বলে أعوذ بالله منك অর্থাৎ আমি আপনার নিকট হতে খোদার আ য় চাই।[৪২৯] এভাবে তিনি চেয়েছেন রাসূলকে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ও বীত   করতে এবং এই মুমিন নারীকে রাসূলের সামনে অপদস্থ করতে। সম্ভবত উম্মুল মুমিনীন রাসূলের প্রতি এরূপ আচরণ করাকে মুবাহ্ এবং নিজ উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এরূপ হারাম কর্ম সম্পাদনকে তুচ্ছ মনে করতেন।

অন্য এক স্থানে আমরা দেখি নবী (সা.) তাঁকে এক বিশেষ নারীর বিষয়ে তথ্য যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করেন যাতে তিনি তার বিষয়ে সঠিকভাবে অবহিত হতে পারেন কিন্তু হযরত আয়েশা নিজ স্বার্থকে অগ্রাধিকার দান করে সত্যকে গোপন করে অসত্য তথ্য প্রদান করেন।[৪৩০]

অন্য এক ঘটনায় তাঁর আবেগতাড়িত হবার বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করি যখন রাসূল (সা.) তাঁর বিষয়ে তাঁর পিতার নিকট অভিযোগ করেন তখন তিনি রাসূলকে বলেন, ''ন্যায়পরায়ণ হোন।''[৪৩১] এতে তাঁর পিতা তাঁর মুখে চপোটঘাত করেন ও তাঁর ঠোঁট কেটে রক্ত বের হয়। অন্যত্র

রাসূলের সামনে রাগান্বিত হয়ে তিনি বলেন, ''আপনি কি সেই ব্যক্তি যিনি ধারণা করেন যে, তিনি আল্লাহর নবী?''[৪৩২]

এরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যা বর্ণনার পরিসর এই পত্রে নেই। তাই নির্ধারিত কয়েকটি উল্লেখ করলাম। আশা করি আপনার জন্য যথেষ্ট হবে।

২। আমার আলোচিত বিষয়ের দ্বিতীয় অংশের জবাবে আপনি বলেছেন আহলে সুন্নাহ্ ভাল-মন্দের নির্ণায়ক হিসেবে আকলকে গ্রহণ করে না এবং এ সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। কিন্তু আপনার নিকট হতে এরূপ কথাকে পছন্দ করতে পারছি না। কারণ আপনার এ কথা সন্দেহবাদীদের কথার অনুরূপ যারা অনুভূত বস্তুকেও অস্বীকার করে। আমরা কিছু কিছু কাজকে ভাল বলে জানি ও প্রশংসা করি (চাই শরীয়ত তা বলুক বা না বলুক) এজন্য যে, সত্তাগতভাবে কাজটি ভাল, যেমন ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার ও কল্যাণ নিজ হতেই ভাল বলে আমরা বিবেকপ্রসূতই এদের ভাল বলে অনুধাবন করি। কোন কোন কাজকে আমরা মন্দ ও অপছন্দনীয় জানি এজন্য যে, সত্তাগতভাবে তা মন্দ ও নিন্দনীয়, যেমন অন্যায় ও অবিচার সত্তাগতভাবেই মন্দ এবং বুি সম্পন্ন মানুষের নিকট এর মন্দ হওয়া স্বতঃসি । এক দুইয়ের অর্ধেক যেমন স্বতঃসি এটিও সেরূপ স্বতঃসি অবশ্যম্ভাবী। সহজাত মানব প্রকৃতি বিচারে যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সার্বক্ষণিক কল্যাণ করে এবং যে ব্যক্তি সার্বক্ষণিক অকল্যাণ করে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কারণ বিবেক স্বভাবগতভাবেই প্রথম ব্যক্তির কর্মকে প্রশংসনীয় ও পুরস্কারযোগ্য এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্মকে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য বলে বিচার করে। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে সন্দেহ করে, সে তার বিবেক ও বুি বৃত্তির বিরু দাঁড়িয়েছে। যদি আমাদের যুক্তি সত্য না হয়ে আপনার মতানুযায়ী শরীয়তকে একমাত্র ভাল- মন্দ নির্ধারক বলে ধরে নিই তবে ধর্ম ও শরীয়ত অস্বীকারকারী নাস্তিক ও যিনদিকদের দৃষ্টিতেও এ বিষয়গুলো এরূপ হত না। তাই আমরা দেখি যদিও নাস্তিকরা ধর্মকে অস্বীকার করে তদুপরি ন্যায়বিচার ও কল্যাণকে ভাল বলে মনে করে এবং এর কর্তাকে প্রশংসনীয় ও পুরস্কারযোগ্য বলে বিশ্বাস করে এবং এর বিপরীতে অন্যায়, অবিচার ও সীমা লঙ্ঘনকে মন্দ বলে এরূপ কর্ম সম্পাদনকারীকে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য ঘোষণা করতে

সন্দেহে পতিত হয় না। তাদের এরূপ চিন্তার পক্ষে দলিল হলো আকল (বিবেক), অন্য কিছু নয়। সুতরাং হে সম্মানিত! যেসব ব্যক্তি বিবেকের বিরুে দাঁড়িয়েছে ও সকল জ্ঞানী ব্যক্তি যাকে সত্য বলে গ্রহণ করে তা অস্বীকার করেছে তাদের আপনি ত্যাগ করুন। এরূপ ব্যক্তিগণ নিজ সহজাত প্রকৃতির বিরুে কাজ করছে। কারণ মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের বাস্তবতার অনেক কিছুই অনুধাবনের ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে যেমন তিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুকে অনুধাবনের ক্ষমতা দিয়েছেন তেমনি আকল দ্বারা ভাল-মন্দ অনুধাবনেরও শক্তি দান করেছেন। সুতরাং সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার মত বস্তুসমূহের ভাল হওয়া এবং অবিচার ও অন্যায়ের মত বস্তুসমূহের খারাপ হবার বিষয়গুলো আকল দ্বারা বুঝতে পারে যেমন সে তার জিহ্বা দ্বারা মধুর মিষ্টি হওয়া এবং তিক্ত বস্তুর তিক্ত হবার বিষয়টি অনুভব করে, সে তার নাক দিয়ে আতরের সুবাস ও মৃতদেহের দুর্গন্ধ, হাত ও চর্ম দিয়ে বস্তুর মসৃণতা ও অমসৃণতা, চোখ দ্বারা সুন্দর ও অসুন্দর দৃশ্যের পার্থক্য, কর্ণ দ্বারা বাঁশীর মনোমু কর শব্দের সঙ্গে গর্দভের কর্কশ শব্দের পার্থক্য বুঝতে পারে। এগুলো সেই ফিতরাত বা সহজাত প্রবণতা যার ওপর আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। তাঁর বিধান এমনই যদিও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

আশা'আরীগণ শরীয়তের প্রতি ঈমান ও এর নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে। তারা আকলের নির্দেশকে অস্বীকার করে বলে 'শরীয়তের নির্দেশই একমাত্র নির্দেশ'। কিন্তু তারা তাদের এ কাজের মাধ্যমে নিজেদের পথকেই রু করেছে। এর ফলে শরীয়তকে গ্রহণের পক্ষে কোন যুক্তি ও দলিল থাকে না এজন্য যে, শরীয়তকে গ্রহণের জন্য যদি বলি যেহেতু শরীয়ত বলেছে সেহেতু শরীয়তের নির্দেশ মানতে হবে তবে বিষয়টি একটি চক্রের রূপ নেবে এবং এটি কোন দলিলই হবে না। যদি আকলের নির্দেশ দানের ক্ষমতা না থাকে তবে নাকল বা শারয়ী দলিল সীমাব হয়ে পড়ে। কারণ আকল ব্যতীত কেউই আল্লাহকে চিনতে পারত না। ফলে কোন ইবাদতকারীই তাঁর ইবাদত করত না। এ বিয়য়ে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের আলেমদের লেখনীতে প্রচুর রয়েছে।

৩। কিন্তু উম্মুল মুমিনীনের এ দাবী যে, নবী (সা.) তাঁর বুকে মাথা রেখে ইন্তেকাল করেন- হাদীসটির বিপরীতে পবিত্র আহলে বাইত হতে সহীহ ও মুতাওয়াতির সূত্রে হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। আহলে সুন্নাহ্ হতেও এরূপ হাদীস বর্তমান। ইবনে সা'দ[৪৩৩] হযরত আলী হতে বর্ণনা করেছেন, "নবী (সা.) মৃত্যুর পূর্বে বললেন: আমার ভ্রাতাকে ডাক। আমি তখন তাঁর নিকট গেলে আমাকে বললেন : কাছে আসো। আমি নিকটবর্তী হলে তিনি আমার শরীরে ভর দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর মুখনিঃসৃত সামান্য পানি আমার ওপর পতিত হলো এমতাবস্থায় তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।"

আবু নাঈম তাঁর 'হুলইয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে, আবু আহমাদ ফারযী তাঁর সংকলনে এবং সুনান লেখকদের অনেকেই হযরত আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, "নবী (সা.) মৃত্যুর সময় জ্ঞানের এক হাজার দ্বার আমার নিকট উন্মোচন করেন যার প্রতিটি হতে এক হাজার দ্বার উন্মোচিত হয়।"[৪৩৪]

যখন কেউ হযরত উমর হতে রাসূলের মৃত্যুকালীন ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইতেন তখন তিনি বলতেন, "আলীকে প্রশ্ন কর, সে এ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল।"

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আল- আনসারী হতে বর্ণিত হয়েছে- কা'ব উল আহবার হযরত উমরকে প্রশ্ন করলেন, "নবী (সা.)- এর শেষ কথা কি ছিল?" হযরত উমর জবাব দিলেন, "আলীকে প্রশ্ন কর।" কা'ব হযরত আলীকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, "নবী (সা.) আমার বুকে শরীরের ভর রেখে মাথাটি আমার কাঁধে স্থাপন করলেন এবং বললেন :

(الصلاة الصلاة) নামায, নামায।" কা'ব বললেন, "হ্যাঁ, নবীদের শেষ উপদেশ এটিই। তাঁরা এ কাজের জন্যই দায়িত্বপ্রাপ্ত ও মনোনীত হন।" কা'ব বললেন, "কে তাঁকে গোসল করায়?" উমর বললেন, "আলীকে প্রশ্ন কর।" হযরত আলী (আ.) বললেন, ''আমি তাঁকে গোসল দেই।''[৪৩৫]

ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করা হলো : আপনি কি দেখেছেন, ওফাতের সময় রাসূলের মাথা কার ক্রোড়ে ছিল? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আলীর বুকে ভর দিয়েছিলেন।" তাঁকে বলা হলো : উরওয়া

হযরত আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা.) তাঁর হাত ও বুকের মাঝে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে আব্বাস তা অস্বীকার করে বললেন, “তোমার বিবেক কি তা বিশ্বাস করে? আল্লাহর কসম, রাসূল আলীর ক্রোড়ে মাথা রেখেই ইন্তেকাল করেছেন এবং তিনিই রাসূলকে গোসল দেন।”[৪৩৬]

ইবনে সা’দ[৪৩৭] ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন যয়নুল আবেদীন (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, “রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আলীর দেহে ভর দেয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।’’

এ সম্পর্কে আহলে বাইতের অন্যান্য ইমামদের হতে মুতাওয়াতির সূত্রে হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এমন কি যে সকল ব্যক্তি তাঁদের ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেন না তাঁদের অনেকেই এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন, যেমন ইবনে সা’দ শা’বী হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) আলী (আ.)- এর ক্রোড়ে মাথা রেখে ইন্তেকাল করেন এবং তিনিই তাঁকে গোসল দেন।[৪৩৮]

আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) স্বয়ং এ বিষয়টি তাঁর খুতবাতে বর্ণনা করেছেন, যেমন নিম্নোক্ত খুতবায় তিনি বলেছেন, ‘‘হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সাহাবীগণ তাঁর গোপন রহস্যের সংরক্ষক। তারা এ বিয়য়ে ভালভাবেই অবহিত যে, আমি কখনোই আল্লাহর বিধান ও রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করি নি, বরং নিজের জীবনকে বাজী রেখে যেসব যুদ্ধে তাঁর সহযোগিতা করেছি সেসব যুদ্ধে সাহাবীদেরও পা কাঁপত ও সেখান হতে পলায়ন করত। আমার এ সাহসিকতা আল্লাহর দেয়া বিশেষ দান। আমার বুকে মাথা রাখা অবস্থায় রাসূলের রুহ তাঁর পবিত্র দেহ ত্যাগ করে। আমার হাত তাঁর প্রাণের স্পর্শ লাভ করলে আমি আমার মুখমণ্ডলে তা বুলিয়ে নিই। আমি তাঁর গোসলের দায়িত্বপ্রাপ্ত হই ও ফেরেশতারা আমাকে এ কাজে সহযোগিতা করেন। তখন তাঁর গৃহের দ্বার ও দেয়াল আর্তনাদ ও ক্রন্দন করছিল। একদল ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করছিলেন, অপর দল আকাশে ফিরে যাচ্ছিলেন। তাঁদের আযানের মৃদু ধ্বনি আমার কানে অবিরত বাজছিল। যতক্ষণ না তাঁকে কবরস্থ করা হল তাঁরা তাঁর ওপর নামায পড়ছিলেন। সুতরাং তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুকালে কোন্ ব্যক্তি আমার চেয়ে তাঁর নিকটবর্তী হবার যোগ্য?’’[৪৩৯]

অন্যত্র নারীকুল শিরোমণি হযরত ফাতিমা (আ.)- এর দাফনের সময় তিনি বলেন, "হে রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! আমার পক্ষ হতে ও আপনার কন্যা যে খুব তাড়াতাড়িই আপনার সান্নিধ্য লাভ করেছে তার পক্ষ হতে সালাম গ্রহণ করুন। হে নবী! আপনার সম্মানিত ও পবিত্র কন্যার বিরহে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে ও আমার শক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়েছে। কিন্তু আপনার মৃত্যু ও বিচ্ছেদ বেদনার পর যে কোন বেদনাই আমার নিকট ক্ষুদ্র। আমি ভুলি নি নিজ হাতে আপনাকে কবরে স্থাপন করেছি এবং মৃত্যুর সময় আপনার পবিত্র মাথা আমার বুকে স্থাপিত ছিল এবং আপনার রুহ এ পৃথিবী ত্যাগ করে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"[৪৪০]

সহীহ হাদীসসূত্রে উম্মে সালামাহ্ বলেছেন, "যে আল্লাহর ওপর আমি বিশ্বাস করি তাঁর শপথ, হযরত আলী অন্য সকল ব্যক্তি হতে রাসূলের নিকটবর্তী ছিলেন। একদিন সকলে তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন, আলী এসেছে কি? আলী এসেছে কি? ফাতিমা বললেন : মনে হয় আপনি তাঁকে কোন দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন?" উম্মে সালামাহ্ বলেন, "অতঃপর আলী আসলেন। আমরা বুঝতে পারলাম তাঁর সাথে রাসূলের বিশেষ কাজ রয়েছে। তাই ঘর হতে বের হয়ে আসলাম কিন্তু আমি অন্য সকলের হতে দরজার নিকটবর্তী ছিলাম ও লক্ষ্য করলাম তিনি অনবরত আলীর কানে কানে কথা বলছেন। সেদিনই নবী (সা.) ইন্তেকাল করেন।" সুতরাং আলী (আ.) নবী (সা.)- এর কর্মের দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে তাঁর সবচেয়ে নিকটের ব্যক্তি।[৪৪১]

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর হতে বর্ণিত হয়েছে- রাসূল (সা.) তাঁর অন্তিম অসুস্থতায় বলেন, আমার ভাইকে ডাক। হযরত আবু বকর আসলে তিনি তাঁর হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর হযরত উসমান আসলেন, তিনি তাঁর হতেও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর হযরত আলী আসলে তিনি তাঁকে তাঁর চাদরের মধ্যে জড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন। কিছুক্ষণ পর আলী তাঁর নিকট হতে চলে এলে তাঁকে প্রশ্ন করা হলো : নবী (সা.) আপনাকে কি বলেছেন? তিনি বললেন :

عَلّمني ألف باب كُلّ بابٍ يفْتَحُ لهُ أَلْفُ بابٍ তিনি আমাকে জ্ঞানের সহস্র দ্বার শিক্ষা দিয়েছেন যার প্রতিটি হতে সহস্র দ্বার উন্মোচিত হয়।"[৪৪২]

নবীর শান ও মর্যাদার সাথে সাম স্যশীল বর্ণনা এটি। কিন্তু হযরত আয়েশা যা বর্ণনা করেছেন তা নারী আসক্ত ব্যক্তিদের শানের সাথেই অধিক সাম স্যশীল। প্রশ্ন হলো যদি কোন রাখাল তার স্ত্রীর বক্ষ ও গলদেশের মাঝে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করে অথচ তার মেষপালের বিষয়ে কোন ওসিয়ত ও নির্দেশনা দিয়ে না যায় তাকে কি অসচেতন ও বিনষ্টকারী বলা হবে না?

আল্লাহ্ উম্মুল মুমিনীনকে ক্ষমা করুন, কারণ তিনি আলী (আ.)- এর এই ফজীলত ও মর্যাদাকে (যা রাসূলের শানের সাথে অধিকতর সাম স্যপূর্ণ) তাঁর হতে সরিয়ে নিজ পিতার দিকে নিতে ব্যর্থ হয়ে নিজের সাথে সংযুক্ত করেন। যেহেতু তাঁর পিতা সে সময় রাসূলের নির্দেশে প্রেরিত উসামা ইবনে যাইদের সেনাদলে মদীনার বাইরে ছিলেন সেহেতু তাঁর পক্ষে এ ফজীলত অর্জন কখনোই সম্ভব ছিল না।

যা হোক রাসূল (সা.) তাঁর মৃত্যুর সময় হযরত আয়েশার ক্রোড়ে মাথা রেখেছিলেন এ হাদীসটি স্বয়ং হযরত আয়েশা ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেন নি। কিন্তু রাসূলের মৃত্যুর সময় তাঁর মাথা আলীর বুকে ছিল এরূপ হাদীস স্বয়ং আলী ছাড়াও ইবনে আব্বাস, উম্মে সালামাহ্, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর, শা'বী, আলী ইবনুল হুসাইন এবং আহলে বাইতের অন্যান্য ইমামগণ হতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সনদের দৃষ্টিতে এ হাদীসটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও রাসূলের শানের জন্য উপযুক্ত।

৪। যদি হযরত আয়েশার হাদীসের বিপরীতে উম্মে সালামাহর হাদীসটিই শুধু থাকত তদুপরি উপরোল্লিখিত কারণে এবং অন্যান্য যুক্তিতেও হযরত আয়েশার হাদীসের ওপর এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত।

ওয়াসসালাম

শ

সাতাত্তরতম পত্র

২০ সফর ১৩৩০ হিঃ

কেন উম্মে সালামাহর হাদীসটি হযরত আয়েশার হাদীসের ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত?

আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থ রাখুন ও হেফাজত করুন এজন্য যে, হযরত আয়েশার হাদীসের ওপর উম্মে সালামাহর হাদীসের অগ্রাধিকারের বিষয়টি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হন নি, বরং বলেছেন এর বাইরেও এর সপক্ষে যুক্তি রয়েছে। আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন। সেগুলোর উল্লেখ করুন যদিও তা অধিক হয়। কোন কিছুই যেন বাদ না যায়, কারণ আমাদের এ আলোচনা জ্ঞান বিতরণ ও অর্জনের জন্যই।

ওয়াসসালাম

স

আটাত্তরতম পত্র

২২ সফর ১৩৩০ হিঃ

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমাহর হাদীসের সপক্ষে অন্যান্য যুক্তি।

উম্মে সালামাহ্ পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতে বর্ণিত ‘অন্তর বক্র’ (সত্য হতে বিচ্যুত) হবার কারণে তওবার নির্দেশপ্রাপ্তাদের[৪৪৩] অন্তর্ভুক্ত নন এবং কোরআনে নবী (সা.) ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধির বিরোধিতার কারণেও তাঁর বিরু আয়াত অবতীর্ণ হয় নি, তিনি এমন কোন কাজও করেন নি যার কারণে তাঁর বিরু আল্লাহ্ তাঁর নবীকে জিবরাঈল, ফেরেশতামণ্ডলী, সৎ কর্মশীল মুমিন এবং নিজ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন[৪৪৪] বা তাঁকে তালাক ও তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী রাসূল (সা.)- কে দানের কথা উল্লেখ করেছেন, [৪৪৫] আল্লাহ্ তাঁর জন্য হযরত নূহ (আ.) ও লুত (আ.)- এর স্ত্রীদের উদাহরণও পেশ করেন নি, [৪৪৬] তিনি কখনোই রাসূলকে কোন বিষয়ে অবিরত অনুযোগ করে তাঁর জন্য হালাল বস্তু হারাম করতে বাধ্য করেন নি, [৪৪৭] রাসূল (সা.) কোনদিন তাঁর ঘরের দিকে ইশারা করে বলেন নি ‘ফিতনা এখান থেকেই[৪৪৮], এখান থেকেই শয়তানের শিং বের হবে’। তিনি আদব ও আখলাকের ক্ষেত্রে কখনোই সীমা লঙ্ঘন করেন নি। রাসূলের সামনে পা প্রসারিত করে নামাযের ব্যাঘাত ঘটান নি যাতে রাসূল (সা.) বাধ্য হন সিজদার স্থান থেকে পা সরিয়ে দিয়ে সিজদা করতে, আবার সিজদা হতে ওঠার পরপরই পা প্রসারিত করে তাঁর বিরক্তিরও সৃষ্টি করেন নি।[৪৪৯] হ্যাঁ, এমনটিই ঘটেছিল অন্যের ক্ষেত্রে।

উম্মে সালামাহ্ হযরত উসমানের বিষয়ে অসন্তোষের জন্ম দান করেন নি বা তাঁকে বৃ ইহুদী বলে মন্তব্য করে আক্রমণ করেন নি। তিনি কখনোই বলেন নি, ‘এই বৃ ইহুদীকে হত্যা কর, কারণ সে কাফির হয়ে গেছে’[৪৫০]। যে ঘরে অবস্থানের নির্দেশ আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছিলেন সেই ঘর হতে তিনি বের হন নি।[৪৫১] তিনি ‘আসকার’ নামক উষ্ট্রের[৪৫২] পিঠে আরোহণ করে উঁচু- নীচু প্রান্তর অতিক্রম করে হাওয়াবে পৌঁছে সেখানকার কুকুরদের আক্রমণের শিকার হন নি। অথচ নবী (সা.)

আয়েশাকে উষ্ট্রে আরোহণ করতে ও হাওয়াব যেতে নিষেধ করেছিলেন।[৪৫৩] উম্মে সালামাহ্ হযরত আলীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রস্তুত ও নেতৃত্বের দায়িত্বও নেন নি।

সুতরাং 'নবী (সা.) আমার চিবুক ও বুকের মাঝে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন' হযরত আয়েশার এ কথা তাঁর বর্ণিত এ হাদীসটির মত যে, "সুদানীরা মদিনার মসজিদে যুদ্ধাস্ত্র, তরবারী, ঢাল ও বর্শা নিয়ে খেলা ও নৃত্যরত ছিল। নবী আমাকে বললেন : তুমি খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি আমাকে তাঁর কাঁধে তুলে নিলেন। আমি তাঁর কাঁধে চিবুক এমনভাবে রেখেছিলাম যে, তাঁর গণ্ডদেশ আমার গণ্ডদেশের সাথে মিশে ছিল। তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করছিলেন যাতে খেলা জমে উঠে ও আমি আনন্দ পাই। অনেকক্ষণ খেলা দেখার পর আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি বললেন : খুশী হয়েছ? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাহলে চলে যাও।"[৪৫৪] অথবা তাঁর বর্ণিত অন্য একটি হাদীসের অনুরূপ যেখানে তিনি বলেছেন, "নবী (সা.) আমার নিকট এসে দেখলেন দুই ক্রীতদাসী গান গাচ্ছে। তিনি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। তখন আবু বকর সেখানে উপস্থিত হলে আমাকে এ বিষয়ে নিষেধ করে বললেন : রাসূলুল্লাহর নিকট কেন এই শয়তানের বাঁশী? রাসূল আবু বকরকে বললেন : তাকে তার অবস্থায় থাকতে দাও।"[৪৫৫]

হযরত আয়েশার এ হাদীসটির সাথে এ হাদীসটিকেও মিলিয়ে দেখতে পারেন যে, "একবার নবী (সা.)- এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করলে আমি জয়ী হলাম। এরপর কিছুদিন অতিক্রান্ত হলে আমি শীর্ণ হয়ে পড়লে দ্বিতীয়বারের মত আমরা প্রতিযোগিতা করলাম ও তিনি জয়ী হলেন এবং বললেন : এটি ঐ বারের প্রতিশোধ।"[৪৫৬] নিম্নোক্ত হাদীসটিও এর সাথে সংযুক্ত করুন। "আমি মেয়েদের সাথে খেলতাম। নবী আমার বন্ধু ও খেলার সাথীদের আমার ঘরে নিয়ে আসতেন যাতে আমি তাদের সাথে খেলতে পারি।"[৪৫৭] সবশেষে তাঁর এ হাদীসটির মূল্যায়ন করুন যেখানে বলেছেন, "আমাকে আল্লাহ্ সাতটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন যা মারিয়ম ইবনে ইমরান ব্যতীত কেউ লাভ করেন নি। তা হলো ফেরেশতা আমার আকৃতিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, নবী (সা.) আমাকে কুমারী অবস্থায় বিয়ে করেন যখন তাঁর সকল স্ত্রীরই পূর্বের স্বামী ছিল, আমি ও রাসূল এক চাদরের নীচে

থাকা অবস্থায় তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হয়, আমি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলাম, আমি ব্যতীত নবীর অন্য কোন স্ত্রী জিবরাঈলকে দেখেন নি, আমার ঘরে তাঁর মৃত্যু ঘটে এবং আমি ও ফেরেশতা ব্যতীত কেউ তাঁর সেবায় নিয়োজিত ছিল না।"[৪৫৮, ৪৫৯]

এরূপ আরো কিছু বৈশিষ্ট্য তিনি নিজের জন্য বর্ণনা করেছেন। এখন কথা হলো হযরত মারিয়ম (আ.) এ বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনটি ধারণ করেছিলেন?

অপর পক্ষে উম্মে সালামাহর একটি বৈশিষ্ট্যই এর বিপরীতে যথেষ্ট। আর তা হলো নবী (সা.)-এর ওয়াসি বা স্থলাভিষিক্ত মনোনীত প্রতিনিধির প্রতি তাঁর ভালবাসা ও আনুগত্য। তিনি সঠিক সি ান্ত, উচ্চতর বু ি বৃত্তি ও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন বলেই হুদায়বিয়ার সন্ধিতে তাঁর বু ি বৃত্তি ও মর্যাদার নিদর্শন রেখেছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর রহমত ও বরকতের ধারা তাঁর ওপর অব্যাহত রাখুন।

ওয়াসসালাম

শ

উনআশিতম পত্র

২৩ সফর ১৩৩০ হিঃ

হযরত আবু বকরের খেলাফত ইজমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত।

আপনি ওসিয়তের পক্ষে যে সুস্পষ্ট দলিলসমূহ এনেছেন তা যদি পূর্ণাঙ্গও হয় তদুপরি আবু বকর সিদ্দীকের হাতে উম্মতের সর্বজনীন বাইয়াতের বিষয়ে কি বলবেন? কেননা আপনি অবশ্যই অবগত আছেন উম্মতের ইজমা দলিল হিসাবে অকাট্য যা রাসূলের এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, لا تجتمع أمّتي على الخطأ "আমার উম্মত ভুলের ওপর একতাব হতে পারে না।" অন্যত্র বলেছেন, لا تجتمع أمّتي على ضلال "আমার উম্মত পথভ্রষ্টতার ওপর একমত হতে পারে না।" এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

ওয়াসসালাম

স

আশিতম পত্র

২৪ সফর ১৩৩০ হিঃ

এ বিষয়ে ইজমা নেই।

আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলব, রাসূল (সা.) যে বলেছেন, 'আমার উম্মত ভুলের ওপর ঐক্যব হতে পারে না' বা 'আমার উম্মত পথভ্রষ্টতার ওপর একমত হতে পারে না' কথাগুলো তখনই কার্যকর হবে যখন উম্মত পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কোন বিষয়ে সি ান্ত গ্রহণ করবে। রাসূল (সা.)- এর বাণী হতে এ অর্থই আমরা বুঝতে পারি।

কিন্তু যখন উম্মতের কয়েক ব্যক্তি নিজস্ব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি উম্মতের সচেতন, জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেয় তখন সেখানে সঠিক পথ ও পথভ্রষ্টতা হতে মুক্তির বিষয় বলে কিছু থাকে না। আমরা জানি সাকীফার ঘটনা পরামর্শের মাধ্যমে জন্মলাভ করে নি, বরং দ্বিতীয় খলীফা, আবু উবাইদা এবং তাঁদের সাথে যে ক'জন ছিলেন তাঁরা পূর্ববর্তী ঘটনা ও ধারার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মনোনীত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে অসহায় অবস্থায় ফেলে আকস্মিকভাবে ঘটনাপ্রবাহকে অন্যদিকে নিয়ে যান যাতে আর করার কিছুই না থাকে। তৎকালীন ইসলামী সমাজের অবস্থা ও সময়ের প্রেক্ষাপট তাঁদের জন্য সহায়ক হয় ফলে তাঁরা তাঁদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেন।

হযরত আবু বকর নিজে স্বীকার করেছেন, তাঁর বাইয়াত চিন্তা ও পরামর্শের মাধ্যমে ঘটে নি। তিনি তাঁর খেলাফতের প্রথম দিনই জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্যে বলেন,

إنّ بيعتي كانت فَلْتَةً وقى الله شرها و خشيت الفتنة "আমার বাইয়াত পূর্বপরিকল্পনা ব্যতীত আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয় ও আল্লাহ্ এর অমঙ্গল দূর করেছেন। আমি ফিতনার আশঙ্কা করেছিলাম।"[৪৬০]

হযরত উমরও তাঁর শাসনকালে শেষ জুমআর খুতবায় নবী (সা.)- এর মিম্বারে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেন যা সকল স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বুখারী তাঁর 'সহীহ'তে[৪৬১] যে বর্ণনাটি করেছেন তা হতে আমাদের আলোচনা সংশ্লিষ্ট অংশটি হলো : আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, তোমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি[৪৬২] বলেছে : আল্লাহর শপথ উমর মৃত্যুবরণ করলে আমরা অমুক ব্যক্তির হাতে বাইয়াত করবো। সাবধান কেউ যেন আত্মগর্বিত হয়ে না বলে আবু বকরের বাইয়াত আকস্মিক ও কোন চিন্তা ও পরামর্শ ছাড়াই হয়েছিল, আমিও অমুকের হাতে বাইয়াত করবো এবং সব ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদিও আবু বকরের বাইয়াত তেমনটিই ছিল তদুপরি আল্লাহ্ এর মন্দ পরিণতি থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন।... যদি কেউ কোন পরামর্শ ব্যতীত কারো হাতে বাইয়াত করে সে জেনে রাখুক বাইয়াতকারী ও যার হাতে বাইয়াত করা হবে তাদের কেউই জনগণের পক্ষ থেকে খেলাফতে অধিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা রাখে না। তাই কেউ যেন তাদের হাতে বাইয়াত না করে, করলে মৃত্যু হতে বাঁচতে পারবে না (কারণ তারা মুসলিম সমাজকে মূল্যহীন করেছে। এ অপরাধে নিহত অথবা নির্বাসিত হবার যোগ্য)।[৪৬৩]

বুখারীতে হযরত উমরের এ বক্তব্যের সঙ্গে এ অংশটিও রয়েছে- হ্যাঁ, নবী (সা.)- এর ওফাতের পর আনসারগণ আমাদের বিরোধিতা করে সাকীফায়ে বনি সায়েদায় মিলিত হলো। হযরত আলী, যুবায়ের ও অন্যান্য অনেকেই আমাদের সাথে একমত পোষণ করেন নি। বুখারী অতঃপর সেখানে সাকীফায় বাকবিতণ্ডার ঘটনা (এর ফলে ইসলামের মধ্যে বিভেদের আশঙ্কা) এবং সেই সাথে হযরত আবু বকরের হাতে হযরত উমরের বাইয়াতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

হাদীস, রেওয়ায়েত ও ইতিহাস গ্রন্থ হতে সুস্পষ্ট হয় যে, রেসালতের ঘাঁটি নবীর আহলে বাইতের এক ব্যক্তিও সাকীফার সেই বাইয়াতে অংশ গ্রহণ করেন নি। অনেকেই তখন আলীর গৃহে সমবেত হয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে আবু যর গিফারী, সালমান ফারসী, মিকদাদ, আম্মার ইবনে ইয়াসির, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, খুজাইমা ইবনে সাবিত (যু শাহাদাতাইন), উবাই ইবনে কা'ব, ফারওয়া ইবনে ওয়াদাকা আনসারী, বারবা ইবনে আযেব, খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস এবং তাঁদের মত অনেকেই ছিলেন। এরূপ ব্যক্তিদের বিরোধিতা স ও কিরূপে ইজমা পূর্ণ

হবে যখন রাসূল (সা.)- এর আহলে বাইত ও বনি হাশিমের সকল সদস্য সাকীফার বিরোধিতা করেছেন যাঁদের স্থান উম্মতের ওপর দেহের ওপর মাথা এবং মুখমণ্ডলের মধ্যে চক্ষুর ন্যায়। নবীর আহলে বাইত তাঁর রেখে যাওয়া মূল্যবান ও ভারী বস্তু (ثقل) এবং তাঁর জ্ঞানের পাত্র, তাঁরা কোরআনের সমমর্যাদার ও আল্লাহর দূত, উম্মতের নাজাতের তরী, ক্ষমার দ্বার, বিচ্যুতি হতে নিরাপত্তাস্থল এবং হেদায়েতের পতাকা, তাঁদের স্থান ও মর্যাদা দলিলের মুখাপেক্ষী নয়। কারণ আমাদের বু বৃত্তি ও বিবেকই আমাদের নিকট তা স্পষ্ট করে দেয়।[৪৬৪] অবশ্য আমরা পূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

বুখারী ও মুসলিম তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে[৪৬৫] এবং অন্যান্য হাদীস ও সুনান লেখকগণও হযরত আলীর বাইয়াত হতে বিরত থাকার ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন সাকীফার ঘটনা হতে ছয় মাস অর্থাৎ ফাতিমা (আ.)- এর ওফাত পর্যন্ত হযরত আলী তৎকালীন খলীফার হাতে বাইয়াত করেন নি এবং ছয় মাস পর ইসলামী সমাজের তৎকালীন অবস্থা ও কল্যাণের কথা চিন্তা করে তিনি খলীফার সাথে সহাবস্থানের সি ান্ত নেন ও সমঝোতা করেন। হযরত আয়েশা হতে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছে হযরত ফাতিমা (আ.) হযরত আবু বকরের ওপর অসন্তুষ্ট হন ও মৃত্যু পর্যন্ত তিনি হযরত আবু বকরের সাথে কথা বলেন নি এবং খলীফার সাথে সমঝোতার সময় হযরত আলী উল্লেখ করেছেন যে, খেলাফত প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অধিকার ও অন্যরা জোরপূর্বক তা ছিনিয়ে নিয়েছে। এ হাদীসটিতে হযরত আলীর সমঝোতার কথা উল্লিখিত হলেও বাইয়াতের কথা উল্লিখিত হয় নি, বরং হযরত আবু বকরের উদ্দেশ্যে হযরত আলীর যুক্তি এরূপে উপস্থাপিত হয়েছে- তিনি বলেছেন,

فـــإنْ كُنْـــتَ بـــالقربى حججـــتَ خصـــيمهم فَغـــــيرك أولى بـــــالنّبيّ و أقـــــرب

“যদি তুমি তোমার বিরোধীদের বিরু আত্মীয়তার যুক্তি পেশ করে থাক তবে জেনে রাখ অন্যেরা নবীর অধিকতর কাছের নিকটাত্মীয়।

و إن كنـــتَ بالشـــورى ملكـــت أمـــورَهم فكيـــف بِهـــذا و المشـــيرون غيّـــب

আর যদি পরামর্শের ভিত্তিতে ক্ষমতা গ্রহণ করে থাক তবে তা কিরূপ পরামর্শ যে পরামর্শদাতারা অনুপস্থিত ছিলেন।"[৪৬৬]

রাসূল (সা.)- এর চাচা হযরত আব্বাস হযরত আবু বকরের বিরুদ্ধে এভাবে যুক্তি পেশ করেছেন[৪৬৭]-

হযরত আব্বাস তাঁকে বলেন, "আপনি যদি নবীর সাথে আত্মীয়তার কারণে খেলাফত দাবী করে থাকেন তবে আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন। আর যদি মুমিনদের মাধ্যমে তা পেয়ে থাকেন তাও অসত্য কারণ মুমিনদের মধ্যে আমরাই সকলের অগ্রগামী। যদি বলেন মুমিনরা আপনার হতে বাইয়াত করেছে তাই আপনি এর অধিকারী হয়েছেন তাও সঠিক হবে না কারণ আমাদের বিরোধিতা ও অপছন্দের কারণে আপনার জন্য তা অশোভনীয়।"

সুতরাং কোন্ ইজমা হযরত আবু বকরের খেলাফতকে প্রতিষ্ঠিত করে? রাসূলের চাচা ও পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের উপরোক্ত বক্তব্যের পর ঐ ইজমার কোন গুরুত্ব থাকে কি? রাসূলের ভ্রাতা, ওলী ও চাচাতো ভাইয়ের প্রদর্শিত যুক্তির পর ঐ ইজমা মেনে নেয়ার আর কোন গুরুত্ব থাকে কি? সেই সাথে নবীর আহলে বাইতের অন্যান্য সদস্যের অবস্থান ও ভূমিকা কি এ ইজমার অসারতা প্রদর্শন করে না?

ওয়াসসালাম

শ

একাশিতম পত্র

২৮ সফর ১৩৩০ হিঃ

বিভেদর পথ রু   হবার মাধ্যমে খেলাফতের বিষয়ে ইজমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

আহলে সুন্নাহ্ স্বীকার করে হযরত আবু বকরের বাইয়াত পরামর্শ ও চিন্তাপ্রসূত ছিল না, বরং পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল। এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, আনসারগণ এর বিরোধিতা করে সা'দ ইবনে উবাদার পাশে সমবেত হয়েছিল এবং বনি হাশিম ও তাঁদের পক্ষের মুহাজির ও আনসার হযরত আলীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা বলেন, "অবশেষে খেলাফত হযরত আবু বকরের জন্যই নির্ধারিত হয় এবং সকলেই তাঁকে ইমাম ও নেতা হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেন।"

সুতরাং প্রথম পর্যায়ের বিভেদ পরে দূরীভূত হয়েছিল এবং পারস্পরিক দ্ব ও সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গিয়েছিল। সকলেই হাতে হাত মিলিয়ে আবু বকরের সহযোগিতায় সর্বাত্মকভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি যাদের সাথে যু র নির্দেশ দেন তাদের সাথে তাঁরা যু   লিপ্ত হন, যাদের সাথে সন্ধি করেন তাদের সাথে তাঁরা সন্ধি করেন, তাঁর আদেশ- নিষেধকে সর্বজনীনভাবে মেনে নেন, এমন কি এক ব্যক্তিও তাঁর বিরোধিতা করেন নি। তাই এভাবে ইজমা প্রতিষ্ঠিত ও খেলাফত বৈধতাপ্রাপ্ত হযেছে। আল্লাহ্ বিভেদের পর তাঁদের মধ্যে ঐক্য এবং পারস্পরিক ঘৃণার পর তাঁদের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁর শোকর আদায় করি।

ওয়াসসালাম

স

বিরাশিতম পত্র

৩০ সফর ১৩৩০ হিঃ

ইজমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং বিভেদও দূর হয় নি।

প্রকাশ্য ও গোপনে হযরত আবু বকরকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্মতি এক বিষয় এবং ইজমার মাধ্যমে তাঁর খেলাফত বৈধ হওয়া ভিন্ন এক বিষয়। এ দুই বিষয় বু ি বৃত্তিক বা শরীয়তগত কোনভাবেই অবিচ্ছেদ্য কোন বিষয় নয়। কারণ হযরত আলী ও তাঁর বংশের পবিত্র ইমামগণ বাহ্যিক ইসলাম পালনকারী শাসকগোষ্ঠী ও প্রসি মাজহাবগুলোর বিপক্ষে বিশেষ প তি অবলম্বন করতেন এবং আমরাও তাতে বিশ্বাসী। আপনার প্রশ্নের জবাবে এ পন্থা নিয়ে আলোচনা করছি।

মুসলিম উম্মাহকে বিচ্ছিন্নতা হতে রক্ষা করা, এর সমস্যা সমাধান, সীমান্ত প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য হুকুমতের (শাসনকার্যের) প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই হুকুমত শাসক ও নিবেদিতপ্রাণ জনসাধারণ ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। এ প্রেক্ষিতে যদি এই হুকুমতের প্রকৃত অধিকারী ও শরীয়তসম্মত উত্তরাধিকারী আল্লাহর পক্ষ হতে মনোনীত নবীর সঠিক স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা সম্ভব হয় তাহলে তা সর্বোত্তম এবং সেক্ষেত্রে এমন ব্যক্তির আনুগত্য মুসলিম উম্মাহর ওপর ফরয ও তিনি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে সে পদে অধিষ্ঠিত করা অপরাধ বলে গণ্য।

কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয়, বরং এমন ব্যক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় যে (অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছে এবং কোন অবস্থায়ই এর প্রকৃত দাবীদারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজী নয় কিন্তু সে) ইসলামের বিধিবিধান কার্যকর করে ও ইসলামী দায়িত্ব পালন করে এবং তার বিরু বিদ্রোহ মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট ও বিভেদের সৃষ্টি করে ফলে ইসলাম হুমকির সম্মুখীন হয় তবে মুসলিম উম্মাহর ওপর ফরয হলো যে সকল বিষয় ইসলামের সম্মান ও মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত সে সকল বিষয়ে তাকে সহযোগিতা করা এবং ইসলামের ভিত্তিকে মজবুত ও এর সীমাকে সংরক্ষণের জন্য

তার পৃষ্ঠপোষকতা করা। এক্ষেত্রে মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঐক্যকে বিভেদে পরিণত করা অবৈধই শুধু নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর জন্য ওয়াজিব হলো তার সাথে ন্যায়ত খলীফার মত আচরণ করা । তাকে ভূমি কর ও রাজস্ব (খারাজ), চতুষ্পদ জন্তু ও ফসলের যাকাত দেয়া যাবে, তার সাথে ক্রয়- বিক্রয়, দান, সদকা, উপহার বিনিময় করা যাবে। যারা তার নিকট থেকে খারাজভুক্ত জমি গ্রহণ করে তারা বাৎসরিক নির্দিষ্ট কর দিবে। ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের ওপর আরোপিত এ দায়িত্ব থেকে তারা অব্যাহতি পাবে। এক্ষেত্রে সে সত্যপন্থী ও মনোনীত ইমামগণের অনুসরণের ন্যায় দায়িত্ব পালন করছে। তাই হযরত আলী (আ.) ও তাঁর পরবর্তী পবিত্র ইমামগণ এ পন্থাই তাঁদের সাথে অবলম্বন করতেন।

নবী (সা.) বলেছেন, "অতি শীঘ্রই আমার পর স্বৈরাচারী ও অবৈধ শাসকবর্গকে দেখবে যারা অপরিচিত।" বলা হলো : হে রাসূল! আমাদের সময়ে তাদের আগমন ঘটলে আমরা কি করবো? তিনি বললেন, "তোমাদের দায়িত্ব তোমরা পালন করবে এবং আল্লাহর কাছে চাইবে তারা যেন তোমাদের অধিকার দান করে।"[৪৬৮] কারণ যদি তা করা না হয় তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে ও হুমকির সম্মুখীন হবে।

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) প্রায়ই বলতেন, "আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে ওসিয়ত করে গিয়েছেন শ্রবণ ও আনুগত্য করতে যদি সে হাত- পা কাটা ক্রীতদাসও হয়।"[৪৬৯]

সালামা জো'ফী জানতে চাইলেন, "হে রাসূলাল্লাহ্! যদি এমন ব্যক্তিবর্গ আমাদের ওপর শাসক হয় যারা আমাদের অধিকার দেয় না, তাদের বিষয়ে আমরা কি করবো?" তিনি বললেন, "শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর। তারা তাদের কর্মের প্রতিফল বহন করবে, তোমরাও তোমাদের কর্মের।"[৪৭০]

হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, "আমার পর এমন ব্যক্তিবর্গ শাসক হবে যারা আমার পথে হেদায়েতপ্রাপ্ত নয় এবং আমার পর সুন্নাহর ওপর আমল করবে না। তাদের চারিদিকে এমন লোকেরা সমবেত হবে যাদের হৃদয় শয়তানের ন্যায় কিন্তু চেহারা মানুষের ন্যায়।" হুজাইফা বলেন, "যদি আমরা সে সময় উপস্থিত থাকি তাহলে কি করবো?" তিনি

বললেন, " বণ কর ও আনুগত্য কর। যদিও (সে) তোমাদের চাবুক দ্বারা প্রহার করে ও তোমাদের সম্পদ কেড়ে নেয়।"[৪৭১]

হযরত উম্মে সালামাহ্ নবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, "আমার পর তোমাদের ওপর এমন শাসকবর্গ আসবে যাদের কোন কোন কর্ম দেখবে উত্তম, কোন কোন কর্ম অন্যায়। যে কেউ তাদের অন্যায় কর্ম বুঝতে পারবে ও সঠিক সময়ে অসৎ কর্ম হতে বিরত রাখার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে; যারা তাদের অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখে ও অস্বীকার করে তারাও মুক্তি পাবে।"[৪৭২] বলা হলো : আমরা কি তাদের বিরু   সংগ্রাম ও যু করবো না? তিনি বললেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত নয় যতক্ষণ তারা নামায পড়ে।"

এ বিষয়ে নবীর পবিত্র আহলে বাইত হতে মুতাওয়াতির সূত্রে হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই আহলে বাইতের ইমামগণ স্বয়ং ধৈর্যধারণ করেছেন যদিও তাঁদের চোখে কাঁটা ও গলায় হাড় বি   হবার মত অবস্থা হয়েছিল। নবী (সা.) বিশেষভাবে তাঁদের এ বিষয়ে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, সকল প্রকার নির্যাতনের পরও ইসলাম ও উম্মতকে রক্ষার তাগিদে তাঁরা যেন কাঁটাবি   চোখ বন্ধ করে রাখেন। তাই তাঁরাও তাঁদের অধিকার হৃত হবার পরও এ সকল শাসকের বিরু   সে মোতাবেক কাজ করেছেন। এটি তাঁদের নিকট তিক্ত রস হজমের মত বিষয় হলেও তা মেনে নিয়ে সত্য ও উন্নতির পথের দিকে শাসকদের নির্দেশনা দিয়েছেন। এরূপ শাসকদের ক্ষমতারোহণ তাঁদের হৃদয়ে ধারালো ছুরি বি   হবার মত হলেও ঐশী নির্দেশ ও প্রতিশ্রুতি পালনের শরীয়তগত ও বু বৃত্তিক অপরিহার্য দায়িত্ব হিসেবে তাঁরাও গুরুত্বপূর্ণ দুই বিপরীতমুখী দায়িত্বের অধিকতর গুরুত্বের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ কারণেই আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে প্রথম তিন খলীফাকে নিষ্ঠার সাথে পরামর্শ দিতেন ও সর্বাত্মকভাবে উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা দিতে চেষ্টা করতেন। কেউ প্রথম তিন খলীফার শাসনামলে হযরত আলীর ভূমিকা নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখবেন রাসূল (সা.) ওফাতের পর যখন তিনি খেলাফতের অধিকার পাবেন না বলে নিশ্চিত হলেন তখন ক্ষমতাসীন শাসকদের সাথে সমঝোতা ও সহযোগিতার পথ বেছে নিলেন। রাসূল (সা.) হতে তাঁর ওপর অর্পিত নেতৃত্বের

দায়িত্ব অন্যের দ্বারা হৃত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন নি। দীন ও মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা এবং আখেরাতকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি নিজ অধিকার আদায়ের সংগ্রাম হতে পিছিয়ে আসেন। তখন তিনি দু'টি বিপদ ও সমস্যার মধ্যে ছিলেন যেরূপ অন্য কেউ ছিল না।

একদিকে তাঁর খেলাফতের পক্ষে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বাণী ও প্রতিশ্রুতিসমূহ তাঁকে করুণস্বরে তাদের দিকে আহবান করছিল। সে আহবান হৃদয়কে রক্তাক্ত ও অন্তরকে দগ্ধ করছিল। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত বিদ্রোহী ও শত্রুদের অপতৎপরতার ফলে আরব উপদ্বীপে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি ও ইসলাম হুমকির সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা ছিল। মদীনার যে সকল মুনাফিক নিফাকের মধ্যে চরমভাবে নিমজ্জিত ছিল ও মদীনার চারপাশে বসবাসকারী মুনাফিক যারা কুফর ও নিফাকের ক্ষেত্রে অন্য সকল হতে কঠোর ছিল (কোরআনের ভাষায় ঈমান তাদের মুখে রয়েছে, অন্তরে প্রবেশ করে নি) তারা ইসলামের নির্দেশ অস্বীকারের সুযোগ খুঁজছিল। আরব ভূ- খণ্ডের তৎকালীন অবস্থা এতটা আশঙ্কাজনক ছিল যে, সে অবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলে ইসলামী সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যেত ও এর কোন অস্তিত্বই থাকত না। এ রকম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল এজন্য যে, রাসূল (সা.)- এর মৃত্যুর পর এরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং মুসলমানরা অন্ধকার রাত্রিতে পথ হারা মেষপালের ন্যায় হয়ে পড়েছিল যারা হিংস্র ও ভয়ঙ্কর নেকড়ের (ঐ সব কাফির ও মুনাফিকদের আক্রমণের মুখে পড়েছিল) হামলার শিকারে পরিণত হয়েছে। মুসাইলামা কায্যাব (ভণ্ড নবী), মিথ্যাবাদী তালহা বিন খালেদ, প্রতারক সাবাহ্ বিনতে হারেস ও তাদের সঙ্গী- সাথী ইসলামকে ধ্বংস ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল এবং এদের সাথে যুক্ত ছিল আরো একদল যারা তাদের অন্তরে নবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত এবং ইসলামকে ভিন্ন এক দৃষ্টিতে দেখত। যে বিভিন্ন দলের কথা আমরা উল্লেখ করলাম তারা ইসলামের ভিত্তি উৎপাটনের মাধ্যমে যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে মানসিক প্রশান্তি পেতে চাচ্ছিল এবং এজন্য প্রস্তুতিও নিয়েছিল। রাসূল (সা.)- এর ওফাতের পর তারা পরিস্থিতি

তাদের অনুকূল মনে করে ত সুযোগের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলামের শক্তি কেন্দ্রীভূত হবার পূর্বেই আঘাত হানতে চেয়েছিল।

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) একদিকে খেলাফতের ঘোষণার আহবান, অন্যদিকে তৎকালীন প্রতিকূল অবস্থা (যা ইসলামের ধ্বংসের সম্ভাবনা ডেকে এনেছিল)- এ উভয় দিক বিবেচনা করে নিজ অধিকারকে ইসলামের প্রাণের জন্য উৎসর্গ করাকেই ে য় মনে করেন ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকে তাঁর ওপর অগ্রাধিকার দেন। সুতরাং হযরত আবু বকরের সাথে তাঁর দ্ব ইসলামের সংরক্ষণ ও মুসলিম সমাজের ঐক্য রক্ষার তাগিদে আপাতঃপ্রশমিত হয়। এ উদ্দেশ্যে স্বয়ং আলী (আ.) সহ নবীর আহলে বাইতের সকল সদস্য এবং মুহাজির ও আনসারদের মধ্য হতে তাঁদের বন্ধু ও অনুসারীরা তখন ধৈর্য অবলম্বন করেছিলেন যদিও তাঁদের চক্ষুতে কণ্টক এবং গলায় হাড় বি হয়েছিল। রাসূলের ওফাতের পর হতে নিজ শাহাদাত পর্যন্ত তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য এ সত্যকেই সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে। নবীর আহলে বাইত সূত্রে এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির।

কিন্তু আনসারদের প্রধান সা'দ ইবনে উবাদা প্রথম দুই খলীফার কারো সাথেই সমঝোতা করেন নি, ঈদ ও জুমআর নামাযসহ কোন নামাযের জামাতেই তাঁদের সাথে অংশ গ্রহণ করেন নি, তাঁদের নির্দেশনাসমূহ পালন করেন নি, নিষেধসমূহ বণ করেন নি। অবশেষে দ্বিতীয় খলীফার শাসনামলে তাঁকে সিরিয়ায় গুপ্ত হত্যা করে প্রচার করা হয় ি নরা তাঁকে হত্যা করেছে। তিনি সাকীফায় ও তার পরবর্তীতেও খেলাফতের বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন যা এখানে উল্লেখের প্রয়োজন মনে করছি না।[৪৭৩](২৬*)

সা'দের সহযোগীদের মধ্যে হাব্বাব ইবনে মুনযির ও অন্যান্য আনসারদের জোরপূর্বক মাথা নত করানো[৪৭৪] ও বাইয়াত নেয়া হয়। তরবারীর ও আগুনে পোড়ানোর ভয়[৪৭৫] দেখিয়ে নেয়া বাইয়াতকে ঈমান ও বিশ্বাসের বাইয়াত বলা যায় কি? এটি কি ইজমার নমুনা হবে? এ অবস্থায় কি আমরা রাসূলের এ হাদীসটি لا تجتمع أمّتي على الخطأ (আমার উম্মত ভুলের ওপর একত্রিত হবে

না) দলিল হিসেবে উপস্থাপন করতে পারব? আপনিই এ বিষয়ে ফয়সালা দিন। এর প্রতিদানও আপনার জন্যই।

ওয়াসসালাম

শ

তিরাশিতম পত্র

২ রবিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ

কোরআন ও সুন্নাহর সাথে সাহাবীদের কর্মের বৈধতার সমন্বয় সম্ভব নয় কি?

বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা নবী (সা.)- এর সরাসরি আদেশ- নিষেধের বিষয়ে সাহাবীদের বিরোধিতায় বিশ্বাস করেন না এবং মনে করেন তাঁরা এ বিষয়ে চোখ বুঁজে তাঁর নির্দেশ পালন করতেন। সুতরাং এটি অবিশ্বাস্য যে, তাঁরা রাসূল (সা.) হতে হযরত আলীর ইমামতের বিষয়ে কিছু শুনে অস্বীকার করবেন। যখন আপনার দাবী মতে একবার নয়, তিনবার তাঁরা এটি শুনেছেন তখন সম্ভব নয় এরপরও তা অগ্রাহ্য করবেন। সাহাবীদের কর্মের বৈধতা ও সুস্পষ্ট দলিলের মধ্যে আপনি কিরূপে সমন্বয় সাধন করবেন?

ওয়াসসালাম

স

চুরাশিতম পত্র

৫ রবিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ

১।	সুস্পষ্ট দলিলের সাথে সাহাবীদের কর্মের সমন্বয় সাধন।

২।	ইমাম আলী (আ.) কেন নিজ অধিকার আদায় হতে বিরত হলেন?

১। অনেক সাহাবীরই জীবনী ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁরা কোরআন ও সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন তবে কোরআন ও সুন্নাহর সেইসব দলিলের যা পরকালের সাথে সম্পর্কিত, যেমন রমযান মাসের রোযা, কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়া, ফরয নামাযের সংখ্যা, দৈনিক নামাযের রাকাত সংখ্যা, নামাযের প তি, কাবা ঘরের চারদিকে সাতবার তাওয়াফ করা। এরূপ পরকালীন জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁরা কোরআন ও সুন্নাহর অনুসারী হলেও ক্ষমতা, নেতৃত্ব, রাজনীতি ও শাসনকার্য সংশ্লিষ্ট বিষয়, যেমন রাষ্ট্র পরিচালনা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, সামরিক ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁরা কোরআন- সুন্নাহর ভিত্তিতে কাজ করতেন না ও তদনুযায়ী ফয়সালা দিতেন না, বরং এক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও নিজস্ব মতানুযায়ী কাজ করতেন, এমন কি তাঁদের ব্যক্তিগত মত ও ইজতিহাদ যদি কোরআন- সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলিলের বিপরীতও হত কিন্তু নিজস্ব ক্ষমতা ও হুকুমতের জন্য কল্যাণকর মনে করতেন তাহলে তাই করতেন। সম্ভবত এ কাজে তাঁরা রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন বলেই মনে করতেন।[৪৭৬]

হযরত আলীর খেলাফতের বিষয়েও তাঁদের ধারণা ছিল আরবরা তাঁর আনুগত্য করবে না ও এ বিষয়ে সুন্নাহর অনুবর্তী হবে না।[৪৭৭] কারণ তিনি আরবদের নতজানু করেছেন, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের রক্ত ঝরিয়েছেন, সত্যকে সাহসী ও বিজয়ী করার জন্য পর্দা উন্মোচন করেছেন, কাফিরদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর দীন প্রজ্বলিত রাখার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাই শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত তারা তাঁর অনুগত হবে না ও আল্লাহর বিধান মেনে নেবে না। আরবরা ঐতিহ্যগতভাবেই চাইবে ইসলাম যে রক্ত ঝরিয়েছে আলী (আ.) হতে তার প্রতিশোধ নিতে।

কারণ রাসূল (সা.)- এর পর বনি হাশিমে আলীর মত স্বনামধন্য কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না যার হতে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে (আরবরা প্রথাগত রীতি অনুযায়ী গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি হতে প্রতিশোধ নিয়ে থাকে)। আরবরা এজন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে ও মনে মনে আলী ও তাঁর বংশের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে ও সুযোগ খুঁজতে থাকে হামলা ও প্রতিশোধের এবং শেষ পর্যন্ত তা সম্পন্নের মাধ্যমে আলী ও তাঁর বংশের জন্য বিপদকে আসমান হতে জমিন পর্যন্ত পূর্ণ করে দেয়।

আরবদের মধ্যে বিশেষ করে কুরাইশরা হযরত আলী হতে প্রতিশোধ নিতে চাইতো এজন্য যে, আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঐশী ধারার প্রতি অসম্মানের কারণে আল্লাহর শত্রু হিসেবে তাদের সাথে আলী (আ.) কঠোর আচরণ করেছিলেন। আরবরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ব্যাপারে হযরত আলী (আ.)- কে ভয় পেত, বিচারের ক্ষেত্রে সকলের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি ও ন্যায়ের প্রতি দৃঢ়তা তাদের আতঙ্কিত করত, কেউ তাঁর প্রতি লোভের চক্ষু নিয়ে তাকানোরও সাহস করত না, এ কারণে তাঁর হতে স্বার্থ উ ার তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। শক্তিমান ও ক্ষমতাবানরা তাঁর নিকট ক্ষুদ্র ছিল যাতে করে তাদের হতে অধিকার আদায় করা যায় এবং দুর্বলরা তাঁর নিকট ছিল শক্তিধর ও প্রিয় যাতে তারা অধিকার আদায় করতে পারে। সুতরাং যে সকল ব্যক্তি কোরআনের বর্ণনানুসারে (আরবরা [মদীনার চারপাশের] কুফর ও নিফাকের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর এবং আল্লাহর বিধান যা রাসূলের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তা সম্পর্কে অধিকতর অজ্ঞ- সূরা তওবা : ৯৭) এরূপ স্বভাবের, তাদের পক্ষে সম্ভব নয় স্বেচ্ছায় আলী (আ.)- এর আনুগত্য করা।

কোরআন অন্যত্র বলেছে, "মদীনার কিছু লোক নিফাকের মধ্যে চরমভাবে নিমজ্জিত রয়েছে, আপনি তাদের চিনেন না কিন্তু আমরা তাদের চিনি। তাদের মধ্যে গোয়েন্দা ও হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিরা মুসলমানদের অকল্যাণের সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়।" কুরাইশ ও অন্যান্য আরব আলীর প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ করত এজন্য যে, আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ হতে আলীকে এতটা দিয়েছেন যে, ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ্, তাঁর নবী (সা.) ও পূর্ববর্তী সৎ

কর্মশীলদের নিকট তাঁর মর্যাদা এত অধিক ছিল যে, তাঁর সমসাময়িক কেউ সে পর্যায়ে পৌঁছতে পারে নি। তাঁর সমবয়সী ও সমপর্যায়ের ব্যক্তিরা সে অবস্থানে পৌঁছানোর ব্যাপারে হতাশ ছিল। বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অগ্রগামিতার কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে এমন স্থান তিনি লাভ করেছিলেন যা অন্যরা আকাঙ্ক্ষা করত ও মনে মনে তার লালসা পোষণ করত। এ কারণে অনেক মুনাফিকের অন্তরে হিংসার আগুন লে উঠেছিল। তারা প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় বিদ্রোহী, ধর্মচ্যুত, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। নবী (সা.)- এর নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে ও পেছনে ফেলে তারা এ হাদীসগুলোকে বিস্মৃতির অন্তরালে ঠেলে দিতে চেয়েছিল। কবির ভাষায়-

যা চলে গেছে তার আর স্মরণ করবো না

এ বিষয়ে ভাল ধারণা পোষণ কর ও কোন প্রশ্ন কর না।

কুরাইশরা ও অন্যান্য আরবরা এতেও খুশী হয়েছিল যে, খেলাফত তাদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হবে এবং এ লক্ষ্যে তারা কাজও শুরু করেছিল। প্রথম পর্যায়ে তারা প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং এ হাদীসগুলোকে বিস্মৃতির মূলে ঠেলে দেয়ার জন্য পরস্পর পরিকল্পনা করে। প্রথম দিনই তারা রাসূল (সা.)- এর প্রতিনিধিকে খেলাফত হতে বঞ্চিত করে ও নিজেদের খেলাফতের পথকে সুগম করার লক্ষ্যে খেলাফতকে নির্বাচন ও রায়ের দিকে ঠেলে দেয় যাতে করে প্রত্যেক গোত্রই পরবর্তী সময়ে খেলাফতের স্বাদ পেতে পারে। যদি তারা কোরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করে আলী (আ.)- কে রাসূল (সা.)- এর পর খলীফা হিসেবে মেনে নিত তাহলে খেলাফত রাসূল (সা.)- এর পবিত্র আহলে বাইতের বাইরে কখনোই যেত না। যদিও রাসূল (সা.) গাদীর দিবসে ও অন্যান্য সময়েও আহলে বাইতকে কোরআনের পাশাপাশি সমমর্যাদা দান করে কিয়ামত পর্যন্ত মুমিনদের ইমাম বলে ঘোষণা করেছিলেন তদুপরি আরবরা খেলাফতকে নবীর পরিবারের জন্য মেনে নিতে পারে নি, বরং সকল গোত্রই এর প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ও এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করেছিল।

لقد هزلت حتّى بدأ من هزالها

এতটা শীর্ণ হয়ে পড়েছিল যে, তার হাড়গুলোও দেখা যাচ্ছিল

كلا ها و حتّى استامها كل مفلس

এমন কি চরম দরিদ্র ব্যক্তিটিও তা ক্রয়ের আশায় দাম জিজ্ঞেস করছিল।

অর্থাৎ খেলাফতকে এমন অবস্থায় ফেলা হয়েছিল যে, সকলেই লোভাতুর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছিল।

যাঁরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরব ও কুরাইশদের ইতিহাস ভালভাবে অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা জানেন, তারা বনি হাশিমের নবুওয়াতকে ততক্ষণ পর্যন্ত মেনে নেয় নি যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়েছে ও প্রতিরোধের আপাত কোন শক্তি ছিল না। সুতরাং কিভাবে সম্ভব তারা বনি হাশিমে নবুওয়াত ও খেলাফতের সমন্বয়কে মেনে নেবে? ইবনে আব্বাসের সাথে কথোপকথনের এক পর্যায়ে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, "কুরাইশ চায় নি নবুওয়াত ও খেলাফত দু'টিই তোমাদের মধ্যে চলে যাক আর তোমরা মানুষের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ কর।"[৪৭৮]

২। এ সকল সাহাবীর পক্ষে নবীর নির্দেশের ওপর টিকে থাকা সম্ভব হয় নি। এ নির্দেশের ওপর দৃঢ়তা প্রদর্শন না করা ইসলাম হতে ফিরে যাবার শামিল হলেও তাঁরা তা করেন নি। তাঁরা বিভেদের মন্দ পরিণতির ভয়ও করছিলেন, বিশেষত রাসূলের ওফাতের পর অনেকেই নিজেদের নিফাককে প্রকাশ করেছেন। তখন মুনাফিকদের অবস্থান সুদৃঢ়, কাফিররা বিদ্রোহী, দীনের ভিত প্রকম্পিত ও মুসলমানদের হৃদয় স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছিল। মুসলমানরা নবী (সা.)- এর ওফাতের পর ঝড় দ্বারা আক্রান্ত একপাল মেষের মত হয়েছিল যারা গভীর রাত্রিতে ভয়ঙ্কর ও হিংস্র নেকড়ের পালের মধ্যে পড়েছে। মদীনার আশেপাশের অনেক গোত্র মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল ও কেউ কেউ ধর্মত্যাগের সি ান্ত নিয়েছিল যা আমরা বিরাশিতম পত্রে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি।

এমন পরিস্থিতিতে হযরত আলী (আ.) জনগণকে নিয়ে বিদ্রোহ করলে ফিতনা- ফ্যাসাদ বৃি পেত ও ইসলামী রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙ্গে পড়ত। সাধারণ মুসলমানদের মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল তা আমরা পূর্বেই বলেছি। মুনাফিকরাও ক্ষোভ ও রাগে আঙ্গুল কামড়াচ্ছিল, সেই সাথে মুরতাদ ও

ধর্মত্যাগীরা সুযোগ খুঁজছিল আর কাফির জাতিসমূহের অবস্থাও পূর্বেই সুস্পষ্ট ছিল। এদিকে আনসাররা মুহাজিরদের বিরোধিতা করছিল ও এ দাবী করছিল যে, দুই খলীফার একজন মুহাজির হতে ও একজন আনসার হতে। তাই হযরত আলী (আ.) খেলাফত হতে মুখ ফিরিয়ে দীনের বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন খেলাফতের পেছনে এখন ছুটলে আল্লাহর দীন ও রাসূল (সা.)- এর উম্মত ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। ইসলামের টিকে থাকা ও সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই তিনি নিজ অধিকার ত্যাগ করে খেলাফতের দাবী হতে সরে আসেন, তবে তিনি নিজ অধিকার সমুন্নত রাখা ও নিজের যৌক্তিক অবস্থানকে প্রমাণের লক্ষ্যে বাইয়াত হতে ততক্ষণ বিরত থাকেন যতক্ষণ না তাঁকে জোরপূর্বক বাইয়াতের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি যদি প্রথমেই বাইয়াত করতেন তবে তাঁর দাবী প্রমাণিত হত না এবং তাঁর ইমামতের বিষয়টিও পরিষ্কার হত না। তিনি তাঁর এ কর্মের মাধ্যমে দীন এবং খেলাফত ও মুমিনদের নেতৃত্বের দাবীর মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর এ ভূমিকা তাঁর বু মত্তা, চিন্তার গভীরতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, হৃদয়ের প্রশস্ততা ও ব্যক্তি অধিকারের ওপর সামাজিক কল্যাণের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ। জগতে এমন ব্যক্তি বিরল যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে দীনের ক্ষেত্রে এরূপ সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করেও নিজ অধিকারের দাবী হতে বিরত হন। অবশ্য তাঁর এ আত্মত্যাগ অত্যন্ত লাভজনক ও কল্যাণময় হয়েছিল এজন্য যে, এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর অধিকতর নৈকট্য লাভ করেছেন।

কিন্তু প্রথম তিন খলীফা ও তাঁদের সহযোগীরা খেলাফত সংক্রান্ত কোরআন- সুন্নাহর দলিলসমূহকে নিজ রাজনৈতিক স্বার্থেই ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতেন এবং এক্ষেত্রে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই। কারণ যে সকল দলিল শাসনকর্তা নিয়োগ, রাষ্ট্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত ছিল সে সকল বিষয়ে তাঁরা ব্যক্তিগত মত ও ইজতিহাদের ওপর আমল করতেন এবং নিখাদ দীনি বিষয়গুলোর মত এগুলোকে দেখতেন না। এ সম্পর্কিত হাদীসের মূল্য তাঁদের নিকট তেমন না হওয়ায় এগুলোর বিরোধিতা তাঁদের জন্য সহজ ছিল। এজন্য ক্ষমতারোহণের পর কঠোর সি ান্তের মাধ্যমে তাঁরা এ হাদীসগুলোকে বিস্মৃতির দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন এবং যে কেউ এ

সকল হাদীসের উ ৃতি দিত তাদের সাথে কঠোর আচরণ করা হত। যখন তাঁরা রাষ্ট্রকাঠামোর সংরক্ষণের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন, অন্য রাষ্ট্র জয় করলেন তখন মুসলমানদের অর্থ, ক্ষমতা ও প্রভাব বৃ করলেন অথচ নিজেরা দুনিয়ায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে বিরত থাকলেন। তাঁদের কর্ম প্রশংসিত হলো, তাঁদের স্থান সুউচ্চ ও দৃঢ় হলো এবং সাধারণ মুসলমানরা তাঁদের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করতে লাগল ও তাঁদের অন্তর শাসকদের প্রতি ঝুঁকে পড়ল। ফলে তারাও এই হাদীসগুলোকে ভুলে যেতে লাগল ও শাসকদের পথ ধরল।

এ সকল শাসকের পর আসলো বনি উমাইয়্যা যাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিল আহলে বাইতকে নিশ্চিহ্ন করা এবং এরূপ হাদীসসমূহকে বিলুপ্ত অথবা বিকৃত করা। তদুপরি আমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য পর্যাপ্ত সহীহ ও সুস্পষ্ট হাদীস আমাদের হাতে রয়েছে।

ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়াসসালামু আলাইকুম

শ

পঁচাশিতম পত্র

৭ রবিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ

যে সকল বিষয়ে খলীফারা কোরআন- সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করেন নি তার নমুনা পেশ করার আহবান।

আপনার সর্বশেষ পত্রটি আমার হস্তগত হয়েছে। আপনি আপনার ব্যাখ্যায় সত্যই অলৌকিকত্ব দেখিয়েছেন এবং বিষয়টি পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে তা সর্বোত্তমরূপে উপস্থাপন করেছেন যা পাঠ করে সবাই আশ্চর্যান্বিত হবে। সেই পবিত্র সত্তার প্রশংসা যিনি যুক্তির বৃক্ষের শাখাগুলোকে আপনার জন্য নমনীয় ও সুবচনের চাবি আপনার হাতে অর্পণ করেছেন। এক্ষেত্রেও আপনি এমন চূড়ায় পৌঁছেছেন যে, বিজয়ের মুকুট আপনার শিরে শোভা পাচ্ছে এবং অন্যরা সেখানে পৌঁছার ইচ্ছা করেও পৌঁছতে পারছে না।

আমরা ভেবেছিলাম যে হাদীসগুলোতে আপনি দলিল উপস্থাপন করেছেন সেগুলোর মধ্যে কোন সমন্বয় নেই এবং সেগুলো হতে বের হবারও সুযোগ নেই।

আফসোস! যদি আপনি যে সকল ক্ষেত্রে তাঁরা সুস্পষ্ট হাদীসের ওপর আমল করেন নি সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করতেন তাতে সঠিক- সরল পথ দৃঢ় যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হত। তাই তাঁদের জীবনী ও ইতিহাস সম্পর্কে আহলে সুন্নাহর হাদীসসমূহ থেকে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্

স

ছিয়াশিতম পত্র

৮ রবিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ

১। বৃহস্পতিবারের কষ্টদায়ক ঘটনা।

২। নবী কেন নির্দেশ দানের পর তা হতে বিরত হলেন?

১। নবী (সা.)- এর নির্দেশ অনুযায়ী আমল (কর্ম সম্পাদন) না করার ঘটনা অসংখ্য। এগুলোর মধ্যে সরচেয়ে প্রসি ও কষ্টদায়ক ঘটনা হলো বৃহস্পতিবারের বেদনাদায়ক ঘটনা।

সহীহ হাদীসগ্রন্থসমূহ ছাড়া অন্যান্য সুনান লেখকগণও এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইতিহাস ও হাদীস বর্ণনাকারীদের সকলেই তা উল্লেখ করেছেন। যেমন বুখারী[৪৭৯] উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ সূত্রে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.)- এর ওফাতের পূর্বে একদল লোক রাসূলের ঘরে সমবেত হয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাবও ছিলেন। রাসূল (সা.) বললেন, هلمّ أكتُبْ لكم كتاباً لا تضلّوا بعده "আন, তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দিয়ে যাব যাতে তারপর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।"[৪৮০] উমর বললেন, "তাঁর ব্যথা তীব্র হয়েছে। তোমাদের নিকট কোরআন রয়েছে। আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট।" তখন উপস্থিত জনতার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলো ও পরস্পর বিতর্ক শুরু করল। কেউ কেউ বলল, "কাগজ নিয়ে এসো। নবী (সা.) এমন কিছু লিখে দিয়ে যাবেন যাতে আমরা বিচ্যুত না হই।" কেউ কেউ উমরের কথা পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। যখন বিতর্ক তীব্র হলো তখন রাসূল (সা.) বললেন, "তোমরা এখান থেকে চলে যাও।"

ইবনে আব্বাস প্রায়ই বলতেন, "বিপদ তখন থেকেই শুরু হয়েছে যখন বিতর্ক ও চিৎকারের মাধ্যমে রাসূল (সা.)- কে লিখা হতে বিরত রাখা হলো।"

এ হাদীসটি সহীহ হাদীসসমূহের অন্তর্ভুক্ত ও এর বিশু তার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বুখারী[৪৮১] তাঁর 'সহীহ'-এর কয়েক স্থানে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিম তাঁর 'সহীহ'তে[৪৮২]'ওয়াসাইয়া' অধ্যায়ের শেষে এটি এনেছেন।

আহমাদ তাঁর মুসনাদে[৪৮৩] ও অন্যান্য সুনান লেখকগণ তাঁদের গ্রন্থে ইবনে আব্বাস হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা হুবহু শাব্দিক বর্ণনা না করে ভাবগত বর্ণনা করেছেন। কারণ হযরত উমর যে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তা হলো إِنَّ النَّبِيَّ يَهجر 'নবী প্রলাপ বকছেন' কিন্তু তাঁরা বলেছেন اِنَّ النَّبِيّ قَدْ غَلَبَ عَليهِ الوجع 'নবীর ব্যথা তীব্র হয়েছে'। এভাবে তাঁরা চেয়েছেন কথাটির কর্কশতাকে কমিয়ে সাধারণ পর্যায়ে আনতে। আমাদের দাবীর পক্ষে প্রমাণ হলো আবু বকর আহমাদ ইবনে আযীয জাওহারীর 'আসসাকিফা' গ্রন্থ[৪৮৪] যেখানে তিনি ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, "নবীর ওফাতের পূর্বে ঘরে বেশ কিছু লোক সমবেত হয়েছিলেন এবং উমর ইবনে খাত্তাব তাঁদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। রাসূল (সা.) বললেন : কাগজ ও কলম নিয়ে আস। আমি তোমাদের জন্য এক পত্র লিখে দিয়ে যাব যাতে তোমরা কখনো বিপথগামী না হও। উমর তখন এমন এক কথা বললেন যার ভাবার্থ নবীর ব্যথা প্রকট হয়েছে, আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব রয়েছে তাই যথেষ্ট (حسبنا كتابُ الله)। তখন নবীর গৃহে অবস্থানরতদের মধ্যে দ্ব দেখা দিল। কেউ বলতে লাগলেন কাগজ ও কালি আন, নবী কিছু লিখে দিয়ে যাবেন। কেউ কেউ উমরের কথার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। বিতর্ক তীব্র হলে নবী (সা.) রাগান্বিত হয়ে বললেন : সকলেই উঠে পড়।" সুতরাং স্পষ্ট বুঝতে পারছেন হযরত উমরের উচ্চারিত শব্দ নয়, বরং তাঁরা ভাবার্থ এনেছেন। যে সকল হাদীসবেত্তা রাসূল (সা.)- এর বক্তব্যের বিরোধিতাকারীর নাম উল্লেখ করেন নি তাঁরা মূল শব্দটি তাঁদের বর্ণনায় এনেছেন। যেমন বুখারী তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থের 'কিতাবে জিহাদ ও সাইর'-এর 'জাওয়াযুল ওফাদ' অধ্যায়ে কাবিছা সূত্রে ইবনে উয়াইনা হতে, তিনি সালমান আহ্ওয়াল হতে, তিনি সাঈদ ইবনে যুবাইর হতে বর্ণনা করেছেন, "ইবনে আব্বাস আফসোস করে বললেন :

يوم الخميس و ما يوم الخميس ثمّ بکی حتّی خضب دمْعه الحصباء বৃহস্পতিবার! হায় কি বৃহস্পতিবারই! অতঃপর তিনি এত অধিক ক্রন্দন করলেন যে, তাঁর গণ্ডদেশ ভিজে গেল। কিছুক্ষণ পর বললেন : বৃহস্পতিবার নবীর ব্যথা তীব্র হলে তিনি বললেন : কাগজ নিয়ে আস, আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দেব যাতে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট না হও। তখন উপস্থিতরা বিতর্কে লিপ্ত হলে একজন বলল : هجر رسول الله নবীর বুদ্ধি বৃত্তি লোপ পেয়েছে। নবী (সা.) বললেন :

دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه আমাকে আমার অবস্থায় ত্যাগ কর। তোমরা আমাকে যার দিকে আহবান কর তা হতে আমি উত্তম অবস্থায় রয়েছি।"[৪৮৫] মহানবী (সা.) ওফাতের সময় তিনটি বিষয়ে ওসিয়ত করে গিয়েছেন : মুশরিকদের আরব উপদ্বীপ হতে বহিষ্কার করা, মদীনায় আগত অতিথিদের উপঢৌকন দেয়া এবং তৃতীয় বিষয়টি ভুলে গিয়েছেন বলে রাবী উল্লেখ করেছেন।[৪৮৬] মুসলিম এ হাদীসটি তাঁর 'সহীহ'- এর 'কিতাবুল ওয়াসিয়াহ্' অধ্যায়ের শেষে ও আহমাদ তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২২ পৃষ্ঠায় ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি নকল করেছেন।

মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থের 'কিতাবুল ওয়াসিয়াহ্' অধ্যায়ে সাঈদ ইবনে যুবাইর হতে অন্য একটি সূত্রে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, "বৃহস্পতিবার! কি বৃহস্পতিবারই!" অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁর চক্ষু হতে অশ্রু মুক্তদানার মত গলদেশ বেয়ে পড়তে লাগল এবং বললেন, "নবী বলেছিলেন : ভেড়ার কাঁধের হাড় বা কাগজ ও কালি নিয়ে আস, আমি এমন কিছু লিখে দিয়ে যাব তার পর আর কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তখন কেউ কেউ বললেন : إنّ رسول الله يَهجر রাসূল প্রলাপ বকছেন।"[৪৮৭] যদি বৃহস্পতিবারের এই বড় মুসিবতের ঘটনা কেউ পর্যালোচনা ও অধ্যয়ন করে তার নিকট সুস্পষ্ট হবে 'রাসূল প্রলাপ বকছেন' কথাটি উমর ইবনে খাত্তাবই প্রথম বলেছেন। অন্যান্যরা তারপর এ কথার পুনরাবৃত্তি করেন। কারণ প্রথম হাদীসটিতে[৪৮৮] লক্ষ্য করেছেন ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'যাঁরা রাসূলের গৃহে ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিতর্ক ও দ্ব সৃষ্টি হলো। কেউ কেউ বলছিলেন কাগজ আন নবী তোমাদের

জন্য এমন কিছু লিখে দিয়ে যাবেন যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। কেউ কেউ উমরের কথার পুনরাবৃত্তি করছিলেন অর্থাৎ বলছিলেন নবীর বু বৃত্তি লোপ পেয়েছে, তিনি প্রলাপ বকছেন'। (নাউযুবিল্লাহ্)

তাবরানী তাঁর 'আওসাত' গ্রন্থে উমর ইবনে খাত্তাব[৪৮৯] হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেখানে উল্লিখিত হয়েছে- যখন নবী (সা.) অসুস্থ হলেন তখন বললেন : কালি ও কাগজ নিয়ে আস, আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দিয়ে যাব যাতে পরবর্তীতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। পর্দার আড়াল হতে মহিলারা বললেন : তোমরা শুনতে পাচ্ছ না, নবী কি বলছেন? উমর বলেন, "আমি বললাম, তোমরা নারীরা হযরত ইউসুফের নারীদের ন্যায়। যখনই নবী অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তোমরা চোখের ওপর চাপ দিয়ে কাঁদার চেষ্টা কর আর যখন তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন তোমরা তাঁর ঘাড়ে চেপে বস।" নবী (সা.) এ কথা শুনে বললেন, "তারা তোমার থেকে উত্তম। তাদেরকে কিছু বল না (دعوهنّ فإنّهنّ خير منكم)।"

এখানে লক্ষ্য করুন তিনি সুন্নাহর অনুবর্তী না হয়ে বিরোধিতা করেছেন। যদি তিনি এক্ষেত্রে অনুবর্তী হতেন তাহলে পথভ্রষ্টতা হতে রক্ষা পেতেন। আফসোস যদি তিনি অনুসরণ হতে বিরত থেকেই স্তব্ধ হতেন! কিন্তু তিনি তা না করে বিরোধিতা করে বলেছেন حسبنا كتاب الله 'আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট'। যেন নবী (সা.) তাঁদের মাঝে আল্লাহর কিতাবের অবস্থান সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এবং তাঁরা নবী অপেক্ষা কোরআনের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত। এরপরও যদি ক্ষান্ত হতেন ও নবীকে চরম অসন্তুষ্ট না করে বলতেন 'তিনি প্রলাপ বকছেন'। নবীর বিদায় মুহূর্তে ও জীবন সায়াহ্নে এমন শব্দ ব্যবহার করে তাঁর হৃদয়কে যদি ক্ষতবিক্ষত না করতেন!

তাঁদের এ কর্ম হতে মনে হয় যদিও তাঁরা বলেছেন 'আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট' তদুপরি তাঁরা শুনেন নি আল্লাহর কিতাব সর্বক্ষণ আহবান করে বলছে,

(ما آتیکم الرَّسولُ فَخُذُوه و ما نَهاکُم عَنْه فانتهوا) “নবী তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যে বিষয় হতে তোমাদের নিষেধ করেন তা হতে বিরত হও।” (সূরা হাশর : ৭)

‘নবী প্রলাপ বকছেন’ কথাটি বলার সময় তাঁরা বোধ হয় কোরআনের এ আয়াতটি ভুলে গিয়েছিলেন-

এ বাণী সম্মানিত রাসূলের যিনি শক্তিমান ও আরশের অধিপতির নিকট বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। আসমানসমূহে তাঁর আনুগত্য করা হয় এবং তিনি বিশ্বস্ত। তোমাদের বন্ধু (মহানবী) উম্মাদ নন। (সূরা তাকভীর : ২২)

তাঁরা কোরআনের এ আয়াতটিও কি পড়েন নি যেখানে বলা হয়েছে-

”নিশ্চয়ই এটি সম্মানিত রাসূলের বাণী এবং এটি কোন কবির কথা নয়। তারা কমই ঈমান আনে। এটি কোন গণকের কথাও নয়। কত কম তারা উপদেশ গ্রহণ করে! এটি মহান বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ।“ (সূরা হাক্কাহ্ : ৪০- ৪৩)

যেন তাঁরা কোরআনের এ আয়াতটিও অধ্যয়ন করেন নি যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন,

“তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট নন ও তিনি বিচ্যুতও হন নি। তিনি প্রবৃত্তি হতেও কিছু বলেন না। তিনি যা বলেন তা তাঁর ওপর অবতীর্ণ ওহী বৈ কিছু নয় যা শক্তিশালী ফেরেশতা তাঁকে শিক্ষাদান করে।” (সূরা নাজম : ২- ৫)

যেন তাঁরা কোরআনের এরূপ অন্যান্য সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বণ করেন নি যেখানে বলা হয়েছে- “নবী নি াপ, তাঁর কথা প্রলাপ নয়, চিন্তা ও যুক্তি ব্যতীত তিনি কথা বলেন না।” তদুপরি আমাদের বুি বৃত্তিও এটি স্বীকার করে যে, নবী (সা.) মাসুম বিধায় বৃথা ও অযথা কথা বলেন না। তাই সত্য এই যে, তাঁরা জানতেন নবী (সা.) খেলাফতের প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ় ও আহলে বাইতের ইমামদের সর্বজনীন নেতৃত্বকে সুন্নাহর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিশেষত আলী (আ.)- এর অভিভাবকত্ব ও স্থলাভিষিক্ত হবার বিষয়টিকে তাগিদের জন্য তেমনটি করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁরা রাসূলকে এ কাজ হতে বিরত থাকতে বাধ্য করেন। দ্বিতীয় খলীফার সাথে ইবনে আব্বাসের কথোপকথন হতে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়।[৪৯০]

আপনি যদি নবীর ايتوني أكتب لكم كتابا لن تضلّوا بعده 'আমার জন্য কালি ও কাগজ আন, আমি এমন কিছু লিখে দিয়ে যাব যার পর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না' এ হাদীসটির সাথে হাদীসে সাকালাইনকে অর্থাৎ إنِّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لنْ تضِلوا : كتاب الله و عترتي أهل بيتي 'আমি তোমাদের মাঝে যে বস্তু রেখে যাচ্ছি যদি তা তোমরা আঁকড়ে ধর কখনোও পথভ্রষ্ট হবে না : আল্লাহর কিতাব ও আমার রক্ত সম্পর্কীয় আহলে বাইত' মিলিয়ে দেখেন তাহলে লক্ষ্য করবেন এ দুই হাদীসের লক্ষ্য একই এবং নবী (সা.) তাঁর অসুস্থতার সময় হাদীসে সাকালাইনে যা উম্মতের জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে চেয়েছিলেন।

২। কিন্তু কেন পরবর্তীতে তিনি লেখা হতে বিরত হলেন? এর জবাবে বলব ঐ সকল ব্যক্তির পক্ষ হতে তাঁর নামে যে কথাগুলো বলা হয়েছিল তাতে তিনি বাধ্য হন লেখা হতে বিরত থাকতে। কারণ এরূপ কথার পর তাঁর লেখা ফিতনা ও বিভেদ ছাড়া অন্য কোন ভূমিকা রাখতে পারত না এজন্য যে, তাঁর লেখা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠত রাসূল (সা.) নাউযুবিল্লাহ্ হয়তো ঘোরের মধ্যে প্রলাপ বকছিলেন যেহেতু তাঁর বু বৃত্তি তখন লোপ পেয়েছিল। এটি অসম্ভব কোন কথা ছিল না, কারণ রাসূলের সামনে যখন এরূপ কথা বলা হয়েছে তখন রাসূলের ওফাতের পর তা বলা আরো স্বাভাবিক। তাই রাসূল (সা.)- এর জন্য 'তোমরা সকলেই উঠে পড়' বলা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। যদি নবী লেখার বিষয়ে নাছোড়বান্দা হতেন তাহলে তারাও নবীকে প্রলাপ বকছেন বলে গোঁয়ারতুমি করত এবং তাঁদের পক্ষের লোকেরা শেষ জীবনে নবী পাগল হয়ে গিয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ্) বলে প্রচারের জন্য উঠে পড়ে লাগত এবং নবীর কথাকে খণ্ডনের জন্য গ্রন্থসমূহ রচনা করত এবং যাঁরা সে হাদীসের ওপর নির্ভর করতেন তাঁদের যুক্তিকে এভাবে অগ্রাহ্য করত। তাই মহানবী (সা.)- এর সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা তাঁকে লেখা হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয় যাতে তাঁর নবুওয়াতের ওপর কোন আঘাত না আসে। অন্যদিকে নবী (সা.) জানতেন আলী (আ.), তাঁর অনুসারী ও বন্ধুরা যাঁরা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, তাঁরা এ লেখার বিষয়বস্তুর প্রতি অনুগত যদিও অন্যরা তা গ্রহণযোগ্য মনে করে আমল করবে না। সুতরাং এরূপ পরিস্থিতিতে বু বৃত্তি (আকল)

না লেখার পক্ষেই মত দেয় কারণ লেখা সে পরিস্থিতিতে বিভেদ ছাড়া অন্য কিছুর জন্ম দিত না এ সত্য সকলের নিকট স্পষ্ট।

ওয়াসসালাম

শ

সাতাশিতম পত্র

৯ রবিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ

ঘটনাটির ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা

সম্ভবত নবী (সা.) যখন কাগজ ও কালি আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা কিছু লিখবার জন্য নয়, বরং সাহাবীদের পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে চেয়েছিলেন তাঁদের চিন্তাগত অবস্থান কতটা উন্নত হয়েছে এবং তাঁরা কি বুঝতে পেরেছেন নবী (সা.) সব কিছু বর্ণনা করে ফেলেছেন। মহান আল্লাহ্ হযরত উমরকে হেদায়েত করেছেন এভাবে যে, তিনি এটি বুঝতে পেরে বলেছেন 'আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট' কিন্তু অন্যরা তা বুঝতে পারেন নি।

সুতরাং কলম ও কাগজ আনার বিরোধিতাকে আল্লাহর নির্দেশের পক্ষে হযরত উমরের অবস্থান বলে তাঁরা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কিন্তু ন্যায়ত لا تضلّوا بعده 'এরপর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না' বাক্যটি কাগজ ও কালি আনার লক্ষ্যকে বর্ণনা করছে। তাই এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। সেক্ষেত্রে হাদীসটির অর্থ হবে 'যদি কাগজ ও কলম আন তাহলে আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখব যে তোমরা কখনো বিপথগামী হবে না'।

তাই পরীক্ষার জন্য রাসূল (সা.) এমনটি বলেছেন বলে ব্যাখ্যা দেয়া হলে তা সুস্পষ্ট মিথ্যা হবে। তদুপরি নবীগণ এরূপ করতে পারেন না। তাঁরা যে বলেছেন, 'কাগজ ও কলম না আনা আল্লাহর নির্দেশের পক্ষে কাজ করার সামিল' আমি এ কথাটিরও বিরোধী তবে আমার দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে ভিন্ন। তাঁদের অনেকেই বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, মহানবী (সা.)- এর নির্দেশ এ বাক্যে ফরয বলে গণ্য ছিল না যে, তা পালন না করা হারাম হবে। তাই তা অগ্রাহ্য করলে বা সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করলে গুনাহগার হবার সম্ভাবনা ছিল না বিধায় এক্ষেত্রে কেউ কোন মন্তব্য করলে তা পরামর্শ বলে গৃহীত হবে এবং নবী (সা.) তখন সাহাবীদের সাথে কথোপকথন করছিলেন ও হযরত উমর তা সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন বলেই আল্লাহর পক্ষ হতে

ইলহামপ্রাপ্ত হয়ে তা বলেছিলেন যাতে কঠিন অসুস্থতা ও তীব্র ব্যথায় রাসূলের ওপর পত্র লেখার কঠিন কষ্ট আপতিত না হয়। এ জন্যই কালি ও কাগজ আনতে তিনি নিষেধ করেছেন।

তাছাড়া এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তিনি ভেবেছেন নবী (সা.) এমন কিছু লিখে দিয়ে যাবেন যা পালনে মানুষ অক্ষম হবে ফলে শাস্তি তাঁদের জন্য অবধারিত হয়ে যাবে কারণ সুস্পষ্ট হাদীস চলে আসলে ইজতিহাদ করার সুযোগ থাকবে না।

সম্ভবত হযরত উমর ভয় পেয়েছিলেন মুনাফিকরা রাসূলের অসুস্থ অবস্থায় লিখিত পত্রের বিষয়ে প্রশ্ন তুলে ফিতনার সৃষ্টি করবে, তাই বলেছেন حسبنا كتاب الله ‘আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট’। যেহেতু আল্লাহ্ বলেছেন ‘আমি কোরআনে কোন কিছুই পরিত্যাগ করি নি এবং বিদায় হজ্বে ঘোষণা করেছেন (اليوم أكملت لكم دينكم) ‘এদিন আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম’ সেহেতু তিনি মনে করেছেন দীনের পূর্ণতার মাধ্যমে পথভ্রষ্টতার পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং পথভ্রষ্টতা হতে রক্ষার জন্য নতুন কিছুই লিখার প্রয়োজন নেই।

উপরোক্ত যুক্তিসমূহ আহলে সুন্নাহর আলেমদের হতে উপস্থাপিত হয়েছে এবং সবগুলোতেই সমস্যা রয়েছে। যেহেতু لا تضلّوا বাক্যটি হতে বোঝা যায় সেটি ফরয ছিল যা ত্যাগ করা হারাম বলে গণ্য ছিল। এমন কর্ম যা বিচ্যুতি হতে রক্ষার কারণ ক্ষমতা থাকলে তা পালন করা নিঃসন্দেহে ওয়াজিব। ‘তোমরা উঠে যাও’ নবীর এ কথা হতে বোঝা যায় তাঁর নির্দেশ পালন না করায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর নির্দেশটি পরামর্শমূলক নয়, বরং অবশ্য পালনীয় ছিল।

সম্ভাবনা রয়েছে কেউ হয়তো এর প্রতিবাদে বলতে পারে বিষয়টি ফরয হলে নবী (সা.)নিজে তা করা হতে বিরত থাকতেন না যেমনভাবে তিনি কাফিরদের বিরোধিতা সত্ত্বেও দীনী দাওয়াতের কাজ হতে বিরত হন নি।

এর উত্তরে বলা যায় এ কথাটি সঠিক হলেও এ থেকে একটি বিষয়ই শুধু পরিষ্কার হয় তা হলো নবী (সা.)- এর ওপর লিখা ফরয ছিল না এবং তাঁদের ওপর কাগজ ও কালি আনা ওয়াজিব হবার সাথে এর কোন বিরোধিতাও নেই। কারণ রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়ে এর পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন

করেছেন যে, এ কাজ তাঁদের চিরতরে পথভ্রষ্টতা হতে রক্ষা করবে এবং চিরন্তন হেদায়েতের দিকে পরিচালিত করবে। কোন কর্মের ক্ষেত্রে নির্দেশিত ব্যক্তির জন্য তা পালন অপরিহার্য, নিদের্শদাতার ওপর নয়, বিশেষত নির্দেশিত বিষয়ের কল্যাণ যদি নির্দেশিতদের জন্যই হয়ে থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে দায়িত্ব অবশ্য পালনীয় হিসেবে নবী (সা.)- এর ওপর নয়, বরং উপস্থিত ব্যক্তিদের ওপর প্রযোজ্য হয়।

তদুপরি যদি নবীর ওপরও কাজটি অপরিহার্য হত তবে 'নবী প্রলাপ বকছেন' উপস্থিত ব্যক্তিদের এরূপ মন্তব্যের পর তাঁর ওপর কর্মটির অপরিহার্যতা আর থাকে না কারণ তা ফিতনা ছাড়া অন্য কিছুর জন্ম দেবে না।

অনেকে বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন- হযরত উমরের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার ছিল না যে, এ লেখা সকল উম্মতকে বিচ্যুতি ও পথভ্রষ্টতা হতে রক্ষা করবে এবং এরপর কেউই পথভ্রষ্ট হবে না, বরং হযরত উমর মনে করেছিলেন 'পথভ্রষ্ট হবে না' অর্থ সকল উম্মত পথভ্রষ্টতার ওপর একতাব হবে না ও বিচ্যুতির বিষয়টি সকলকে আক্রান্ত করবে না। যেহেতু হযরত উমর পথভ্রষ্টতার ওপর সকলেরই একমত হওয়া সম্ভব নয় বলে জানতেন সেহেতু লেখার কোন প্রয়োজনীয়তা তিনি দেখেন নি এবং নবীর এ কর্মকে উম্মতের প্রতি তাঁর অত্যধিক ভালবাসা হতে নিঃসৃত মনে করেছেন যার কারণে নবী (সা.) সতর্কতামূলকভাবে এ পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিলেন। এ কারণেই নিজ মতানুযায়ী নবীকে উদ্দেশ্য করে পূর্বোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন। এক্ষেত্রে রাসূলের নির্দেশ ওয়াজিব না হয়ে ভালবাসাপ্রসূত বলে গণ্য হবে।

উপরোক্ত বিভিন্ন মতামতের মাধ্যমে আহলে সুন্নাহর আলেমরা চেয়েছেন বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে। কিন্তু যে কেউ রাসূল (সা.)- এর হাদীসটি পড়বে তাতে নিশ্চিত হবে যে, এ ব্যাখ্যাগুলো সত্য হতে দূরে। কারণ 'তোমরা গোমরাহ হবে না' কথাটি হতে যেমন কাজটি ফরয বলে প্রতীয়মান হয় তেমনি নবী (সা.)- এর অসন্তুষ্টিও প্রমাণ করে যে, একটি ফরয কাজ পরিত্যাগ করা হচ্ছে।

সুতরাং এক্ষেত্রে সর্বোত্তম জবাব হলো এটি এমন একটি বাস্তব ঘটনা যা আকস্মিক ও ব্যতিক্রমীরূপে তার মূল থেকে বেড়িয়ে এসেছে। ঘটনাটি তাঁদের জীবন প তির বিপরীতে সংঘটিত হয়েছিল বলে প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্ই সত্যপথের হেদায়েতকারী।

ওয়াসসালাম

স

আটাশিতম পত্র

১১ রবিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ

এ যুক্তি অগ্রহণযোগ্য।

যে কেউ পূর্ণ ঈমান ও ন্যায়সহ বিচার করবে সে সঠিক কথাটিই বলবে ও ন্যায়ের পক্ষে রায় দেবে।

এ সকল অপযুক্তির বিপরীতে আপনি যে যুক্তিসমূহ এনেছেন এর বাইরেও অনেক যুক্তি রয়েছে। সেগুলো আপনার সমীপে উপস্থাপন করে বিচারের ভার আপনার ওপরই অর্পণ করছি।

প্রথম উত্তরটিতে তাঁরা বলেছেন নবী (সা.) যখন লেখার জন্য কালি ও কাগজ আনার নির্দেশ দেন সম্ভবত এর মাধ্যমে তিনি তাঁদের পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে আপনি যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি যোগ করতে চাই যে, সে মুহূর্তে নবী (সা.) [আমার পিতামাতা তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত হোক] তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে ও মৃত্যুমূলে ছিলেন তাই সে মুহূর্ত পরীক্ষার মুহূর্ত হতে পারে না, বরং উম্মতকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়ত ও পূর্ণাঙ্গ উপদেশ দেয়ার মুহূর্ত সেটি। তিনি তাঁর সর্বশেষ ওসিয়তের মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করবেন ও নিজ দায়িত্বের ইতি টানবেন এটিই যুক্তিযুক্ত। মৃত্যুমুহূর্তে মানুষ কৌতুক করে না, বরং নিজ ও নিকটবর্তী ব্যক্তি বা আত্মীয়- স্বজনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেয়। আর মৃত্যুগামী ব্যক্তিটি যদি হয় রাসূল (সা.) সেক্ষেত্রে এটি আরো অধিক প্রযোজ্য।

যে নবী তাঁর সমগ্র জীবনের সুস্থতার সময় এভাবে তাঁদের পরীক্ষার সুযোগ পান নি মৃত্যুমুহূর্তে কিভাবে তাঁর পক্ষে তা সম্ভব? তাঁদের বিতর্কের কারণে নবী (সা.)- এর অসন্তুষ্টিও এ বিষয়টি পরিষ্কার করে। নবীর নির্দেশের বিরোধিতার মাধ্যমে তাঁরা সত্যপথ অবলম্বন করে থাকলে নবী এ বিরোধিতায় খুশি ও সন্তুষ্ট হতেন। যে কেউ হাদীসটিকে ভালভাবে লক্ষ্য করলে 'নবী প্রলাপ বকছেন' কথাটি হতে নিশ্চিত হবেন যে, তাঁরা জানতেন নবী (সা.) যে বিষয়ে কথা বলবেন তা তাঁদের পছন্দনীয় নয়। এ জন্যই নবীর বিরু   এ ধরনের কথা বলে তাঁরা দ্ব ময় ও বিশৃঙ্খল

পরিবেশের সৃষ্টি করেন। ইবনে আব্বাসের ক্রন্দনও ঘটনাটিকে বিষাদময় বলে। তাঁর বর্ণনাও তাঁদের এ যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে। অপব্যাখ্যাকারীরা বলেছেন হযরত উমর সঠিক পথ অনুধাবনের বিষয়ে যথার্থ ছিলেন এবং এ বিষয়ে আল্লাহ্ হতে ইলহামপ্রাপ্ত হতেন।

কিন্তু এ কথাটি এমন স্থানে বলা হয়েছে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না, কারণ এক্ষেত্রে কথা বলার অর্থ নবী (সা.) নন বরং হযরত উমর সত্যকে অধিক অনুধাবন করেছেন ও আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত ওহী অপেক্ষা ইলহামের গুরুত্ব বেশী।

তাঁদের একদল আবার বলেছেন হযরত উমর ভালবাসার তাড়নায় রাসূলকে লেখা হতে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন যাতে তাঁর ওপর কষ্ট আপতিত না হয় এবং তিনি ব্যথার তীব্রতায় ক্লান্ত হয়ে না পড়েন। কিন্তু আপনি জানেন বিষয়টি লিখিত হলে নবীর অন্তর পরিতৃপ্ত হত এবং পথভ্রষ্টতা হতে উম্মতের মুক্তি ও নিরাপত্তা তাঁর চক্ষু উ   ল করত। তদুপরি নবীর ইচ্ছা পবিত্র লক্ষ্য হতে উৎসারিত ও অবশ্য পালনীয় বিধায় তা লঙ্ঘনের অধিকার কারো নেই। রাসূল (সা.) কাগজ ও কালি চাইলে তাঁর এ নির্দেশের বিরোধিতা অপরাধ বলে পরিগণিত। কারণ কোরআন বলেছে, "কোন বিষয়ে খোদা ও তাঁর রাসূল ফয়সালা ও নির্দেশ দেয়ার পর কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর এ বিষয়ে কোন এখতিয়ার নেই এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করবে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত।" (সূরা আহযাব : ৩৬)

এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাসূলের বিরোধিতা ও তাঁর সামনে বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ সৃষ্টি নবীর জন্য ওসিয়ত লেখা অপেক্ষা অধিকতর কষ্টদায়ক ছিল। কারণ এ ওসিয়ত উম্মতকে বিচ্যুতি হতে রক্ষা করত। এটি কিরূপে সম্ভব, যে ব্যক্তি রাসূলের লেখার কষ্টকে সহ্য করতে পারেন না তিনি রাসূলের সামনে বললেন 'রাসূলের বু বৃত্তি লোপ পেয়েছে, তিনি প্রলাপ বকছেন'?

যাঁরা উমরের حسبنا كتاب الله 'আমাদের জন্য কোরআনই যথেষ্ট' কথাটির সপক্ষে দলিল হিসেবে কোরআনের (ما فرّطنا في الكتاب من شيء) 'আমরা কোরআনে কোন কিছুই পরিত্যাগ করি নি' এবং (اليوم أكملت لكم دينكم) 'এইদিন আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম' এ

দু'টি আয়াতকে এনেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বলব এ দু'টি আয়াত পথভ্রষ্টতা হতে রক্ষা ও হেদায়েতকে নিশ্চিত করে না। যদি তা হত তবে নবী (সা.) তাঁর সমগ্র প্রচেষ্টাকে এ লেখার জন্য নিয়োজিত করতেন না। যদি কোরআনের অস্তিত্বই পথভ্রষ্টতা হতে রক্ষার জন্য যথেষ্ট হত তাহলে উম্মতের মধ্যে দূর হবার মত নয় এমন বিভেদ সৃষ্টি হত না।[৪৯১]

তাঁদের উ ৃ ত সর্বশেষ উত্তরে আপনি উল্লেখ করেছেন তাঁরা বলেন হযরত উমর এ হাদীস হতে বুঝেন নি এ লেখা প্রত্যেকটি উম্মতকে বিচ্যুতি হতে রক্ষা করবে, বরং তিনি ভেবেছেন এর ফলে উম্মত পথভ্রষ্টতার ওপর একমত হবে না এবং যেহেতু তিনি জানতেন উম্মতের পক্ষে পথভ্রষ্টতার ওপর একমত হওয়া সম্ভব নয় তাই তিনি এরূপ কথা বলে রাসূলকে লেখা হতে বিরত রাখেন।

এ বিষয়ে আপনার উল্লিখিত দিকগুলো ছাড়া অন্যান্য দিকও রয়েছে বিশেষত হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাসূলের বক্তব্য হতে সর্বসাধারণের জন্য সুস্পষ্ট বিষয়টিকে অবশ্যই অনুধাবন করেছিলেন যে, এ লেখা সমগ্র উম্মতকে বিচ্যুতি হতে রক্ষা করবে। কারণ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, শহুরে, গ্রাম্য সকলের চিন্তাবোধে এই অর্থই ধরা দেয়। তাই হযরত উমর নিশ্চিত বুঝেছিলেন রাসূল (সা.) সামষ্টিকভাবে উম্মতের পথভ্রষ্টতার বিষয়ে ভীত ছিলেন না যেহেতু প্রায়শঃই তিনি বিভিন্নভাবে উম্মতের সামষ্টিকভাবে বিচ্যুত হওয়া সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করেছেন, যেমন কখনো বলেছেন, 'আমার উম্মত কখনো পথভ্রষ্টতার ওপর একতাব হবে না', কখনো বলেছেন, 'আমার উম্মত ভুলের ওপর একতাব হবে না', আবার কখনো বলেছেন, 'সব সময়ই আমার উম্মতের এক অংশ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে'। ত প কোরআনেও এসেছে 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম করেছে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পূর্ববর্তীদের ন্যায় তাদেরও পৃথিবীতে নেতৃত্ব দান করবেন এবং তাদের জন্য মনোনীত দীনকে প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় করবেন ও তাদের ভীতিকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে এবং কোন কিছুকেই আমার অংশীদার করবে না।'[৪৯২] সুতরাং কোরআন ও সুন্নাহয় অসংখ্য স্থানে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে সমগ্র উম্মত পথভ্রষ্টতার ওপর ঐক্যব হতে পারে না। তাই কোরআন ও সুন্নাহ্ সুস্পষ্টরূপে যে বিষয়টিকে উম্মতের জন্য প্রত্যাখ্যান করেছে

হযরত উমর উম্মতের জন্য রাসূল (সা.) সে আশঙ্কাই করেছেন মনে করে কাগজ ও কালি আনতে নিষেধ করেছেন এ যুক্তি অপাঙ্ক্তেয়। বরং অন্যরা এ নির্দেশ হতে যা বুঝে হযরত উমরও তাই বুঝেছিলেন। তদুপরি কাগজ ও কালি না আনা ও এ বিষয়ে বিতণ্ডা সৃষ্টির জন্য রাসূল (সা.) তাঁদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছেন, 'সকলেই বেরিয়ে যাও' যা হতে বোঝা যায় তাঁর নির্দেশটি ওয়াজিব বা অবশ্য পালনীয় ছিল। যদি প্রকৃতই হযরত উমর সঠিকভাবে রাসূলের কথা বুঝতে না পেরে এরূপ বলতেন তাহলে রাসূল (সা.) অবশ্যই তাঁকে বুঝাতেন। নবী (সা.) যদি তাঁদের বুঝাতে পারবেন মনে করতেন তবে তাঁদের বেরিয়ে যেতে বলতেন না। ইবনে আব্বাসের দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে ক্রন্দন আমাদের যুক্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করে। ন্যায়ত কোন ব্যাখ্যাই এই শোককে মুছতে পারে না যেমনটি আপনি বলেছেন, 'এটি একটি বিশেষ ও বাস্তব ঘটনা যা আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল।' যদিও একবারই তা ঘটে থাকে তা বিধ্বংসী ও পঙ্গুকারী ছিল। ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ওয়াসসালাম

শ

উননব্বইতম পত্র

১৪ রবিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ

১। ব্যাখ্যাগুলো সঠিক না হবার বিষয়ে স্বীকারোক্তি।

২। সাহাবীগণ কর্তৃক এরূপ ভিন্ন ব্যাখ্যার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোও উল্লেখের আহবান।

১। আপনি অপব্যাখ্যাকারীদের পথ রু করেছেন, তাদের লক্ষ্যের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ রইল না এবং আপনার যুক্তিতে কোন দ্বিধা ও অস্পষ্টতাও রইল না।

২। অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে সাহাবীগণ কোরআন ও সুন্নাহকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেগুলোও উল্লেখ করুন।

ওয়াসসালাম

স

নব্বইতম পত্র

১৭ রবিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ

উসামার সেনাদল

উচ্চৈঃস্বরে সত্যের বাণী প্রচারে যদি মানুষের সমালোচনার ভয় না করেন তবে সত্যই আপনার কথা যথার্থ। আপনি প্রকৃতই বৃক্ষের এক দৃঢ় ও ফলদায়ক শাখা। মানুষ আপনার নিকট আ য় পেতে পারে এবং আপনার কথাও বিশ্বাস করতে পারে, আপনার মত পেলে অন্যদের মতের তারা মুখাপেক্ষী হবে না যেহেতু আপনি সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মি ত করেন না, আপনার সম্মান উচ্চ ও হৃদয় পবিত্র। আপনার আত্মিক পবিত্রতা আপনাকে কলুষতা হতে দূরে রেখেছে। আল্লাহ্ আপনাকে সম্মানিত করুন। আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্রে সাহাবীগণ নিজ মতকে নবী (সা.)- এর নির্দেশের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন সেগুলো উল্লেখ করার। এর উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবে রাসূলের জীবদ্দশায় প্রেরিত সর্বশেষ সেনাদল যা রোমানদের উদ্দেশ্যে উসামা ইবনে যাইদ ইবনে হারেসার নেতৃত্বে প্রেরিত হয়েছিল সে সম্পর্কে বর্ণনা করছি। নবী (সা.) এ সেনাদল প্রেরণের বিষয়টিতে খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং এজন্য সাহাবীদের প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। নবী (সা.) স্বয়ং সাজসর াম ও প্রস্তুতির বিষয়টি তদারকের মাধ্যমে তাঁদের মনোবলকে দৃঢ় করছিলেন। নবী (সা.) আনসার ও মুহাজেরদের সকলকেই, এমন কি হযরত আবু বকর, উমর, [৪৯৩] আবু উবাইদাকেও সেনাদলের সঙ্গে যাত্রার নির্দেশ দেন। একাদশ হিজরীর সফর মাসের ২৫ তারিখে এ ঘটনা ঘটেছিল।

ঐদিন প্রভাতে নবী (সা.) উসামাকে ডেকে বললেন, "তোমার পিতার শাহাদাত স্থানের দিকে অশ্ব নিয়ে রওয়ানা হও। তোমাকে এ সেনাদলের দায়িত্ব দিলাম।[৪৯৪] উবনার[৪৯৫] অধিবাসীদের ওপর প্রত্যুষে আক্রমণ করে তাদের অবরোধ কর। তাদের নিকট এ হামলার খবর পৌঁছার পূর্বেই ত সেখানে পৌঁছাও। যদি তাদের ওপর জয়ী হও তাহলে সেখানে স্বল্পদিন অবস্থান কর। যাত্রার সময় অভিজ্ঞ ও পথ চেনে এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে নাও। অগ্রগামী সৈন্যদের সঙ্গে পূর্বেই

পাহারাদার ও গুপ্তচরদের প্রেরণ কর। ২৮ সফর নবী (সা.)- এর আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা লোপ পেল এবং তিনি প্রচণ্ড মাথা ব্যথা ও রে আক্রান্ত হলেন। ২৯ তারিখে তিনি লক্ষ্য করলেন সেনাদল তাঁর নির্দেশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করছে। এজন্য স্বয়ং সেনাদলের মধ্যে গিয়ে তাঁদের উৎসাহিত করলেন। তাঁদের মনোবলকে দৃঢ় ও উজ্জীবিত করার জন্য নিজ হাতে পতাকা বেঁধে উসামার হাতে দিয়ে বললেন, "আল্লাহর নামে তাঁর পথে যু কর এবং সকল কাফিরকে ঐ এলাকা হতে বহিষ্কার কর।" উসামা পতাকা হাতে মদীনা হতে বের হয়ে বুরাইদার হাতে অর্পণ করেন ও 'জুরফে' ছাউনি ফেলার নির্দেশ দেন। যদিও নবী (সা.) তাঁদেরকে যাত্রার জন্য উপর্যুপরি তাকিদ দিয়েছিলেন তদুপরি তাঁরা নবীর নির্দেশ অমান্য করে সেখানে অপেক্ষা করতে থাকেন। নবী (সা.) তাঁদের বলেছিলেন, 'প্রত্যুষে উবনার অধিবাসীদের ওপর আক্রমণ কর। ত যাত্রা কর যাতে আক্রমণস্থলে খবর পৌঁছার পূর্বেই পৌঁছাতে পার' অথচ অবশ্য পালনীয় ও সুস্পষ্ট এ নির্দেশ সে ও তাঁরা তা পালন করেন নি। নবী (সা.)- এর এ নির্দেশ হতে অবশ্যই তাঁরা ফরয ও ওয়াজিব বুঝেছিলেন, মুস্তাহাব নয়।

সাহাবীদের অনেকেই উসামার সেনাপ্রধান মনোনয়নের বিষয়টিকে উপহাস করেছেন যেমন মুতার যু র সময় উসামার পিতা যাইদকে সেনানায়ক মনোনয়নের বিষয়টিকেও উপহাস ও নবীর নিকট এর তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। এক্ষেত্রেও যখন নবী (সা.) সেনাদলের দায়িত্ব উসামার ওপর অর্পণ করে বললেন 'এই সেনাদলের দায়িত্ব তোমার হাতে অর্পণ করলাম ও তোমাকে সেনাপতি মনোনীত করলাম' এবং অসুস্থ শরীরে পতাকা বেঁধে তাঁর হাতে দিলেন তখনও তাঁরা এর প্রতিবাদ করতে লাগলেন। নবী (সা.) তাঁদের এ আচরণে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে প্রচণ্ড অসুস্থতা[৪৯৬] সে ও (শরীরে প্রচণ্ড র ও মাথা ব্যথা এবং মাথায় রপট্টি বাঁধা ছিল) গৃহ হতে বের হয়ে এসে তাঁদেরকে এ কর্ম হতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। এ ঘটনাটি ১০ রবিউল আউয়াল নবী (সা.)- এর ওফাতের দু'দিন পূর্বে ঘটে। তিনি ঘরে হতে বের হয়ে মসজিদের মিম্বারে গেলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর বললেন, "হে লোকসকল! উসামার সেনাপতিত্বের বিষয়ে এটি কিরূপ কথা যা আমার কানে পৌঁছেছে? এখন তোমরা তার নেতৃত্ব

নিয়ে প্রশ্ন তুলছ, ইতোপূর্বে তোমরা তার পিতার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলে। তার পিতা যেরূপ সেনাপতিত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল সেও অনুরূপ সেনাপতিত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন।” অতঃপর নবী (সা.) তাঁদের যাত্রার জন্য তাকিদ দিলেন এবং সেনাদল জুরফের দিকে যাত্রা করল।

নবী (সা.) চরম অসুস্থতার সময়ও বারংবার বলছিলেন, “উসামার সেনাদলকে সুসজ্জিত হতে বল, তাকে যাত্রা করতে বল, ত গন্তব্যে পৌঁছতে বল।” তদুপরি যাত্রার ক্ষেত্রে তাঁরা গড়িমসি করতে থাকেন। ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার উসামা সেনা ছাউনী হতে রাসূলের সঙ্গে দেখা করতে আসলে রাসূল তাঁকে আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের আশা দিয়ে যাত্রা করার জন্য পুনঃনির্দেশ দিলেন। এ দিনই রাসূল (সা.) ইন্তেকাল করেন। উসামা নবীকে বিদায় জানিয়ে গিয়েও পরে আবু উবাইদা ও হযরত উমরকে নিয়ে ফিরে আসলেন। সেনাদলও মদীনার নিকটবর্তী তিবায় ফিরে আসল। তাঁরা আবু বকরের সঙ্গে পরামর্শ করে সি ান্ত নিলেন যু যাত্রা হতে বিরত থাকবেন যদিও তাঁরা এ বিষয়ে রাসূল (সা.)- এর পুনঃ পুনঃ তাকিদ, ত যাত্রার নির্দেশ, শত্রু অবহিত হবার পূর্বেই ঐ স্থানে পৌঁছানো ও আক্রমণের নির্দেশ শুনেছিলেন। তাঁরা দেখেছেন এ বিষয়ে রাসূলের পক্ষে যা করা সম্ভব তার সবটুকুই তিনি করেছেন। সেনাদলকে সুসজ্জিত করা, উসামাকে প্রয়োজনীয় দিক- নির্দেশনা প্রদান, স্ব হস্তে তাঁর হাতে পতাকা অর্পণ এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও যাত্রার জন্য নির্দেশ প্রদান সবই করেছেন। রাসূলের মৃত্যুর পর আবু বকর ব্যতীত সকলেই সেনাদলের যাত্রা মূলতবী করার পক্ষে ছিলেন। যখন তাঁরা দেখলেন আবু বকর সেনা প্রেরণের বিষয়ে অনঢ় তখন উমর ইবনে খাত্তাব আনসারদের মাধ্যমে উসামাকে অপসারণের পরামর্শ দেন ও বলেন অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করুন। অথচ কয়েকদিনও অতিবাহিত হয় নি নবী (সা.) উসামার সেনাপতিত্বের বিষয়ে প্রতিবাদের কারণে তাঁদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে মাথায় রপট্টি বাঁধা অবস্থায় শরীরের প্রচণ্ড উত্তাপসহ মাটিতে পা টেনে টেনে মিম্বারে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন ‘হে লোকসকল! এটি কিরূপ কথা তোমরা উসামার সেনাপতিত্বের বিষয়ে বলছ? তোমরা ইতোপূর্বে তার পিতার বিষয়েও অনুরূপ কথা বলেছিলে। আল্লাহর শপথ, যাইদ সেনাপতি পদের জন্য উপযুক্ত ছিল আর তার পুত্রও সে পদের জন্য যোগ্য’। লক্ষ্য

করুন নবী (সা.) এখানে আল্লাহর শপথ করে বিশে   পদ দিয়ে শুরু করে তাকিদের জন্য তাকিদের লাম (لام التّأكيد) ও কসম ব্যবহার করেছেন

(وأيم الله إن كان لخليقا بالامارة و إن ابنه من بعده لخليق بِها) এজন্য যাতে তাঁরা মন হতে বিদ্বেষ দূর করেন। কিন্তু তাঁরা এ বিদ্বেষ অন্তরে পোষণ করে রেখেছিলেন এবং নবীর ইন্তেকালের পর উসামাকে অপসারণের দাবী তুলেছিলেন কিন্তু খলীফা তাঁদের দাবী প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে বহাল রাখেন। সেনাদলের যাত্রা মূলতবী করার পরামর্শও তিনি গ্রহণ করেন নি। এ বিষয়ে তাঁরা এতটা বাড়াবাড়ি করেন যে, খলীফা আবু বকর হযরত উমরকে বলেন, "হে খাত্তাবের পুত্র! তোমার মাতার তোমার জন্য ক্রন্দন করা উচিত কারণ নবী (সা.) তাকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন আর তুমি আমাকে বলছ তাকে পদচ্যুত করতে?"[৪৯৭]

অতঃপর তাঁদের আপত্তি স   ও সেনাদল যাত্রা করল। এক হাজার আরোহীসহ মোট তিন হাজার সেনার বাহিনী নিয়ে উসামা যাত্রা করেন। যে সকল ব্যক্তিকে রাসূল ঐ সেনাদলের সঙ্গে যাত্রা করতে বলেছিলেন তাঁদের অনেকেই এ সেনাদলের সঙ্গে যাত্রা হতে বিরত থাকেন অথচ নবী (সা.) বলেছিলেন, "যে উসামার সেনাদলের সঙ্গে যাত্রা হতে বিরত থাকবে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।"[৪৯৮] আপনি অবগত আছেন যে, তাঁরা প্রথম বারেও যাত্রা করতে বিলম্ব করেন এবং দ্বিতীয় বারে যাত্রা হতে বিরত থাকেন। নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে তাঁরা সুন্নাহর ওপর নিজস্ব প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দানকে অধিকতর লাভজনক মনে করেছেন। যেহেতু তাঁরা দেখেছেন নবীর নির্দেশ মত তাঁর মৃত্যুর পূর্বে সেনাদলের সঙ্গে যাত্রা করলে খেলাফত তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যাবে সেহেতু নবীর নির্দেশ অমান্য করে তাঁরা বিলম্ব করেন যদিও উসামার যাত্রা পরবর্তীতে মূলতবী হয় নি।

মহানবী (আমার পিতামাতা তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত) চেয়েছিলেন এ সকল ব্যক্তি হতে মদীনাকে মুক্ত রেখে শান্তিপূর্ণ ও নিশ্চয়তার সাথে হযরত আলী (আ.)- এর হাতে খেলাফত অর্পণ করতে যাতে করে তাঁরা ফিরে আসার পূর্বেই তাঁর খেলাফত দৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁরা ফিরে এসে

কোন গোলযোগ সৃষ্টি করতে না পারেন। ১৭ বছরের উসামার হাতে রাসূল (সা.) সেনাপতিত্বের দায়িত্ব এজন্য অর্পণ করেছিলেন যাতে তাঁদের মধ্যকার কিছু আত্মগর্বী ও অহঙ্কারী ব্যক্তির গর্ব চূর্ণ হয় ও ক্ষমতার কেন্দ্রে তাঁদের হতে যুবক কোন ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত করলেও মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং কোন মন্দ আচরণ ও বিশৃঙ্খলার জন্মদান না করতে পারেন। তাঁরা এটি বুঝতে পেরেই উসামার বিষয়ে আপত্তি তুলতে থাকেন ও তাঁর সঙ্গে যাত্রায় গড়িমসি করতে থাকেন এবং এ অবস্থায়ই রাসূল (সা.) তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান।

তাঁরা কখনো যু   প্রস্তুতি বন্ধের, কখনোও বা পতাকা খুলে ফেলা, কখনো উসামাকে অপসারণের চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের অনেকেই উসামার সেনাদল হতে ফিরে আসেন।[৪৯৯]

সুতরাং উসামার সেনাদল প্রেরণের এ ঘটনাতেই পাঁচটি ক্ষেত্রে তাঁরা নবী (সা.)- এর নির্দেশ পালন হতে বিরত থাকেন এবং এরূপ রাজনৈতিক বিষয়গুলোতে তাঁরা নিজ মত অনুযায়ী কাজ করতেন, নবীর সুন্নাহর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না।

ওয়াসসালাম

শ

একানব্বইতম পত্র

১৯ রবিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ

১। উসামার সেনাদল হতে বিরত থাকার পক্ষে যুক্তি।

২। এ সেনাদলে অংশ গ্রহণে বিরোধিতাকারীদের রাসূল (সা.) অভিসম্পাত করেছেন এমন কোন হাদীস নেই।

১। হ্যাঁ, রাসূল (সা.) উসামার সঙ্গে যু যাত্রার জন্য তাঁদের তাকিদ দিয়েছিলেন এবং কাজটি এতটা ততার সঙ্গে সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে উসামাকে বলেছিলেন 'আজ ভোরেই উবনার অধিবাসীদের ওপর হামলা কর (বিকেল পর্যন্তও তাঁদের সময় দেন নি), এজন্য যত শীঘ্র সম্ভব যাত্রা কর'। সুতরাং নবী (সা.) তাঁদের বিলম্বে সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং এ বিষয়ে তাঁদের ওপর কড়াকড়িও তিনি আরোপ করেছিলেন। কিন্তু এর পরপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর অসুস্থতা এতটা তীব্র হয় যে, তাঁরা নবীর জীবন নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এ কারণে তাঁদের মন নবী (সা.) হতে বিচ্ছিন্ন হতে সায় দিচ্ছিল না। তাঁরা জুরফে এজন্য অপেক্ষা করছিলেন যাতে নবীর অবস্থার খবরাখবর জানতে পারেন। নবীর প্রতি অসম্ভব ভালবাসা তাঁদের এ অবস্থায় ফেলেছিল। সুতরাং তাঁদের বিলম্ব ও অপেক্ষার কারণ এ দু'টি ভিন্ন কিছু হতে পারে না- প্রথমত, নবীর সুস্থতা কামনায় তাঁরা চেয়েছিলেন চক্ষু উ ল করতে, দ্বিতীয়ত, (যদি নবী সুস্থ না হয়ে ওঠেন) নবীর উত্তরাধিকারী হিসেবে যিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন তাঁর ক্ষমতার ভিতকে মজবুত ও শক্তিশালী করতে। তাই তাঁদের বিলম্ব ও অপেক্ষাকে আমরা ত্রুটি বলতে পারি না, বরং তাঁরা এক্ষেত্রে ক্ষমার যোগ্য।

নবীর মৃত্যুর পূর্বে উসামাকে সেনাপতি মনোনয়নে তাঁরা যে বিরোধিতা করেছিলেন (নবীর বক্তব্য ও কর্ম হতে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া স ও) এজন্য যে, উসামা একজন যুবক ছিলেন অথচ তাঁরা প্রবীণ অথবা বৃ । স্বাভাবিকভাবেই প্রবীণরা কোন তরুণের নেতৃত্বের আওতায় যেতে চায় না ও

বাস্তবে যুবকদের নির্দেশ পালন ও আনুগত্যে তাদের অনীহা থাকে। সুতরাং উসামার নেতৃত্বকে মেনে নিতে তাঁদের অস্বীকৃতি মানবিক প্রবণতা থেকে উৎসারিত এবং এটিকে বিদআত বা অন্যায় বলা যায় না।

কিন্তু নবীর মৃত্যুর পরও উসামার নেতৃত্বের বিষয়ে আপত্তির বিষয়টি অনেক আলেমই এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁদের দৃষ্টিতে উসামার অপসারণ অধিকতর কল্যাণকর ছিল এবং মনে করেছিলেন খলীফাও তাঁদের পরামর্শের সঙ্গে একমত হবেন। কিন্তু ন্যায়ত এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপনকে আমি যুক্তিসম্মত মনে করি না। কারণ নবী (সা.) এক্ষেত্রে এতটা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, শরীরে প্রচণ্ড উত্তাপ ও র নিয়েও মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় তিনি ঘর হতে বেরিয়ে এসে মিম্বারে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে খুতবা দেন ও তাঁদের এ কর্মের তীব্র সমালোচনা করেন যা একটি ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বলে সকলেই জেনেছেন। তাই এক্ষেত্রে তাঁদের ওজর ও আপত্তির কারণ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানেন না।

কিন্তু উসামার সেনাদলকে প্রেরণে রাসূলের বিশেষ দৃষ্টি ও নির্দেশ এবং এ বিষয়ে উপর্যুপরি বক্তব্যের পরও খলীফা আবু বকরের নিকট এ সেনাদল প্রেরণ স্থগিত করার আহবান তাঁরা এজন্য রেখেছিলেন যে, তাঁরা ইসলামের কেন্দ্র রক্ষার জন্য একে অধিকতর সতর্কতা মনে করেছিলেন। তাঁরা ভীত ছিলেন সেনাদল মদিনা হতে বেরিয়ে গেলে পার্শ্ববর্তী এলাকার মুশরিকরা সেখানে হামলা করতে পারে। কেননা নবীর মৃত্যুর পর নিফাক প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল ও ইহুদী-নাসারারা শক্তি অর্জন করেছিল, বিভিন্ন আরব গোত্রগুলো মুরতাদ হতে শুরু করেছিল। অনেক গোত্রই যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। এ কারণেই সাহাবীরা খলীফার সঙ্গে কথা বলে উসামার সেনাদল প্রেরণ স্থগিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খলীফা এতে রাজী হন নি এবং তাঁদেরকে বলেন, "আল্লাহর শপথ, রাসূলের নির্দেশ অমান্য করা অপেক্ষা পাখিরা আমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে তাদের খাদ্যে পরিণত করাকে আমি ে য় মনে করি।"

খলীফা আবু বকর হতে আহলে সুন্নাহর আলেমরা এ বক্তব্যসমূহ বর্ণনা করেছেন। যদিও আবু বকর ব্যতীত অন্য সকলেই উসামার সেনাদল প্রেরণের বিরোধিতা করেছেন তদুপরি এর পেছনে ইসলামকে রক্ষা ব্যতীত তাঁদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

উসামার সেনাদলের সঙ্গে যাত্রা হতে হযরত আবু বকর ও উমর যে বিরত ছিলেন তা ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিকে মজবুত করা ও খেলাফত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই ছিল। কারণ এ ছাড়া মুহাম্মাদী রাষ্ট্র ও দীনকে সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল না।

২। আপনি শাহরেস্তানীর 'মিলাল ওয়ান নিহাল' হতে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা সনদহীন ও মুরসাল। হালাবী ও যাইনী দাহলান তাঁদের সীরাত গ্রন্থে বলেছেন যে, এ বিষয়ে কোন হাদীসই নেই। যদি এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহর সূত্রে কোন হাদীস আপনার জানা থাকে তা উল্লেখ করে আমাদের পথ- নির্দেশনা দিন। আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থ রাখুন।

ওয়াসসালাম

স

বিরানব্বইতম পত্র

২২ রবিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ

১। আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে তাঁদের ব্যাখ্যার কোন সংঘর্ষ ও বৈপরীত্য নেই।

২। শাহরেস্তানী হতে আমরা যে হাদীসটি বর্ণনা করেছি তা মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

১। আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থ রাখুন। আপনি নবী (সা.)- এর ত যাত্রার নির্দেশ সে ও উসামার সেনাদলের সঙ্গে যাত্রায় তাঁদের অনীহা ও জুরফে যাত্রাবিরতির বিষয়টি স্বীকার করেছেন ও মেনে নিয়েছেন যে, তাঁরা উসামার সেনাপতিত্বের বিষয়ে রাসূলের বক্তব্য ও বাস্তব ভূমিকার পরও আপত্তি উত্থাপন করেছেন। আপনি এও মেনে নিয়েছেন উসামার নেতৃত্বের বিষয়ে আপত্তি তোলায় রাসূল তাঁদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর অসন্তুষ্টি এতটা তীব্র ছিল যে, অসুস্থ ও উত্তপ্ত শরীরে মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় গৃহ হতে বের হয়ে মিম্বারে যান ও এ কর্মের জন্য তাঁদের সমালোচনা করেন যা একটি ঐতিহাসিক সত্য। এ বক্তব্যে রাসূল (সা.) সেনাপতিত্বের ক্ষেত্রে উসামার যোগ্যতার বিষয়টিকে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। এতদসে ও তাঁরা খলীফা আবু বকরের নিকট তাঁর অপসারণের দাবী জানান।

আপনি আরো স্বীকার করেছেন নবীর নির্দেশ সে ও তাঁরা খলীফার নিকট সেনা প্রেরণ স্থগিত করার দাবী জানান। নবী কর্তৃক বাঁধা পতাকা তাঁরা খুলে ফেলতে চেয়েছিলেন। যদিও তাঁরা দেখেছিলেন তিনি এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছিলেন এবং এ কারণেই প্রস্তুতি সম্পন্নের পর ত যাত্রা করতে বলেছিলেন এবং তাঁর উপর্যুপরি তাকিদ হতেও তাঁরা বুঝেছিলেন যে, বিষয়টি অবশ্য পালনীয় (ফরয) [তদুপরি তা পালনে তাঁরা বিরত থাকেন]।

যে সকল ব্যক্তিকে রাসূল (সা.) উসামার নেতৃত্বে যু যাত্রা করতে বলেন ও স্বহস্তে তাঁদের সুসজ্জিত করেন তার অনেকেই সে সেনাদলের সাথে যাত্রা করেন নি এটিও আপনি স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে হাদীস লেখক, হাফিয ও মুহাদ্দিসগণ একমত পোষণ করেছেন।

কিন্তু আপনি বলেছেন তাঁরা এক্ষেত্রে ক্ষমার যোগ্য। কারণ নবীর বক্তব্য ও নির্দেশ নয়, বরং তাঁদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের জন্য অধিকতর কল্যাণকর ছিল। এজন্যই তাঁরা নবী (সা.)- এর নির্দেশের ওপর ব্যক্তিগত মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এর বাইরে আমরা আর কিছু বলতে পারি না। অন্যভাবে বললে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল সাহাবীরা কোরআন ও সুন্নাহর সকল নির্দেশ মেনে চলতেন কি না? আপনার মত ছিল তাঁরা সমগ্র কোরআন ও সুন্নাহর ওপর আমল করতেন কিন্তু আমরা বলেছি না, সকল ক্ষেত্রে তাঁরা তা করতেন না। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার স্বীকারোক্তিসমূহ আমাদের কথাকেই প্রমাণ করে। তাই বিষয়টিতে তাঁরা ক্ষমার যোগ্য ছিলেন কি না তা আমাদের আলোচনা বহির্ভূত।

যখন আপনার নিকট এটি প্রমাণিত হয়েছে তাঁরা উসামার সেনাদলের বিষয়ে নিজ মতকে সুস্পষ্ট সুন্নাহর ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন তখন নবী (সা.)- এর পর খেলাফতের বিষয়টিতেও আমরা কি একই কথা বলতে পারি না যে, ইসলামের কল্যাণে গাদীর ও অন্যান্য স্থানে বর্ণিত নবীর নির্দেশের ওপর নিজ মতকে নবীর পর খেলাফতের জন্য তাঁরা অধিকতর উপযুক্ত মনে করেছেন?

যে সকল ব্যক্তি প্রবীণতার কারণে যুবক উসামার নেতৃত্বকে মেনে নেন নি তাঁদের পক্ষে যুক্তি হিসেবে আপনি বলেছেন প্রকৃতিগতভাবেই বৃ ও প্রবীণরা তরুণদের নেতৃত্ব ও আনুগত্যে যেতে চায় না। যদি তাই হয় তবে অপেক্ষকৃত তরুণ আলীর নেতৃত্ব বর্ণনাকারী গাদীরের সুন্নাহকেও তাঁরা (বয়োবৃ রা) মেনে নেবেন না এটিই স্বাভাবিক, নয় কি? কারণ সুস্পষ্ট বর্ণনামতে উসামাকে সেনাদলের নেতৃত্বের জন্য তাঁরা যেরূপ যুবক মনে করেছিলেন নবীর মৃত্যুর পর ইসলামী রাষ্ট্রের খেলাফতের জন্য অনুরূপ আলীকেও তরুণ ভেবেছিলেন। একটি সেনাদলের নেতৃত্ব এবং সকলের ওপর নেতৃত্বের মধ্যে অনেক পার্থক্য। যখন তাঁদের প্রকৃতিই এরূপ যে, কয়েকদিনের এক যু র জন্য এক তরুণের নেতৃত্বকে তাঁরা মেনে নিতে পারেন না তখন সমগ্র জীবনের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয়ে অপেক্ষাকৃত তরুণ এক ব্যক্তিকে তাঁরা কিভাবে মেনে নেবেন?

কিন্তু সাধারণ প্রবীণ মানসিকতা সামগ্রিকভাবে তরুণ নেতৃত্ব মেনে নেয় না বলে যে দাবী করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ যে সকল প্রবীণ ঈমানের পূর্ণতায় পৌঁছেছেন তাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর

রাসূলের আনুগত্যের পথে যে কোন তরুণের নেতৃত্বকে নির্দ্বিধায় মেনে নেন। শুধু তরুণদের আনুগত্যের বিষয়েই নয়, বরং আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে যে কোন বিষয়েই তাঁরা অনুগত যেমনটি কোরআন বলেছে,

(فلا و ربِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا)

তোমার প্রভুর শপথ, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনে নি যতক্ষণ না তাদের বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তারা তোমাকে বিচারক মনোনীত করবে। অতঃপর তুমি যা ফয়সালা দেবে সে বিষয়ে তাদের মনে কোন কষ্ট থাকবে না ও পূর্ণ আনুগত্য করবে।

অন্যত্র বলেছে,

(وَما آتاكُم الرَّسُول فَخُذُوه وَما نَهاكُم عَنْه فانْتَهوا)

এবং রাসূল যা তোমাদের দেন তা গ্রহণ কর এবং যা হতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত হও।

২। যাঁরা উসামার সেনাদল হতে বিরত থাকার ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে শাহরেস্তানী হাদীসটি কোন সনদ ছাড়া বর্ণনা করেছেন বলে আপনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আবু বকর আহমাদ ইবনে আবদুল আযীয জাওহারী তাঁর ‘আসসাকিফা’ গ্রন্থে সনদসহ হাদীসটি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা এখানে উল্লেখ করছি, “হামিদ ইবনে ইসহাক ইবনে সালিহ্, আহমাদ ইবনে সাইয়ার হতে, তিনি সাঈদ ইবনে কাসির আনসারী হতে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহমান হতে বর্ণনা করেছেন, “নবী (সা.) তাঁর সর্বশেষ অসুস্থতার সময় (যাতে তাঁর মৃত্যু হয়) উসামা ইবনে যাইদকে সকল আনসার ও মুহাজিরের ওপর নেতা মনোনীত করেন। এ সেনাদলে হযরত আবু বকর, উমর, আবু উবাইদা জাররাহ্, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, তালহা এবং যুবাইরও ছিলেন। অতঃপর নবী (সা.) উসামাকে নির্দেশ দেন তাঁর পিতার শাহাদাতস্থল মুতায় হামলা করার এবং ফিলিস্তিনে পৌঁছার। কিন্তু উসামা এ যাত্রায় অলসতা প্রদর্শন করে বিলম্ব করেন, তাঁর সেনাদলও ত প করে। এ অবস্থায় নবীর অসুস্থতা কখনো বৃ পাচ্ছিল কখনো কম হচ্ছিল। তিনি তখনও সেনাদলের যাত্রার বিষয়ে তাকিদ দিতে থাকলে উসামা বললেন : আমার

পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। আপনি কয়েকদিন বিলম্বের অনুমতি দেবেন কি যাতে আল্লাহ্ আপনাকে আরোগ্য দান করেন? তিনি (সা.) বললেন : আল্লাহর অনুগ্রহসহ যাত্রা কর। উসামা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার অবস্থা এরূপ সঙ্গীন হওয়া স ে ও কি আমি যাত্রা করবো অথচ মদীনা হতে বের হতে আমার হৃদয় কষ্ট পাচ্ছে। তিনি বললেন : বিজয় ও সমৃ ি র দিকে (ক্ষমার দিকে) যাত্রা কর।

উসামা পুনরায় বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য এটি কঠিন যে, আপনার অবস্থা পথিকদের নিকট জানব অথচ আপনি এ অবস্থায় শায়িত থাকবেন। নবী (সা.) তাঁকে বললেন : আমি তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছি সে অনুযায়ী কাজ কর। এই বলে রাসূল অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। উসামা নবীর গৃহ হতে বের হয়ে মদীনা হতে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে লাগল। নবীর জ্ঞান ফিরে আসলে উসামার সেনাদল সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। বলা হলো তারা যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পুনঃপুনঃ বলছিলেন : উসামার সেনাদলকে যাত্রা করতে বল। যে ব্যক্তি উসামার সেনাদলের সঙ্গে যাত্রার নির্দেশ পেয়ে যাবে না তার ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। উসামা যাত্রা শুরু করলেন, সাহাবীরাও তাঁর সামনে- পেছনে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং জুরফে পৌঁছে তাঁরা ছাউনী ফেললেন। হযরত আবু বকর, উমরসহ অধিকাংশ মুহাজির তাঁর সঙ্গে ছিলেন, আনসারদের হতেও উসাইদ ইবনে খুজাইর, বাশির ইবনে সা'দসহ প্রায় সকলেই ছিলেন। জুরফে উম্মে আইমান উসামাকে খবর দিলেন যে, রাসূল মৃত্যুবস্থায় রয়েছেন, মদীনায় ফিরে চল। উসামা ত যাত্রা করে মদীনায় পৌঁছলেন। তিনি পতাকা নবীর গৃহের দরজায় যখন বাঁধছিলেন ঠিক তখনই রাসূল (সা.) দুনিয়া হতে বিদায় নেন।"

এ হাদীসটি আল্লামাহ্ ইবনে আবিল হাদীদ তাঁর 'শারহে নাহজুল বালাগাহ্'- এর দ্বিতীয় খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

ওয়াসসালাম

শ

তিরানব্বইতম পত্র

২৩ রবিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ

এরূপ অন্যান্য ঘটনাও উপস্থাপনের আহবান।

বৃহস্পতিবারের শোকাবহ ঘটনার বর্ণনার মত উসামার সেনাদলের যাত্রার বর্ণনাটিও দীর্ঘ হলো। যা হোক এটি সত্যানুসন্ধানীদের জন্য দিনের আলো উ াসিত করে অস্পষ্টতা দূর করেছে। অনুগ্রহপূর্বক অন্য যে সকল ক্ষেত্রে তাঁরা কোরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করেন নি তার উল্লেখ করুন।

ওয়াসসালাম

স

চুরানব্বইতম পত্র

২৫ রবিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ

ফিতনার উদগাতাকে হত্যার জন্য রাসূলের নির্দেশ অমান্য

উম্মতের প্রসি   ব্যক্তিবর্গ, নেতা ও হাফিযদের হতে বর্ণিত এ সম্পর্কিত উ ৃতিসমূহ এ বিষয়ে যথেষ্ট। এ সম্পর্কিত আহমাদ ইবনে হাম্বলের মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ১৫ পৃষ্ঠা হতে বর্ণনা করছি যা আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

তিনি বর্ণনা করেছেন, "হযরত আবু বকর রাসূল (সা.)- এর নিকট এসে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমি অমুক নাম ও চিহ্নের স্থান অতিক্রম করার সময় অত্যন্ত সুন্দর একটি দৃশ্য দেখেছি। সেখানে এক ব্যক্তি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নামায পড়ছিল। নবী (সা.) তাঁকে বললেন : যাও তাকে হত্যা কর। আবু বকর সেখানে গিয়ে তাকে নামাযরত অবস্থায় দেখেন। তাঁর মন চাইল না তাকে হত্যা করতে, তাই তিনি ফিরে আসলেন। রাসূল (সা.) তা দেখে হযরত উমরকে বললেন : যাও ঐ ব্যক্তিকে হত্যা কর। হযরত উমরও গিয়ে তাকে সেই অবস্থায় দেখে হত্যা হতে বিরত হলেন। তিনি ফিরে এসে রাসূলকে বললেন : তাকে পূর্ণ বিনয় ও মনোযোগের সঙ্গে নামায পড়তে দেখে হত্যা করা হতে বিরত হলাম।

নবী (সা.) আলীকে বললেন : যাও তাকে হত্যা কর। হযরত আলী (আ.) সেখানে গিয়ে তাকে না পেয়ে ফিরে এসে নবীকে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! তাকে দেখলাম না। নবী বললেন : ঐ ব্যক্তি ও তার অনুসারীরা কোরআন পাঠ করবে কিন্তু এ পাঠ তাদের জিহ্বার কম্পনেই সীমিত, তা তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না। তীর যেমন ধনুক হতে বিচ্ছিন্ন হয় তেমনি তারা আল্লাহর দীন হতে বিচ্ছিন্ন হবে এবং কখনোই ফিরে আসবে না। এদের হত্যা কর কারণ পৃথিবীর ওপর এরা সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি।"

ইবনে হাজারের 'আল ইসাবাহ্' গ্রন্থের যু সাদিয়ার জীবনী হতে আবু ইয়ালী তাঁর মুসনাদে আনাস ইবনে মালিক হতে বর্ণনা করেছেন, "নবী (সা.)- এর জীবদ্দশায় এক ব্যক্তির ইবাদত-

বন্দেগী আমাদের সকলকে আশ্চর্যান্বিত করত। আমরা বিষয়টি নবীর নিকট উপস্থাপন করে ঐ ব্যক্তির নাম, পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করলে তিনি চিনলেন না। ঠিক এ সময় সেই ব্যক্তি উপস্থিত হলে আমরা নবীকে বললাম : এই সেই ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ তখন বললেন : তোমরা আমাকে এমন ব্যক্তির বর্ণনা দিচ্ছিলে যার চেহারায় শয়তানের চিহ্ন সুস্পষ্ট। ঐ ব্যক্তি আরো নিকটবর্তী হয়ে সাহাবীদের নিকট দণ্ডায়মান হলো কিন্তু কাউকেই সালাম দিল না। নবী (সা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যখন তুমি এখানে উপস্থিত হও তখন তোমার মনে কি এটি আসে নি যে, এ সভায় তোমার চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তি উপস্থিত নেই? সে উত্তর দিল : হ্যাঁ। অতঃপর সে ভেতরে প্রবেশ করে নামযরত হল। নবী বললেন : কে এই ব্যক্তিকে হত্যা করবে? আবু বকর বললেন : আমি। এ বলে তিনি তার নিকট গিয়ে দেখলেন সে নামাযে দাঁড়িয়েছে। তিনি নিজে নিজে বললেন : সুবহানাল্লাহ্ (আল্লাহ্ পবিত্র), আমি কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করবো যে নামায পড়ে? তিনি ফিরে এলে নবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন : তাকে হত্যা করেছ? তিনি বললেন : যেহেতু আপনি নামাযীদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তাই তাকে নামাযরত দেখে হত্যা করি নি।[৫০০] নবী পুনরায় বললেন : কে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করতে রাজী আছ? উমর বললেন : আমি । অতঃপর তিনি গিয়ে ঐ ব্যক্তিকে সিজদারত অবস্থায় দেখে নিজেকে বললেন : আবু বকর আমার চেয়ে উত্তম, তিনি তাকে হত্যা করেন নি, আমি কিরূপে তা করবো? এ কথা বলে ফিরে আসলে নবী প্রশ্ন করলেন : কি হয়েছে? তিনি বললেন : আমি গিয়ে দেখলাম সে মাটিতে সিজদারত অবস্থায় রয়েছে, তাই মন চাইল না তাকে হত্যা করতে। নবী (সা.) বললেন : কে তাকে হত্যা করতে রাজী আছ? আলী বললেন : আমি। রাসূল তাঁকে বললেন : যদি তাকে পাও। আলী সেস্থানে গিয়ে তাকে পেলেন না। তিনি ফিরে এলে রাসূল তাঁর নিকট এ বিষয়ে জানতে চাইলে আলী বললেন : তাকে পেলাম না। রাসূল বললেন : যদি ঐ ব্যক্তি নিহত হত তবে আমার উম্মতের মধ্যে কোনদিনই এখতেলাফ (বিভেদ) হত না।”

এই হাদীসটি হাফিয মুহাম্মদ ইবনে মূসা সিরাজী তাঁর গ্রন্থে ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান, মাকাতিল ইবনে সুলাইমান, ইউসুফ কাত্তান, কাসেম ইবনে সালাম, মাকাতিল ইবনে হায়ান, আলী ইবনে

র্হাব, সা'দী, মুজাহিদ, কাতাদাহ্, ওয়াকী ও ইবনে জারিহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। বিশিষ্ট আলেমদের কয়েকজন, যেমন শাহাবুদ্দীন আহমাদ যিনি ইবনে আবদে রাব্বিহি আন্দালুসী বলে প্রসি তাঁর 'আকদুল ফারিদ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে আসহাবে আহওয়ার আলোচনায় এ ঘটনাটিকে প্রতিষ্ঠিত বলেছেন। তিনি এ ঘটনার শেষে রাসূল (সা.) হতে বলেছেন, "এই ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম বিদ্রোহী হবে। যদি তোমরা তাকে হত্যা করতে তবে দুই ব্যক্তি আমার পর এখতেলাফ করত না। বনি ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। তাদের একদল ব্যতীত সবাই জাহান্নামী হবে।"[৫০১]

কাছাকাছি বর্ণনায় হযরত আলী হতে সুনান লেখকগণও এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, [৫০২] যেমন বর্ণিত হয়েছে- কুরাইশ গোত্রের একদল ব্যক্তি নবী (সা.)- এর নিকট এসে বলল, "হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রতিবেশী ও সন্ধিচুক্তিতে আব । আমাদের কিছু দাস তোমার নিকট পালিয়ে এসেছে, তারা না দীনের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, না জ্ঞান ও শিক্ষার প্রতি, তারা শুধু আমাদের বাগান ও সম্পদ দেখাশোনার কাজ হতে বাঁচার জন্য তোমাদের নিকট আ য় নিয়েছে। তুমি তাদেরকে আমাদের নিকট ফিরিয়ে দাও।" নবী (সা.) আবু বকরকে বললেন, "এ ব্যাপারে তুমি কি বল?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, এরা আপনার প্রতিবেশী এবং সত্য বলেছে।" এ কথা শুনে নবীর রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। অতঃপর নবী উমরকে বললেন, "তুমি কি বল?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তারা সত্য বলেছে, তারা আপনার প্রতিবেশী ও চুক্তিব ।" নবীর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, আল্লাহ্ তোমাদের (কুরাইশ) সঙ্গে যু র জন্য এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যার অন্তরকে আল্লাহ্ ঈমান দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। সে দীনের পথে তোমাদের সঙ্গে যু করবে।" আবু বকর বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি সেই ব্যক্তি?" তিনি বললেন, "না।" উমর বললেন, "আমি কি সেই ব্যক্তি?" তিনি বললেন, "না। সে ব্যক্তি এখন জুতা সেলাই করছে।" উল্লেখ্য নবী (সা.) তাঁর জুতা সেলাই করার জন্য আলী (আ.)- কে দিয়েছিলেন।

ওয়াসসালাম

শ

পঁচানব্বইতম পত্র

২৬ রবিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ

ফিতনার উদগাতাকে হত্যা না করার কারণ

সম্ভবত আবু বকর ও উমর নবী (সা.)- এর নির্দেশ হতে তার হত্যাকে মুস্তাহাব মনে করেছিলেন অর্থাৎ তাঁরা এ কাজটিকে ওয়াজিব মনে করেন নি বা ওয়াজিব মনে করলেও ওয়াজিবে কেফায়ী মনে করেছেন, তাই হত্যা হতে নিবৃত্ত থাকেন। যেহেতু তাঁরা মনে করেছেন অন্য সাহাবীরা এ কাজটি করতে পারবেন সেহেতু ওয়াজিব হলেও তা সম্পন্ন হবে। আর সে ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যাবে যার ফলে হত্যার কাজটি সম্পন্ন হবে না তা তাঁরা ভাবেন নি। কারণ ঐ ব্যক্তি এ বিষয়ে অবহিত ছিল না।

ওয়াসসালাম

স

ছিয়ানব্বইতম পত্র

২৯ রবিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ

এ যুক্তির বিপক্ষে জবাব

'আমর' বা নির্দেশ মূলত ওয়াজিব বা অপরিহার্যতা বুঝায়। সুতরাং মুস্তাহাব নির্দেশক ব্যতীত তা হতে মুস্তাহাব বোঝা ঠিক নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয়টিতে মুস্তাহাব নির্দেশক কিছু ছিল না, বরং এমন নির্দেশনা ছিল যা ওয়াজিব ও অপরিহার্যতা অর্থ দেয়। অনুগ্রহপূর্বক এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোতে যথার্থ দৃষ্টি দিন। তখন আমাদের বক্তব্যকেই সত্যায়ন করবেন। বিশেষত এ বাক্যটি 'এই ব্যক্তি ও তার অনুসারীরা কোরআন পাঠ করে কিন্তু এই পঠন তাদের অন্তরে স্থান লাভ করে না; যেরূপ তীর ধনুক হতে বিচ্ছিন্ন হলে আর ফিরে আসে না সেরূপ তারা দীন থেকে বেরিয়ে গিয়ে কখনোও ফিরে আসবে না। তারা জমীনের ওপর নিকৃষ্ট সৃষ্টি, তাদেরকে হত্যা কর' হতে আমরা উজুব বা অপরিহার্যতাই বুঝি। রাসূল (সা.) আরো বলেছিলেন 'এ ব্যক্তি যদি নিহত হত তাহলে আমার উম্মতের দুই ব্যক্তির মধ্যে বিভেদ হত না'- এ বাক্যটিও তাকে হত্যার অপরিহার্যতা ও তাকিদই বুঝায়।

মুসনাদে আহমাদের হাদীসটিতে লক্ষ্য করলে দেখবেন হত্যার নির্দেশ প্রথমে বিশেষভাবে আবু বকরের ওপর ছিল। পরে উমরের প্রতিও বিশেষভাবে তা আরোপিত হয়। তাই বিষয়টি ওয়াজিবে কেফায়ী হতে পারে না।

হাদীসটিতে স্পষ্ট এসেছে তাঁরা ঐ ব্যক্তিকে বিনয়ের সাথে নামাযরত দেখায় তাকে হত্যা করা হতে বিরত হলেন অর্থাৎ নবীর নির্দেশের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে নিজ ইচ্ছানুযায়ী তাঁরা সি ান্ত নেন। এখানেও তাঁরা নিজ ইচ্ছাকে নবীর নির্দেশের ওপর প্রাধান্য দেন। এটি কোরআন ও সুন্নাহর ওপর ব্যক্তিগত মতের প্রাধান্য দানের অন্যতম নমুনা।

ওয়াসসালাম

শ

সাতানব্বইতম পত্র

৩০ রবিউল আউয়াল ১৩৩০ হিঃ

এরূপ অন্যান্য বিষয়ও আলোচনার আহবান।

অনুগ্রহপূর্বক এরূপ অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করুন। যদি তাতে পত্র দীর্ঘ হয় তবুও কোন কিছু অবশিষ্ট রাখবেন না।

ওয়াসসালাম

স

আটানব্বইতম পত্র

৩ রবিউস সানী ১৩৩০ হিঃ

১। এরূপ কয়েকটি বিষয়।

২। অনুরূপ আরো বিষয়সমূহ।

১। হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা, হুনাইন যু র গণীমত, বদরের য বন্দীদের ফিদিয়া (মুক্তিপণ গ্রহণ) আদায়, তাবুকের যু র সময় অনাহারের কারণে বেশ কিছু উট জবাইয়ের জন্য রাসূলের নির্দেশ অমান্য, উহুদের যু র ঘটনা (যু ক্ষেত্র হতে পলায়ন), 'যে কেউ তাওহীদের ঈমান নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে সে বেহেশতের সুসংবাদ পাবে'- আবু হুরাইরার এ ঘোষণা বর্ণনার দিন, মুনাফিকের ওপর নামায পড়া (জানাযার নামায), সদকার বিষয়ে বিতর্ক ও রুক্ষতার সঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপন, যাকাত ও খুমসের আয়াতের অর্থের বিকৃতি, হ তামাত্তু ও মুতা বিয়ের বিধান পরিবর্তন, তালাকের আয়াতের বিধান পরিবর্তন, রমযান মাসের নফল নামায (তারাবীহ্) সম্পর্কিত সুন্নাহর পরিমাণ ও প তিগত পরিবর্তন সাধন, আযানের বাণীতে পরিবর্তন, হাইয়া আলা খাইরিল আমালকে আযান হতে বাদ দেয়া, জানাযার নামাযের তাকবীরের সংখ্যা হ্রাস এরূপ অসংখ্য বিষয় রয়েছে যা এ ক্ষুদ্র পত্রে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এছাড়া হাতেব ইবনে বালতাআর ঘটনায় বিরোধিতা, মাকামে ইবরাহীমের স্থান পরিবর্তন, বনি হাশিমের সম্পত্তি জোরপূর্বক মসজিদের আওতাভুক্ত করা, আবু খারাশ হাজলীর রক্তপণের ক্ষেত্রে ইয়ামানীদের প্রতি অবিচার, নাসর ইবনে হাজ্জাজ সালামীর নির্বাসন, জো'দা ইবনে সালিমের ওপর হাদ্দ জারী[৫০৩], ইরাক ভূ- খণ্ডে খারাজ প্রবর্তন, জিজিয়া আদায়ের প তিতে পরিবর্তন, শুরা গঠনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব, রাত্রিতে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন, দিনে অনুসন্ধান ও গুপ্তচরবৃত্তি, উত্তরাধিকার আইনে নিজ মতানুযায়ী সি ান্ত প্রদান। এ বিষয়গুলোতে

তাঁরা কোরআন ও সুন্নাহর বিধান হতে নিজ মত জনসাধারণের জন্য অধিকতর কল্যাণময় মনে করে তদনুযায়ী সি ান্ত দিয়েছেন।

আমরা ‘সাবিলুল মুমিনীন’ গ্রন্থে এ বিষয়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৫০৪](২৭*)

২। হযরত আলীর খেলাফত এবং রাসূল (সা.)- এর আহলে বাইত সংক্রান্ত হাদীসসমূহ ছাড়াও অন্যান্য সুন্নাহ্, হাদীস ও রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁরা কাজ করেন নি, বরং এর বিপরীত ভূমিকাই পালন করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, খেলাফতের বিষয়টিতেও তাঁরা সুন্নাহর ওপর নিজ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ বিষয়ে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, খেলাফতের ক্ষেত্রে নবী (সা.)- এর সুন্নাহ্ এরূপ অন্যান্য বিষয়ের মত অকার্যকর রয়ে গিয়েছিল ও ব্যক্তিগত মত সুন্নাহর ওপর প্রাধান্য লাভ করেছিল।

ওয়াসসালাম

শ

নিরানব্বইতম পত্র

৫ রবিউস সানী ১৩৩০ হিঃ

১। তাঁরা এ সকল বিষয়ে সাধারণের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিতেন।

২। এরূপ অন্যান্য বিষয়গুলোও আলোচনা করুন।

১। কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই তাঁদের সৎ উদ্দেশ্যের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবেন না। কারণ তাঁরা জানেন এই ব্যক্তিবর্গ সাধারণের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিতেন। তাঁরা এমন পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টায় রত ছিলেন যা মুসলিম উম্মাহর জন্য অধিকতর কল্যাণকর ও সহজ হয় এবং উম্মাহর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃ পায়। তাই তাঁরা যে সকল কাজ আ াম দিয়েছেন তাতে কোন ত্রুটিই নেই, হোক সে বিষয়ে তাঁরা কোরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধান অনুসারে ফয়সালা দিয়ে থাকেন অথবা নিজস্ব ব্যাখ্যা ও মতানুযায়ী সি ান্ত নিয়ে থাকেন।

২। আপনার প্রতি আহবান জানিয়েছি যে সকল বিষয়ে তাঁরা কোরআন ও সুন্নাহর মত অনুযায়ী চলেন নি তার সবগুলোই বর্ণনা করার। আপনি তার আংশিক বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, ইমাম ও আহলে বাইত সম্পর্কে খেলাফতের প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য প্রসঙ্গেও হাদীসসমূহ ছিল যার ওপর পূর্ববর্তীগণ আমল করেন নি। যদি অনুগ্রহপূর্বক সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিতেন এবং উপর্যুপরি এ আহবান হতে আমাকে নিবৃত্ত করতেন।

ওয়াসসালাম

স

একশতম পত্র

৮ রবিউস সানী ১৩৩০ হিঃ

১।	আলোচনার কেন্দ্র পরিত্যাগ।

২।	আহবান গ্রহণ।

১। আপনি স্বীকার করেছেন যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আমরা করেছি তাতে তাঁরা হস্তক্ষেপ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্, আমাদের কথাকে সত্যায়ন করেছেন। এখন তাঁদের এ কর্মের পেছনে সৎ উদ্দেশ্য, সাধারণের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দান, উম্মতের জন্য সর্বোত্তম পথ গ্রহণ, ইসলামের শক্তি ও সম্মান বৃি র প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিষয় ছিল কি না তা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত বিষয়। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় তাঁরা এ সকল বিষয়ে রাসূল (সা.)- এর সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করেছেন কি করেন নি? কিন্তু কেন তা করেন নি তা আমাদের আলোচনার কেন্দ্র বহির্ভূত।

২। আপনার সর্বশেষ পত্রে হযরত আলী (আ.) সম্পর্কে যে সকল সহীহ হাদীস আহলে সুন্নাহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সাহাবীগণ তদনুযায়ী আমল করেন নি বা সেগুলোকে উপেক্ষা করেছেন তা আলোচনা করার আহবান জানিয়েছেন। আপনি স্বয়ং সুন্নাহ্ ও হাদীসের ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের বিশেষজ্ঞদের নেতা এবং হাদীস সংকলন অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণে দীর্ঘ সময় ধরে কঠোর ম দিয়ে আসছেন। তাই আমি কি করে ভাবতে পারি যে সকল বিষয় আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি আপনি সে সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত নন? কে আমাদের ইশারাকৃত ঐ সকল বিষয়ে নিজকে আপনার হতে অধিকতর জ্ঞানী মনে করতে পারে? আহলে সুন্নাহর আলেমদের মধ্যে আপনার সমপর্যায়ের অন্য কেউ রয়েছেন কি? অবশ্যই নেই।

তাই বিস্তারিত আলোচনার জন্য আপনার যে আহবান তাকে আমরা এ বাক্যটির নমুনা মনে করছি যে, ‘কত অধিক প্রশ্নকারী রয়েছে যারা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত’।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, অনেক সাহাবীই হযরত আলী (আ.)- এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। তাঁরা আলী (আ.)- কে কষ্ট ও অপবাদ দিতেন, তাঁর প্রতি অবিচার করতেন, তাঁকে মন্দ বলা ও গালি দেয়াকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য কর্ম মনে করতেন, এমন কি কেউ কেউ আলী (আ.), তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের বিরুে অস্ত্রও ধারণ করেছেন। হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহ এর সাক্ষী।

অথচ নবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করেছে সে আল্লাহর আনুগত্য করেছে, আর যে আমার নির্দেশ অমান্য করেছে সে আল্লাহরই নির্দেশ অমান্য করেছে। যে ব্যক্তি আলীর আনুগত্য করেছে সে আমারই আনুগত্য করেছে। আর যে আলীর নির্দেশ অমান্য করেছে সে আমার নির্দেশই অমান্য করেছে।"

অন্যত্র রাসূল (সা.) বলেছেন, "যদি কেউ আমা হতে বিচ্ছিন্ন হয় সে আল্লাহ্ হতে বিচ্ছিন্ন হয় আর যে আলী হতে বিচ্ছিন্ন হয় সে আমা হতেই বিচ্ছিন্ন হয়।"

রাসূল আরো বলেছেন, "হে আলী! তুমি পৃথিবীতেও যেমনি নেতা আখেরাতেও তেমনি নেতা। তোমার বন্ধু আমারই বন্ধু এবং আমার বন্ধু আল্লাহরই বন্ধু। তোমার শত্রু আমারই শত্রু এবং আমার শত্রু আল্লাহর শত্রু। ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যে আমার পর তোমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়।"

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি আলীকে মন্দ বলল (গালি দিল) সে আমাকেই মন্দ বলল, আর যে আমাকে মন্দ বলল সে আল্লাহকেই যেন মন্দ বলল।"

রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে আলীকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকেই কষ্ট দিল।"

অন্যত্র নবী বলেছেন, "যে আলীকে ভালবাসল সে আমাকেই ভালবাসল, আর যে তাকে অপছন্দ করল সে আমাকেই অপছন্দ করল।"

রাসূল (সা.) আলী (আ.)- কে বলেছেন, "হে আলী! মুমিন ব্যতীত কেউ তোমাকে ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ব্যতীত কেউ তোমার প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করবে না।"

রাসূল (সা.) বলেছেন, "হে আল্লাহ্! যে আলীকে ভালবাসে আপনি তাকে ভালবাসুন এবং যে তার সঙ্গে শক্রুতা পোষণ করে আপনি তার প্রতি শক্রুতা পোষণ করুন। তার সাহায্যকারীকে আপনি সাহায্য করুন। যে তাকে অপমানিত করতে চায় তাকে আপনি অপমানিত করুন।"

একদিন রাসূল (সা.) হযরত আলী, ফাতিমা, ইমাম হাসান ও হুসাইন (আ.)- কে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমাদের সঙ্গে যে যু করে আমিও তাদের সঙ্গে যু করি এবং তোমাদের সঙ্গে যে সন্ধি করে আমিও তাদের সঙ্গে সন্ধি করি।"

যেদিন রাসূল (সা.) তাঁদের (আহলে বাইত) ওপর আবা (এক প্রকার বস্ত্র) বিছিয়ে দিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন সেদিন তিনি বলেছিলেন, "তাদের সঙ্গে যারা যু লিপ্ত হয় আমি তাদের সঙ্গে যু লিপ্ত হই, যারা তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে আমিও তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করি। তাদের সঙ্গে আমি শক্রুতা পোষণ করি যারা তাদের সঙ্গে শক্রুতা পোষণ করে।"

এরূপ অধিকাংশ হাদীসই এই সকল সাহাবী গ্রহণ করেন নি, বরং এর বিপরীত আচরণ করেছেন। এক্ষেত্রে নিজ প্রবৃত্তি ও উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাঁরা এগুলোকে উপেক্ষা করেছেন। চিন্তাশীল সচেতন ব্যক্তিরা সুনান গ্রন্থসমূহে হযরত আলী (আ.)- এর ফজীলত ও মর্যাদা বর্ণনাকারী হাদীসসমূহ সম্পর্কে অবগত যার সংখ্যা শতাধিক। এ সকল হাদীসে তাঁর আনুগত্যের অপরিহার্যতা ও তাঁর সঙ্গে শক্রুতা নিষি ঘোষিত হয়েছে সুস্পষ্টরূপে। এর প্রতিটিতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট তাঁর বিশেষ সম্মান, মর্যাদা ও স্থান বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী পত্রসমূহে এর অনেকাংশই আমরা উল্লেখ করেছি তদুপরি অবর্ণিত অংশ এর কয়েক গুণ। আলহামদুলিল্লাহ্, আপনি সুনান গ্রন্থসমূহের ওপর পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী ও এগুলোর ওপর আপনার পূর্ণ দখল রয়েছে। আপনার নিকট প্রশ্ন এর কোনটিতে আলীর প্রতি কটুক্তি ও যু করা বৈধ ঘোষিত হয়েছে কি? এর কোনটিতে তাঁর সঙ্গে শক্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করার কথা বলা হয়েছে কি? এগুলোতে তাঁর অধিকার হরণ, তাঁকে কষ্টে আপতিত করা, তাঁর প্রতি অবিচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কি? কখনোই নয়। তবে কেন মুসলমানদের মিম্বারে জুমআ ও ঈদের দিনে তাঁর প্রতি লানত ও অভিশাপ বর্ষণ তাঁদের সুন্নাহয় পরিণত হয়েছিল? কেন তাঁরা এ সকল

হাদীসের বিশু তা ও আধিক্যের প্রতি গুরুত্ব দিতেন না? কারণ তাঁরা এ সকল হাদীসকে তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী মনে করতেন। তাঁরা উত্তমরূপে জানতেন আলী (আ.) নবীর ভ্রাতা, স্থলাভিষিক্ত, উত্তরাধিকারী, রক্ত সম্পর্কীয়দের নেতা, পরম বন্ধু, তাঁর উম্মতের হারুন (আ.), তাঁর নয়নের মনির জীবনসঙ্গী (ও সমমর্যাদার ব্যক্তি), তাঁর সন্তানদের পিতা, তাঁর ওপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী, ইখলাস (নিষ্ঠা)-এর ক্ষেত্রে সকলের ঊর্ধ্বে, সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, সর্বাধিক আমলকারী, ধৈর্যের ক্ষেত্রে সকলের আদর্শ, ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস)-এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে দৃঢ়, দীনের পথে সর্বাধিক কষ্ট সহ্যকারী, ঐশী পরীক্ষায় সর্বোত্তমরূপে উত্তীর্ণ, মর্যাদার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ, দীনের ক্ষেত্রে সকল হতে অগ্রগামী ও প্রথম, ইসলামের ওপর সর্বাধিক দক্ষ, রাসূলের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী, চরিত্র ও আচরণে রাসূলের সদৃশ, বাণী ও নীরবতার ক্ষেত্রে অনন্য এবং হেদায়েতের নমুনা। তদুপরি তাঁরা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে নিজ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে এর ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সুতরাং এখানে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, তাঁরা ইমামতের ক্ষেত্রে গাদীরের হাদীসকে দূরে ঠেলে দেবেন এবং এরূপ অন্যান্য শত হাদীসের ন্যায় গাদীরের হাদীসটিকেও নিজ ইচ্ছানুযায়ী ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করবেন। এটিই স্বাভাবিক, তাঁরা রাসূলের এ বাণী শুনে থাকবেন যে, তিনি (সা.) বলেছেন, "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি যদি তা তোমরা আঁকড়ে ধর কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না, আল্লাহর কিতাব ও আমার রক্ত সম্পর্কীয় আহলে বাইত।" রাসূল (সা.) তাঁদের বলেন, "আমার আহলে বাইতের উদাহরণ হলো নূহের তরণির ন্যায়। যে তাতে আরোহণ করবে সে মুক্তি পাবে আর যে আরোহণ করবে না সে নিমজ্জিত হবে" এবং "আমার আহলে বাইত বনি ইসরাঈলের তওবা ও মুক্তির তোরণের ন্যায়। যে কেউ তাতে প্রবেশ করবে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে"।

রাসূল (সা.) বলেন, "আকাশের তারকারা পৃথিবীবাসীদের নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষার উপায়। আমার আহলে বাইতও ত প বিভেদ হতে মুক্তির উপায়। তাই আরবদের কোন গোত্র তাদের বিরোধিতা করলে বা তাদের বিষয়ে দ্ব   লিপ্ত হলে শয়তানের দলে পরিণত হবে।"

পরিশেষে বলা যায় এরূপ সকল সহীহ হাদীসের প্রতি তাঁরা অনুগত ছিলেন না।

ওয়াসসালাম

শ

একশত একতম পত্র

১০ রবিউস সানী ১৩৩০ হিঃ

কেন হযরত আলী (আ.) সাকীফার দিন তাঁর খেলাফত ও স্থলাভিষিক্তের বিষয়ে উল্লিখিত হাদীসগুলো হতে যুক্তি উপস্থাপন করেন নি?

সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর প্রশংসা যে, এখন শুধু একটি বিষয় অজ্ঞাত রয়ে গেছে, তাঁর চিহ্ন ও নিদর্শন প্রকাশিত হয় নি। বিষয়টি আপনার নিকট উপস্থাপন করছি এ উদ্দেশ্যে যেন অস্পষ্টতা ও গোপনীয়তার পর্দা উন্মোচিত হয়। প্রশ্ন হলো কেন ইমাম আলী (আ.) হযরত আবু বকর ও তাঁর হাতে বাইয়াতকারীদের বিপক্ষে খেলাফত সম্পর্কিত যে সকল হাদীস আপনি উল্লেখ করেছেন তা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন নি? আপনি কি ইমাম হতে উপরোক্ত হাদীসের অর্থ সম্পর্কে অধিকতর অবহিত?

ওয়াসসালাম

স

একশত দুইতম পত্র

১১ রবিউস সানী ১৩৩০ হিঃ

১। সাকীফায় হযরত আলী (আ.)- এর উপরোক্ত দলিল উপস্থাপনে যে প্রতিবন্ধকতাসমূহ ছিল।

২। ইমাম আলী ও তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা ঐ প্রতিবন্ধকতা থাকা সে ও এতদসংক্রান্ত দলিলসমূহ বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন।

১। সকলেই এ বিষয়ে অবগত আছেন, হযরত আলী (আ.), বনি হাশিম ও তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা কেউই সাকীফায় উপস্থিত ছিলেন না। সেদিন তাঁরা সেখানে যান নি এবং সেদিনের সংঘটিত সকল কিছু হতে তাঁরা দূরে ছিলেন (অনবহিত ছিলেন)। নবী (সা.)- এর মৃত্যুর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি ছিল তা হলো নবীর গোসল ও দাফন- কাফনের ব্যবস্থা করা। তাই ওয়াজিব এ দায়িত্ব পালনের জন্যই তিনি ও তাঁর সহযোগীরা ব্যস্ত ছিলেন। নবীর পবিত্র দেহ দাফনের পূর্বেই সাকীফার কর্মকর্তা ও উদ্যোক্তারা তাঁদের কর্ম সম্পাদন করে আবু বকরের বাইয়াতের বিষয়টি পাকাপোক্ত করে ফেলেছিলেন। তাঁরা ঐক্যব ভাবে এ সি ান্ত নিয়েছিলেন যে, যে কোন কথা ও কর্ম যা সাকীফার বাইয়াতকে দুর্বল, সন্দেহযুক্ত ও আশঙ্কার দিকে ঠেলে দিতে পারে তার বিরু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এজন্য তাঁরা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন।

হযরত আলী (আ.) যেহেতু সেখানে উপস্থিতই ছিলেন না সুতরাং কিরূপে তাঁদের বিরু এতদসংক্রান্ত দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করবেন? এমন কি সাকীফা ও মসজিদে নববীতে বাইয়াতের পরও তাঁকে সে সযোগ দেয়া হয় নি। কিরূপে সম্ভব তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করবেন যখন ক্ষমতাধিকারীরা সুপরিকল্পিত ও সতর্কতামূলকভাবে পূর্ব হতেই শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগের নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

বর্তমান সময়েও কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রতিষ্ঠিত একটি সরকারের বিরু   বিদ্রোহ করা সম্ভব কি? যদি এরূপ কোন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায় তবে সে ব্যক্তি রক্ষা পাবে কি? কখনোই নয়। বর্তমানের সঙ্গে সে সময়ের তুলনা করে দেখুন। কারণ বর্তমান ও সে সময়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। (আর বিশেষ ব্যক্তিরাও পরিস্থিতি তাঁদের অনুকূলে না থাকলে এরূপ পদক্ষেপে কখনোই আগ্রহী নন) তবে যদি সকল মুসলমান এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে তাদের নেতার আনুগত্য করে তখনই কেবল ক্ষমতার এ প্রভাববলয় ছিন্ন করা সম্ভব, নতুবা নয়।(২৮*)

উপরন্তু হযরত আলী (আ.) সে সময় ও সেদিন এরূপ যুক্তি প্রদর্শনকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও নিজ অধিকার চিরতরে বিলুপ্ত হবার উপায় ভিন্ন অন্য কিছু মনে করেন নি। কারণ তিনি খোদ ইসলাম ও তাওহীদের বিষয়ে আতঙ্কিত ছিলেন। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি তিনি সে সময় এমন দুই সমস্যার মুখোমুখি ছিলেন যা অন্য কেউ ছিলেন না। একদিকে খেলাফতের বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর সুস্পষ্ট হাদীসসমূহ তাঁকে করুণস্বরে আহবান করছিল যা তাঁর হৃদয়কে রক্তাক্ত করছিল ও অন্তর দ   হচ্ছিল। অন্যদিকে তিনি আশঙ্কা করছিলেন বিদ্রোহীদের বিশৃঙ্খলার কারণে সমগ্র আরব উপদ্বীপ ধ্বংসের সম্মুখীন হবে, আরবরা দলে দলে মুরতাদ হয়ে ইসলামের প্রসার চিরতরে রু   হয়ে যাবে যা ইসলামের বিলুপ্তিই ডেকে আনবে।

মদীনার মুনাফিকরা তাঁকে শঙ্কিত করছিল কারণ তারা নিফাকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার সেই সব আরব যাদের কোরআনই মুনাফিক বলে ঘোষণা করেছে তারাও তাঁর শঙ্কার কারণ ছিল। যেহেতু তারা রাসূলের ওপর অবতীর্ণ বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত ছিল না তাই নিফাকের ক্ষেত্রে কঠোর ছিল। তারা রাসূলের মৃত্যুর ফলে শক্তি ও মনোবল অর্জন করেছিল। অপর পক্ষে মুসলমানরা অন্ধকার ঝড়ের রাত্রিতে একদল হিংস্র নেকড়ের মুখে রাখালহীন মেষপালের মত হয়ে পড়েছিল।

ভণ্ড নবী মুসাইলামা কায্যাব, কুৎসা রটনাকারী তালহা ইবনে খুওয়াইলিদ, প্রতারক সাজাহ বিনতে হারিস ও তাদের সহযোগীরা যেমন ইসলামকে ধ্বংস এবং মুসলমানদের চূর্ণবিচূর্ণ করার

জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। রোম, পারস্য ও অন্যান্য সম্রাজ্যের শাসকবর্গও তেমনি ওত পেতে বসেছিল। এছাড়াও যে সকল বিদ্রোহী নবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইত ও তাঁদের প্রেমিকদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত তারা ইসলামের চরম বিরোধিতা করত এবং ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য সব সময় সচেষ্ট ছিল। এ শক্তিশালী প্রতিপক্ষসমূহ রাসূলের ওফাতের বিষয়টিকে তাদের জন্য সুযোগ ও লক্ষ্যে পৌঁছা চূড়ান্ত মনে করে   ততার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা এ সুযোগের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে চেয়েছিল নির্যাতিতদের সহায় ও ন্যায়ের ধ্বজাধারী এ মুসলমানদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করতে।

তখন যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রক্ষমতা ততটা মজবুত ও দৃঢ় হয়ে ওঠে নি সেহেতু সে মুহূর্তকেই এ আক্রমণের প্রকৃত সময় বলে তারা মনে করেছে।

হযরত আলী (আ.) এ দুই ভিন্নমুখী সমস্যার মধ্যে ছিলেন। সুতরাং তিনি নিজ ন্যায্য অধিকারকে মুসলমানদের জীবনের বিপরীতে বিসর্জন দেবেন এটিই তো স্বাভাবিক।[৫০৫] অবশ্য তিনি সি ান্ত নিয়েছিলেন তাঁর খেলাফতের অধিকারকে ভিন্নভাবে সংরক্ষণ করবেন এবং এজন্য যারা তাঁর এ অধিকার হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তাদের বিরু   এমনভাবে যুক্তি উপস্থাপন করেন যাতে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট না হয় আর শত্রুরাও সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিশৃঙ্খলার জন্ম দিতে না পারে। এজন্যই তিনি গৃহে অবস্থানের সি ান্ত নেন যতক্ষণ না তাঁকে জোরপূর্বক গৃহ হতে বের করা হয় (বাইয়াতের উদ্দেশ্যে)। তিনি যদি স্বেচ্ছায় বাইয়াত করতেন তবে তাঁর অনুসারীরা তাঁর খেলাফতের পক্ষে কোন দলিল- প্রমাণ উপস্থাপনে সক্ষম হতেন না। এভাবে হযরত আলী (আ.) কোন রক্তপাত ছাড়াই তাঁর খেলাফতের অধিকার ও দীনের হেফাজতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।

ইমাম যখন দেখলেন ইসলামের শত্রুদের প্রচেষ্টা নস্যাতের সঙ্গে ইসলামের টিকে থাকা নির্ভর করছে তখন তিনি অভ্যন্তরীণ ঐক্য রক্ষার স্বার্থে খলীফাদের সঙ্গে সহাবস্থানের নীতি অবলম্বন করেন। তিনি উম্মতের ঐক্য ও দীনের নিরাপত্তাকে নিজ অধিকারের ওপর অগ্রাধিকার দান করেন। আখেরাতকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দান এবং দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিবের মধ্যে দ্ব   র

প্রেক্ষিতে অধিকতর গুরুত্বের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়ার লক্ষ্যে তিনি তাঁদের সঙ্গে সমঝোতা করেন। সুতরাং সুস্পষ্ট যে, তৎকালীন অবস্থা ও পরিবেশ তাঁকে তাঁর খেলাফতের অধিকারের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন বা এজন্য বিদ্রোহের সুযোগ দেয় নি।

২। এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিতে তিনি, তাঁর সন্তানগণ ও তাঁর অনুরাগী মনীষীগণ নবী (সা.)-এর ওসিয়ত সম্পর্কিত ঐ আলোচনা ও সুস্পষ্ট হাদীসসমূহ উল্লেখ করতেন। বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবগত।

ওয়াসসালাম

শ

একশত তিনতম পত্র

১২ রবিউস সানী ১৩৩০ হিঃ

ইমাম ও তাঁর বন্ধু- অনুরাগীদের যুক্তিসমূহ বর্ণনার আহবান।

ইমাম (আলী) কোথায় এরূপ কথা বলেছেন? তাঁর বংশধর ও বন্ধুরাই বা কখন এ বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন? তার কিছু উদাহরণ পেশ করুন।

ওয়াসসালাম

স

একশত চারতম পত্র

১৫ রবিউস সানী ১৩৩০ হিঃ

১। ইমাম আলী (আ.) যে সকল ক্ষেত্রে এ সম্পর্কিত দলিল উপস্থাপন করেছেন।

২। হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.)- ও এ সম্পর্কিত দলিল উপস্থাপন করেছেন।

১। ইমাম আলী (আ.) এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন। যাতে ইসলামের কোন ক্ষতি না হয় এজন্য সতর্কতামূলকভাবে কখনোই তাঁর শত্রুদের বিরু তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতেন না। মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি কখনো তাদের বিরু কঠোর সি ান্ত নিতেন না। কখনো তিনি তাঁর অধিকার দাবী না করে বা এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ না করে বলতেন 'কোন ব্যক্তি তার অধিকার আদায়ের বিষয়ে বিলম্ব করলে সেটি তার ত্রুটি বলে গণ্য নয়, বরং ত্রুটি ঐ ব্যক্তির যে বিষয়ে তার অধিকার নেই তা যদি সে হস্তগত করে।'[৫০৬]

তাঁর অধিকার সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করতেন যাতে তাঁর প্রজ্ঞার প্রতিফলন ঘটত। যেমন লক্ষ্য করেছেন তিনি রাহবার দিনে (তাঁর খেলাফতের সময়কালে) কিরূপে লোকদের সমবেত করে গাদীর দিবসকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যে কোন মুসলমান গাদীরের সেই দিনে রাসূল কি বলেছিলেন তা শুনে থাকলে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দাও। যারা নবীকে ঐ দিন সে অবস্থায় দেখেছে তারা ব্যতীত অন্যদের দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই।"

ত্রিশ জন সাহাবী যাঁদের বারজন বদরী সাহাবী ছিলেন উঠে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন গাদীর দিবসে নবী (সা.) হতে হাদীসটি শুনেছেন।[৫০৭] হযরত উসমানের হত্যা এবং বসরা ও সিরিয়ায় উ ূত ফিতনার জটিল পরিস্থিতিতে তিনি এ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। আমার আত্মার শপথ, সেরূপ মুহূর্তে এ ধরনের দলিল উপস্থাপন খুব কমই লক্ষ্য করা যায় যদিও তা প্রজ্ঞাপূর্ণ। হযরত আলী

(আ.)- এর মহান মর্যাদার প্রতি সালাম তাঁর এ কর্মের জন্য। যে মুহূর্তে গাদীরের হাদীস সকলের স্মরণ হতে মুছে যাবার উপক্রম হয়েছিল সে মুহূর্তে রাহবার ঐ বৃহৎ সমাবেশে তিনি তা উ ল ও জীবিত করে তোলেন।

সেদিন গাদীর দিবসের দৃশ্য সকলের নিকট তিনি প্রতিমূর্ত করে তোলেন। রাসূল (সা.) হযরত আলী (আ.)- এর হাত উঁচিয়ে ধরে রয়েছেন, এক লক্ষ বা ততোধিক সাহাবী তাঁদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এবং নবী (সা.) ঘোষণা করছেন, "আলী আমার পর তোমাদের মাওলা (অভিভাবক)।" এ কারণেই গাদীরের হাদীস মুতাওয়াতির হাদীসসমূহের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। নবী (সা.)- এর প্রজ্ঞাকে লক্ষ্য করুন কোন্ প্রেক্ষাপটে তিনি এ ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির প্রজ্ঞাও লক্ষ্য করুন কিরূপে তিনি রাহবায় সকলকে সমবেত করে এভাবে কসম দিয়ে সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে গাদীরকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এভাবে ইমাম আলী (আ.) সময়ের চাহিদানুযায়ী অত্যন্ত নমনীয়তার সঙ্গে তাঁর অধিকারের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। পূর্ণ সতর্কতা ও শান্তি বজায় রেখে তিনি সকল সময় এ বিষয়টিকে উপস্থাপন করতেন এবং এভাবেই খেলাফত সম্পর্কিত রাসূলের হাদীসসমূহকে প্রচারের দায়িত্ব পালন করতেন ও কোন উচ্চবাচ্য ছাড়াই এ সম্পর্কে অসচেতন মানুষদের সচেতন করতেন। ফলে তা কখনোই বিদ্বেষ ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দিত না।

এ সম্পর্কিত যে সকল হাদীস সুনান লেখকগণ উল্লেখ করেছেন তা আপনার অবগতির জন্য যথেষ্ট বলে মনে করছি। লক্ষ্য করুন যেদিন নবী (সা.) মহান আল্লাহর নির্দেশে তাঁর নিকটাত্মীয়দের ভীতি প্রর্দশনের জন্য তাঁর চাচা ও মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আবু তালিবের গৃহে তাদের সমবেত করেছিলেন সেদিন যে দীর্ঘ হাদীস তিনি বর্ণনা করেন তার গুরুত্ব কতটা?[৫০৮] উম্মাতের নিকট এ ঘটনা ইসলাম ও নবুওয়াতের নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত। কারণ সেদিন নবী (সা.) মু'জিযার মাধ্যমে সামান্য খাদ্যের দ্বারা বড় সংখ্যার একদল মানুষকে পরিতুষ্ট করেছিলেন। এ হাদীসটির শেষে বর্ণিত হয়েছে নবী (সা.) সেখানে আলীর কাঁধে হাত রেখে বলেন, "এ বালক (আলী)

তোমাদের মাঝে আমার ভ্রাতা, স্থলাভিষিক্ত ও নির্বাহী প্রতিনিধি। তোমরা তার কথা   বণ ও তার আনুগত্য করবে।”

হযরত আলী (আ.) প্রায়ই বলতেন, “রাসূল (সা.) আমার সম্পর্কে বলেছেন :

أنْتَ وَلِيّ كلّ مُؤمِن بعْدي   তুমি আমার পর সকল মুমিনের অভিভাবক।” রাসূলের এ হাদীসটিও তিনি প্রায়ই উল্লেখ করতেন, أنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هارونَ منْ موسى তুমি আমার নিকট সে অবস্থানে রয়েছ যে অবস্থান মূসার নিকট হারুনের ছিল। এমন কি গাদীরে খুমের এ হাদীসটিও ইমাম আলী (আ.) অনেকবার উল্লেখ করেছেন, “নবী (সা.) বলেছেন :

ألسْتُ أولى بالمؤمنين من أنْفُسهم؟ قالوا بَلى! قالَ : من كنتُ وليّه فهذا عليّ وَلِيّه

আমি কি মুমিনদের নিজেদের অপেক্ষা তাদের ওপর অধিক অধিকার রাখি না? তারা বলল : হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : আমি যার অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক।”

প্রতিষ্ঠিত ও অনস্বীকার্য এরূপ অনেক হাদীসই তিনি বিশ্বস্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিদের মাঝে বর্ণনা ও প্রচার করেছেন। যে সময়ের প্রেক্ষাপটে যে বিষয়গুলো উপস্থাপনের সুযোগ ছিল তা তিনি উপস্থাপন করেছেন। যদিও তা তাদের ওপর কোন প্রভাব ফেলে নি তদুপরি তিনি যতটুকু প্রয়োজন ছিল ততটুকু বলেছেন, যেমন শুরা বা পরামর্শ পরিষদের (উমর ইবনে খাত্তাবের মৃত্যু পরবর্তীতে) কর্মকাণ্ডের দিন তিনি এর সদস্যদের খলীফা মনোয়ননের বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে নিজ মর্যাদা ও অবস্থানের সপক্ষে পর্যাপ্ত দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

তাঁর খেলাফতের সময়েও নিজ অধিকার ও বঞ্চনার বিষয়ে মিম্বারে বলেছেন, “আল্লাহর শপথ, অমুক খেলাফতের পোষাক পরিধান করেছে অথচ সে ভালভাবেই জানত আমার সাথে খেলাফতের সম্পর্ক ঘানির (যাতা) কেন্দ্রীয় দণ্ডের ন্যায়, জ্ঞান আমার অস্তিত্ব থেকেই উৎসারিত হয় এবং আমার মর্যাদার শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছার চিন্তা কোন বিহঙ্গও করতে পারে না। তাই আমি সাধারণ পোষাক পরিধান করে নিজেকে সঙ্কুচিত করে নিলাম। ভাবছিলাম নিজ অধিকার আদায়ের জন্য একক সংগ্রামে লিপ্ত হব নাকি এ বঞ্চনা আমার হৃদয়ে যে অন্ধকারের ছায়া

ফেলেছে তাতে ধৈর্য ধারণ করবো? এটি এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তা চিন্তা করতে বৃ রা অথর্ব এবং শিশুরা বৃে পরিণত হয়ে যেত এবং মুমিনরা এতটা কষ্ট পেত যে, তাদের জীবনাবসান ঘটত এবং মৃত্যুর মাধমে স্রষ্টার নৈকট্যকেই ে য় মনে করত। দেখলাম ধৈর্য ধারণই বুি বৃত্তিক। ধৈর্য ধারণ করলাম এমন অবস্থায় যে, আমার চোখে কণ্টক এবং গলায় হাড় বি হয়েছিল। আমার উত্তরাধিকার এভাবে হৃত হলো।"[৫০৯] খুতবা- ই শিকশিকিয়ার শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টি তিনি বর্ণনা করেছেন।

কতবার তিনি বলেছেন, "হে আল্লাহ্! আমি কুরাইশ ও তাদের সহযোগীদের বিপক্ষে আপনার সাহায্য চাই।[৫১০] তারা আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আমার মর্যাদা ও সম্মানকে ক্ষুদ্র করে ফেলেছে। খেলাফতের বিষয়ে আমার বিরুে ঐক্যব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।" অতঃপর তিনি বলেছেন, "কোন কোন অধিকার রয়েছে যা আদায় করতে হয়।" তখন এক ব্যক্তি উঠে বলল, "হে আবু তালিবের পুত্র! তুমি খেলাফতের প্রতি লোভী।"[৫১১] তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ, তোমরা আমার চেয়ে এর প্রতি অধিকতর লোভী কারণ আমি ঐ অধিকার দাবী করছি যা আমার আর তোমরা তা দখলের নিমিত্তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছ।"

আবার বলেছেন, "আল্লাহর শপথ, রাসূলের ওফাতের পর হতে এখন পর্যন্ত আমি আমার অধিকার হতে বঞ্চিত এবং আমার প্রতি সকল সময় স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ করা হয়েছে।"[৫১২]

অন্যত্র বলেছেন, "আমাদের যে অধিকার রয়েছে তা যদি দেয়া হয় তা উত্তম আর যদি না দেয়া হয় তবে ধৈর্য ধারণ করবো যদিও তা দীর্ঘ হয়।"

নিজ ভ্রাতা আকীলের প্রতি লিখিত পত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, "মহান আল্লাহ্ আমার প্রতি অসদাচরণের কারণে কুরাইশদের শাস্তি দিন, তারা আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তোমার মাতার সন্তানকে ক্ষমতা ও শাসনকার্য (হুকুমত) থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।"[৫১৩]

অনেক বার বলেছেন, "লক্ষ্য করলাম আমার আহলে বাইত ব্যতীত কোন সহযোগী নেই। তাই তাদের মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ হতে বিরত হলাম, কাঁটা বি চোখ বন্ধ করলাম, হাড় বি গলায় পানীয় পান করলাম, ক্রোধ দমনের জন্য চরম তিক্ততার সাথে ধৈর্য ধারণ করলাম।"[৫১৪]

যখন তাঁর কিছু সাহাবী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “কিরূপে আপনার আত্মীয়- স্বজন সর্বোত্তম ও যোগ্যতম হওয়া স ও আপনার হতে এ পদ কেড়ে নিল?” তিনি বললেন, “হে আসাদের ভ্রাতা! তুমি একজন দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তি। যদিও সঠিক সময় ও স্থানে তুমি প্রশ্ন কর নি তদুপরি তোমার সাথে আমার আত্মীয়তার কারণে এ বিষয়ে তোমার জানার অধিকার রয়েছে। জানতে চেয়েছ আমাদের মর্যাদা সর্বাধিক ও রাসূল (সা.)- এর নৈকট্যের ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে নিকটের হওয়া স ও কেন আমাদের সাথে স্বৈরাচারী আচরণ করা হয়েছে। এর কারণ হলো আমাদের সম্মান ও মর্যাদা তাদের অনেককে ঈর্ষান্বিত ও এর প্রতি লোভাতুর করে। আবার অনেকে কল্যাণের চিন্তা করে মহ র সাথে এ হতে বিরত হলেন। এখন আল্লাহ্ বিচারক এবং কিয়ামতে সকলের প্রত্যাবর্তন তাঁর দিকে।”[৫১৫]

অন্যত্র তিনি বলেছেন, “আমাদের ভিন্ন তারা কোথায় যারা নিজেদের প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী করেছিল? এ এক মিথ্যা দাবী যা আমাদের বিপক্ষে করা হয়েছে এবং আমাদের প্রতি অন্যায় ও অবিচার করা হয়েছে। তারা এসে লক্ষ্য করুক আল্লাহ্ আমাদের সমুন্নত এবং তাদের অসম্মানিত করেছেন। আল্লাহ্ আমাদের দিয়েছেন, তাদের বঞ্চিত করেছেন, তিনি আমাদের নিজ অনুগ্রহ ও নিয়ামতে প্রবেশ করিয়েছেন, তাদেরকে বহিষ্কার করেছেন। আমাদের মাধ্যমেই মানুষ হেদায়েতপ্রাপ্ত ও দৃষ্টিবান হয়। ইমাম ও নেতা কুরাইশদের মধ্যে বনি হাশেমের জন্য নির্দিষ্ট করা হযেছে, অন্যদের মাঝে নেতৃত্বের এরূপ যোগ্যতা নেই। তাই তাদের হতে (ইসলামী রাষ্ট্রের) নেতা হতে পারে না।”[৫১৬]

তাঁর কোন কোন খুতবায় এরূপ এসেছে- যখন রাসূল (সা.)- এর রুহ আল্লাহর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল তখন অনেকেই ইসলামপূর্ব যুগে ফিরে গেল। প্রবৃত্তি তাদের পথভ্রষ্ট করল। তারা প্রতারণার আ য় নিল ও অনাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করল। তাদের যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছিল তা রক্ষা করল না, বরং খেলাফতের প্রাসাদকে তার প্রকৃত স্থান থেকে স্থানান্তর এবং পথভ্রষ্টতা ও ত্রুটিপূর্ণ স্থানে স্থাপনের সি ান্ত নিল। তারা ঐ সকল ব্যক্তি যারা

হিংসায় নিমজ্জিত ছিল, যারা প্রবৃত্তির নেশায় মত্ত হয়ে পড়েছিল। তারা ফিরআউনের বংশধরের পথ অবলম্বন করেছিল, প্রকাশ্যে দীন ত্যাগ করে দুনিয়ার সাথে সংযুক্ত হয়েছিল।[৫১৭]

নিজ খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণের পর তিনি যে খুতবা পাঠ করেন যা নাহজুল বালাগাহর একটি উ ল ও আকর্ষণীয় ব্যক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত, তাতে তিনি বলেন, ‘‘এই উম্মতের কোন ব্যক্তিকেই রাসূলের আহলে বাইতের সাথে তুলনা করা সম্ভব নয়, মুহাম্মদ (সা.)- এর বংশধরগণ যে নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত তারা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা এক সারিভুক্ত হতে পারে না। নবীর আহলে বাইত দীনের ভিত্তি ও ইয়াকীনের স্তম্ভ, সীমা লঙ্ঘনকারীরা তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, পশ্চাদপদরা তাদের দিকে সংযুক্ত হবে, তাদের মাঝেই নবীর উত্তরাধিকারী, নির্বাহী প্রতিনিধিত্ব ও বেলায়েতের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এখন খেলাফত তার প্রকৃত অধিকারীর নিকট ফিরে এসেছে, স্থানচ্যুত হবার পর তার সঠিক স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছে।”[৫১৮]

অন্য এক খুতবায় তিনি তাঁর বিরোধীদের কথায় অবাক হয়ে বলেছেন, “আমি আশ্চর্যান্বিত হই এবং কেনই বা আর্শ্চয হব না কারণ এ সকল ব্যক্তি তাদের দীনের যুক্তি ও নিদর্শনের ক্ষেত্রে ভুলে আপতিত হয়ে না নবীর অনুসরণ করছে, না নবীর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত প্রতিনিধির।”[৫১৯]

২। এ বিষয়ে হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.)- ও কয়েকটি সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উ ৃত দু’টি প্রসি খুতবা মুখে মুখে বংশ পরম্পরায় সকলের নিকট পৌঁছেছে যা মুখস্থ করার জন্য আহলে বাইতের ইমামগণ তাঁদের সন্তানদের উদ্বু করতেন। এ বিষয়ে কোরআন হিফয (মুখস্থ) করার মত এ দুই খুতবা হিফজ করাও তাঁদের জন্য আবশ্যকীয় মনে করতেন।

যে সকল ব্যক্তি খেলাফতকে প্রকৃত স্থান হতে চ্যুত করে নিজেরা তা দখল করেছিল হযরত ফাতিমা (আ.) তাদের কর্মের প্রতিবাদ করে বলেন, “দুর্ভাগ্য তাদের যারা খেলাফতকে রেসালতের দৃঢ় পর্বত ও এর চূড়া হতে স্থানচ্যুত করেছে, নবুওয়াতের স্তম্ভ ও ফেরেশতাদের অবতীর্ণ হবার স্থান থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ঐ ব্যক্তি হতে খেলাফতকে দূরে সরিয়েছে যে দীন ও দুনিয়ার বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী। তাদের এ কর্মের ফল প্রকাশ্য ক্ষতি ব্যতীত কিছুই হতে পারে না। আবুল হাসানের মধ্যে কোন ত্রুটি কি তারা দেখেছিল? কেন তাঁর প্রতি তারা অসন্তষ্ট? আল্লাহর

শপথ, তারা যুে আবুল হাসানের তরবারীর ক্ষুরধারতা, আল্লাহর নির্দেশের ক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ়তা ও ক্রোধ সম্পর্কে জানত। আল্লাহর শপথ, তারা যদি রাসূলের নির্দেশ মত খেলাফত পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করে তাঁর আনুগত্য করত তাহলে তিনি দৃঢ়তার সাথে তা ধারণ করে তাদের জন্য শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনের ব্যবস্থা করতেন যেখানে কোন অসন্তুষ্টিই থাকত না। কোন ব্যক্তিই কষ্টে পতিত হত না। তিনি তাদের এমন গন্তেব্যে পৌঁছে দিতেন যেখান হতে জীবন- সঞ্চারী সুপেয় ধারা প্রবাহিত হয়, স্বচ্ছ ও পরিষ্কার পানি যার নদীসমূহের তীর উপচে পড়ে। যে পানিতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই যা তার প্রবাহকে বন্ধ করতে পারে। তিনি অবিরত প্রবাহমান এ পানি হতে তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করাতেন যা কখনোই শেষ হবার নয়। তিনি গোপন ও প্রকাশ্যে তাদের উপদেশ দিতেন। তিনি আসমান ও যমীনের বরকতের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করতেন। ক্ষুধার প্রাচীর তিনি বিলুপ্ত করতেন। এসব ব্যতীত তিনি কিছুই চাইতেন না। তাই তাঁর বিষয়ে যারা এরূপ করেছে অতি শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন। বণ কর তোমাদের জন্য কঠিন দিন অপেক্ষা করছে। যে অবস্থায় রয়েছ তা হতে বিস্ময়কর অবস্থা তোমাদের সামনে রয়েছে। কিরূপ নিকৃষ্ট আ য়স্থলই না তোমরা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছ! কিরূপ দুর্বল হাতলই না তোমরা ধারণ করেছ! কত মন্দ নেতা ও অভিভাবক তোমরা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছ! অত্যাচারীরা কি মন্দ ব্যাবাসায়ই না করেছে! মূল শাখা ত্যাগ করে তারা পাতা ও অগ্রভাগ ধারণ করেছে, পাখা ত্যাগ করে পুচ্ছ ধরেছে, ঘোড়ার কেশর ত্যাগ করে লেজের চুল ধারণ করেছে। এ গোত্রসমূহের নাসিকা কর্তিত ও ভূলু ত হোক। তারা ভেবেছে উত্তম কাজ করেছে অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা অন্যায়কারী ও তাদের চিন্তাশক্তি অক্ষম। ধ্বংস তাদের জন্য। যে ব্যক্তি অন্যদের সত্যের পথে হেদায়েত করে সে অধিকতর অনুসরণযোগ্য নাকি ঐ ব্যক্তি যে হেদায়তের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী? তোমাদের কি হয়েছে? কিরূপ মন্দ তোমাদের ফয়সালা![৫২০]

এগুলো নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করলাম। পবিত্র আহলে বাইতের বক্তব্যগুলোকে এর সাথে মিলিয়ে তুলনা করুন।

ওয়াসসালাম

শ

একশত পাঁচতম পত্র

১৬ রবিউস সানী ১৩৩০ হিঃ

এ আলোচনাটি আরো দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গ করার আহবান জানাচ্ছি। হযরত আলী ও হযরত ফাতিমা (আ.) ব্যতীত অন্যদের হতে উপস্থাপিত প্রমাণসমূহ আলোচনা করুন। আপনার ৫ ষ্ঠত্ব প্রমাণ করুন।

ওয়াসসালাম

স

একশত ছয়তম পত্র

১৮ রবিউস সানী ১৩৩০ হিঃ

১। ইবনে আব্বাসের যুক্তিসমূহ।

২। ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আ.)- এর উপস্থাপিত দলিল।

৩। রাসূল (সা.)- এর যে সব সাহাবী শিয়া বলে প্রসি তাঁদের উপস্থাপিত দলিল।

৪। মহানবী (সা.)- এর ওসিয়তের বিষয়ে তাঁদের উপস্থাপিত দলিলের প্রতি ইঙ্গিত।

১। এখানে ইবনে আব্বাস ও হযরত উমরের মধ্যে সংঘটিত দীর্ঘ আলোচনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইবনে আব্বাসকে উমর বললেন, "তুমি কি জান তোমাদের স্বগোত্রীয়রা কেন তোমাদেরকে তোমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে?" ইবনে আব্বাস বলেন, "আমি তার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই নি। তাই বললাম : আমীরুল মুমিনীন জানেন। উমর বললেন : নবুওয়াত ও খেলাফত এক গৃহে সমবেত হোক এটি তারা পছন্দ করে নি, কারণ এতে যদি তোমরা অহঙ্কারী ও অতি উৎফুল্ল হয়ে পড়। এজন্য কুরাইশরা খেলাফতকে নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে ও তাতে পৌঁছতে সক্ষম হয়।" ইবনে আব্বাস বলেন, "যদি আমাকে কিছু বলার অনুমতি দেন তাহলে এ বিষয়ে আপনার ক্রোধকে প্রশমিত করে আমি কিছু বলব। তিনি বললেন : বল।

আমি বললাম : আপনার বক্তব্য অনুযায়ী কুরাইশরা খেলাফতকে নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে তাতে পৌঁছতে সফল হয়। এক্ষেত্রে যদি মহান আল্লাহ্ই খেলাফতকে তাদের জন্য মনোনীত করে থাকেন তবে তারা সঠিক কাজটিই করেছে। তাই তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করা বা তাদের হতে তা ফিরিয়ে নেয়া ঠিক হবে না। কিন্তু আপনি যে বলছেন তারা চায় নি নবুওয়াত ও খেলাফত এক গৃহে সমবেত হোক যদি তা সঠিক হয়ে থাকে তবে তারা নিম্নোক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত যেখানে

আল্লাহ্ বলেছেন : (ذلك بأنّهم كرهوا ما أنْزَلَ الله فأحْبَطَ أعمالهم) আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল, তাই তিনি তাদের কর্মকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। (সূরা- মুহাম্মদঃ৯)

উমর বললেন : আফসোস, হে আব্বাসের পুত্র! তোমার বিষয়ে আমার নিকট কিছু তথ্য এসেছে। আমি চাই না তুমি নিজেই সে বিষয়ে স্বীকারোক্তি করে আমার নিকট তোমার মর্যাদা হারাও। আমি বললাম : বিষয়টি কি? যদি আমি সত্য বলে থাকি তবে আপনার নিকট আমার মর্যাদা হারানো উচিত নয়। যদি অসত্য হয়ে থাকে তবে বলব আমি মিথ্যাকে আমা হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছি।

উমর বললেন : আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, তুমি বলেছ খেলাফতকে বিদ্বেষবশত অন্যায়ভাবে তার প্রকৃত কেন্দ্র হতে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

আমি বললাম : আপনি বলেছেন অন্যায়ভাবে এটি করা হয়েছে, তা জ্ঞানী ও মূর্খ সকলের নিকটই স্পষ্ট এজন্য যে, হযরত আদমের প্রতিও বিদ্বেষ পোষণ করা হযেছিল এবং আমরা তাঁর সন্তান হিসেবে অন্যদের বিদ্বেষের কারণ হওয়া স্বাভাবিক।

উমর বললেন : বহুদূর, বহুদূর। আল্লাহর শপথ, তোমাদের বনি হাশিমের অন্তরসমূহ বিদ্বেষে পূর্ণ যা কখনো দূর হবার নয়। আমি বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন! যে অন্তরসমূহকে মহান আল্লাহ্ অপবিত্রতা ও কলুষতা থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন[৫২১] সে সম্পর্কে এমন কথা বলবেন না।"[৫২২]

অন্য একবার তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে কথোপকথন হলে উমর ইবনে আব্বাসকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার চাচাতো ভাইয়ের খবর কি?" ইবনে আব্বাস বলেন, "আমি মনে করেছিলাম তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর সম্পর্কে জানতে চাইছেন। তাই বললাম : সে তার বন্ধুদের সাথে জীবন অতিবাহিত করছে। উমর বললেন : আমি তার কথা বলি নি। আমার উদ্দেশ্য তোমাদের আহলে বাইতের প্রধান ব্যক্তি। আমি বললাম : তাঁকে বালতি দিয়ে পানি উঠাতে দেখে এসেছি ও তখন তিনি কোরআন পাঠ করছিলেন। উমর রাগান্বিত হয়ে বললেন : কোরবানীর সকল উটের রক্তের দায়- দায়িত্ব তোমার ওপর বর্তাক, আমি যা জানতে চেয়েছি তা তুমি গোপন করছ। আমি

জানতে চাইছি এখনও তাঁর অন্তরে খেলাফতের আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করছে কি? বললাম : হ্যাঁ। উমর বললেন : সে কি মনে করেছে রাসূলুল্লাহ্ তাঁকে খলীফা মনোনীত করে গিয়েছেন?”

ইবনে আব্বাস বলেন, “আমি এর থেকে বড় কিছু বলতে চাই। আমি আমার পিতাকে খেলাফতের বিষয়ে হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : বিষয়টি সত্য। উমর বলেন : নবী (সা.) তাঁর কথায় তাঁর (আলীর) উচ্চ মর্যাদার বিষয়ে বলতেন, কিন্তু তাঁর এ কথা খেলাফতের বিষয়ে সুস্পষ্ট দলিল হতে পারে না। যদিও নবী কখনো কখনো তাঁর খেলাফতের বিষয়ে উম্মতকে পরীক্ষা করতেন এবং তাঁর অন্তিম অসুস্থতার সময় সি ান্ত নিয়েছিলেন তাঁকে খলীফা মনোনীত করবেন কিন্তু আমি তা হতে দিই নি।”[৫২৩]

তৃতীয়বারের মত এ বিষয়ে ইবনে আব্বাসের সাথে তাঁর কথোপকথনে উমর ইবনে আব্বাসকে বলেন, “তোমার বন্ধুকে মজলুম দেখছি।” ইবনে আব্বস বললেন, “যদি তাই হয় তবে অন্যায়ভাবে তাঁর যে অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে তা ফিরিয়ে দিন। উমর এ কথা শুনে আমার হাত হতে নিজ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ নিজে নিজে কি যেন বলতে লাগলেন। তিনি দাঁড়ালে আমি নিকটে গেলাম। তিনি বললেন : ইবনে আব্বাস! আমার মনে হয় না স্বগোত্রীয়রা (কুরাইশ) তাঁর মর্যাদাকে ছোট করে দেখা ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাঁকে বঞ্চিত করেছে।” ইবনে আব্বাস বললেন, “আমি বললাম : আল্লাহর শপথ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যখন আলীকে তোমার বন্ধু (আবু বকর) হতে সূরা তওবা গ্রহণের জন্য পাঠান তখন তাঁকে ক্ষুদ্র মনে করেন নি। উমর আমা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে   ত চলে গেলেন, আমিও ফিরে আসলাম।”[৫২৪]

বনি হাশিমের মুখপাত্র, রাসূলের চাচাত ভাই, উম্মতের জ্ঞানের প্রতিভূ ইবনে আব্বাসের সাথে খলীফা উমরের এ ধরনের আলোচনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছে। একদল ব্যক্তি যারা আলী (আ.)- এর সম্পর্কে মন্দ বলছিল তাদের উদ্দেশ্যে ইবনে আব্বাস যে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন তা ছাব্বিশ নম্বর পত্রে এনেছি যাতে হযরত আলী (আ.)- এর দশটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ে ষ্ঠত্ব তিনি উল্লেখ করেছেন। সেখানে উল্লিখিত হয়েছে নবী (সা.) তাঁর দাদা ও চাচার পুত্রদের সমবেত করে বলেন, “তোমাদের মধ্য হতে কে দুনিয়া ও আখেরাতে আমার সহযোগী হতে রাজী আছ?” কেউ

ইতিবাচক জবাব না দিলে ইমাম আলী (আ.) দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার সহযোগী হব।" তখন তিনি আলী (আ.)- কে বললেন, أنت وليّ في الدّنيا و الآخرة "তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার সহযোগী।"

সর্বশেষে সেখানে উল্লিখিত হয়েছিল রাসূল (সা.) তাবুকের যু র উদ্দেশ্যে যখন মদীনা হতে সকলকে নিয়ে বের হন তখন আলী (আ.) এসে বললেন, "হে আল্লাহর নবী! আমিও আপনার সাথে যেতে চাই?" নবী (সা.) বললেন, "না।" আলী কেঁদে ফেললেন। রাসূল (সা.) তাঁকে বললেন, "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে আমার সম্পর্ক মূসার সাথে হারুনের সম্পর্কের ন্যায়, তবে আমার পর কোন নবী নেই। কিন্তু তুমি আমার খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হবার উপযুক্ত বলেই এটি ঠিক হবে না আমি চলে যাব আর তোমাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে যাব না।"

ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, "নবী (সা.) তাঁকে বলেন : তুমি আমার পর সকল মুমিনের নেতা ও অভিভাবক। আমি যার মাওলা (অভিভাবক) আলীও তার মাওলা।"

২। বনি হাশিমের অনেকেই এ ধরনের যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, এমন কি একবার ইমাম হাসান (আ.) আবু বকরকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, "আমার পিতার স্থান (রাসূলুল্লাহর মিম্বার) হতে নেমে আসুন।" ইমাম হুসাইন (আ.)- ও হযরত উমরকে উদ্দেশ্য করে এরূপ কথা বলেন।[৫২৫]

৩। শিয়া সূত্রের গ্রন্থগুলোতে হাশিমী এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্য হতে তাঁদের অনুসারীরা যে প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করেছেন তা উল্লিখিত হয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে জানার জন্য এতদসম্পর্কিত গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য আহবান জানাচ্ছি। তবে এখানে আল্লামাহ্ তাবারসীর 'ইহতিজাজ' গ্রন্থে নিম্নোক্ত সাহাবীদের হতে যে বর্ণনা এসেছে তা লক্ষ্য করুন। সাহাবীদের মধ্যে খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস উমাভী[৫২৬], সালমান ফারসী, আবু যর গিফারী, আম্মার ইয়াসির, মিকদাদ, বুরাইদাহ্ আসলামী, আবুল হাইসাম ইবনে তিহান, সাহল ও উসমান ইবনে

হুনাইফ, খুজাইমা ইবনে সাবেত যুশ শাহাদাতাইন, উবাই ইবনে কা’ব, আবু আইয়ুব আনসারী ও অন্যান্যরা এ বিষয়ে যে সকল দলিল উপস্থাপন করেছেন তা অধ্যয়ন করুন।

কেউ আহলে বাইত (আ.) এবং তাঁদের বন্ধুদের জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখবেন তাঁরা কখনোই সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। যখনই কোন সুযোগ পেতেন সরাসরি অথবা

ইশারা-ইঙ্গিতে, কখনো নরম স্বরে, কখনো উচ্চকে দৃঢ়তার সাথে বিরোধীদের সৃষ্ট কঠিন পরিস্থিতিতেও তাঁদের বক্তব্য ও লেখায় এ সম্পর্কে যুক্তি উপস্থাপন করতেন।

৪। তাঁরা বিভিন্ন সময় রাসূল (সা.)-এর ওসিয়ত সম্পর্কে কথা বলতেন ও তা হতে যুক্তি উপস্থাপন করতেন।

ওয়াসসালাম

শ

একশত সাততম পত্র

১৯ রবিউস সানী ১৩৩০ হিঃ

কোথায় এবং কখন তাঁরা ওসিয়তের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন?

ইমাম (হযরত আলী) সম্পর্কিত ওসিয়তের বিষয়টি কোথায় এবং কখন তাঁরা স্মরণ করেছেন? উম্মুল মুমিনীন (আয়েশা)- এর সম্মুখে একবার শুধু বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছিল ও তিনি তা অস্বীকার করেন। যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

ওয়াসসালাম

স

একশত আটতম পত্র

২২ রবিউস সানী ১৩৩০ হিঃ

ওসিয়ত সম্পর্কিত উপস্থাপিত প্রমাণসমূহ

হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) ওসিয়তের বিষয়টি মিম্বারে আলোচনা করেছেন যা আমরা হুবহু ১৪৪ নম্বর পত্রে উল্লেখ করেছি। যে সকল বর্ণনাকারী হাদীসে ইয়াওমু ার বা ইয়াওমুল ইনযার (সূরা শুআরার ২১৪ নম্বর আয়াত অবতীর্ণের পটভূমি) বর্ণনা করেছেন তাঁদের অনেকেই হযরত আলীর সনদে তা নকল করেছেন। হযরত আলীর খেলাফত ও ওসিয়তের বিষয়টি তাতে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয়েছে। আমরা ২০ নম্বর পত্রে হাদীসটি এনেছি। তদুপরি হযরত আলী (আ.)- এর শাহাদাতের পর বেহেশতের যুবকদের নেতা ইমাম হাসান মুজতবা অতীব মূল্যবান যে বক্তব্যটি রাখেন তাতে তিনি বলেন, "আমি রাসূল (সা.) ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও মনোনীত প্রতিনিধির (ওয়াসি) সন্তান।"[৫২৭]

ইমাম জাফর সাদেক (আ.) বলেছেন, "ইমাম আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর নবুওয়াতের পূর্বেও তাঁর সাথে ছিলেন এবং ফেরেশতাদের আহবান শুনতে পেতেন ও রেসালতের নূর প্রত্যক্ষ করতেন।"[৫২৮] তিনি আরো বলেন, "নবী (সা.) আলীকে লক্ষ্য করে বলেন : আমি যদি শেষ নবী না হতাম তবে তুমি নবুওয়াতের ক্ষেত্রে আমার অংশীদার হতে। কিন্তু তুমি নবী নও কারণ নবীর ওয়াসি (মনোনীত প্রতিনিধি) ও উত্তরসূরী।" আহলে বাইতের সকল ইমাম হতে এ ভাবার্থ মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আহলে বাইতের ইমামগণ ও তাঁদের অনুসারীরা সাহাবীদের সময়কাল হতে এখন পর্যন্ত বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস করেন।

সালমান ফারসী বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) সব সময়ই বলতেন, "আমার মনোনীত প্রতিনিধি (ওয়াসি) আমার রহস্যের কেন্দ্র, আমি যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে আমার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রেখে যাব সে আলী ইবনে আবি তালিব। সে আমার দেয়া প্রতিশ্রুতিসমূহ রক্ষা ও আমার ঋণসমূহ পরিশোধ করবে।"

আবু আইয়ুব আনসারী বলেছেন, “আমি শুনেছি রাসূল (সা.) ফাতিমাকে বলেছেন : তুমি কি জান মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার মধ্য হতে তোমার পিতাকে মনোনীত করে নবী ঘোষণা করেন। অতঃপর এর অধিবাসীদের মধ্য হতে তোমার স্বামীকে মনোনীত করে আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেন যেন তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিই ও আমার স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করি।”

‘বুরাইদাহ্ বর্ণনা করেছেন, “নবী (সা.)- কে বলতে শুনেছি, সকল নবীরই উত্তরাধিকারী ও ওয়াসি ছিল। আমার উত্তরাধিকারী ও ওয়াসি আলী ইবনে আবি তালিব।”[৫২৯]

জাবির ইবনে ইয়াযীদ জো’ফী যখনই ইমাম বাকির (আ.) হতে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন حدّثني وَصيّ الأوصياء অর্থাৎ এ হাদীসটি (নবীর) মনোনীত নির্বাহী প্রতিনিধিদের অন্যতম হতে শুনেছি।

(হারিশ বারিকীর কন্যা) উম্মুল খাইর সিফিফনের যু   কুফাবাসীদের মুয়াবিয়ার বিরু   যু উদ্বু   করার লক্ষ্যে যে   ালাময়ী বক্তব্য রাখেন তাতে তিনি বলেন :-

هلمُّوا رَحِمكُمُ الله إلىَ الإمام العادل الوَصِيّ الوفيّ الصّدّيق الأكبر “আল্লাহ্ তোমাদের ওপর দয়া করুন; তোমরা ন্যায়পরায়ণ নেতা, মনোনীত প্রতিনিধি (ওয়াসি), প্রতিশ্রুতিবান ও সর্বে ষ্ঠ সত্যবাদী শাসকের দিকে অগ্রসর হও।”[৫৩০]

পূর্ববর্তী ব্যক্তিবর্গের বর্ণিত হাদীস ও বক্তব্য হতে ওসিয়ত সম্পর্কিত উপরোক্ত অংশটুকু আপনার জন্য যথেষ্ট মনে করছি। যদি কেউ পূর্ববর্তীদের জীবনী অধ্যয়ন করেন তাহলে লক্ষ্য করবেন যেমনভাবে কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট নাম থাকে তেমনি ওয়াসি বলতে তাঁরা আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- কেই বুঝতেন ও শুধু তাঁর জন্যই এটি ব্যবহার করতেন, এমন কি আরবী ভাষার প্রসি অভিধান ‘তাজুল আরুস’ গ্রন্থের লেখক দশম খণ্ডের ৩৯২ পৃষ্ঠায় وصي (ওয়াসি) শব্দের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, তা غني (গাণী) শব্দের ন্যায় আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর)- এর

উপাধি ছিল। কবিতাসমূহের মধ্যে আলী (আ.)- এর ওসিয়তের বিষয় এত অধিক ব্যবহৃত হয়েছে যা গণনা করা সম্ভব নয়। আমরা তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি :

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব বলেছেন,

وصـــــيّ رســـــول الله مـــــنْ دون أهلـــــه و فارســـه إنْ قيـــل هـــل مـــن منـــازل

“তিনি রাসূলের পরিবারের মধ্যে তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি এবং তিনি রাসূলের অশ্বারোহী বীর যখন শত্রুরা প্রতিদ্ব ী আহ্বায়ক।”

মুগীরাহ্ ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব সিফিফনে মুয়াবিয়ার বিরু ইরাকীদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে বলেন,

هـــــذا وصـــــي رســـــول الله قائـــــدكم وصـــــهره وكتـــــاب الله قـــــد نشـــــرا

“আল্লাহর কিতাবের শপথ, যা প্রচারিত হয়েছে ইনিই রাসূলে খোদার ওয়াসি, জামাতা ও তোমাদের নেতা।”

আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিস ইবনে আবু সুফিয়ান ইবনে আবদুল মুত্তালিব বলেছেন,

و منـــــاّ علـــــيّ ذاك صـــــاحب خيـــــبر وصـــــاحب بـــــدر يـــــوم ســـــالت كتائبـــــه

“খায়বার ও বদরের অধিপতি (বিজয়ী) আলী আমাদের সাথে রয়েছেন। সেদিন সেনাদল যু র জন্য যাত্রা করেছে।

وصـــــيّ نـــــبيّ المصـــــطفى و ابـــــن عمـــــه فمـــــن ذا يدانيـــــه و مـــــن ذا يقاربـــــه

তিনি আমাদের নবী মুস্তাফার ওয়াসি (প্রতিনিধি) ও চাচাত ভাই। কে তাঁর সমকক্ষ ও নিকটবর্তী হতে পারে?”

আবুল হাইসাম ইবনে তাইহান যিনি বদরের যু র একজন যো া ও সহযোগী ছিলেন তিনি উষ্ট্রের যু র দিন নিম্নোক্ত কবিতা পড়েন-

إنّ الوَصِي إمامُنا و وليّنا   برح الخفا و باحت الاسرار

নবীর ওয়াসি আমাদের ইমাম ও অভিভাবক। গোপন প্রকাশিত হয়েছে, রহস্য উন্মোচিত হয়েছে।

খুজাইমা ইবনে সাবিত যুশ্ শাহাদাতাইন যিনি একজন বদরী সাহাবী তিনি উষ্ট্রের যু এ কবিতা পাঠ করেন-

يا وصي النبِي قد أجلت الحر   ب الأعادي و سارت الاظعان

হে নবীর ওয়াসি (স্থলাভিষিক্ত- প্রতিনিধি)! শত্রুদের যু করেছেন ছত্রভঙ্গ উষ্ট্রসমূহ দিয়েছে তাই রণভঙ্গ।

أعائش خلى عن علي و عيبه   بما ليس فيه إنّما انت والده

হে আয়েশা! আলীর কুৎসা রটনা ও নিন্দা হতে বিরত হও। কারণ কোরআনের ভাষায় তুমি মা হও।

وصي رسول الله من دون أهله   أنت علي ما كان من ذاك شاهده

তিনি (আলী) রাসূলের পরিবারের মধ্য হতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ওয়াসি তুমি নিজেও এর বাস্তব সাক্ষী (প্রত্যক্ষদর্শী)।

আবদুল্লাহ্ ইবনে বুদাইল ওয়ারাকা খাজামী যিনি হযরত আলীর সাথে সিফফিনের যু অংশ গ্রহণ করে নিজ ভ্রাতাসহ শহীদ হন তিনি সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম সাহসী সাহাবী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি উষ্ট্রের যু নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন-

يـــا قـــوم للخطـــة العظمـــى الـــتي حـــدثت   حـــرب الوصـــي و مـــا للحـــرب مـــن آلى

হে লোকসকল! নবীর ওয়াসির পথে যু   এক সুর্বণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে (তা হাতছাড়া কর না) এবং যখন যু   ব্যতীত আরোগ্যের পথ নেই।

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) সিফিফনে বলেন,

مـــا كـــانَ يرضـــى أحمـــد لَـــوْ اخْـــبرا   أَنْ يقرنـــــوا وصـــــيه و الابـــــترا

"যদি নবী আহমাদকে খবর দেয়া হয় তাঁর ওয়াসি নির্বংশদের (মুয়াবিয়া ও আমর ইবনে আস) সহাবস্থান করছে, কখনোই সন্তুষ্ট হবেন না।"

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ বাজালী, শারাহ বিন সামাতের নিকট পত্রে যে সকল পঙ্ক্তি উ ৃ ত করেন তাতে হযরত আলী সম্পর্কে বলেন,

وصـــي رســـول الله مـــن دون أهلـــه   وفارســـه الحـــامي بـــه يضـــرب المثـــل

"তিনি রাসূলের পরিবার হতে মনোনীত ওয়াসি এবং তাঁর শক্তিমান সহযোগী বলে হয়েছেন প্রবাদবাক্যে পরিণত।"

উমর ইবনে হারিশা আনসারী মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়া সম্পর্কে যে কবিতা রচনা করেছেন তাতে বলেছেন,

سمـــــى النّـــــبي و شـــــبه الوصـــــي   ورايتـــــــه لونهـــــــا العنـــــــدم

"তিনি নবীর সমনামের ও তাঁর মনোনীত ওয়াসির সদৃশ এবং তাঁর পতাকা রক্তিম।"

আবদুর রহমান ইবনে জাঈল হযরত ওসমানের হত্যার পর যখন মানুষ হযরত আলীর হাতে বাইয়াত করে তখন নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন-

لعمري لقد بايعتم ذا حفيظة على الدين معروف العفاف موفقاً

আমার জীবনের শপথ, তোমরা এমন ব্যক্তির বাইয়াত করেছ যিনি দীনের সংরক্ষণকারী, আত্মিক পবিত্রতায় প্রসি ও সফলকাম।

عليّاً وَصيّ المصطفى وابن عمّه و أوّل من صلّى اخا الدّين والتّقى

আলী নবীর মনোনীত প্রতিনিধি, তাঁর চাচাত ভাই, সর্বপ্রথম নামায আদায়কারী এবং দীন ও তাকওয়ার ভ্রাতা।

আযদ গোত্রের এক ব্যক্তি জামালের যু বলেন,

هذا علي وهو الوصيّ اخاه يوم النجوة النّبيّ

"এ ব্যক্তি আলী যিনি রাসূলের মনোনীত প্রতিনিধি যাকে রাসূল মুক্তির দিন ভ্রাতা বলে ঘোষণা দিয়েছেন

و قال هذا بعدي الولي وعاه واع و نسى الشقي

এবং বলেছেন এই আলী আমার পর অভিভাবক। এ কথাকে সংরক্ষণকারীরা সংরক্ষণ করেছে ও বিপদগামীরা ভুলে গিয়েছে।"

জামালের যু বনি দাব্বাহ্ গোত্রের এক যুবক যু র ময়দানে এসে ঘোষণা করল, "আমি আয়েশার সৈন্য।" অতঃপর বলল,

نحـــــــن بنوضـــــــبة أعـــــــداء علــــــيّ ذاك الـــــذى يعـــــرف قـــــدما بالوصــــــي

“আমরা বনি দাব্বাহ্ গোত্র সেই আলীর শত্রু, যে পূর্বকাল হতেই ওয়াসি বলে প্রসি

وفـــــارس الخيــــــل علــــى عهـــــد النــــــبي مــــا أنـــــا عَـــنْ فضـــل علــــي بــــالعمى

এবং নবীর সময় ে ষ্ঠ অশ্বারোহী যো া ছিল, তার মর্যাদা সম্পর্কে আমি অনবহিত নই।

لكنني انعى ابن عفان التقى

কিন্তু পবিত্র উসমান ইবনে আফফানের রক্তের বদলা তার হতে গ্রহণ করতে চাই।”

সাঈদ ইবনে কাইস হামাদানী উষ্ট্রের যু হযরত আলীর সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি যু র দিন এ কবিতা পড়েন-

اَيّـــــــة حــــــرب اضـــــــرمت نيرانهـــــا كســـــــرت يـــــــوم الـــــــوعى مرانهـــــا

হে যু ! যার লেলিহান শিখা প্র লিত হয়েছে ও যার কাঠিন্যে দৃঢ়তা ভেঙ্গে পড়েছে

قـــــل للوصـــــــي اقبلــــــت قحطانهـــــا فـــــادع بهـــــا تكفيكهـــــا همــــــدانها

ওয়াসিকে বল বনি কাহতান তাঁর সাহায্যে এবং তাদের আহবান করে বল শুধু হামাদান গোত্রই তাঁকে চিন্তামুক্ত করবে।

هم بنوها و هم إخوانها

তারা যু র সন্তান ও ভ্রাতা।

হযরত আলীর অন্যতম সহযোগী যিয়াদ ইবনে লুবাইদ আনসারী উষ্ট্রের যু বলেন,

كيـــــف تـــــرى الأنصـــــار في يـــــوم الكلـــــب إنّـــــا انـــــاس لا نبـــــالي مـــــن عطـــــب

“যু র কঠিন মুহূর্তে আনসারদের কিরূপ দেখেছ? আমরা এমন একদল ব্যক্তি যারা সংকটে ভয়হীন।

ولا نبـــــالي في الوصــــي مـــــن غضـــب   و إنّمـــــا الأنصــــار جـــــدلا لعــــب

নবীর মনোনীত প্রতিনিধির পথে আমরা কোন ক্রোধকেই পরোয়া করি না এবং আনসাররা এ বিষয়কে খেল- তামাশা মনে করে নি, বরং গুরুত্বসহকারে নিয়েছে।

هــــذا علـــــي وابــــن عبــــدالمطلب   ننصــره اليــوم علــى مــن قــد كــذب

এই আলী, আবদুল মুত্তালিবের সন্তান, তাই মিথ্যাবাদীদের বিরু আমরা তাঁকে সাহায্য করবো।

من يكسب البغي   فبئس ما أكتسب

যে বিদ্রোহ ও অন্যায়ের পথ অবলম্বন করে সে কত নিকৃষ্ট বস্তু আহরণ করছে!”

হাজর ইবনে আদী কিন্দী ঐ দিন বলেন,

يـــــا ربنـــــا ســــــلم لنـــــا عليّـــــا   ســــــلم لنـــــا المبـــــارك لمضـــــيا

“হে প্রভু! আলীকে আমাদের জন্য সুস্থ রাখুন এবং এই বরকতময় ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিকে আমাদের জন্য নিরাপদ রাখুন।

المــــــــؤمن الموحـــــــــد التّقيّـــــــا   لاخطـــــــل الـــــــرأى و لا غويـــــا

সেই ঈমানদার ও একত্ববাদী ব্যক্তি যার না মতে দুর্বলতা রয়েছে, না পথে বিচ্যুতি রয়েছে।

بـــــل هاديـــــا موفقـــــا مهـــــديا   و احْفظـــــه ربيّ و احفـــــظ النبيـــــا

তিনি হেদায়েতকারী, সফল ও হেদায়েতপ্রাপ্ত। হে প্রভু! তাঁকে সংরক্ষণ কর এবং তাঁর মধ্যে তোমার নবীর অস্তিত্বকে সংরক্ষণ কর।

فيــــه فقــــد كــــانَ لــــه وليّــــا   ثمّ ارتضــــاه بعــــده وصــــيا

তিনি তাঁর সহযোগী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াসির (মনোনীত প্রতিনিধি) ওপর সন্তুষ্ট হন।”

আমর ইবনে আহিজয়া উষ্ট্রের যু র দিনে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরের বক্তব্যের পর ইমাম হাসান যে বক্তব্য রাখেন সে সম্পর্কে বলেন,

حســـــن الخــــــير يـــــا شـــــبيه ابيــــه   قمــــت فِينـــــا مقــــام خــــير خطيـــــب

“হে উত্তম হাসান! যে পিতার সদৃশ, তুমি আমাদের মাঝে সর্বোত্তম বক্তার স্থান লাভ করেছ।

قمــــت بالخطبـــــة الّـــــتي صــــدع الـــــلا   ه بِهـــــاعن أبيــــــك أهــــــل العيــــــوب

এমন বক্তব্যের জন্য দাঁড়িয়েছিলে যার মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিদের তোমার পিতা হতে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছ।

لسْــــتَ كــــابن الـــزبير لجلــــج في القــــو   ل وطأطــــــأ عنــــــان فســــــل مريــــــب

তুমি যুবাইয়ের পুত্রের মত নও যে, কথা জিহ্বায় জড়িয়ে যায় ও কথার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

وأبى الله أنْ يقـــــــــــــوم بماقــــــــــــــا   م بــــه ابــــن الوصـــــي و ابــــن النجيــــب

এবং আল্লাহ্ চান না সে নবীর ওয়াসি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রের ন্যায় কথা বলুক।

إن شخصـــا بـــــين النــــبيّ لــــك الخــــي   ر وبـــــين الوصـــــي غـــــير مشـــــوب

যিনি নবী ও তাঁর ওয়াসি হতে জন্ম লাভ করেছেন তাঁর মধ্যে কোন ত্রুটি থাকতে পারে না।”

যাজর ইবনে কাইস জো’ফী উষ্ট্রের যু   বলেন,

أضــــــــربكم حــــــــتّى تقــــــروا لعلـــــــي   خــــير قــــريش كلهـــــا بعــــــد النّــــــبي

“তোমাদের ওপর এতটা আঘাত হানব যেন আলীর অধিকারের স্বীকৃতি দান কর যিনি নবীর পর কুরাইশদের সর্বোত্তম।

من زانه الله وسمّاه الوصي

তাঁকে আল্লাহ্ সুসজ্জিত করেছেন ও ওয়াসি বলে ঘোষণা করেছেন।”

যাজর ইবনে কাইস সিফিফনের যু   বলেন,

فصــــــلى الإلـــــه علــــــى أحمـــــد　　رســــــول المليـــــك تمــــام الـــــنعم

“ইলাহ্ (উপাস্য) আহমাদের ওপর দরূদ প্রেরণ করুন যিনি সকল নিয়ামতের অধিকারীর দূত,

رســــــول المليـــــك و مــــــن بعـــــده　　خليفتنـــــــا القــــــــائم المـــــــدعم

(সকল নিয়ামতের) অধিকারীর দূত ও যিনি তাঁর পর আমাদের সমর্থিত দায়িত্বপালনকারী খলীফা তাঁর ওপর দরূদ

عليـــــا عنيــــــت وصــــــي النـــــبي　　يجالـــــد عنــــــه غـــــواة الأمـــــم

আমার উদ্দেশ্য নবীর মনোনীত প্রতিনিধি আলী যিনি উম্মতের বিপথগামীদের তাঁর হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

আশআস ইবনে কায়েস কিন্দী এ যু   পাঠ করেন-

اتانــــــا الرســــــول، رســــــول الامــــــام　　فســــــــر بمقْدَمــــــــه المســــــــلمونا

বার্তাবাহক এসেছে, মুসলমানদের নেতার প্রেরিত ব্যক্তির আগমনে সকলে আনন্দিত।

رســــــول الوصــــــي,وصــــــي النـــــبي　　لـــــه الســـــبق و الفضـــــل في المؤمِنينـــــا

প্রেরিতের মনোনীত প্রতিনিধি, নবীর ওয়াসি, যিনি মুমিনদের মধ্যে মর্যাদা ও সম্মানে সকলের অগ্রগামী।

اتانـــــا الرســـــول، رســـــول الوصـــــي علـــــي المهـــــذب مـــــن هاشـــــم

বার্তাবাহক এসেছে, প্রেরিতের মনোনীত প্রতিনিধি, আলী যিনি বনি হাশিমের পরিশু ব্যক্তি

وزيـــــــر النـــــــبي وذى صـــــــهره وخـــــــير البريـــــــه والعـــــــا لم

নবীর পরামর্শদাতা ও জামাতা, যিনি সৃষ্টিজগতের ে ষ্ঠ ব্যক্তি।

নোমান ইবনে আজলান যারকী আনসারী সিফিফনের যু নিম্নোক্ত কবিতা আবৃতি করেন-

كيـــــف التفـــــرق و الوصـــــي إمامنـــــا لاكيـــــف إلّا حـــــيرة و تخـــــاذلا

কেন বিভেদ কর যখন আমাদের ইমাম রাসূলের ওয়াসি। কেন নয়? কেন তোমরা দিশেহারা ও অপমানিত হওয়া ব্যতীত কিছুই চাও না?[৫৩১]

فـــــذروا معاويـــــة الغـــــوى وتـــــابعوا ديـــــن الوصـــــي لتحمـــــدوه آجـــــلا

বিচ্যুতদের ত্যাগ করে দীনের মনোনীত প্রতিনিধির অনুসরণ কর, হে মুয়াবিয়া! তবে কিয়ামতে প্রশংসিত হবে।

আবদুর রহমান ইবনে যুআইব আসলামী যে কবিতার মাধ্যমে মুয়াবিয়াকে ইরাকের (কুফার) সেনাদল সম্পর্কে সন্ত্রস্ত করতে চেয়েছেন তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ-

يقـــــودهم الوصـــــي إليـــــك حـــــتّى يـــــردك عـــــن ضـــــلال و ارتيـــــاب

নবীর ওয়াসি তাদের তোমার প্রতি পরিচালিত করবেন যাতে করে তিনি (ইরাকের সেনাদলকে) তোমাকে পথভ্রষ্টতা ও সন্দেহ হতে ফিরিয়ে আনেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব বলেন,

إِنّ وليّ الأمـــــــر بعـــــــد محمـــــــد علـــي وفي كـــل المـــواطن صــــاحبه

নিশ্চয়ই রাসূলের পর ওয়াসি ও নির্দেশদাতা হলেন আলী যিনি সকল ক্ষেত্রে তাঁর সহযোগী ছিলেন।

وصــــي رســـول الله حقــــا و صــــنوه و أول مـــن صــــلى و مــــن لان جانبــــه

আসলেই তিনি রাসূলের ওয়াসি ও ভ্রাতা এবং সর্বপ্রথম নামায আদায়কারী ও তাঁর পক্ষাবলম্বনকারী (ইসলাম আনয়নকারী)।

খুযাইমা ইবনে সাবেত যুশ শাহাদাতাইন আবৃত্তি করেন-

وصــــي رســـول الله مـــن دون أهلـــه و فارســـه مـــذكان في ســـلف الـــزمن

তিনি রাসূলের পরিবার হতে মনোনীত প্রতিনিধি এবং পূর্বকাল হতেই তিনি বীর যো া।

و أول مـــن صـــلّى مـــن النـــاس كلّهـــم ســـوى خـــيرة النســـوان و الله ذو المـــنن

তিনি সর্বে ষ্ঠ রমনীর (খাদিজাহ্) পর সর্বপ্রথম নামায আদায়কারী পুরুষ। এ সত্যকে মহান আল্লাহর শপথ করে বলতে পারি।

কুফার ইবনে হুযাইফা আসাদী পাঠ করেন-

فحوطـــوا عليـــا و انصـــروه فإنّـــه وصـــــــي في الإســـــــلام أول أول

আলীকে ঘিরে থাক, তাঁকে সাহায্য কর কারণ তিনি নবীর মনোনীত প্রতিনিধি (ওয়াসি) এবং ইসলামের প্রথম ব্যক্তি।[৫৩২]

আবুল আসওয়াদ দুআলী আবৃত্তি করেন-

أُحـــــب محمـــــــداً حبـــــا شـــــــديداً   و عبّاســـــــا وحمـــــــــزة و الوصـــــــــيا

আমি মুহাম্মদকে প্রচণ্ড ভালবাসি সেই সাথে আব্বাস, হামযাহ্ এবং ওয়াসিকেও (আলী)।

আনসারদের বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও কবি নোমান ইবনে আজলান আমর ইবনে আসকে লক্ষ্য করে যে কাসিদা[৫৩৩] পাঠ করেন তাতে বলেন,

و كـــــان هوانــــــاً في علـــــيّ و أنـــــه   لا هــل لهــا مــن حيــث تــدري و لا تــدري

"আমরা আলীর প্রতি অনুরক্ত কারণ তিনি তার উপযুক্ত, সে দিকটি সম্পর্কে তুমি জান বা না- ই জান।

فـــــذاك بعــــون الله يـــــدعو إلى الهــــدى   وينهـــى عـــن الفحشــاء والبغـــي والنكـــر

তিনি আল্লাহর সাহায্যে হেদায়েতের দিকে আহবান করেন এবং অন্যায়, অশ্লীল ও মন্দ কর্ম হতে বিরত রাখেন (নিষেধ করেন)।

وصـــيّ النـــبيّ المصــــطفى و ابـــن عمّـــه   وقاتـــــل فرســـــان الضـــــلالة و الكفـــــر

তিনি নবীর ওয়াসি ও চাচাতো ভ্রাতা এবং কুফর ও বিপথ অবলম্বনকারী যো াদের হত্যাকারী।"

ফযল ইবনে আব্বাস তাঁর কবিতায় বলেছেন[৫৩৪],

اَلا إنَّ خـــــير النّـــــاس بعـــــد نبــــيهم   وصـــي النـــبيّ المصـــطفى عنـــد ذى الـــذكر

"জেনে রাখ, আল্লাহর নিকট নবীর পর ে ষ্ঠ মানুষ নবী মুস্তাফার ওয়াসি।

و أول مـــــن صـــــلى وصـــــنو نبيـــــه   و أول مـــن اردى الغـــواة لـــدى بـــدر

তিনি সর্বপ্রথম নামায আদায়কারী ও নবীর ভ্রাতা এবং বদর দিবসে প্রথম ব্যক্তি যিনি পথভ্রষ্টদের হত্যা ও ধরাশায়ী করেছেন।

হাসসান ইবনে সাবেত তাঁর এক কবিতায়[৫৩৫] সকল আনসারের পক্ষ থেকে হযরত আলীর প্রশংসা করে বলেছেন,

حفظــــــتَ رســـــول الله فينـــــا و عهـــــــده   إليـــك و مـــن أولى بـــه منـــك مَـــن و مَـــن

"আমাদের মাঝে আপনি রাসূলুল্লাহকে সংরক্ষণ করেছেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিও আপনার নিকট। তাই আপনার হতে কে তাঁর অধিক নৈকট্যের অধিকারী?

ألســـــت أخـــاه في الهــــدى و وصـــــيه   و أعلـــم مـــنهم بالكتـــاب و بالســـنن

আপনি কি হেদায়েতের পথে তাঁর ভ্রাতা ও ওয়াসি এবং কোরআন ও সুন্নাহর ক্ষেত্রে সকলের হতে জ্ঞানী নন?"

অনেক কবি ইমাম হাসানকে লক্ষ্য করে বলেছেন[৫৩৬],

يـــا أجـــل الأنـــام يـــابن الوصـــي   أنـــت ســـبط النّـــبيّ و ابـــن علـــيّ

"হে সর্বোত্তম মানুষ! আপনি নবীর ওয়াসির পুত্র ও তাঁর দৌহিত্র, আলীর সন্তান।"

উম্মে সিনান বিনতে খাইসামা ইবনে খারশা মাযহাজী[৫৩৭] আলী (আ.)- কে লক্ষ্য করে যে স্তুতিবাক্য পাঠ করেছেন তাতে বলেছেন,

قَـــد كنـــتَ بعـــد محمـــد خلفـــا لنـــا   أوصـــى إليـــك بنـــاَ فكنـــتَ وفيـــا

“আপনি মুহাম্মদের পর আমাদের জন্য খলীফা ও তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি ছিলেন এবং আমাদের ব্যাপারে নবী আপনাকে যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা যথার্থরূপে পালন করেছেন।”

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর সময়কালে যে সকল কবিতা তাঁর শানে পাঠ করা হয়েছে সেগুলো হতে তড়িঘড়ি কিছু কবিতা যা এই পত্রের কলেবরে ধারণযোগ্য তা আপনার জন্য উপস্থাপন করলাম। হযরত আলীর পরবর্তী সময়ে তাঁর প্রশংসায় যত কবিতা রচিত হয়েছে তা সংগ্রহ ও সংকলনে আমি অক্ষম। সেগুলোর উল্লেখ আপনার ক্লান্তি আনতে পারে এবং সে কারণে আমাদের মূল আলোচনা হতে দূরে সরে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই প্রসি ব্যক্তিবর্গের কবিতার প্রতিই শুধু ইশারা করেছি। এগুলো এ বিষয়ে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করুন।

কুমাইত ইবনে যাইদ ‘মীমী কাসিদা’য় (যে কবিতায় পঙ্ক্তি মীম দ্বারা শেষ হয়েছে) এরূপ বলেছেন,

و الوصـــــيّ الــــذي آمـــال التجـــوبى   بـــــه عــــرش امـــــة لا نهـــــدام

“ওয়াসি আশা- ভরসার আ য়স্থল ও উম্মতের মর্যাদার সংরক্ষণকারী (পতন হতে রক্ষাকারী)।[৫৩৮]

كـــانَ أهـــل العفـــاف و المجـــد و الخـــي   ر و نقـــــض الأمـــــور و الابـــــرام

তিনি পবিত্রতা, সম্মান ও কল্যাণের অধিকারী এবং কর্মে দৃঢ়তা অবলম্বনকারী।

و الوصـــــيّ الـــولي و الفـــارس المعـــر   لم تحـــت العجـــاج غـــير الكهـــام

নবীর ওয়াসি, ওয়ালী এবং পতাকাধারী যো া ধুলা- ধূসরিত ক্ষেত্রে শত্রুকে পরাস্ত করেন এবং কোন দুর্বলতা প্রদর্শন করেন না।

وصــــيّ الوصـــيّ ذى الخطـــة الفصـــر   ل ومـــردى الخصـــوم يـــوم الخصـــام

মনোনীতের মনোনীত প্রতিনিধি ফয়সালার সীমা নির্ধারণকারী এবং যু র দিনে শত্রুদের

পর্যুদস্তকারী।”

কাসির ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আমের খাযায়ী যিনি কাসির ইয়্যা বলে প্রসি , তিনি বলেন,

وصـــيّ النّـــبيّ المصـــطفى و ابـــن عمّـــه　　　وفكـــــاك اعنـــــاق وقاضـــــي مغـــــارم

“নবী মুস্তাফার মনোনীত প্রতিনিধি (ওয়াসি) এবং চাচাত ভ্রাতা মানুষের মুক্তিদাতা ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধকারী।”

আবু তামাম তাঈ তার ‘কাসীদে রাই’ (যে কাসিদার পঙ্ক্তিসমূহ ‘র’ অক্ষর দিয়ে পরিসমাপ্ত হয়)- তে বলেছেন[৫৩৯],

ومـــــن قبلـــــه احلَفـــــتم لوصـــــيه　　　بداهيـــــة دهيـــــاء لـــــيس لهـــا قَـــدر

“পূর্বে তোমরা তাঁর ওয়াসির জন্য কসম করে বলেছিলে সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তেও সীমাহীনভাবে তাঁর সহযোগিতা করবে।

فجئـــتم بهـــا بكـــراً عوانـــا و لم يكـــن　　　لهـــا قبلهـــا مـــثلا عـــوان ولابكـــر

তোমরা উপর্যুপরি আক্রমণের মাধ্যমে যে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছ যার নজির পূর্বে ছিল না।

اخـــوه إذا عـــد الفخـــار و صـــهره　　　فـــلا مثلـــه أخ ولا مثلـــه صـــهر

তাঁর (নবীর) ভ্রাতা ও জামাতা তিনি, যা গর্বের বিষয় বলে তখন মনে করা হত, তাঁর মত ভ্রাতাও নেই, জামাতাও নেই।

وشـــدّ بـــه ازر النـــبيّ محمّـــد　　　كمـــا شـــدّ مـــن موســـى بهـــا رونـــه الازر

তাঁর মাধ্যমেই নবী মুহাম্মদের কোমর শক্তিশালী হয়েছে যেমনভাবে হারুনের মাধ্যমে মূসার কোমর শক্তিশালী হয়েছিল।”

দে’বাল ইবনে আলী খুযাঈ শহীদদের নেতা ইমাম হুসাইন (আ.)- এর উদ্দেশ্যে যে মর্সিয়া পড়েন তা এরূপ-

رأس ابن بنت محمد و وصيه   يا للرجال على قناة يرفع

হে লোকসকল! মুহাম্মদের কন্যা ও ওয়াসির সন্তানের মস্তক বর্শার অগ্রভাগে স্থান লাভ করেছে।

আবু তাইয়েব মুতানাব্বীকে আহলে বাইতের প্রশংসাগীতি হতে বিরত থাকতে দেখে যখন তিরস্কার করা হয় তখন তিনি বলেন,

و تركتُ مدحى للوصي تعمدا   إذ كان نوراً مستطيلاً شاملاً

“আমি ওয়াসির প্রশংসা ইচ্ছাপূর্বক এজন্য ত্যাগ করেছি যে, তিনি সর্বব্যাপী সুউচ্চ নূরের অধিকারী।

و إذا استطال الشّيء قام بنفسه   وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً

যখন কোন বস্তু শক্তি লাভ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে (তখন সাহায্যের প্রয়োজন নেই) কারণ সূর্যের আলোর বৈশিষ্ট্য হলো অন্ধকার ও বাতিলকে দূরীভূত করা।”

আবুল কাসেম তাহির ইবনে হুসাইন ইবনে তাহির আলাভী তাঁর কবিতায় ইমাম হুসাইনের প্রশংসা করে বলেছেন,

هو ابن رسول الله و ابن وصيه   و شبهها شبهت بعد التجارب

“তিনি রাসূলুল্লাহ্ ও তাঁর ওয়াসির সন্তান, তাঁদের অনুরূপ, এ সাদৃশ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বোঝা যায়।”

ওয়াসসালাম

শ

একশত নয়তম পত্র

২৩ রবিউস সানী ১৩৩০ হিঃ

উনিশ নম্বর পত্রে আপনাকে বলেছি আপনাদের কট্টর বিরোধীরা শিয়া মাজহাবের উসূল ও ফুরুয়ে দীনের ক্ষেত্রে (ধর্মের মৌল বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে) আহলে বাইতের ইমামদের হতে বর্ণিত সনদের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। তাই তখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এ বিষয়ে আপনার সাথে সংলাপ করবো। এখন সে সময় এসেছে মনে করছি। তাই জানতে চাইছি তাঁদের সন্দেহ অপনোদনে কি উত্তর দেয়া যায়?

ওয়াসসালাম

স

একশত দশতম পত্র

২৯ রবিউস সানী ১৩৩০ হিঃ

১। শিয়া মাজহাব আহলে বাইতের ইমামদের হতে মুতাওয়াতির সূত্রে প্রতিষ্ঠিত।

২। কোরআন- সুন্নাহর তাফসীর ও দীনি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিয়ারা সাহাবীদের সময়ই এর লিখন ও বিস্তারে রত হন।

৩। শিয়া মুহাদ্দিস ও লেখকগণ তাবেয়ীন ও তাবে- তাবেয়ীনের যুগেই পরিচিত ছিলেন।

১। সচেতন ব্যক্তিরা সন্দেহাতীতভাবে এ বিষয়ে অবহিত যে, বার ইমামী শিয়াগণ উসূল ও ফুরুয়ে দীনের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় নবী (সা.)- এর পবিত্র আহলে বাইতের সাথে সংযুক্ত ছিলেন এবং কখনোই তাঁদের হতে বিচ্ছিন্ন হন নি। সুতরাং শিয়া মত নবীর আহলে বাইতের মত হতেই গৃহীত। কোরআন ও সুন্নাহ্ হতে দীনের মৌল বিশ্বাস ও কর্মের সকল বিষয় তাঁরা তাঁদের হতে অর্জন করেছেন। এর কোনটিতেই তাঁরা আহলে বাইত ভিন্ন অন্য কারো ওপর নির্ভর করেন নি এবং এ বিষয়ে অন্য কাউকে প্রশ্নও করেন নি। সুতরাং তাঁরা আল্লাহর বিধানে বিশ্বাসী ও তাঁর সান্নিধ্য প্রত্যাশী। তবে এজন্য তাঁরা শুধু আহলে বাইতের পথকে সঠিক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ পথ থেকে ফিরে আসার কোন যুক্তিই তাঁরা দেখেন না এবং পূর্ববর্তী পুণ্যবান ও সৎ কর্মশীল ঐ সকল ব্যক্তি যাঁরা ইমাম আলী, হাসান ও হুসাইন (আ.) এবং ইমাম হুসাইনের বংশধর নয়জন ইমামের সময়কাল হতে এ পথে চলে এসেছেন তাঁরা এখনো তাঁদের অনুসৃত পথে চলছেন।

প্রথম তিন ইমামসহ ইমাম হুসাইনের বংশধারা হতে আগত নয়জন ইমামের সকল হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাফিয, ক্বারী ও হাদীসবেত্তা শিয়া মাজহাবের উসূল ও ফুরুয়ে দীনের বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন। এদের মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক তাকওয়া ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যাঁদের সংখ্যা তাওয়াতুরের পর্যায় হতেও অধিক। তাঁরা পরবর্তীদের জন্য মুতাওয়াতির সূত্রে এ সকল বিষয়ে রেওয়ায়েত করে গিয়েছেন যা বংশ পরম্পরায় (প্রজন্ম হতে প্রজন্মে) স্থানান্তরিত হয়ে

আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং দিবালোকের মত উ ল হয়ে লছে যার সামনে কোন পর্দা নেই। সুতরাং উসূল ও ফুরুয়ে দীনের ক্ষেত্রে আমরা (শিয়ারা) রাসূল (সা.)- এর বংশের ইমামদের পথেই রয়েছি এবং এ মাজহাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সকল বিষয় আমাদের পিতৃপুরুষরা তাঁদের পূর্ব-পুরুষদের সৎ কর্মশীলদের হতে অবিচ্ছিন্নভাবে ইমাম আসকারী, ইমাম হাদী, ইমাম জাওয়াদ, ইমাম রেযা, ইমাম সাদিক, ইমাম বাকির, ইমাম সাজ্জাদ, ইমাম হুসাইন, ইমাম হাসান এবং আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) হতে শিক্ষা লাভ করেছেন। তবে আমরা পূর্ববর্তী সৎ কর্মশীল শিয়াদের সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁরা ইমামগণের সাহাবী ছিলেন ও দীনের বিধি- বিধান এবং ইসলামী জ্ঞানসমূহ অর্জন ও সংরক্ষণ করেছেন তাঁদের সকলের পরিচয় দিতে সক্ষম নই কারণ এর জন্য যে ব্যাপক প্রচেষ্টা ও সময় প্রয়োজন তা এখন দেয়া সম্ভব নয়। তবে এজন্য প্রসি ব্যক্তিবর্গ ও আলেমগণ এ সম্পর্কে যে গবেষণা চালিয়েছেন সেগুলো অধ্যয়ন করতে পারেন। নিঃসন্দেহে লক্ষ্য করবেন এ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থসমূহের বর্ণনা হেদায়েতপ্রাপ্ত ইমামগণের জ্ঞানসমুদ্র হতে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদের পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীই সেগুলোতে সংকলিত হয়েছে।

সুতরাং এ সকল লেখনী তাঁদের জ্ঞানপত্র ও প্রজ্ঞার শিরোনাম হিসেবে তাঁদের সময়েই সংকলিত হয়েছে এবং পরবর্তী প্রজন্মের শিয়াদের জন্য সনদ ও পাণ্ডুলিপিতে পরিণত হয়েছে। এ কারণেই অন্যান্য চার মাজহাব হতে আহলে বাইতের মাজহাব বিশেষত্বের অর্ধিকারী। চার মাজহাবের ইমামদের শি দের হতে কাউকেই আমরা জানি না যাঁরা তাঁদের ইমামদের জীবদ্দশায় ঐ মাজহাব সম্পর্কে কোন গ্রন্থ রচনা করেছেন, বরং তাঁদের মৃত্যুর পর যখন শাসকবর্গের পক্ষ হতে এ চারটি মাজহাবের যে কোন একটিকে অনুসরণ অপরিহার্য করা হয় তখন ধীরে ধীরে তাঁদের বিষয়ে পরিচিতি বৃ পায় এবং জনগণ ধর্মীয় বিধি- বিধানের ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ শুরু করে। তৎকালীন সময়ে এ চার ইমাম অন্যান্য ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস হতে বিশেষ কোন মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। তাই তাঁদের জীবদ্দশায় কেউ তাঁদের মত ও ফতোয়া লিখে রাখার বিষয়ে কোন গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু শিয়াগণ প্রথম হতে আহলে বাইতের ইমামদের কথা ও বক্তব্য লিখে রাখার

বিষয়ে সচেতন ছিলেন ও এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন। কারণ মাজহাব ও ধর্মের বিধি- বিধানের ক্ষেত্রে তাঁরা আহলে বাইত ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়াকে বৈধ মনে করতেন না। এজন্য তাঁরা সর্বক্ষণ তাঁদের ঘিরে থাকতেন ও তাঁদের হতে দীনি নির্দেশনা গ্রহণের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকতেন। তাঁদের হতে যা কিছুই বণ করতেন তা লিখে রাখতেন ও তা সংরক্ষণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতেন। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি ইমাম সাদিক

(আ.)- এর সময় এ বিষয়ে চারশ গ্রন্থ রচিত হয় যা 'উসূলে আরবাআতু মিয়াহ্' বলে প্রসি । চারশ লেখক এই গ্রন্থসমূহ সংকলন করেছেন যাতে ইমাম সাদিক (আ.)- এর ফতোয়াসমূহ লিপিব করা হয়েছে। ইমাম জাফর সাদিক (আ.)- এর শি গণ এই চারশ' গ্রন্থের বাইরেও গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন যার বিবরণ আমরা ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে খুব শীঘ্রই দেব।

আহলে সুন্নাহর চার মাজহাবের ইমামগণের কেউই আহলে বাইতের ইমামগণের ন্যায় তাঁদের অনুসারীদের নিকট এতটা সম্মানিত নন। বিশেষত তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁরা যে মর্যাদা লাভ করেছেন তাঁদের জীবদ্দশায় তা ছিল না। ইবনে খালদুন তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় ফিকাহশাস্ত্র সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এটি স্বীকার করেছেন। আহলে সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ আলেমদের অনেকেই তাঁদের গ্রন্থেও এ মত দিয়েছেন। আমরা নিঃসন্দেহে মনে করি এ মাজহাবসমূহের অনুসারীরা যে পথ অবলম্বন করেছেন তা তাঁদের ইমামদেরই পথ এবং তাঁদের কর্মসমূহ প্রজন্ম হতে প্রজন্মে লিখিতরূপে স্থানান্তরিত হয়েছে। যেহেতু প্রত্যেক মাজহাবের অনুসারীরাই স্বীয় মাজহাব সম্পর্কে অধিকতর অবগত সেহেতু শিয়াগণ তাঁদের ইমামদের মাজহাব সম্পর্কে অধিকতর অবগত হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ তাঁরা এই মাজহাব অনুসারে আল্লাহর ইবাদত করছেন এবং এ পথ ভিন্ন আল্লাহর নৈকট্য লাভের কোন পথ নেই।

২। বিশেষজ্ঞগণ অবগত যে, ইসলামী জ্ঞানের সংকলনে শিয়াগণ অন্যদের হতে অগ্রগামী ছিলেন। প্রথম যুগে হযরত আলী (আ.) ও তাঁর সহযোগী শিয়া সাহাবীগণ ব্যতীত অন্যরা এরূপ ব্যাপক লেখনীর কাজ করেন নি। কারণ অন্যদের মধ্যে হাদীস লিপিব বৈধ কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল।

ইবনে হাজার আসাকালানী তাঁর 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃষ্ঠা ৪) বর্ণনা করেছেন (অন্যরাও তা স্বীকার করেছেন), উমর ইবনে খাত্তাবসহ অনেক সাহাবী হাদীস লিপিব করণকে বৈধ মনে করতেন না এজন্য যে, কোরআনের সাথে তার মি ত হবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু হযরত আলী, তাঁর উত্তরাধিকারী ও পুত্র ইমাম হাসান এবং সাহাবীদের মধ্যে তাঁদের অনুসারীরা হাদীস লিপিব করণকে বৈধ মনে করতেন। দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর শুরুতে তাবেয়ীদের সময় ইজমার মাধ্যমে হাদীস সংকলন বৈধ ঘোষিত হয়। তখনই ইবনে জারির, মুজাহিদ ও আত্তার সূত্রে তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। গাজ্জালীর মতে ইসলামের লিখিত প্রথম হাদীস গ্রন্থ এটি কিন্তু সঠিক হলো আহলে সুন্নাহ্ সূত্রে এটি ইসলামের প্রথম গ্রন্থ, সার্বিকভাবে নয়। সুন্নী সূত্রে এর পর যে গ্রন্থটি লিখিত হয় তা হলো মু'তামার ইবনে রাশেদ সানআনীর এবং তার পর আসে মালিক ইবনে আনাসের 'মুয়াত্তা'- এর নাম। 'ফাতহুল বারী'র ভূমিকায় এসেছে- রাবী ইবনে সাবিহ্ সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি গ্রন্থ সংকলন করেন যার সময়কাল হলো তাবেয়ীদের যুগের শেষ পর্যায়ে।

সুতরাং এ বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে যে, প্রথম যুগে শিয়াসূত্র ভিন্ন কোন গ্রন্থ রচনা হয় নি। হযরত আলী (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা প্রথম যুগেই এ কাজে হাত দেন। হযরত আলী (আ.) সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তা হলো কোরআন সংকলন। তিনি নবী (সা.)- এর কাফন- দাফনের পর শপথ করেন কোরআন সংকলন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নামাযের সময় ব্যতীত আবা (বিশেষ বস্ত্র) পরিধান করবেন না। তিনি কোরআন অবতীর্ণ হবার ধারায় তা সংকলন করেন এবং এর আয়াতসমূহকে নাসিখ, মানসুখ, স্পষ্ট ও রূপক (মুহকাম ও মুতাশাবিহ), শর্তযুক্ত ও শর্তহীন (মুতলাক ও মুকাইয়্যিদ), সর্বজনীন ও বিশেষায়িত (আম ও খাস) এভাবে ে ণীব করেন। এতে ফরয, হালাল, হারাম, মাকরুহ, মুবাহ্ ইত্যাদি বিষয়েও ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আয়াতসমূহের শানে- নুযূলসহ তাফসীরও তাতে সংযুক্ত করেন। এজন্যই ইবনে সিরিন প্রায়ই বলতেন 'যদি ঐ কোরআনটি পেতাম তবে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পেতাম'।

অবশ্য সাহাবীদের কেউ কেউ কোরআন সংকলনের কাজে হাত দিয়েছিলেন কিন্তু তাতে তাঁরা অবতীর্ণ হবার ধারা অবলম্বন এবং উপরোক্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো অবতারণায় ব্যর্থ হন।

সুতরাং বলা যায় হযরত আলী যে সংকলন করেন তা তাফসীর সদৃশ ছিল। কোরআন সংকলনের পর তিনি ফাতিমা (আ.)- এর জন্য একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা তাঁর সন্তানদের নিকট 'মুসনাদে ফাতিমা' বলে প্রসি । এ গ্রন্থে উপদেশ, নির্দেশ, শিক্ষামূলক ঘটনা, হাদীস, দিক- নির্দেশনা ও তাঁর পিতার ওফাতে তাঁকে সান্ত্বনা দানকারী বিষয়সমূহ লিপিব ছিল। অতঃপর তিনি দিয়াহ্ (হত্যা, অঙ্গহানী ঘটানো, আহত করা প্রভৃতির জন্য যে অর্থ রক্তপণ হিসেবে দিতে হয়) সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন যার নাম 'সহীফা' রাখা হয়। ইবনে সা'দ তাঁর 'আল জামে' নামক প্রসি গ্রন্থের শেষে হযরত আলীর সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমও এই সহীফার কথা উল্লেখ করে কয়েক স্থানে তা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে আ'মাশ হতে ইবরাহীম তাইমী সূত্রে তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, "হযরত আলী (আ.) বলেছেন : আমাদের নিকট কোরআন ও এই সহীফা ব্যতীত পাঠ্য অন্য কোন গ্রন্থ নেই। অতঃপর তিনি এই সহীফা আনলেন, তাতে দেখলাম আঘাত, জখম, উষ্ট্রের দাঁত সম্পর্কিত বিধানাবলী রয়েছে। এক স্থানে লেখা রয়েছে মদীনা নিষি (হারাম) স্থান, এর সীমা আইর হতে সউর পর্বত পর্যন্ত। যে কেউ এই সীমায় অপরাধ ও অন্যায় করবে অথবা কোন অপরাধীকে আ য় দেবে তার ওপর আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী এবং সকল মানুষের অভিশম্পাত।" এ হাদীসটি বুখারী তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে 'কিতাবে ফারায়েয'- এর ইসমুন মান তাবাররা মিন মাওয়ালিহী' অধ্যায়ে ৪র্থ খণ্ডের ১১১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫২৩ পৃষ্ঠায় 'কিতাবে হ '- এর 'ফাযলুল মদীনা' অধ্যায়ে এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ'- এর কয়েকটি স্থানে এ সহীফা সম্পর্কে বলেছেন। যেমন মুসনাদের ১ম খণ্ডের একশ পৃষ্ঠায় তারেক ইবনে শিহাব হতে বর্ণনা করেছেন, "হযরত আলীকে মিম্বারে বলতে দেখেছি : আল্লাহর শপথ, আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব ও এই সহীফা ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ নেই যা তোমাদের জন্য পাঠ করি। গ্রন্থটি তখন তাঁর তরবারীর সাথে ঝুলছিল এবং তিনি রাসূল (সা.) হতে তা গ্রহণ করেছেন।"

অন্য এক রেওয়ায়েতে সাফার আবদুল মালিক হতে বর্ণনা করেছেন, "হযরত বাকির (আ.) হযরত আলীর গ্রন্থটি চাইলেন, ইমাম জাফর সাদিক (আ.) তা আনলেন। গ্রন্থটি প্যাঁচানো ও এর পুরুত্ব

একজন মানুষের ঊরুর ন্যায় ছিল। তাতে লিখা ছিল স্ত্রীরা তাদের স্বামীর মালিকানাধীন গৃহের উত্তরাধিকারী হবে না। ইমাম আবু জাফর (আ.) বললেন : আল্লাহর শপথ, এটি হযরত আলীর হস্তলিপি ও রাসূল (সা.)- এর কথা।" হযরত আলীর একদল অনুসারী এ বিষয়ে (শ্রুতিলিখনে) তাঁর অনুসরণ করেছেন ও ঐ সময়েই সংকলনের কাজে হাত দেন, যেমন সালমান ফারসী ও আবু যর গিফারী। ইবনে শাহরাশুব বলেছেন, "ইসলামের সর্বপ্রথম গ্রন্থ লেখক আলী ইবনে আবি তালিব (আ.), দ্বিতীয় সালমান ফারসী, তৃতীয় আবু যর গিফারী এবং চতুর্থ হলেন রাসূল (সা.)- এর মুক্ত দাস আবু রাফে।" আবু রাফে হযরত আলীর বায়তুল মালের দায়িত্বে ছিলেন ও তাঁর বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তিনি হযরত আলী হতে হাদীস বণ করে বিচার ও বিধান সম্পর্কিত সুনান গ্রন্থ সংকলন করেন। গ্রন্থটি পূর্ববর্তী যুগের শিয়া ব্যক্তিত্বদের নিকট বিশেষ গুরুত্ব রাখত। আমাদের হাদীসশাস্ত্রবিদরা তাঁদের নিজ সূত্র অনুযায়ী ঐ গ্রন্থ হতে বর্ণনা করেছেন।

এরূপ অপর একজন ব্যক্তিত্ব হলেন আলী ইবনে আবি রাফে। 'আল ইসাবাহ্' গ্রন্থে তাঁর পরিচিতি পর্বে এসেছে তিনি নবী (সা.)- এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন এবং নবী স্বয়ং তাঁর নাম রাখেন আলী। তিনি আহলে বাইতের মাজহাব অনুসারে ফিকাহশাস্ত্র সংকলন করেন। আহলে বাইতের ইমামগণ এই গ্রন্থটিকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন এবং তাঁদের অনুসারীদের এটি অধ্যয়ন ও অনুসরণের জন্য নির্দেশ দিতেন। মূসা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসান বলেন, "এক ব্যক্তি আমার পিতাকে 'তাশাহহুদ' সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : আবু রাফের পুত্রের বইটি নিয়ে আস। অতঃপর তিনি তা হতে আমাদের জন্য পাঠ করেন।"

'রাওযাতুল জান্নাত' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, "এটি শিয়াদের মধ্যে সর্বপ্রথম ফিকাহর বই।" কিন্তু এটি ভুল। প্রথম যুগের শিয়াদের অন্যতম হলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি রাফে। তিনি হযরত আলীর ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন এবং তিনি এ বর্ণনাটি করেছেন যে, রাসূলকে জাফর তাইয়ারের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছেন, 'তুমি সৃষ্টি ও চরিত্রগতভাবে আমার অনুরূপ'। অনেকেই তাঁর হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যেমন আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ'- এ এটি এনেছেন। ইবনে হাজার তাঁর 'আল ইসাবাহ্' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে আসলাম বলেছেন কারণ

তাঁর পিতার নাম ছিল আসলাম। উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবি রাফে সিফিফনের যু   রাসূলের যে সকল সাহাবী অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইবনে হাজার তাঁর 'ইসাবাহ্' গ্রন্থে এই গ্রন্থ হতে প্রচুর বর্ণনা করেছেন।[৫৪০]

তৎকালীন গ্রন্থ সংকলকদের অন্যতম হলেন রাবিয়া ইবনে সামিই। তিনি পশুর যাকাত সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ সংকলন করেন এবং এ গ্রন্থের হাদীসসমূহ হযরত আলীর সূত্রে রাসূল হতে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইবনে হুর ফারসীও হযরত আলীর সূত্রে রাসূল হতে বর্ণিত হাদীসের একটি সংকলন লিখেন।

হযরত আলীর বিশেষ ভক্ত ও অনুসারী আসবাগ ইবনে নুবাতাও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। মালিক আশতারের প্রতি লিখিত হযরত আলীর পত্র এবং পুত্র মুহাম্মদ হানাফীয়ার প্রতি তাঁর ওসিয়তনামা তিনিই নকল করেছেন। আমাদের হাদীস বর্ণনাকারীরা এ পত্র দু'টি তাঁর হতে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সালিম ইবনে কাইস হিলালী হযরত আলীর অন্যতম সাহাবী। তিনিও হযরত আলী ও সালমান ফারসী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইমামত সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম নোমানী তাঁর 'আল গাইবা' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন, "সকল শিয়া আলেম ও পণ্ডিত এবং হাদীস বর্ণনাকারী এ সত্য স্বীকার করেছেন যে, সালিম ইবনে কাইসের গ্রন্থটি পূর্বকাল হতেই আহলে বাইতের হাদীসসমূহের অন্যতম ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত ছিল এবং তাঁদের নিকট একটি মৌলিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হত।"

যে সকল ব্যক্তি তৎকালীন সময়ে গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে শিয়া হাদীস ও রিজালবিদদের অনেকেই গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ সম্পর্কে জানার জন্য তাঁদের রিজালগ্রন্থসমূহ (বিশেষত মরহুম হা   আগা বুজুর্গ তেহরানীর 'আয্যাররিয়াত' গ্রন্থ) দেখতে পারেন।

৩। দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থাৎ তাবেয়ীদের মধ্যে সংকলকদের সংখ্যা এত অধিক যে, এ ক্ষুদ্র পত্রে তার উল্লেখ সম্ভব নয়। তাঁদের পরিচয় ও লেখনী সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের আলেম ও মনীষীদের লিখিত রিজাল ও হাদীসসূচীর গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে পারেন।[৫৪১]

এ যুগেই (তাবেয়ীদের যুগ) আহলে বাইতের জ্যোতি সমু ল হয়ে ওঠে। এর পূর্বে অত্যাচারীদের অনাচারের মেঘে তা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। এ যুগের মূলে ছিল কারবালার শোকাবহ রক্তাক্ত ঘটনা যা আহলে বাইতের শত্রুদের মুখে অপমানের ছায়া ফেলে দিয়েছিল, সচেতন ব্যক্তিদের চোখে তাদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে পেরেছিল, বিশেষজ্ঞদের আহলে বাইতের মাজলুমিয়াতের দিকে আকৃষ্ট করে যা রাসূল (সা.)- এর ওফাতের সাথে সাথে শুরু হয়েছিল। কারবালার মর্মান্তিকতা মানুষদের এ শোকাবহ ঘটনার মূল উদঘাটনে উদ্বু করে এবং এর কারণ নির্ণয়ে তারা এ মুসিবতের উৎপত্তির বীজ খুঁজতে থাকে। যে সকল মুসলমানের ভেতর পৌরুষত্ব রয়েছে তাঁরা আহলে বাইতের মর্যাদা রক্ষায় দাঁড়িয়ে যান কারণ মানুষ সহজাতভাবেই মজলুমের প্রতি সহানুভূতিশীল ও অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে। বাস্তবে এ শোকাবহ ঘটনার পর মুসলমানরা জাগরিত হয়ে নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে। তারা ইমাম যয়নুল আবেদীন (আ.)- এর প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং উসূল ও ফুরুয়ে দীনের বিষয়াবলীতে জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে তাঁর শরণাপন্ন হয়। কোরআন, সুন্নাহ্ ও ইসলামের সার্বিক বিষয়ে জ্ঞান অন্বেষণে তারা ইমাম সাজ্জাদ ও তাঁর পুত্র বাকির (আ.)- এর নিকট যাতায়াত শুরু করে। প্রথম পর্যায়ের শিয়াদের সকলেই এই দুই ইমামের শি যাঁদের সংখ্যা চার সহস্রাধিক। রিজাল গ্রন্থসমূহে তাঁদের নাম উল্লিখিত হয়েছে এবং তাঁদের লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা দশ হাজারের অধিক। হাদীসবিদগণ সহীহ সনদে এ গ্রন্থগুলোর লেখনীকে প্রজন্ম হতে প্রজন্মে স্থানান্তরিত করেছেন। এদের অনেকেই এই দুই ইমাম ছাড়াও ইমাম সাদিক (আ.) হতে তাঁদের জ্ঞানের পাত্র পূর্ণ করেছেন। তাঁদের একজন হলেন আবু সাঈদ আবান ইবনে তাগলিব ইবনে রিয়াহ্ জারিরী যিনি একাধারে ফকীহ্, মুফাসসির, মুহাদ্দিস এবং ইলমে উসূলের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবীদের একজন যিনি তিন ইমামেরই সাহচর্য লাভ করেছেন ও তাঁদের তিনজন হতেই হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষা লাভ করেছেন। প্রসি রিজালশাস্ত্রবিদ মির্যা মুহাম্মদ তাঁর ‘মানহাজুল মাকাল’ গ্রন্থে আবানের জীবনী আলোচনায় আবান ইবনে উসমানের সূত্রে ইমাম

সাদিক হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শুধু ইমাম সাদিক (আ.) হতেই ত্রিশ হাজার হাদীস নকল (বর্ণনা) করেছেন।[৫৪২]

এই তিন ইমামের নিকট তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। ইমাম বাকির (আ.) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

اِجلسْ فِيْ المسجد و أفت النآسَ فإِنيّ أحبّ أَنْ يُرى في شيعتي مثلك

“মসজিদে আসন গ্রহণ কর ও জনগণের জন্য ফতোয়া দাও। আমি পছন্দ করি আমার শিয়াদের মধ্যে তোমার মত ব্যক্তি প্রকাশিত হোক।”

ইমাম সাদিক (আ.) তাঁকে বলেছেন,

ناظِرْ أهلَ المدينة فإِنيّ أحبُّ أَنْ يكونَ مثلك من رُواتي و رجالي

“মদীনার লোকদের সাথে বিতর্ক কর। আমি চাই তোমার মত ব্যক্তি রিজাল ও রাবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক।”

আবান যখন মদীনার মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন সকলেই তাঁর দিকে লক্ষ্য করত এবং সেখানে অন্যান্য আলেমদের সভায় উপস্থিত হলে রাসূল (সা.)- এর জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ স্তম্ভের নিকট তাঁকে বসার জায়গা করে দিত।

ইমাম সাদিক (আ.) সালিম ইবন আবি হাব্বাহকে বলেন, “আবান ইবনে তাগলিবের নিকট যাও। সে আমা হতে অসংখ্য হাদীস   বণ করেছে এবং তার হতে যে হাদীসই   বণ করবে বলতে পার তা আমি বলেছি।”

তিনি (ইমাম সাদিক) আবান ইবনে উসমানকে বলেন, “আবান ইবনে তাগলিব আমা হতে ত্রিশ হাজার হাদীস বর্ণনা করেছে, তুমি তার হতে তা শিক্ষা ও বর্ণনা কর।”

আবান ইবনে তাগলিব যখনই ইমাম সাদিক (আ.)- এর নিকট আসতেন তখন তিনি তাঁর সাথে মুসাফাহ (হাত মিলাতেন) করতেন এবং কোলাকুলি করে তাঁর জন্য বসার গদি ও বালিশ আনতে বলতেন ও তাঁর মুখোমুখি বসতেন।

আবানের মৃত্যুর খবর যখন ইমাম সাদিক (আ.)- কে দেয়া হয় তখন তিনি বলেন,

أماَ و الله لَقَد أوجَعَ قلبِيْ موتُ أبان “আবানের মৃত্যু আমার হৃদয়ে ব্যথার সৃষ্টি করেছে।”

আবান ১৪১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আবান আনাস ইবনে মালিক, আ’মাশ, মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের, সাম্মাক ইবনে হারব্, ইবরাহীম নাখয়ী, ফুযাইল ইবনে আমর এবং হাকাম হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসলিম এবং সুনানে আরবাআহর সংকলকগণ তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন যা আমরা ১৬ নম্বর পত্রে উল্লেখ করেছি।

বুখারী তাঁর হতে কোন হাদীস বর্ণনা না করায় তাঁর কোন ক্ষতি হয় নি, বরং তিনি আহলে বাইতের ইমামগণের অনুসরণের কারণে সম্মানিত। বুখারী এই মহান ব্যক্তিদের হতেও হাদীস বর্ণনা করেন নি, এমন কি বেহেশতের যুবকদের নেতা ও রাসূলের বড় দৌহিত্র ইমাম হাসান হতেও হাদীস বর্ণনা করেন নি কিন্তু মারওয়ান ইবনে হাকাম, ইমরান ইবনে হাত্তান, আকরামাহ্ বারবারী, আমর ইবনে আস ও এদের মত ব্যক্তিবর্গ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আবানের মূল্যবান কিছু রচনা রয়েছে। তার মধ্যে ‘গারিবুল কোরআন’ নামক তাফসীর গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য যাতে কোরআনের শব্দ চয়নের সপক্ষে আরবী কবিতাসমূহ থেকে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

পরবর্তী পর্যায়ে আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ আযদী কুফী, আবান, মুহাম্মদ ইবনে সায়েব কালবী, ইবনে রওক, আতিয়া ইবনে হারিসের গ্রন্থসমূহকে সংকলন করে একটি গ্রন্থে রূপ দেন। অতঃপর তাঁদের পারস্পরিক পার্থক্যের বিষয়ে এ গ্রন্থে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাই আবানের গ্রন্থ পৃথকভাবে যেমন পাওয়া যায় ঠিক তেমনি অন্য গ্রন্থের সাথে সংকলন হিসেবেও পাওয়া যায়। শিয়া হাদীসবিদগণ এ দু’ধরনের গ্রন্থই নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আবান ‘আল ফাজায়েল’ ও ‘সিফিফন’ নামক দু’টি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। শিয়াদের প্রসি চারশ মূল গ্রন্থের একটি আবানের রচিত। এই গ্রন্থসমূহ শরীয়তের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বিবেচিত। আবানের সকল গ্রন্থই তাঁর সূত্রে বর্ণিত বলে রিজালশাস্ত্রবিদগণ উল্লেখ করেছেন।

অপর একজন বিশ্বস্ত ও প্রসি রাবী হলেন সাবেত ইবনে দীনার (আবু হামযাহ্ সুমালী)। তিনিও ইমাম সাজ্জাদ, ইমাম বাকির ও ইমাম সাদিক (আ.) হতে জ্ঞান শিক্ষা করেছেন এবং তাঁদের নিকট বিশেষ মর্যাদা রাখতেন। ইমাম সাদিক (আ.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "আবু হামযাহ্ বর্তমান সময়ের সালমান ফারসী।" ইমাম রেযা (আ.) বলেছেন, "আবু হামযাহ্ তার সময়ের লোকমান হাকিম।"

আবু হামযাহর রচিত তাফসীরে কোরআন রয়েছে যা হতে ইমাম তাবারসী তাঁর 'মাজমায়ুল বায়ান'[৫৪৩] গ্রন্থে নকল করেছেন। তিনি 'আন নাওয়াদির' নামক একটি গ্রন্থ সংকলন ছাড়াও 'যুহুদ' (দুনিয়া বিমুখতা) সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি 'রেসালাতুল হুকুক'[৫৪৪] গ্রন্থটি ইমাম যয়নুল আবেদীন হতে বর্ণনা করেছেন। রমযান মাসে সাহরীর সময় পড়ার মহামূল্যবান ও গভীর অর্থবহ দোয়াটি তিনিই ইমাম যয়নুল আবেদীন হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি আনাস ও শা'বী হতে হাদীস নকল করেছেন। নির্বিশেষে সুন্নী ও শিয়া রাবীগণ তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী, আবু নাঈম ও এ পর্যায়ের রাবীদের অনেকেই তাঁর হতে হাদীস শুনেছেন ও নকল করেছেন। ১৬ নম্বর পত্রে এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছি।

যে সকল মহান জ্ঞানী ব্যক্তি ইমাম সাজ্জাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করলেও ইমাম বাকির ও ইমাম সাদিক হতে হাদীস ও ইসলামী দীক্ষা নিয়েছেন তন্মধ্যে আবুল কাসেম, বুরাইদ ইবনে মুয়াবিয়া আজলী, আবু বাসির আসসাগীর অর্থাৎ লাইস ইবনে মুরাদ বুখতুরী মুরাদী, আবুল হাসান, যুরারাহ্ ইবনে আ'য়ুন, আবু জাফর মুহাম্মদ, মুসলিম ইবনে রিবাহ্, কুফী, তায়েফী, সাকাফী উল্লেখযোগ্য যাঁরা অন্ধকারে আলোর প্রদীপ হিসেবে বিরাজ করতেন। এ ছাড়াও অনেকে রয়েছেন যাঁদের নাম উল্লেখের সুযোগ এখানে নেই।

উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বুরাইদ ইবনে মুয়াবিয়া, আবু বাসির লাইস ইবনে মুরাদ, যুরারাহ্ এবং মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছেছিলেন। তাঁরা এমন এক পূর্ণ পাত্রের সন্ধান লাভ করেছিলেন ও নাগাল পেয়েছিলেন যে, ইমাম সাদিক (আ.) তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন,

هؤلاء أمناء الله على حلاله و حرامه "তারা হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে আল্লাহর আমীন অর্থাৎ প্রহরী।"

অন্যত্র ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন,

ما أجِدُ أحدا أحيا ذِكْرنا إلّا زرارة و أبو بصير ليث و محمد بن مسلم و بريد

“যুরারাহ্, আবু বাসির লাইস, মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম এবং বুরাইদ ব্যতীত অন্য কাউকে আমি পাই নি যাঁরা আমাদের স্মরণকে জীবন্ত করেছেন।”

অতঃপর তিনি বলেছেন,

هؤلاء حُفّاظُ الدّين، و أمناء أَبي,على حلال الله وحرامه و هم السّابقون إلينا في الدّنيا السّابقونَ إلينا في الآخرة

“তাঁরা দীনের সংরক্ষক, আল্লাহর হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে আমার পিতার বিশ্বস্ত প্রহরী। তাঁরা দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের প্রতি সর্বাধিক অগ্রসরমান।”

অন্যত্র ইমাম সাদিক (আ.) ‘বিনয়ীদের প্রতি বেহেশতের সুসংবাদ দাও’- এ কথা বলার পর এই চার ব্যক্তির নাম স্মরণ করে যে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন সেখানে বলেন, “আমার পিতা আল্লাহর হারাম ও হালালের বিষয়ে তাঁদের বিশ্বস্ত মনে করতেন। তাঁরা তাঁর জ্ঞানের পাত্র ছিলেন যেমনি এখনও তাঁরা আমার রহস্যের ভাণ্ডার। তাঁরা আমার পিতার ন্যায়পরায়ণ সাহাবী এবং আমাদের শিয়াদের মধ্যে জীবন ও মৃত্যুতে (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়) উ ল তারকার ন্যায় সমু ল। তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ্ সকল বিদআতের মূলোৎপাটন ও ধ্বংস সাধন করেছেন। তাঁরা বাতিলপন্থীদের অপচেষ্টাকে নস্যাৎ করেছেন ও ইমামদের সম্পর্কে অতির ন ও বাড়াবাড়িকারীদের অন্যায় ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণকে বিলুপ্তকারী।

এই মহান ব্যক্তিবর্গের সম্মান, মর্যাদা ও আনুগত্যের বিষয়ে ইমাম সাদিক (আ.) হতে এত অধিক হাদীস এসেছে যে, এ পত্রের কলেবরে তার বর্ণনা সম্ভব নয়। উন্নত চরিত্র স ও এ ব্যক্তিবর্গের বিষয়ে বিভিন্ন লেখক যে মিথ্যাচার করেছেন তার জবাব আমরা ‘মুখতাছারুল কালাম ফি মুয়াল্লিফিশ শিয়া ফি সাদরিল ইসলাম’ গ্রন্থে দিয়েছি। তাঁদের বিরু প্রচারিত এই মিথ্যাচার আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের নিকট তাঁদের মর্যাদার কোন হানি ঘটায় নি যেমনটি নবীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাও হিংসার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদার বৃ বৈ হ্রাসে সক্ষম হয় নি, বরং

তাদের (বিদ্বেষ পোষণকারীদের) এ কর্ম তাঁদের মত ও পথের প্রচার ও প্রসারে সাহায্য করেছে এবং জ্ঞানী ও সত্যপ্রত্যাশীদের অন্তরে তাঁদের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইমাম সাদিক (আ.)- এর সময়কালে জ্ঞানের সর্বোচ্চ প্রসার ঘটে। শিয়াগণ তাঁর পিতার প্রতি যেমন আকৃষ্ট হয়ে ছুটে যেতেন তেমনি তাঁর প্রতিও আগ্রহ ও আশা নিয়ে এগিয়ে আসেন। তিনিও তাঁদের সানন্দে গ্রহণ করতেন এবং তাঁদের অজ্ঞতা দূরীকরণে সকল রকম প্রচেষ্টা চালাতেন। তিনি এ সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের নিকট জ্ঞানের রহস্য উন্মোচনে লিপ্ত হন।

আবুল ফাতহ শাহরেস্তানী তাঁর ‘মিলাল ওয়ান নিহাল’ গ্রন্থে ইমাম সাদিকের[৫৪৫] এ অবদানকে স্বীকার করে বলেছেন, “তিনি (ইমাম সাদিক) ধর্মীয় জ্ঞানে পণ্ডিত, প্রজ্ঞায় সংস্কৃতিবান ও পূর্ণ, দুনিয়া বিমুখতায় আদর্শ ও প্রবৃত্তির মোকাবিলায় তাকওয়ার পূর্ণ নমুনা ছিলেন।” অতঃপর বলেছেন, “তিনি বেশ কিছুদিন মদীনায় তাঁর অনুসারী শিয়াদের জ্ঞান শিক্ষা দিতেন এবং তাঁর বন্ধুদের জ্ঞানের রহস্যের বৃষ্টিধারায় স্নাত করতেন। অতঃপর ইরাকে গমন করেন এবং কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। তিনি শাসকগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডে কখনো হস্তক্ষেপ করেন নি এবং খেলাফতের বিষয়েও বির্তকে লিপ্ত হন নি (কারণ সে সময় পরিবেশ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেরই উপযোগী ছিল, অন্য রকম ভূমিকা নেয়ার পরিবেশ ছিল না)।”

অতঃপর ইমাম সাদিক (আ.)- এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলেছেন, “যে ব্যক্তি জ্ঞানের সমুদ্রে অবগাহন করে সে একটি মেঘের প্রতি লোভ পোষণ করে না। যে সত্যের চূড়ায় অবস্থান করছে সে বাহ্যিক পদমর্যাদা লাভ না করাকে অপমান মনে করে না (পতনের ভয় করে না)।”

و الحقّ ينطق منصفا و عنيداً

সত্য, ন্যায়পরায়ণ ও অহংকারী উভয় ব্যক্তিকেই কথা বলতে বাধ্য করে।

ইমাম সাদিকের অনেক সাহাবীই জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে এমন স্থানে পৌঁছেছিলেন যে, নিজেরাই হেদায়েতের পথ- প্রদর্শক, অন্ধকারের প্রদীপ, জ্ঞানের সমুদ্র ও উ ল নক্ষত্র এবং নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। ইরাক, হেজাজ, পারস্য, সিরিয়া ও ইয়েমেনের এরূপ চার হাজার ব্যক্তির বর্ণনা রিজাল গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় যাঁরা গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করেছেন এবং এ গ্রন্থসমূহ শিয়াদের

নিকট প্রসি । ‘উসূলে আরবাআতু মিয়াহ্’ বা চারশ মূল গ্রন্থ এই সকল ব্যক্তির লেখা হতেই সংকলিত যাঁরা ইমাম সাদিকের শি ছিলেন। এই গ্রন্থসমূহে তাঁর ফতোয়াসমূহ লিপিব হয়েছে যা পরবর্তী প্রজন্মের জ্ঞান ও কর্মের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ইমাম সাদিকের পর শিয়া মাজহাবের আলেমরা এবং ইমামগণের প্রতিনিধিরা সকলের বোঝার জন্য সহজ ও সংক্ষিপ্ত বিশেষ কিছু গ্রন্থ সংকলিত করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম চারটি গ্রন্থ (কুতুবে আরবাআহ্) সে সময় হতে এখন পর্যন্ত উসূল ও ফুরুয়ে দীনের ক্ষেত্রে বার ইমামীদের নিকট ে ষ্ঠ বলে পরিগণিত। এই প্রসি চারটি গ্রন্থ হলো মরহুম সিকাতুল ইসলাম কুলাইনীর ‘কাফী’, শেখ তুসীর ‘তাহযীব’ ও ‘ইসতিবসার’ এবং মরহুম সাদুকের ‘মান লা ইয়াহদ্বারুহুল ফাকীহ্’। এ গ্রন্থ চারটি মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত এবং তাঁদের হতেই যে বর্ণিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই চারটির মধ্যে ‘কাফী’ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, সর্বোত্তম ও পুরাতন। এতে ১৬১৯৯টি হাদীস রয়েছে। এতে আহলে সুন্নাহর সিহাহ সিত্তাহর গ্রন্থসমূহ হতে অধিক সংখ্যক হাদীস রয়েছে। ইমাম সাদিক (আ.) এবং ইমাম কাযেম (আ.)- এর শি দের মধ্যে হিশাম ইবনে হাকামও অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন তন্মধ্যে উনত্রিশটি প্রসি লাভ করেছে এবং আমাদের হাদীসবিদগণ তাঁর সনদে এ উনত্রিশটি গ্রন্থ নকল করেছেন। ‘মুখতাছারুল কালাম ফি মুয়াল্লিফিশ্ শিয়া মিন সাদরিল ইসলাম’ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

হিশাম ইবনে হাকামের গ্রন্থগুলো বিশেষ গুণে গুণান্বিত এবং বর্ণনা ও যুক্তি উপস্থাপনে অনন্য ও উ লতায় ভাস্বর। এই গ্রন্থগুলোতে উসূল ও ফুরুয়ে দীন, তাওহীদ ও বু বৃত্তিক দর্শন, নাস্তিক ও যিন্দীকদের যুক্তির বিপক্ষে আলোচনা, প্রকৃতি পূজারীদের অসারতা, কাযা ও কদরের ক্ষেত্রে জাবরী মতবাদের সমালোচনা, খারেজী ও নাসেবীদের (হযরত আলীর প্রতি বিদ্বেষী) বিপক্ষে যুক্তি, হযরত আলী ও আহলে বাইতের ইমামদের ওসিয়তের পক্ষে দলিল, ে য় নয় এমন কাউকে ে য় স্থানে অধিষ্ঠিত করাকে যারা বৈধ মনে করে তাদের জবাব, আলী ও আহলে বাইতের ইমামদের বিষয়ে বাড়াবাড়ি এবং অতির নকারীদের প্রতি উত্তর প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

হিশাম কালামশাস্ত্র, ঐশী প্রজ্ঞা ও ইসলামী জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় দ্বিতীয় শতাব্দীর পুরোধা ছিলেন। তিনি ইমামতের বাস্তবতা প্রস্ফুটিত করে তুলে ধরেন ও দীনের বিষয়গুলোকে গভীর চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে পরিশোধিত করেন।

তিনি ইমাম সাদিক ও ইমাম কাযেম (আ.) হতে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের নিকট বিরল সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁরা তাঁকে এতটা প্রশংসা করেছেন যে, তাঁর আসন সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি প্রথমে বিচ্যুত একটি সম্প্রদায় 'জাহমীয়া'র অনুসারী ছিলেন। পরে ইমাম সাদিক (আ.) তাঁকে হেদায়েতের নিদের্শনা দেন এবং তাঁকে শি হিসেবে গ্রহণ করেন। ইমাম সাদিক (আ.)-এর শাহাদাতের পর তিনি ইমাম কাযেম (আ.)- এর শি ত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর শি দের মধ্যে ৫ ষ্ঠত্বের আসন লাভ করেন।

দুঃখজনক যে, আল্লাহর প্রদীপ নির্বাপণের প্রচেষ্টাকারীরা তাঁকে 'মুজাসসিমাহ্' সম্প্রদায়ের (যারা কিয়ামতে আল্লাহর দৈহিক উপস্থিতিতে বিশ্বাসী) অন্তর্ভুক্ত বলেছে ও তাঁর প্রতি অন্যায় দোষারোপ করেছে। যারা আল্লাহর দীনের নূরকে প্রদীপের ফানুসের অভ্যন্তরেই নির্বাপিত করার পরিকল্পনা করেছিল তারাই তাঁর প্রতি এরূপ অপবাদ আরোপের মাধ্যমে আহলে বাইতের প্রতি তাদের বিদ্বেষকে প্রকাশ করেছে। অথচ তাঁর মাজহাব সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশী অবগত এজন্য যে, তাঁর লেখনী ও বক্তব্য আমাদের নিকট সংরক্ষিত রয়েছে যেখানে তিনি আমাদের মাজহাব সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। সুতরাং আমাদের মাজহাবের অগ্রবর্তী হিসেবে তাঁর বক্তব্য ও লেখনীর এমন কিছু নেই যা আমাদের নিকট অপ্রকাশিত আর অন্যদের নিকট প্রকাশিত থাকবে। কারণ তারা তাঁর মাজহাব হতে দূরে ছিল আর আমরা নিকটবর্তী।

এগুলো বাদ দিলেও শাহরেস্তানীর 'মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থে হিশাম সম্পর্কিত আলোচনায় হিশাম যে মুজাসসিমাহ্ ছিলেন না তা প্রমাণিত হয়েছে। এখানে আমরা শাহরেস্তানী যে ঘটনা হতে হিশাম 'মুজাসসিমাহ্' ছিলেন বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন তা হুবহু বর্ণনা করছি। তিনি বলেন, "হিশাম ইবনে হাকাম মাজহাবের মৌলনীতিতে গভীর চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন।

মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযোগ আরোপ করতেন তা হতেই তাঁর আকীদা বোঝা যায়। কারণ ব্যক্তির আকীদা ও মত তার বিরোধীদের সে যে বিষয়ে অভিযুক্ত করে তা হতেই বোঝা যায়, যা সে প্রকাশ করে তা হতে নয়। যেমন আলাফের সাথে বিতর্কে হিশাম তাঁকে অভিযুক্ত করেন : তুমি বিশ্বাস কর বিশ্বজগতের স্রষ্টা জ্ঞানী তাঁর জ্ঞানের কারণে তবে তাঁর জ্ঞান তাঁর সত্তাগত। সুতরাং তুমি মনে কর তিনি জ্ঞানী কিন্তু অন্যান্য জ্ঞানীদের মত নন। তবে কেন বল না তাঁর দেহ রয়েছে তবে অন্যদের মত নয়।"

এ বর্ণনা হতে শাহরেস্তানী বলতে চান হিশাম মুজাসসিমাহ্ বা আল্লাহর দৈহিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। তবে হিশাম আলাফের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবার কারণেই বলতে পারি না যেহেতু তিনি এ বিষয়ে তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন সেহেতু তিনি এরূপ মতবাদে বিশ্বাসী। কারণ হয়তো হিশাম এ পদ্ধতিতে আলাফকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন যে, তিনি কতটা গভীর চিন্তা করেন। স্বয়ং শাহরেস্তানী স্বীকার করেছেন ব্যক্তির আকীদা তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে যে অভিযোগে অভিযুক্ত করে তা হতেই বোঝা যায়, সে যা প্রকাশ করে তা হতে নয়।

তদুপরি যদিও এ বর্ণনা তাঁর দৃষ্টিতে হিশামের 'মুজাসসিমাহ্' হওয়াকেই প্রমাণ করে তবুও বলা যায় এটি তাঁর শিয়া হবার পূর্বের ঘটনা। কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি তিনি শিয়া হবার পূর্বে 'জাহমিয়া' ফিরকায় বিশ্বাসী ছিলেন ও আহলে বাইতের ইমামদের মাধ্যমে হেদায়েতপ্রাপ্ত হন ও তাঁদের বিশেষ শিষ্যে পরিণত হন। এতদসত্ত্বেও আমাদের পূর্ববর্তীরা শত্রুগণ কর্র্তৃক তাঁর ওপর আরোপিত এরূপ অভিযোগের কোন ভিত্তি ও নমুনা খুঁজে পান নি। তেমনিভাবে যুরারাহ্ ইবনে আ'য়ুন, মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম, মুমিন তাঁকে ও তাঁদের মত ব্যক্তিবর্গের ওপর আরোপিত অভিযোগেরও কোন প্রমাণ পান নি। আমরাও এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা চালিয়ে দেখেছি এগুলো তাঁদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষপ্রসূত আরোপিত অসত্য বৈ কিছু নয়, যা অন্যায়।

و لا تحسبنّ الله غافلاً عمّا يعمل الظّالمون

কখনোই মনে কর না অন্যায়কারীরা যা করছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অসচেতন (অজ্ঞ)।

শাহরেস্তানী হিশাম সম্পর্কে আরো বলেছেন যে, তিনি আলীকে খোদা বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর এ কথায় শোকাক্রান্ত মহিলারাও হেসে উঠবে কারণ তিনি কখনোই এরূপ অবাস্তব বিষয়ে বিশ্বাস পোষণ করতেন না যখন তিনি নিজেই তাওহীদের আলোচনায় কোন কিছুর খোদার অবতার হবার বিরোধী মত পোষণ করেন ও আল্লাহকে এ থেকে পবিত্র মনে করেন। তাঁর বিরোধীরা বিদ্বেষ অথবা অজ্ঞতাবশত তাঁর প্রতি যে দোষারোপ করে তিনি তার ঊর্ধ্বে অবস্থান করছেন।

তাঁর ইমামত ও ওসিয়ত সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি আলী (আ.)- এর ওপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর ৎে ষ্ঠত্বের বিষয়টি বর্ণনা করে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "আলী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর উম্মতের অন্যতম ও তাঁর অনুসারী, তিনি নবীর খলীফা ও ওয়াসি এবং আল্লাহর এমন এক বান্দা যাঁর প্রতি অন্যায় ও অবিচার করা হয়েছে। তিনি তাঁর অধিকার আদায়ে অক্ষম হয়ে শত্রুর নিকট বাহ্যত আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। তিনি ঐ সকল ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত যাঁরা সহযোগী ও বন্ধুর অভাবে ভয় ও আশঙ্কায় ছিলেন।"

কিরূপে সম্ভব একদিকে শাহরেস্তানী বলছেন হিশাম মাজহাবের মৌলনীতিতে গভীর চিন্তা করতেন এবং মু'তাযিলাদের বিপরীতে তাঁর উপস্থাপিত অভিযোগকে আমাদের ভুললে চলবে না কারণ তিনি আলাফের বিপক্ষে যে অভিযোগ আরোপ করেছেন তা হতেই আমরা তাঁর আকীদা সম্পর্কে জানতে পারব। তিনি আলাফকে বলেন, "কেউ খোদার দৈহিক অস্তিত্বের বিষয়ে এ কথা বল না যে, তাঁর দেহ রয়েছে তবে অন্যদের মত নয়।"

অন্যদিকে তাঁর সম্পর্কে বলছেন তিনি আলীকে স্বয়ং খোদা বলে বিশ্বাস করতেন। এ দুই বক্তব্য পরস্পর বিপরীত নয় কি? হিশামের মত সম্মানিত ব্যক্তিকে এরূপ অজ্ঞতাপূর্ণ মন্তব্যের অভিযোগে অভিযুক্ত করা কুপমণ্ডুকতা নয় কি? অথচ তাই করা হয়েছে। কারণ গুজব রটানো ব্যতীত তাঁদের কোন কিছু করার নেই। আহলে বাইত ও তাঁদের মাজহাবে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের প্রতি তাঁরা বিদ্বেষবশত এমনই করে থাকেন। ওয়া লা হাউলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

ইমাম মূসা কাযেম, ইমাম রেযা, ইমাম জাওয়াদ, ইমাম হাদী ও ইমাম আসকারীর সময়কালে অসংখ্য গ্রন্থ সংকলিত ও রচিত হয়েছে। তাঁদের হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ সরাসরি অথবা তাঁদের শি দের মাধ্যমে মুসলিম রাজ্যের বিভিন্ন শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। শি রা দীনের জ্ঞান প্রচারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় লিপ্ত ও গবেষণার কাজে ব্যাপৃত হন। তাঁরা দীনের সমুদ্রে মুক্তা আহরণে এর গভীরে প্রবেশ করেন এবং খাঁটি নির্যাস হস্তগত করে সত্যকে অসত্য হতে পৃথক করা শুরু করেন এবং গ্রন্থ রচনা ও সংকলনে সকল কলাকৌশল প্রয়োগ করে বিচ্ছিন্ন আলোচনাসমূহকে সুশৃঙ্খল আকারে রূপ দেয়ার কাজে লিপ্ত হন।

মুহাক্কেক (আল্লাহ্ তাঁর সম্মানকে সমুন্নত করুন) নির্ভরযোগ্য একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ইমাম জাওয়াদের ছাত্রদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা কম নয়। যেমন হুসাইন ইবনে সাঈদ ও তাঁর ভ্রাতা হাসান, আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি নাসর বাযানতী, আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালিদ বারকী, শাযান, আবুল ফযল আল আমা, আইয়ুব ইবনে নূহ, আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ঈসাসহ অনেকেই।

তিনি আরো বলেছেন যে, তাঁদের যে সকল গ্রন্থ আমাদের মাঝে বিদ্যমান সেগুলো তাঁদের জ্ঞানের গভীরতার প্রমাণ দেয়।

আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি বারকীর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। বাযানতীর একটি বৃহৎ গ্রন্থ রয়েছে যা ‘জামে বাযানতী’ নামে প্রসি । হুসাইন ইবনে সাঈদের গ্রন্থ সংখ্যা ৩০টি।

ইমাম সাদিকের এই সন্তানের শি দের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা অসংখ্য। তাই রাবীদের পরিচিতিমূলক গ্রন্থ এবং ফেহ্রেসত (সূচীপত্র) গ্রন্থসমূহে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের জীবনী অধ্যয়ন করুন : মুহাম্মদ ইবনে সিনান, আলী ইবনে মাহযিয়ার, হাসান ইবনে মাহবুব, হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাম্মাআহ্, সাফওয়ান ইবনে ইয়াহিয়া, আলী ইবনে ইয়াকতীন, আলী ইবনে ফাযযাল, আবদুর রহমান ইবনে নাজরান, ফযল ইবনে শাযান (দুইশ গ্রন্থের রচিয়তা), মুহাম্মদ ইবনে মাসউদ আইয়াশী (দুই শতাধিক গ্রন্থের প্রণেতা), মুহাম্মদ ইবনে উমাইর, আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (ইমাম সাদিকের একশ সাহাবী হতে হাদীস বর্ণনাকারী), মুহাম্মদ ইবনে

আলী ইবনে মাহবুব, তালহা ইবনে তালহা ইবনে যাইদ, আম্মার ইবনে মূসা সাবাতী, আলী ইবনে নোমান, হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ্, আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মেহরাওয়ান (ইবনে খানাহ্ নামে প্রসি), সাদাকাহ্ ইবনে মুনযির কুমী এবং উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আলী হালাবী। তন্মধ্যে হালাবী তাঁর সংকলিত গ্রন্থ ইমাম সাদিকের কাছে দেন এবং ইমাম তা সংশোধিত করে প্রশংসা করে বলেন, "আহলে সুন্নাহর মধ্যে এরূপ গ্রন্থ দেখেছ কি?" আবু উমর, তাবিব এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে সাঈদ তাঁদের গ্রন্থসমূহ ইমাম রেযার নিকট পেশ করেন। ইউনুস ইবনে আবদুর রহমানও তাঁর গ্রন্থ ইমাম আসকারীর নিকট পেশ করেন।

যদি কেউ শিয়া মাজহাবের পূর্ববর্তী বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের জীবনী অধ্যয়ন করেন বিশেষত ইমাম হুসাইন (আ.)- এর বংশধারার নয়জন ইমামের শি দের রচিত ও সংকলিত গ্রন্থ হতে যে সকল বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন (যাঁরা প্রকৃতপক্ষে উসূল ও ফুরুয়ে দীনের ক্ষেত্রে রাসূলের বংশের ইমামদের হাদীসের সংরক্ষক ছিলেন) ও বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁদের মাধ্যমে এ গ্রন্থসমূহ স্থানান্তরিত হয়েছে তাঁদের চরিত্র বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেন তাহলে তিনি নিশ্চিত হবেন আহলে বাইতের ইমামদের প্রতিষ্ঠিত মাজহাব মুতাওয়াতির সূত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করবেন উসূল ও ফুরুয়ে দীনের ক্ষেত্রে আমরা যে মাজহাবে বিশ্বাসী তা নবী (সা.)- এর পবিত্র বংশধরদের হতেই গৃহীত হয়েছে। একগুঁয়ে, উ ত ও মূর্খ ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করবে না।

الحمدُ للهِ الذي هدانا لِهذا و ما كناّ لِنهتدي لولا أَنْ هدانا الله

আল্লাহর প্রশংসা এজন্য যে, আমাদের এদিকে হেদায়েত করেছেন। যদি তিনি আমাদের হেদায়েত না করতেন তাহলে আমরা হেদায়েত পেতাম না।

ওয়াসসালাম

শ

একশত এগারতম পত্র

১ জমাদিউল উলা ১৩৩০ হিঃ

আমিও সাক্ষ্য প্রদান করছি আপনারা উসূল ও ফুরুয়ে দীনের ক্ষেত্রে ঐ পথেই রয়েছেন যে পথে রাসূল (সা.)- এর পরিবারের ইমামগণ ছিলেন। সত্যই আপনি সুন্দরভাবে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করেছেন এবং অপ্রকাশিতকে প্রকাশিত করেছেন।

সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের কারণ। আমি এ পত্রটি গভীরভাবে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করেছি ও এর ত্রুটি অনুসন্ধানে প্রচেষ্টা চালিয়েছি কিন্তু প্রশ্নাতীতভাবে এতে আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। আমি এই পবিত্র ও মৃদু বাতাসের উৎস সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলাম কারণ এর সুগন্ধ ও জীবন- সঞ্চারী প্রবাহে আমি মোহিত ও প্রাণ ফিরে পেয়েছিলাম। আপনার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবার পূর্বে আমি শিয়াদের সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতাম। এরূপ ভুল ধারণা গুজব রটনাকারীদের অসত্য প্রচারণা থেকেই লাভ করেছিলাম। কিন্তু যখন আল্লাহ্ আপনার সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন তখন আমি সত্যের ধ্বজার সন্ধান পেলাম এবং অন্ধকারে আলোর উ ল প্রদীপ হাতে পেলাম। আপনার সাথে আলোচনার পর সফলতার দ্বারে উপনীত হয়ে নিজ প্রবৃত্তির ওপর জয়লাভ করলাম। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমে কত বড় নিয়ামতই না আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন! কত মূল্যবান ও পুণ্যময় নিয়ামত আপনি আমার সমীপে পেশ করেছেন! সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের।

ওয়াসসালাম

স

একশত বারতম পত্র

২ জমাদিউল উলা ১৩৩০ হিঃ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন, ধীশক্তিসম্পন্ন ও এর নিকটবর্তী। আপনি সাহসিকতার সাথে আকাশের উল্কার মত গতিতে আলোচনার গভীরে প্রবেশ করেছেন এবং কৌতুহলী মনোবৃত্তি নিয়ে সত্যানুসন্ধানে রত হয়েছেন। আলোচনার সার্বিক দিকগুলো ভালোভাবে পর্যালোচনা করেছেন ও এর মূল বিষয়বস্তু ও সূক্ষ্ম দিকগুলোকে আপনার অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে পর্যবেক্ষণ এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিকগুলো তুলনামূলক যাচাই করেছেন। আমি লক্ষ্য করেছি আপনি এর ভেতরের তথ্য জানতে আগ্রহী ছিলেন। যেখানেই অসত্য ও বানোয়াট কিছু আছে বুঝতে পেরেছেন সেখানেই এর উৎস অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে সকল মাজহাবী সংস্কার ও গোঁড়ামী পরিত্যাগ করেছেন। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ আপনার সত্য অনুধাবনের প্রতিবন্ধক হতে পারে নি। আমি আশা করছি আপনার সহনশীলতার ভিত্তি অটল থাকবে, আপনার চিন্তা- চেতনার বিহঙ্গ স্থিরতা লাভ করবে, আপনি এ বিষয়ে আরো গভীরে প্রবেশ করবেন, এক্ষেত্রে বু বৃত্তিকে পর্বতসম দৃঢ় ও বক্ষকে দুনিয়া থেকে প্রসারিত করবেন যাতে আত্মীয়তার কোন সম্পর্কই আপনার মনে প্রভাব ফেলতে না পারে। তবেই সকল গোপন রহস্য উন্মোচিত হয়ে সত্য পর্দাহীনভাবে আপনার নিকট প্রকাশিত হবে। ভোরের আলো চক্ষুষ্মান মানুষের জন্য সকল কিছুই দৃশ্যমান করে তোলে। আল্লাহর প্রশংসা এজন্য যে, তাঁর সত্য দীনের প্রতি আমাদের হেদায়েত করেছেন ও এ পথ আমাদের চিনিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের প্রতি দরূদ ও সালাম।

এই গ্রন্থ আল্লাহর সাহায্য ও তৌফিকে আবদুল হুসাইন শারাফুদ্দীন আমেলীর কলমে লিখিত ও সমাপ্ত হয়েছে।[৫৪৬] আল্লাহ্ তাঁর প্রতি করুণা ও রহমতের আচরণ করুন এবং তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের ছায়ায় আ য় দান করুন।

ওয়াসসালাম

শ

প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসমূহ

*১। আহলে সুন্নাহর ভাইয়েরা উসূলে দীনের ক্ষেত্রে দু'টি প্রধান ধারার অনুসারী : মু'তাযিলা ও আশা'ইরা। তবে এ দু'টি ছাড়াও অন্যান্য মতবাদ রয়েছে, তদুপরি তাদের প্রত্যাবর্তন এ দু'য়ের প্রতিই।

আশা'ইরা মতবাদের প্রবক্তা আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল আশা'আরী যিনি সাহাবী আবু মূসা আশা'আরীর বংশের লোক। তাই কখনো কখনো এ মাজহাবকে আশা'আরী মাজহাবও বলা হয়।

*২। আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহ্ ফুরুয়ে দীন অর্থাৎ ফেকাহগত বিধিবিধানের ক্ষেত্রে চার মাজহাবের অনুসারী অর্থাৎ হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী পর্যায়ক্রমে আবু হানিফা, মালিক ইবনে আনাস, মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস শাফেয়ী এবং আহমাদ ইবনে হাম্বলের নামে পরিচিত। আহলে সুন্নাহর এ চার মাজহাবকে একত্রে 'মাজাহিব- ই আরবাআহ্' বলা হয়েছে। চতুর্থ পত্রে তাঁদের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ উল্লিখিত হয়েছে।

*৩। حطه (হিত্তাহ্) শব্দটির অর্থ ঝরানো, পতন ও নিম্নে আনয়ন। প্রচুর রেওয়ায়েতে রাসূল (সা.) আহলে বাইতের ইমামদের باب الحطه (বাবুল হিত্তাহ্) বা ক্ষমার দ্বার বলেছেন। 'বাবুল হিত্তাহ্' বায়তুল মুকাদ্দাসের অন্যতম দ্বার এবং বনি ইসরাঈলকে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের সময় এ দ্বার দিয়েই প্রবেশ করতে বলা হয়েছিল এবং তখন এ অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্র শব্দটি উচ্চারণের আদেশ দেয়া হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল প্রবেশের সময় حطه 'আমাদের গুনাহসমূহ ঝরিয়ে দিন' শব্দটি সমবেত স্বরে পাঠ করতে। নবী (সা.) আহলে বাইতের ইমামদের এজন্য 'বাবুল হিত্তাহ্' বলতেন যাতে করে মুসলমানরা তাঁদের মোকাবিলায় আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁদের হতেই খোদায়ী বিধান গ্রহণ করে।

حطه শব্দটি পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ৫৮ ও সূরা আরাফের ১৬১ নং আয়াতে এসেছে।

*৪। যে সকল ব্যক্তি নবী (সা.)- এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন তাঁদের সাহাবী, যাঁরা নবীর সাক্ষাৎ পান নি কিন্তু সাহাবীদের সান্নিধ্য পেয়েছেন তাঁদের তাবেয়ী এবং যাঁরা সাহাবীদের সাক্ষাৎ পান নি কিন্তু তাবেয়ীদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন তাঁদের তাবে- তাবেয়ীন বলা হয়।

*৫। তিন শতাব্দী বলতে নবী (সা.), সাহাবী ও তাবেয়ীদের সময়কাল বুঝানো হয়েছে। এ তিন যুগে আশা'আরী ও চার মাজহাবের কোন অস্তিত্ব ছিল না।

*৬। চার মাজহাবের প্রধানগণ কোন যুক্তি ছাড়া তাঁদের ফতোয়া গ্রহণে নিষেধ করেছেন। আবু হানিফা, মালিক, শাফেয়ী এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের ফতোয়া আল্লাহর ওহীর ন্যায় নয় যে, তার বিরোধী আমল করা যাবে না, বরং তাঁরা সুস্পষ্ট বলেছেন, "আমরা অন্যান্য মানুষদের মতই ফতোয়া প্রদানে ভুল করি। তাই যদি নবীর হাদীসে আমাদের ফতোয়ার বিপরীত দেখা যায় সেক্ষেত্রে আমাদের ফতোয়া পরিত্যাগ করে ঐ হাদীস গ্রহণ করবে।" এ থেকে বোঝা যায় ফতোয়াকে তাঁরা নিজেদের স্বত্বাধিকারের বস্তু মনে করতেন না এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সকল মুসলমান সমান বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির কয়েকটি নমুনা নিম্নে প্রদান করছি :

আবু হানিফা বলেছেন,

ক) إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي "যখন হাদীস সহীহ ও নির্ভুল হবে, আমার ফতোয়াও সেটিই।"

(ইবনে আবেদীন তাঁর হাসিয়ার ১ম খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠায় এবং 'রাসমূল মুফতী ' রেসালার ১ম খণ্ডের ৪র্থ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

খ) وَ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَن يَأخُذَ بِقَوْلنا ما لم يعْلم مِنْ أين أخذناه "কারো জন্য বৈধ নয় আমাদের কথাকে গ্রহণ করবে যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হবে কোথা হতে আমরা তা নিয়েছি।" (ইবনে আবদুল বার তাঁর 'আল ইনতিকা ফি ফাজাইলিল আইম্মাতিল ফুকাহা'র ১৪৫ পৃষ্ঠায়; ইবনুল কাইয়েম তাঁর 'আলামুল মুকেয়ীন ' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩০৯ পৃষ্ঠায়; শা'রানী আল মিযান গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠায়; ইবনে আবেদীন আল বাহর আর রায়িক গ্রন্থের প্রান্ত লেখনীতে (৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা) ও রাসলূল মুফতী গ্রন্থের

২৯ ও ৩২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় বর্ণনাটি আব্বাস দাওরী ইবনে মুঈনের ইতিহাসে (১/৭৭/৬) যুফার থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।)

তিনি অন্যত্র বলেছেন, حرام عَلى منْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيلي أَنْ يُفتى بكلامي "যে ব্যক্তি আমার ফতোয়ার পক্ষের দলিল সম্পর্কে না জানে, আমার বক্তব্য অনুযায়ী ফতোয়া দান তার জন্য নিষি (হারাম)।"

فإنّنا بشر نقول القول اليَوم و نرجع عنه غداً "নিশ্চয়ই আমরাও মানুষ; আজকে একটি কথা বলি আগামীকাল তা হতে ফিরে আসি (পরিবর্তন করি)।"

অন্য এক সূত্রে তিনি আবু ইউসুফকে বলেন,

وَيْحَكَ يا يَعْقُوبُ لا تَكْتُبْ كُلّماَ تسْمع منِّي فإِنِّ قد أرىَ الرَّاي اليوم و أَتركه غداً و أرى الرَّأْيَ غداً وأتركه بَعْدَ غدٍ

"আফসোস তোমার জন্য হে ইয়াকুব! আমার নিকট হতে যা কিছু বণ কর তা লিপিব কর না। কারণ আমি আজকে এক মত প্রদান করি কাল তা ফিরিয়ে নিই। আগামীকাল এক ফতোয়া দিই অতঃপর তা পরিহার করি।"

গ) إذا قُلْتُ قَولا يُخالِف كتابَ اللهِ تعالى و خَبَرَ الرسولِ فاتركوا قَوْلي "যখনই কোন ফতোয়া দিই এবং তা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসের বিরোধী হয় তা প্রত্যাখ্যান কর।"

মালিক ইবনে আনাস

মালিক ইবনে আনাস হতেও এরূপ উ ্ তি বর্ণিত হয়েছে যার একটি এখানে উল্লেখ করছি :

إنَّما أنا بَشَرٌ اَخطِئُ وأُصيبُ فانظُروا فِيْ رأيي فَكلّ ما وافَقَ الكتابَ و السنَّةَ فَخذوه وكلُّ ما لم يُوافِقِ الكتاب و السنَّة فاتركوْهُ

"অবশ্যই আমি মানুষ, কখনো ভুল করি, কখনো সঠিক সি ান্ত দিই। আমার ফতোয়া যাচাই করে দেখ যদি তা আল্লাহর গ্রন্থ ও রাসূলের সুন্নাহর সাথে সাম স্যশীল হয় তাহলে তা গ্রহণ কর এবং

কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী হলে ত্যাগ কর।” (ইবনে আবদুল বার তাঁর ‘জামেয়া ’ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় এবং ইবনে জাযম তাঁর ‘উসূলুল আহকাম ’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৪৯ পৃষ্ঠায় এটি উল্লেখ করেছেন।(

ইমাম শাফেয়ী

তাঁর হতে এ বিষয়ে প্রচুর বাণী উ ৎ ত হয়েছে যার কয়েকটি নমুনা হিসেবে পেশ করছি :

ক)

ما مِنْ أَحَدٍ إِلّا وتَذْهَبُ عليه سُنَّةٌ لِرَسولِ اللهِ وتَعْزبُ عَنْهُ فَمَهما قُلْتُ منْ قَوْلٍ أوْ أَصَّلْتُ منْ أَصْلٍ فيهِ عَنْ رسولِ اللهِ خلافُ مَا قُلْتُ,فالْقَوْلُ ما قال رَسولُ الله (ص) وهُوَ قولي

যদি কোন ব্যক্তি রাসূলের সুন্নাহকে ভুলে যায় অথবা তার হাতে তা না থাকে সে যেন আমি যে বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছি অথবা কোন মৌলিক ভিত্তি স্থাপন করেছি তা রাসূলের বর্ণিত কথার সাথে যাচাই করে দেখে। যদি বিষয়টি তার বিরোধী হয় তবে আমার ফতোয়াকে প্রত্যাখ্যান করে রাসূলের কথাকেই আমার কথা বলে ধরে নেয়। (হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে শাফেয়ী হতে এবং ইবনে আসাকির তাঁর তারিখে দামেসকে তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।{৩/৯/১৫})

খ) إِذا وَجَدْتُمْ فِيْ كتابيْ خلافَ سُنَّةِ رَسولِ اللهِ فقولوا بسُنَّةِ رسولِ الله ودَعوا ما قُلْتُ

যখনই আমার গ্রন্থে রাসূলুল্লাহর সুন্নাহর পরিপন্থী কিছু পাও রাসূলের সুন্নাহকে গ্রহণ কর ও আমি যা বলেছি তা ত্যাগ কর। (যাম্মুল কালাম {১/৪৭/৩}; আল ইহিতজাজ বিশ্ শাফেয়ী {২/৮}, ইমাম আসাকির {১০/৯/১৫}।)

গ). و أَنتُمْ أَعْلَمُ بالْحَديث و الرّجالِ مِنِّي فإِذا كان الحديث الصحيح فاعْلموني بهِ أيّ شيء يكون كوفياً اوبصرياً او شامياً حَتّى أذْهبَ إليه إذا كان صَحيحاً

আহমাদ ইবনে হাম্বলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, “আপনি হাদীস ও রিজালশাস্ত্রে আমার চেয়ে জ্ঞানী। তাই যখনই কোন সহীহ হাদীস পাবেন আমাকে জানাবেন হাদীসটি কিরূপ এবং এর রাবী

কুফী, বসরী না সিরিয়ীয় যাতে করে সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমি ফতোয়া দিতে পারি। (ইবনে আবদুল বার -এর আল ইহিতজাজ বিশ্ শাফেয়ী{১/৮},আল ইনতিকা গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠায়,ইমাম জাওযী প্রণীত মানাকিব -ই ইমাম আহমাদ গ্রন্থের ৪৯৯ পৃষ্ঠা।)

ঘ)

كل مسئلة صحيح فيها الخبرُ عنْ رسولِ اللهِ (ص) عِنْدَ أهْلِ النقل بخلاف ما قُلْتُ فأنا راجعٌ عنها في حياتي و بعد موتي

যে কোন বিষয়েই রাবীগণ নবী (সা.) হতে বিশু   হাদীসে আমার কথার বিপরীতে কিছু বর্ণনা করলে আমি ঐ ফতোয়া হতে আমার জীবিত ও মৃত্যুবস্থায় এ দিকে (রাসূলের হাদীস ও সুন্নাহর দিকে) প্রত্যাবর্তন করেছি। (যামুল কালাম{১/৪৭}, আ'লামুল মূকিয়ীন {২/৩/৬৩}।)

ঙ) إذَا رأَيْتموني أقولُ قولاً و قدْ صحّ عنِ النبيّ (ص) خلافُه فاعْلَموا أنّ عقْلي قدْ ذهب

যখন লক্ষ্য করবে কোন কিছু আমি বলেছি অথচ নবী (সা.) হতে তার বিপরীত বর্ণিত হয়েছে তখন মনে করবে আমার চিন্তাশক্তি ভুল করেছে। (আবু হাফস মুয়াদ্দাব তাঁর মুনতাফী গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় এবং ইবনে আসাকির {১/১০/১৫} তাঁর তারিখে দামেসকে এনেছেন। আবুল কাসেম সামারকান্দীও 'আমালী ' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।)

ইমাম আহমাদ ইবনে হা ল

অধিকাংশ হাদীসই আহমাদ ইবনে হাম্বল সংকলন করেছেন এবং তিনি ব্যক্তিমত ও ইজতিহাদ সম্বলিত গ্রন্থসমূহকে অপছন্দ করতেন। এজন্য আলোচ্য বিষয়ে তাঁর মত নিম্নরূপ :

ক) لا تقلّدْني و لا تقلّد مالكاً و لا الشافعي و لا الأوزاعي و لا الثوري و خُذْ مِنْ حيثُ أخذوا

আমার অনুসরণ কর না, মালিক, শাফেয়ী, আওজায়ী এবং সাওরীরও অনুসরণ কর না, বরং তাঁরা যেখান হতে ফতোয়া গ্রহণ করেছেন সেখান হতে ফতোয়া গ্রহণ কর। (ইবনে কাইয়েমের 'আল আলাম ' { ২/৩০২}।)

খ) رأْيُ الأوزاعي و رأْي مالك و رأْي أبي حنيفة كُلّهُ رأْيٌ و هو عنْدي سواء و إنّما الحجّة في الأثار

আওজায়ী, মালিক, আবু হানিফাসহ সকল মতই আমার নিকট সমান। তাই আমার নিকট দলিল হলো কেবল রাসূলের হাদীস। (ইবনে আবদুল বারের ‘জামেয় ’ { ২/১৪৯}।)

এখানে যা বর্ণিত হলো তা “সিফাতু সালাতিন্নাবী’ গ্রন্থের ২৩-৩৪ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে উক্ত গ্রন্থের মূল অংশ ও পাদটীকাগুলো অধ্যয়ন করুন। বইটির লেখক মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী। তিনি সিরিয়ার দামেস্কের অধিবাসী এবং মদীনার আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া হতে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়।

*৭। ইমামের এ কথার অর্থ যদিও তাঁরা মারা যান অথবা শহীদ হন তদুপরি বারযাখেও এ পৃথিবীর সাথে সম্পর্কিত এবং এ সম্পর্ক এতটা গভীর যেন আমাদের মাঝেই জীবন-যাপন করছেন। ইমাম তাঁর বক্তব্যের শেষে বলেছেন ‘অনেক সত্য রয়েছে ঐ সকল বস্তুর মধ্যে যা তোমরা অস্বীকার কর’, সম্ভবত তা এজন্য যে, উক্ত বক্তব্য অনেকের নিকটই অতিরি ত মনে হতে পারে ও তারা তা অস্বীকার করতে পারে।

*৮। আপনি আহলে বাইতের ইমামদের বাণী হতেই তাঁদের অনুসরণ অপরিহার্য প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যা চক্রের সৃষ্টি করছে এজন্য যে, তাঁদের অনুসরণের অপরিহার্যতা অন্যদের বাণী হতে প্রমাণিত হতে হবে যাতে তা গ্রহণযোগ্য হয়, তাঁদের নিজেদের কথা হতে নয়। তাঁদের বাণী হতেই তাঁদের অনুসরণের সপক্ষে দলিল উপস্থাপন করলে তা যুক্তিবিদ্যার ভাষায় চক্রের সৃষ্টি করে যা অগ্রহণযোগ্য।

লেখক এ পত্রে তার জবাবে বলেছেন এটি চক্রের সৃষ্টি করে না। কারণ তাঁদের নেতা মহানবী (সা.) তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্যে তাঁদের বাণীকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছেন। সুতরাং অন্যান্য দলিলের ন্যায় তাঁদের বাণীও দলিল বলে পরিগণিত এবং একে চক্র বলা যায় না।

*৯। সাকালাইন বা সিকলাইন (ثقلين) শব্দটি অত্যন্ত অর্থবহ কারণ এ শব্দটি অভিধানে মুসাফিরের সম্বল অর্থে যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু ও সম্পদের ক্ষেত্রেও। হাদীসটিতে এ শব্দ ব্যবহারের কারণ হয়তো এটিই যে, রাসূল (সা.) মৃত্যুর সময় সম্বল হিসেবে এ দু’বস্তুই উম্মতের জন্য রেখে গিয়েছেন যার সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমেই সর্বাঙ্গীন সাফল্য লাভ সম্ভব।

হাদীসে সাকালাইন সম্পর্কে আরো অবহিত হবার জন্য 'ইহকাকুল হাক্ক' গ্রন্থের ৯ম খণ্ডের ৩০৯ পৃষ্ঠায় আহলে সুন্নাহর সনদসমূহ অধ্যয়ন করুন।

* ১০।হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে শাইখানের শর্ত :

শাইখাইন বলতে মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ কুশাইরী নিশাবুরী যিনি 'সহীহ মুসলিম'- এর প্রণেতা ও মুসলিম নামে প্রসি এবং মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী যিনি বুখারী নামে প্রসি ও 'সহীহ বুখারী'- এর সংকলক এ দু'ব্যক্তিকে বোঝানো হয়।

আহলে সুন্নাহর ভাইদের নিকট তাঁদের হাদীস গ্রন্থ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে পরিগণিত। তাঁরা তাঁদের হাদীস গ্রন্থে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশেষ শর্ত অনুসরণ করতেন। এ গ্রন্থ (আল মুরাজিয়াত) হাদীস সহীহ হবার ক্ষেত্রে ঐ শর্তকেই 'শাইখাইনের শর্ত' বলে উল্লেখ করেছে।

মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২য় পৃষ্ঠার ভূমিকায় শর্তসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, "নবী (সা.) হতে বর্ণিত হাদীসসমূহকে আমি তিন ভাগে ভাগ করেছি। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যে সকল হাদীস অপেক্ষাকৃত ত্রুটিহীন ও এর বর্ণনাকারীরা সঠিক আকীদা- বিশ্বাসের অধিকারী ও বর্ণিত হাদীসের প্রতি অধিকতর আস্থাবান সেই সাথে যদি ঐ সকল হাদীসে কোন বৈপরীত্য ও লক্ষণীয় দোষ না থাকে তবে সেগুলো প্রথমে। অতঃপর ঐ সকল বর্ণনাকারীর হাদীস এনেছি যাঁদের নির্ভরযোগ্যতা ও হিফয করার ক্ষমতা তাঁদের হতে নিম্ন পর্যায়ে ছিল; তাঁরা উত্তম বলে পরিগণিত হলেও পূর্ববর্তী দলের ন্যায় নন। এদের কয়েকজন হলেন আতা ইবনে সায়েব, ইয়াযীদ ইবনে আবি যিয়াদ ও লাইম ইবনে আবি সালিম। প্রথম পর্যায়ের রাবীদের মধ্যে রয়েছেন মানসুর ইবনে মু'তামার, সুলাইমান আ'মাশ ও ইসমাঈল ইবনে আবি খালিদ প্রমুখ। তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছেন সেই সকল রাবী যাঁরা হাদীসবিদদের নিকট বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত এবং এ পর্যায়ের রাবীদের হতে আমি বর্ণনা করি নি।"

'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ভূমিকায় বুখারীর হাদীস গ্রহণের শর্ত আলোচনা করে উ ৃত হয়েছে : যে সকল হাদীসের সকল বর্ণনাকারীই বিশ্বস্ত বলে ঐকমত্য রয়েছে এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের কারো হতে বর্ণনা করেছেন, রাবীদের মধ্যে বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে তাঁর বিষয়ে মতদ্বৈততা না

থাকে, হাদীসটিও সনদের ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন হয় তবে সে হাদীসসমূহ বুখারীর নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। যদি ঐ সাহাবী হতে দু'জন রাবী বর্ণনা করেন তা উত্তম, যদি না হয় তাহলে একজনও যথেষ্ট। হাফিয আবু ফযল ইবনে তাহির এ শর্ত বর্ণনা করেছেন।

হাফিয আবু বকর জাযমী বলেছেন, "বুখারীর হাদীস গ্রহণের শর্ত ছিল হাদীসের সনদ অবিচ্ছিন্ন, বর্ণনাকারী মুসলমান ও সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, হাফিয, উত্তম স্মরণ শক্তির অধিকারী, সুস্থ মতে বিশ্বাসী, ত্রুটি অপেক্ষাকৃত কম ও খিয়ানতকারী না হয়।" (ফাতহুল বারী, পৃষ্ঠা ৭)

*১১। এই হাদীসটি আহলে সুন্নাহর অনেক আলেমই নয়জন সাহাবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 'ইহকাকুল হাক্ক' গ্রন্থের ২৯৪-৩০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

*১২। এ হাদীসটিতে আল্লাহ্ মানুষকে প্রদত্ত চারটি বড় নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম : সুস্থতা; দ্বিতীয় : জীবনকাল; তৃতীয় : অর্থ-সম্পদ; চতুর্থ : পথপ্রদর্শক ইমাম। এই চারটি নিয়ামত তাকে তিনি দিয়েছেন যাতে করে সে পূর্ণতা ও সাফল্যের পথ অতিক্রম করতে পারে। যদি মানুষকে দেহ দেয়া হয় কিন্তু দেহ সুস্থ না থাকে তবে তা হতে লাভবান হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি সুস্থতা ও দীর্ঘ জীবন হলেও অর্থ-সম্পদ না থাকলে সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব নয়। আবার সুস্থতা, সম্পদ ও দীর্ঘ জীবন থাকলেও যদি সঠিক পথপ্রদর্শক না থাকে তবে এ সব কিছুই পথভ্রষ্টতার পথে ব্যয়িত হবে। তখন এই তিন বস্তুই তাকে দুর্ভাগ্য ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। এজন্যই এ নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে যে, তা সঠিক পথে ব্যয়িত হয়েছে, নাকি কুফরি ও অকৃতজ্ঞতার পথে ব্যয়িত হয়েছে।

*১৩। 'যুননুরাইন' উসমানের উপাধি যার অর্থ 'দুই জ্যোতির অধিকারী'। তাঁকে এ নামে ডাকা হত এ কারণে যে, তিনি নবীর দুই কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

*১৪। কেউ কেউ প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন সূরা মাআরিজ মক্কায় অবতীর্ণ অর্থাৎ গাদীরের ঘটনার প্রায় দশ বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে তাই কিরূপে এর প্রথম আয়াত গাদীরে খুমে অবতীর্ণ হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে?

মরহুম আল্লামাহ্ আমিনী তাঁর ‘আল গাদীর’ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৩৯-২৬৩ পৃষ্ঠায় এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, কোন সূরা মক্কায় অবর্তীণ হবার অর্থ এটি নয় যে, এর সবগুলো আয়াত মক্কায় অবর্তীণ হয়েছে। এ কারণে অনেক মাক্কী সূরাই রয়েছে যার কিছু আয়াত মদীনায় অবর্তীণ হয়েছে, এমন কি এ দাবীও করা যায় না যে, মাক্কী সূরার প্রথম আয়াতগুলো মক্কায় অবর্তীণ হয়েছে। কারণ অনেক মাক্কী সূরারই প্রথম আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে আবার এর বিপরীতে অনেক মাদানী সূরার আয়াতসমূহও মক্কায় অবর্তীণ হয়েছে।

‘আল গাদীর’ গ্রন্থের লেখক অতঃপর যে সকল মাক্কী সূরার আয়াতসমূহ মদীনায় অবর্তীণ হয়েছে সেগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কেন এরূপ করা হয়েছে সে বিষয়ে আমরা অবগত নই। যেমনভাবে আমরা কোরআন অবতীর্ণ হবার ধারার গুঢ় ও পূর্ণ রহস্য সম্পর্কে অবগত নই।

*১৫। সূরা আরাফের ১৭২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ ফিতরাতের ওপর ভিত্তি করে তাওহীদের যে প্রতিশ্রুতি বান্দাদের হতে গ্রহণ করেছেন। এ প্রতিশ্রুতি ‘আমি কি তোমাদের প্রভু নই’ এই বাক্যের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছিল যা ‘আহেদ আলাসতু’ (আলাসতুর প্রতিজ্ঞা) নামে প্রসি ।

*১৬। আহলে সুন্নাহর হাদীসগ্রন্থগুলোর মধ্যে ছয়টি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে প্রসি এবং এ গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হাদীসসমূহ সহীহ বলে পরিগণিত। তাই এ ছয় গ্রন্থকে ‘সিহাহ সিত্তাহ্’ বলা হয়। এগুলো হলো সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সহীহ তিরমিযী, সহীহ আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ্ ও সুনানে নাসায়ী।

শিয়াদের প্রসি চারটি গ্রন্থ যা ‘কুতুবে আরবাআহ্’ নামে পরিচিত তা হলো : কাফী- সংকলক সিকাতুল ইসলাম কুলাইনী, মান লা ইয়াহদ্বারুহুল ফাকীহ্- সংকলক শেখ সাদুক, তাহ্যীব ও ইস্তিবসার- সংকলক শেখ তুসী।

*১৭। যাহাবী- মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে উসমান ইবনে কিসাম দামেস্কী শাফেয়ী যাহাবী নামে প্রসি । তিনি ৬৭৩ হিজরীতে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দামেস্ক ও মিশরে তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন। হাদীস ও রিজালশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ

রচনা করেছেন তন্মধ্যে তাযকিরাতুল হুফফায, সাইরুন্নুবলা, মিযানুল ই'তিদাল এবং তাজরিদু আসামায়িস্ সাহাবা ব্যাপকভাবে পরিচিত। তিনি ৭৪৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। (আনকুনা ওয়াল আলকাব, ২য় খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

* ১৮। আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস হানযালী (আবু হাতেম নামে প্রসি) আহলে সুন্নাহর আলেমদের মতে বিশিষ্ট আলেম ও হাফিয। তাঁকে 'হাফিযুল মাশরেক' বলা হয়ে থাকে। তিনি তীক্ষ্ণ ধী শক্তির অধিকারী ও জ্ঞানের ধারক বলে প্রসি ছিলেন। তিনি ২৭৭ হিজরীর শাবান মাসে ইন্তেকাল করেন। (আলকুনা ওয়াল আলকাব, ২য় খণ্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা)

* ১৯। সম্ভবত আবু হানিফা 'ফাজরে কাযিব' হতে রোযা শুরু হয় মনে করতেন; কিন্তু শিয়া মতে 'সুবহে সাদিক' হতে রোযা শুরু হয়। যেহেতু আ'মাশ সুবহে সাদিক পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করতেন, তাই আবু হানিফা তাঁর রোযাকে বাতিল মনে করতেন। হুজাইফার হাদীস মতে 'সুবহে সাদিক' পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করা যায় যা আবু হানিফার দৃষ্টিতে বাতিল ছিল তাই তিনি আ'মাশ সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছেন। গ্রন্থ প্রণেতার মতে আ'মাশের এ কর্ম কোরআন অনুসারেই সঠিক।

* ২০। আহলে সুন্নাহর 'জারহ্' ও 'তা'দিল' গ্রন্থগুলোর মধ্যে ইবনে আবি হাতেম এবং ইবনুল ওয়াবাদের গ্রন্থ দু'টি প্রসি ।

* ২১। 'নাকিসীন' অর্থাৎ বাইয়াত ভঙ্গকারীরা হলো ঐ সকল ব্যক্তি যারা হযরত আলী (আ.)-এর সাথে কৃত বাইয়াত ভঙ্গ করে বসরায় উষ্ট্রের যু অংশ গ্রহণ করেছিল। তাদের প্রধান হলেন যুবায়ের ও উম্মুল মুমিনীন আয়েশা।

'কাসেতীন' বা অত্যাচারীরা হলো মুয়াবিয়া ও তার অনুসারী সেই সব ব্যক্তি যারা সত্যপন্থী ইমামের বিরোধিতা করে সিফফিন যু র সৃষ্টি করে।

'মারেকীন' বা দীনত্যাগীরা হলো খাওয়ারেজ (খারেজীরা) যারা হযরত আলীকে ত্যাগ করে তাঁর সাথে যু লিপ্ত হয়েছিল।

* ২২। اَبوا শব্দটি ابو হতে এসেছে যার মূল অর্থ প্রশিক্ষণ ও খাদ্য দান। এজন্য বলা হয়

أبوت الشيء أبوه أبوا إذا غذوته و بذلك سمى الأب ابا তখনই أبَوتُ الشيء বলা হয় যখন কাউকে আমরা

খাদ্য দেব। পিতাকে أَب বলা হয় এজন্য যে, তিনি খাদ্য ও প্রশিক্ষণ দান করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও হযরত আলী (আ.) উম্মতের সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষক হিসেবে তাদের আত্মা ও চিন্তার খোরাক দানকারী ছিলেন বলেই এ উম্মতের পিতা বলে ঘোষিত।

* ২৩।'মুহাজ্জালিন' শব্দটি 'মুহাজ্জাল' শব্দের বহুবচন। যে অশ্বের কপাল, হাত ও পা সাদা বর্ণের তাকে 'মুহাজ্জাল' বলে। অশ্বদলে এরূপ অশ্ব বিশেষত্বের অধিকারী। মুমিনগণও কিয়ামতে পুনরুত্থিত মানব মণ্ডলীর মধ্যে তাঁদের চেহারার ঔ   লের কারণে বিশেষত্বের অধিকারী হবেন এবং তাঁদের নেতা হবেন আলী (আ.)।

* ২৪। আহলে সুন্নাহর ভাইদের নিকট যে সকল ব্যক্তি এক লক্ষ হাদীস ও বাণী সনদসহ মুখস্থ করেছেন তাঁরা হাফিয বলে পরিগণিত। তিন লক্ষ হাদীস ও বাণী সনদসহ মুখস্থকারীদের হুজ্জাত (নিদর্শন) বলা হয়। কারণ তাঁরা এর সাথে হাদীস বর্ণনাকারীদের বিশ্লেষণগত অবস্থান সম্পর্কেও অবহিত।

হাকিম তাঁকে বলা হয় যিনি সকল হাদীস, এর রাবীদের জীবনরীতি ও চারিত্রিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে জ্ঞাত।

হাদীসের প্রথম সারির শিক্ষকদের ইমাম, শাইখ ও মুহাদ্দিস বলা হয়। (সাফিনাতুল বিহার, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ২৮৭)

* ২৫। আকাবার বাইয়াত : আকাবার শপথ (বাইয়াতে আকাবা) ইসলামের ভবি   ৎ নির্ধারক হিসেবে ইতিহাসে প্রসি । মিনায় 'জামারায়ে আকাবা'র নিকটবর্তী স্থানটিকেই আকাবা বলা হয় যেখানে হাজীরা পাথর নিক্ষেপ করেন। আকাবায় দু'বার বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এজন্য এ দুই বাইয়াতকে যথাক্রমে 'আকাবায়ে উলা' ও 'আকাবায়ে সানীয়াহ্' বলা হয়। নিম্নে এ দুই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো :

রাসূল (সা.) হজ্বের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের ব্যক্তিদের সাথে বসতেন ও তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এমন একটি বৈঠকে তিনি মদীনা থেকে আগত খাযরাজ গোত্রের নিকট ইসলামের আহবান পেশ করেন। খাযরাজ গোত্রের লোকেরা মদীনার ইহুদীদের নিকট প্রায়ই শুনত এ সময় একজন নবীর আর্বিভাব ঘটবে। তারা (ইহুদীরা) বলতো নবীর আগমন ঘটলে আমরা তাঁর অনুসরণ করবো এবং তোমরা আদ ও সামুদ জাতির ন্যায় ধ্বংস হবে।

এ কারণেই খাযরাজ গোত্রের অনেকেই ধারণা করে যে, ইনিই সেই নবী। যখন তাদের নিকট প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদ (সা.)- ই সেই প্রত্যাশিত নবী তখন তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁকে সত্যায়ন করে। খাযরাজ গোত্রের সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন আসআদ ইবনে যুরারাহ্, আবু আমামা, আওফ ইবনে হারেস, রাফে' ইবনে মালিক, আমের ইবনে আবদে হারেস, কাতাবা ইবনে আমের ইবনে জাদীদা এবং আকাবা ইবনে আমের ইবনে নাবী।

তাঁরা মদীনায় ফিরে গিয়ে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। পরবর্তী বছর তাঁদের বারজন ব্যক্তি হজ্বের সময় রাসূল (সা.)- এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাইয়াত করেন। তাঁরা হলেন আসআদ ইবনে যুরারাহ্, হারেসের দুই পুত্র আওফ ও মায়ায, রাফে' ইবনে মালিক, যাকওয়ান ইবনে আবদে কাইস, উবাদা ইবনে সামেত, ইয়াযীদ ইবনে সা'লাবা, আব্বাস ইবনে উবাদা ইবনে নাদলা, কাতাবা ইবনে আমের, আকাবা ইবনে আম্বার, আবু হাইসাম ইবনে তাইহান ও উওইয়াম ইবনে সায়েদা।

এই বাইয়াত বা শপথ অনুষ্ঠানের পর রাসূল (সা.) মুসআব ইবনে উমাইরকে কোরআন ও ইসলামের বিধান শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে তাঁদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। আকাবায় অনুষ্ঠিত এ প্রথম শপথ অনুষ্ঠানকে 'আকাবায়ে উলা' বলা হয় যদিও তা 'বাইয়াতুন্নিসা' নামেও পরিচিত। এই বাইয়াতে তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে, শিরক, চুরি, যিনা (ব্যভিচার) করবেন না, কারো প্রতি অপবাদ আরোপ হতে বিরত থাকবেন, সন্তানদের হত্যা করবেন না, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করবেন না। মহানবী (সা.) তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁরা এই শপথ ভঙ্গ না করলে বেহেশতের অধিকারী হবেন এবং প্রতিশ্রুতি পালন না করলে তাঁরা আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হবেন।

মুসআব ইবনে উমাইরের ইসলাম প্রচারে দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সা'দ ইবনে মায়ায ও উসাইদ ইবনে খুজাইর ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের সহযোগিতায় মুসআব অনেককেই প্রভাবিত করতে সক্ষম হন এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের তৎপরতা বৃ পায়। তাঁরা নবী (সা.)- এর সাথে সাক্ষাতের সি ান্ত গ্রহণ করেন এবং তাঁদের গোত্রের অমুসলমানদের সাথে হ   পালনের নিমিত্তে মক্কায় আগমন করেন। তাঁরা গোপনে নবীর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে মিনায় অপেক্ষা করতে থাকেন।

১১- ১৩ জিলহ র এক মধ্য রাতে তাঁরা সত্তরজন সঙ্গোপনে আকাবায় নবীর সাথে মিলিত হন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন, যেমন কাবের কন্যা ও আসমা ইবনে উমর।

রাসূলের চাচা আব্বাসও তাঁর সাথে ছিলেন যদিও তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তিনি সর্বপ্রথম মদীনাবাসীদের (পরবর্তীতে আনসার বলে পরিচিত) উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "মুহাম্মদ আমাদের মাঝে প্রিয় ও সম্মানিত। কিন্তু সে চায় তোমাদের সঙ্গে তার বন্ধনকে মজবুত করতে। তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করলে উত্তম নতুবা সে আমাদের মধ্যেই সম্মানের সঙ্গে থাকবে।" আনসাররা জবাবে বললেন, "আমরা আপনার কথা শুনলাম।" তাঁরা রাসূল (সা.)- কে প্রশ্ন করলেন, "হে নবী! আপনি আপনার ও আপনার প্রভুর জন্য আমাদের নিকট যা চান বলুন?" নবী (সা.) তাঁদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন। তিনি কোরআন হতে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে তাঁদেরকে ইসলামের বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁকে নিজ স্ত্রী- পুত্রের ন্যায় রক্ষার আহবান জানালেন।

তাঁরা ইতিবাচক জবাব দিয়ে বাইয়াতের প্রস্তুতি নিলে আবু হাইসাম বললেন, "হে নবী! আমাদের সাথে ইহুদীদের চুক্তি রয়েছে, আপনার জন্য আমরা তা রহিত করছি। কিন্তু পরিশেষে এমন তো হবে না যে, আপনি জয়ী হয়ে আমাদের ছেড়ে নিজ জাতি ও গোত্রের নিকট ফিরে যাবেন?" নবী (সা.) মৃদু হেসে বললেন,

بَلْ الدّم الدّم و الهدْم الهدم انتم مني و انا منكم اسالِم من سالمتم و أُحاربُ مَنْ حاربتم

"রক্তের বিনিময়ে রক্ত, ধ্বংসের বিনিময়ে ধ্বংস, তোমরা আমা হতে ও আমি তোমাদের হতে, তোমরা যার সাথে সন্ধি কর আমিও তাদের সাথে সন্ধি ও শান্তি স্থাপন করি এবং তোমরা যার সাথে যু কর আমিও তার সাথে যু করি।"

অতঃপর বললেন, "তোমাদের মধ্য হতে বার ব্যক্তিকে তাদের নিজ গোত্রের দায়িত্বের জন্য মনোনীত কর।"

তাঁরা খাযরাজ গোত্র হতে নয়জন ও আওস গোত্র হতে তিনজনকে মনোনীত করলেন। অতঃপর আব্বাস ইবনে উবাদা তাঁদের দৃঢ়তা দানের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! মনে রেখ এই ব্যক্তির সঙ্গে তোমরা রঙ্গিন ও কালো যু ে র (তরবারী, ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও বিপদাপদের) সহযোগী হবার অঙ্গীকার করেছ। তাই যদি এমন হয় যে, এতে তোমাদের সম্পদ লু ি ত ও বিশিষ্টরা নিহত হন তবে পেছনে ফিরে যেও না। কারণ এতে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের অমঙ্গল। আর যদি এ অঙ্গীকার রক্ষা কর তাতেই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত।"

সকলেই বললেন, "আমরা আমাদের সম্পদ ও ব্যক্তিত্বদের হারানোর কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত।" অতঃপর নবীকে লক্ষ্য করে বললেন, "এর বিনিময়ে আমরা কি পাব?" নবী (সা.) বললেন, "জান্নাত।" তাঁরা বললেন, "আপনার হাত উন্মুক্ত করুন, আমরা বাইয়াত করবো।"

এভাবেই বাইয়াতে আকাবাহ্ গৃহীত হলো। সা'দ ইবনে উবাদাও এ বাইয়াতে উপস্থিত ছিলেন। এ বাইয়াত বা শপথ অনুষ্ঠান ইসলাম প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

ইবনে কাসির প্রণীত 'তারিখে কামিল', ২য় খণ্ড, ৯৫-১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

*২৬। খলীফা আবু বকরের হাতে বাইয়াত সম্পর্কে তাঁর (সা'দ ইবনে উবাদা) অন্যতম বক্তব্য ছিল :

لا و اللهِ حتّى أرْميكُم بما في كنانتي و اَخْضبَ سنانَ رُمْحي و اضرب بِسيفي و اُقاتِلكُم بأهْلِ بيتي و مَنْ أطاعني و لو إجتَمعَ معكُم الجنّ و الإنس ما بايعتكم حتّى أعرض على رَبّي

কখনোই না, আল্লাহর শপথ, তোমাদের বাইয়াত করবো না যতক্ষণ না আমার ধনুকের তীর শেষ, আমার বর্শা রক্তিম এবং তরবারী চালনা সমাপ্ত হবে। আমি আমার পরিবার ও অনুগতদের নিয়ে তোমাদের বিরু যু করবো। যদি সকল মানুষ ও ীন তোমাদের বাইয়াত করে আমি তা করবো না এবং আমার প্রভুর নিকট উপস্থাপন পর্যন্ত আমি এ অবস্থায়ই থাকবো।" (কামিল- ইবনে আসির, ২য় খণ্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)

* ২৭। লেখক যে সকল বিষয়ের ইশারা করেছেন তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি :

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় হযরত উমর নবী (সা.)- এর সি ান্তের প্রতিবাদ করে বলেন, "তবে কি আমরা সত্যপন্থী ও তারা বাতিলের অনুসারী নয়?" নবী (সা.) বললেন, "হ্যাঁ।" উমর বললেন, "আমাদের নিহতরা বেহেশতে ও তাদের নিহতরা কি জাহান্নামে নয়?" নবী বললেন, "হ্যাঁ।" উমর বললেন, "তবে কেন আমরা দীনের বিষয়ে অপমান মাথায় নিয়ে মদীনায় ফিরে যাব?" নবী বললেন, "হে খাত্তাবের পুত্র! আমি আল্লাহর রাসূল, তিনি আমাকে ত্যাগ করতে পারেন না (অপমানিত হতে দিতে পারেন না)।" উমর বললেন, "তবে কি আপনি বলেন নি আমরা মক্কায় প্রবেশ করবো ও কাবা ঘর তাওয়াফ করবো?" নবী বললেন, "আমি কি বলেছি এ বছর?" তিনি বললেন, "না।" অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, "অবশ্যই তোমরা মক্কায় প্রবেশ করবে ও কাবা তাওয়াফ করবে।" (এ ঘটনাটি 'সহীহ্ বুখারী'র 'কিতাবুশ শুরুত' অধ্যায়ে ও মুসলিমের 'হুদায়বিয়ার সন্ধি'র আলোচনায় উ ৃত হয়েছে)

হালাবী তাঁর সীরাত গ্রন্থে এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণে উমরের সাথে রাসূলের বাক্য বিনিময়ের শেষে রাসূলের এ উ ৃতিটি এনেছেন যে, তিনি (সা.) বলেন, "হে উমর! আমি এতে সন্তুষ্ট হলেও তুমি তাতে হও নি (গ্রহণ কর নি)।"

হুনায়নের যুে নবী (সা.) যখন কাউকে কাউকে অধিক দান করেন তখন এক ব্যক্তি আল্লাহর শপথ করে বলে এ বণ্টন ন্যায়ের সাথে হয় নি। রাবী বলেন নবী (সা.)- কে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বলেন, "যদি আল্লাহ্ ও তাঁর নবী ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা না করেন তবে কে তা করবে?" অতঃপর বলেন, "আল্লাহ্ হযরত মূসাকে রহম করুন, তিনি এ থেকে অধিক

তিরস্কার সহ্য করেছেন ও এ বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করেছেন।" ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠায় সুলাইমান ইবনে রাবীয়া হতে বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত উমরকে বলতে শুনেছি : নবী (সা.) গণীমত বণ্টন করছিলেন, আমি তাঁকে বললাম অন্যরা এ গণীমত হতে অধিক পাওয়ার যোগ্য। নবী বললেন : তুমি আমাকে রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করছ।"

বদরের যু র বন্দীদের ব্যাপারে নবীর সি ান্ত ছিল বন্দীদের হতে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেবার। কিন্তু উমর এ সি ান্তকে গ্রহণ না করে বলেন, "হযরত হামযাহর উচিত তাঁর ভ্রাতা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে ও আলীর উচিত তাঁর ভ্রাতা আকীলকে হত্যা করা এবং এভাবে সকল মুসলমানই তার নিকটাত্মীয়কে হত্যা করবে।" নবী (সা.) তাঁর এ কথায় মনে প্রচণ্ড কষ্ট পান। তাবুকের যু মুসলমানরা ক্ষুধার্ত হলে নবী উট কুরবানী করতে বললে উমর বলেন, "উটগুলো নিশ্চিহ্ন হলে আমরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।"

রাসূল (সা.) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের জানাযার নামায পড়াতে গেলে (ইবনে উবাইয়ের সন্তানদের অনুরোধে) উমর রাসূল (সা.)- এর চাদর টেনে ধরে এতে বাধা দেন। উহুদে ইবনে উবাই নিজ চাদর হযরত হামযাহর কাফনের জন্য খুলে দিয়েছিল সেজন্য নবীও তাঁর চাদর ইবনে উবাইয়ের কাফনের জন্য দিয়ে দেন। যেহেতু তখনও মুনাফিকের জানাযা পড়া নিষি করে ওহী অবর্তীণ হয় নি তাই নবী (সা.) তার জানাযা পড়ান ও বলেন, "আমার এ বস্ত্র তার কোন কল্যাণই করবে না। কিন্তু আমার এ কর্মের মাধ্যমে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করবে।"

খুমসের বিষয়ে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত হলো :

(و اعلَموا أنّما غَنمتم مِنْ شيءٍ فإنَّ لله خُمسه و للرَّسول و لذِى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل)

জেনে রাখ খুমস (যা কিছুই তোমরা অর্জন কর, গণীমত হিসেবে পাও তার এক পঞ্চমাংশ) আল্লাহ্, তাঁর রাসূল, নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকিন ও মুসাফিরের জন্য।

মালিক ইবনে আনাস খুমসের বিষয়ে ফতোয়া দেন যে, এটি শাসক বা সুলতানের হাতে অর্পণ করতে হবে ও তিনি যেমনভাবে চান তা ব্যয় করবেন।

আবু হানিফা ফতোয়া দেন যে, খুমসকে তিন ভাগে ভাগ করে মুসলমানদের ইয়াতিম, মিসকিন ও সম্বলহীন মুসাফিরের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। তিনি নিকটাত্মীয়দের সাথে অন্যদের পার্থক্য করেন নি। অথচ সকল মুসলমানই অবগত যে, খুমসেরর একাংশ নবী (সা.)- এর, একাংশ তাঁর নিকটাত্মীয়দের ও একাংশ তাঁর বংশের ইয়াতিম ও মিসকিনদের। কিন্তু খলীফা আবু বকর রাসূল (সা.) ও তাঁর নিকটাত্মীয়দের এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন।

উমরের পরামর্শক্রমে আবু বকর কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত ও রাসূলের সুন্নাহর বিপরীতে যাকাতের অন্যতম খাত 'আল মুয়াল্লাফাতু কুলূবুহুম'- কে রহিত করেন। 'আল জাওহারাতুন্ নাইয়েরা' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে- চুক্তিব অমুসলমান, নতুন ঈমান আনয়নকারীরা মদীনায় খলীফার নিকট তাদের অংশ নিতে এলে খলীফা আবু বকর তা লিখে দেন। কিন্তু উমর তাদের থেকে কাগজটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন ও বলেন, "ইসলামের তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই।"

আর হে তামাত্তু ও মুতা (অস্থায়ী) বিবাহ যা প্রসি এবং আহলে সুন্নাহর সকল নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এতদসংক্রান্ত পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ সম্পর্কে উমর তাঁর খেলাফতকালে মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণে বলেছিলেন, "রাসূলুল্লাহর যুগে দু'টি মুতা প্রচলিত ছিল; আর আমি এ দু'টি নিষি করছি এবং এ দু'টির জন্য (অর্থাৎ কোন ব্যক্তি এ দু'টি মুতা করলে) আমি শাস্তি দিব। মুতাদ্বয়ের একটি মুতআতুল হ (হে তামাত্তু) ও অন্যটি মুতআতুন্ নিসা (মুতা বিবাহ)।" অথচ পবিত্র কোরআনে এ দু'টি মুতা জায়েয হবার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হে তামাত্তু সংক্রান্ত আয়াত : আর তোমাদের মধ্যে যারা হ ও ওমরা একত্রে একই সাথে (হে তামাত্তু) পালন করতে চায় তবে যা কিছু সহজলভ্য তা দিয়ে কোরবানী করাই তার ওপর কর্তব্য।- (সূরা বাকারা : ১৯৬)

অস্থায়ী বিবাহ সংক্রান্ত আয়াত : অনন্তর তাদের (মহিলাদের) মধ্যে যাকে ভোগ (ইস্তিমতা' বা মুতা) করবে তোমরা তাকে তার নির্ধারিত পারি মিক (মোহরানা) দান কর।- (সূরা নিসা : ২৪)

অধিকতর অবগতির জন্য ‘তাফসীরে নমুনা’ ও ‘আমাদের ধর্মের গ্রন্থ’ নামক দু’টি গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতসমূহের আওতায় যে ব্যাপক ব্যাখ্যা ও আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে তা দ্রষ্টব্য।

তালাকের বিষয়ে কোরআনের আয়াত হলো :

(الطّلاقُ مرّتانِ فإمساك بمعْروفٍ أو تسريح بإحسانٍ فإن طلّقها فَلا تحلّ لهُ من بَعْد حتّى تَنْكِحَ زوجاً غيره)

তালাক দু’বার, এরপর হয় সৎভাবে জীবন যাপন কর নতুবা সদাচারণের সাথে বিদায় দাও। যদি তৃতীয়বার তালাক দাও তবে ঐ স্ত্রী ততক্ষণ তোমার জন্য বৈধ হবে না যতক্ষণ না সে অন্য ব্যক্তির দ্বারস্থ হয় (অর্থাৎ অন্য ব্যক্তি তাকে বিবাহের পর তালাক দেয়)।

এ আয়াত অনুযায়ী তালাক ভিন্নভাবে তিন বার হতে হবে এবং এরপর রাজঈ বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু তাঁরা এক বৈঠকে তিন তালাক বৈধ মনে করেন যা কোরআনের আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থী। সহীহ মুসলিমের ১ম খণ্ডের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে- খলীফা উমরের শাসনকালের দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত বিধান হিসেবে এটিই প্রচলিত ছিল। অতঃপর খলীফা তা পরিবর্তন করেন।

হাতেব ইবনে বালতায়ার ঘটনা : হাতেব মক্কার মুশরিকদের নিকট মুসলমানদের আক্রমণের খবর জানিয়ে পত্র পাঠিয়েছিলেন। ঘটনাটি প্রকাশিত হবার পর নবী (সা.) তাঁকে এ কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, “আমি এ কাজের মাধ্যমে চেয়েছিলাম মুশরিকদের নিকট আমার অবস্থান দৃঢ় করে আমার পরিবার ও সম্পদকে তাদের হাত থেকে নিরাপদে রাখতে। কারণ আমি ব্যতীত আপনার সাহাবীদের সকলেরই কেউ না কেউ মক্কায় রয়েছে যারা তাঁদের পরিবার ও সম্পদ রক্ষা করবে।”

নবী (সা.) বললেন, “সে সত্য বলেছে, তোমরা তার সম্পর্কে ভাল বৈ মন্দ বল না।” উমর এর প্রতিবাদ করে বলেন, “এই ব্যক্তি রাসূল ও মুসলমানদের প্রতি খিয়ানত করেছে, একে হত্যা করা হোক।”

আটানব্বই নম্বর পত্রে যে সমস্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা 'ফুসূলুল মুহিম্মা' গ্রন্থে ব্যাখ্যাসহ এসেছে। আমরা এ সম্পর্কে ওপরে যা বর্ণনা করেছি তা উক্ত গ্রন্থ্ হতে নিয়েছি।

*২৮। লেখক ইতিহাসের বিভিন্ন পটে মুসলমানদের মধ্যে অসচেতনতা, নির্লিপ্ততা, শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের যে অভাব লক্ষ্য করেছেন তা হতেই এরূপ মন্তব্য করেছেন। আফসোস! তিনি যদি বেঁচে থাকতেন ও ইমাম মাহদী (আ.)- এর প্রতিনিধি ইমাম খোমেইনী (রহঃ)- এর নেতৃত্বে সংঘটিত ইরানের ইসলামী বি বকে দেখে যেতে পারতেন তাহলে একটি মুসলিম জাতি কিরূপে অধিকার অর্জনে আত্মবিসর্জন, সমন্বয়, সাহসিকতা ও শৃঙ্খলার নমুনা উপস্থাপনে সক্ষম তা দেখে গর্বিত হতেন ও ভিন্নরূপ মন্তব্য করতেন।

তথ্যসূত্র

১। নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ৮৭

২। নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ৯৭।

৩। নাহজুল বালাগাহ্, বাণী ২৩৯ (সুবহি সালিহ্)।

৪। নাহজুল বালাগাহ্, বাণী ৯৪ (সুবহি সালিহ্)

৫। নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ১৫৪।

৬। নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ১৪৭।

৭। নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ৪।

৮। নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ১০৫।

৯। নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ১০৯।

১০। নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ১৪৪।

১১। নাহজুল বালাগাহ্, ১৯০ নং খুতবার অংশ।

১২। আস- সাওয়ায়েক- ইবনে হাজার, পৃষ্ঠা ১৪২।

১৩। আস- সাওয়ায়েক- ইবনে হাজার, পৃষ্ঠা ১৩৭।

১৪। সূরা আলে ইমরান : ১০৫।

১৫। আস- সাওয়ায়েক, ১১শ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৯০।

১৬। এই হাদীসটি তিরমিযী ও নাসায়ী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী হতে এবং মুত্তাকী হিন্দী তাঁর কানজুল উম্মাল গ্রন্থে এ দুই গ্রন্থ হতে (প্রথম খণ্ড, ৪৪ পৃঃ) বর্ণনা করেছেন।

১৭। এই হাদীসটি তিরমিযী হযরত যাইদ ইবনে আরকাম হতে নকল করেছেন এবং কানজুল উম্মালেও প্রথম খণ্ডের ৪৪ পৃষ্ঠায় এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

১৮। এই হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ যাইদ ইবনে সাবিত হতে দুইভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি ৫ম খণ্ডের ১৮২ নং পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয়টি ৫ম খণ্ডের ১৮৯ নং পৃষ্ঠায়। কানজুল উম্মাল, হাদীস নং ৮৭৩।

১৯। হাকিম নিশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক ’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৪৮ নং পৃষ্ঠায় এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, “বুখারী ও মুসলিম হাদীস সহীহ হওয়ার যে শর্ত বলেছেন সে শর্তানুসারে এই হাদীস সহীহ বলে গণ্য। ” যাহাবীও তাঁর ‘তালখিসে মুসতাদরাক ’ গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন।(*১০)

২০। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল এই হাদীসটি তাঁর মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ১৭ ও ২৬ পৃষ্ঠায় হযরত আবু সাঈদ খুদরী হতে এবং ইবনে আবি শাইবাহ্, আবু ইয়ালী ও ইবনে সা’দ আবু সাঈদ থেকে তা বর্ণনা করেছেন। আর এটিই কানযুল উম্মাল ১ম খণ্ডের ৪৭ পৃষ্ঠার ৯৪৫ নং হাদীস।

২১। হাকিম নিশাবুরী তাঁর মুসতাদরাকের ৩য় খণ্ডের ১০৯ পৃষ্ঠায় হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী ও মুসলিম তা রেওয়ায়েত না করলেও তাঁদের প্রস্তাবিত শর্তানুসারে হাদীসটিকে তিনি সহীহ বলেছেন। হাদীসটি তিনি যাইদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

২২। এ হাদীসটি তাবরানী তাঁর ‘আরবাইনাল আরবাইন ’ গ্রন্থে এবং আল্লামাহ্ সুয়ূতী তাঁর ‘ইহ্ইয়াউল মাইয়্যেত ’ গ্রন্থে এনেছেন।

২৩। ইবনে হাজার হাইতামী তাঁর ‘আসসাওয়েকুল মুহরাকাহ্ ’ গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়ের ৭৫ পৃষ্ঠায় চল্লিশটি বিভিন্ন হাদীসের পর এ হাদীসটি এনেছেন।

২৪। সাওয়ায়েকুল মুহরাকাহ্ গ্রন্থের ১১ অধ্যায়ের ৮৯ নং পৃষ্ঠার শেষে সূরা সাফফাতের ২৪ নং আয়াতের তাফসীরে তিনি এ কথা বলেছেন।

২৫। সূরা হা মীম সিজদা : ৪২।

২৬। আস- সাওয়ায়েক, রাসূলের ওসিয়ত অধ্যায়, ১৩৫ পৃষ্ঠা। সুতরাং এখন তাঁকে প্রশ্ন করুন তবে কেন আবুল হাসান আশা’আরীকে দীনের মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং চার মাজহাবের ইমামগণকে ফিকাহর ক্ষেত্রে নবীর আহলে বাইত হতে প্রাধান্য দান করেন?

কিরূপে নবী (সা.)- এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আলী ইবনে আবি তালিবকে (যিনি ব্যতীত সূরা তওবা প্রচারের অধিকার অন্য কাউকে আল্লাহ্ দান করেন নি) অন্যদের পরে স্থান দেন? কিরূপে

মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের মত মুর্জিয়া যে আল্লাহর দৈহিক অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল এমন ব্যক্তির তাফসীরকে আহলে বাইতের ইমামগণের চেয়ে অগ্রগামী মনে করেন?

২৭। হাকিম নিশাবুরী তাঁর মুসতাদরাকের ৩য় খণ্ডের ১৫১ পৃষ্ঠায় হযরত আবু যার থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

২৮। তাবরানী তাঁর 'আরবাইন ' গ্রন্থের ২১৬ পৃষ্ঠায় আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৯। হাকিম নিশাবুরী তাঁর 'মুসতাদরাক ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে ইবনে আব্বাস থেকে এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

৩০। আস- সাওয়ায়েক, ১১ পৃষ্ঠা, ৭ম আয়াতের তাফসীর।

৩১। উপরোক্ত গ্রন্থের ১৪৩ পৃষ্ঠায় রাসূল (সা.)- এর মৃত্যুর পর তাঁর আহলে বাইতের ওপর আপতিত বিপদাপদের বর্ণনা দানের পর এ কথাটি বলেছেন।

৩২। আস- সাওয়ায়েক, ১১ অধ্যায়, ৯১ পৃষ্ঠা।

৩৩। এখন আমার প্রশ্ন এসব জানার পরও তিনি কেন দীনের মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ে আহলে বাইতের অনুসরণ করেন নি?

৩৪। কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৭, হাদীস নং ৩৭১৯;   মুসনাদে আহমাদের ৫ম খণ্ডের ৯৪ পৃষ্ঠায়ও এ হাদীস শুধু একটি শব্দের পার্থক্যসহ এসেছে। হাফিয আবু নাঈমও হাদীসটি তাঁর 'হুলইয়া ' গ্রন্থের ৪৪৯ পৃষ্ঠায় মুসনাদে আহমাদ থেকে নকল করেছেন।

৩৫। কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৫, হাদীস নং ২৫৭৮ এবং মুনতাখাবুল কানযুল উম্মালের ৫ম খণ্ডের ফুটনোটে মুসনাদে আহমাদ হতে এ হাদীসটি এসেছে। এ হাদীসটির সনদে ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ালা মুহারেবীর কারণে ইবনে হাজার হাদীসটিকে যাঈফ বললেও ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ালা সকল রিজালশাস্ত্রবিদের মতে নির্ভরযোগ্য এবং বুখারী, মুসলিম ও যাহাবী তাঁর থেকে নকলকৃত হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

৩৬। হাকিম নিশাবুরী তাঁর মুসতাদরাকের ৩য় খণ্ডের ১২৮ পৃষ্ঠায় এ হাদীসটি এনেছেন এবং বলেছেন এ হাদীসটি সহীহ, অথচ বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। তাবরানী তাঁর

কাবীর গ্রন্থে এবং আবু নাঈম তাঁর ফাজায়েলুস্ সাহাবায় হাদীসটি এনেছেন। কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫৫, হাদীস নং ২৫৭৭ এবং মুসনাদে আহমাদ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩২।

৩৭। তাবরানী তাঁর কাবীর গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এ হাদীসটি এনেছেন। কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠার ২৫৭১ নং হাদীস।

৩৮। তাবরানী তাঁর কাবীর গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে আবি আবদুহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আম্মার ইবনে ইয়াসির তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর পিতামহ হযরত আম্মার হতে এটি বর্ণনা করেছেন। কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠার ২৫৭৬ নং হাদীস।

৩৯। ইবনে হাজার (وَ قِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ)আয়াতটির তাফসীরে (আস- সাওয়ায়েক গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায়) এ হাদীসটি এনেছেন ও মোল্লা তাঁর আস- সিরাহ্ গ্রন্থে এ হাদীসটি উ ৃত করেছেন।

৪০। ইবনে হাজার তাঁর ‘সাওয়ায়েক ’ গ্রন্থের চতুর্থ মাকসাদের ১০৫ পৃষ্ঠায় সূরা শুরার ২৩ নং আয়াতের তাফসীরে এ হাদীসটি এনেছেন।

৪১। তাবরানী হাদীসে সাকালাইনের সঙ্গে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে হাজার তাঁর আস- সাওয়ায়েক গ্রন্থের ১১ অধ্যায়ের ৮৯ পৃষ্ঠায় (وَ قِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ)আয়াতটির তাফসীরে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪২। অনেক হাদীস লেখক হযরত আবু যার হতে এ হাদীসটি মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম আস- সাব্বান, শেখ ইউসুফ নাবাহানী, আশশারাফুল মুয়াইয়াদ, পৃষ্ঠা ৩১।

৪৩। তাবরানী তাঁর ‘আওসাতে’সুয়ূতী তাঁর ‘ইহ্ইয়াউল মাইয়্যেত ’ নাবাহানী তাঁর ‘আরবাইনাল আরবাইনে ’ এবং ইবনে হাজার তাঁর ‘আস- সাওয়ায়েক ’ গ্রন্থে এ হাদীসটি এনেছেন। ‘কারো কর্মই আমাদের অধিকারের প্রতি সচেতনতা ও সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত ফলদান করবে না ’ কথাটির প্রতি চিন্তা করুন।

৪৪। কাজী আয়াজ ‘আশ- শিফা ’ গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় ‘আহলে বাইতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে নবীরই প্রতি সম্মান প্রদর্শন ’ এ যুক্তির সপক্ষে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এখানে

নবীর আহলে বাইতের পরিচিতি লাভ শুধু তাঁদের নাম জানা নয়, বরং রাসূলের পর তাঁরাই যে উলিল আমর (দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ) এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখা ও তদনুযায়ী আমল করা। কারণ রাসূল (সা.) নিজেই বলেছেন, "যে কেউ এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো সে জানে না তার ইমামকে, তাহলে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।"

৪৫। যদি তাঁরা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্বাচিত না হতেন তবে তাঁদের ভালবাসা ও অনুসরণের বিষয়ে এরূপ প্রশ্ন করা হত না। এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস হতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাবরানী, সুয়ূতী ও নাবাহানী বর্ণনা করেছেন।

৪৬। সা'লাবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সূরা শুরার ২৩ নং আয়াতের তাফসীরে জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ বাজালী হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ত প যামাখশারীও তাঁর তাফসীরে এ বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন।

৪৭। মোল্লা তাঁর মাকাসাদের 'আস- সাওয়ায়েক' অধ্যায়ে ১৪ নং আয়াতের তাফসীরে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪৮। এ হাদীসটি আবদুল গণী ইবনে সা'দ তাঁর 'ইজাহুল ইশকাল' গ্রন্থে এনেছেন। কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯৬ পৃষ্ঠায় ৬০৫০ নং হাদীস হিসেবে এটি এসেছে।

৪৯। এ দু'টি কবিতার পঙ্ক্তি শাফেয়ী নবী পরিবারের প্রশংসায় বলেছেন যা ইবনে হাজার তাঁর 'আস- সাওয়ায়েক' গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীরে এনেছেন। নাবাহানী তাঁর 'আশ- শারাফুল মুওয়াইয়াদ' গ্রন্থের ৯৯ পৃষ্ঠায় এটি বর্ণনা করেছেন।

৫০। সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "হে আহলে বাইত! আল্লাহ্ চান তোমাদেরকে পাপ ও পঙ্কিলতা হতে মুক্ত এবং নিষ্কলুষ ও পবিত্র করতে।' এই আয়াতকে আয়াতে তাতহীর বলা হয়।

৫১। এ বৈশিষ্ট্য ও ে ষ্ঠত্ব মহান আল্লাহ্ তাঁদেরই দান করেছেন এবং বলেছেন, "বলুন! আমি তোমাদের হতে কোন প্রতিদান চাই না আমার নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালবাসা ছাড়া এবং যে কেউ

সৎ কর্ম (তাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষণ) করবে তার আমলকে বাড়িয়ে দেয়া হবে। ” (সূরা শুরা :২৩)

৫২। সা’লাবী তাঁর তাফসীরে কাবীর গ্রন্থে আবান ইবনে তাগলিবের সূত্রে ইমাম সাদিক (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, “আল্লাহর রজ্জু বলতে আমাদের আহলে বাইতকে বুঝানো হয়েছে। ” ইমাম শাফেয়ী এ সত্যকে কবিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন-

لِمـــا رأيـــت النّـــاس قـــد ذهبـــت بِهـــم   مـــــذاهبهم في أبْحـــر الغـــيّ و الجهـــل

যখন লক্ষ্য করলাম মানুষ মাজহাবের বিষয়ে গোমরাহীর সমুদ্রে নিমজ্জমান

ركبـــت علـــى اســـم الله في ســـفن النجـــا   وهـــم اهـــل بيـــت المصـــطفى خـــاتم الرســـول

আমি আল্লাহর নামে মুক্তির তরণীতে আরোহণ করলাম যা শেষ নবীর আহলে বাইত

و امســـكت حبـــل الله وهـــو ولائهـــم   كمـــا قـــد امرنـــا بالتمســـك بالحبـــل

আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরলাম যা তাঁদের বেলায়েতের রজ্জু যেরূপ তা আঁকড়ে ধরার জন্য নির্দেশিত হয়েছি।

৫৩। ইমাম বাকির ও ইমাম সাদিক (আ.) সব সময় বলতেন, “সিরাতুল মুস্তাকীম বলতে সত্যপন্থী ইমামদের এবং সুবুল বলতে বিভ্রান্ত নেতাদের বোঝানো হয়েছে যারা তোমাদের আল্লাহর পথ হতে দূরে সরিয়ে দেয়। ”

৫৪। সিকাতুল ইসলাম কুলাইনী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন বুরাইদ আজালী ইমাম বাকির (আ.)- কে প্রশ্ন করলেন এ আয়াতটির অর্থ কি? ইমাম বাকির (আ.) সূরা নিসার ৫১- ৫৩ আয়াতের যে ব্যাখ্যা দান করেন তার সংক্ষিপ্ত রূপ হলো- ‘তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে এবং কাফিরদেরকে বলে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে। এরা সেই সমস্ত লোক যাদের ওপর স্বয়ং আল্লাহপাক লানত করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ যার ওপর লানত করেন তুমি তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না। তাদের কাছে কি হুকুমত ও রাজত্বের (ইমামত ও খেলাফতের)

কোন অংশ রয়েছে? যদি এরূপ হত (তারা রাজত্ব পেত) তাহলে মানুষকে কোন অংশই দান করত না। নাকি যা কিছু আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে (নবী ও তাঁর আহলে বাইতকে) তারা হিংসা করে এবং আমরাই সেই ব্যক্তিবর্গ, যে ইমামত ও নেতৃত্ব আমাদের দেয়া হয়েছে সে কারণে আমাদের হিংসা করা হয়। অবশ্যই আমি ইবরাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য। কোরআন বলছে, "তাদের মধ্যে নবী, রাসূল ও ইমাম প্রেরণ করেছি। " অন্যরা আলে ইবরাহীমের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে কবুল করলেও কেন আলে মুহাম্মদের ক্ষেত্রে তা কবুল করে না? (যেরূপ নামাযের দরূদে আহলে সুন্নাহ্ আলে ইবরাহীমকে যা দান করা হয়েছিল ত প যেন আলে মুহাম্মদকেও দান করা হয় তার জন্য দোয়া করে থাকে)। অতঃপর তাদের কেউ তাঁকে মান্য করেছে আবার কেউ তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে।

৫৫। সা'লাবী তাঁর তাফসীরে কাবীর গ্রন্থে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো তখন আলী (আ.) বললেন, "আমরা (আহলে বাইত) সেই ব্যক্তিবর্গ যারা জানে (আহলুয যিকর)। " অন্যান্য ইমাম হতেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আল্লামাহ্ বাহরাইনী তাঁর গায়াতুল মারাম গ্রন্থের ৩৫ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশাধিক সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৬। ইবনে মারদুইয়া বর্ণনা করেছেন এখানে 'রাসূলের বিরোধিতা ' র অর্থ আলী (আ.)- এর মর্যাদার বিরোধিতা ও 'সত্য প্রকাশিত হবার পর ' অর্থ আলী (আ.)- এর প্রতিনিধিত্ব ও মর্যাদার বিষয় জানার পর।

আয়াশী তাঁর তাফসীরে একই ভাবার্থের কয়েকটি হাদীস এনেছেন। মুমিনদের পথ বলতে যে আহলে বাইতের ইমামদের পথ তা আহলে বাইতের ইমামদের হতে সহীহ ও মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

৫৭। সা'লাবী তাঁর তাফসীরে কাবীরে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত নাযিল হবার পর রাসূল (সা.) তাঁর হাতকে আলী (আ.)- এর বুকে রাখলেন ও বললেন, "আমি ভয়

প্রদর্শনকারী ও আলী হেদায়েতকারী। হে আলী! হেদায়েতপ্রাপ্তগণ তোমার মাধ্যমেই হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। ”

৫৮। সা'লাবী তাঁর 'তাফসীরে কাবীর ' গ্রন্থে সূরা ফাতিহার তাফসীরে ইবনে বুরাইদা হতে নকল করেছেন যে, 'সিরাতুল মুস্তাকীম ' বলতে মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর বংশধরদের পথকে বুঝানো হয়েছে। ওয়াকি ইবনে জাররাহ্, সুফিয়ান সাওরী, সা'দী, আসবাত ও মুজাহিদ হতে ও এরা সকলেই ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, 'আমাদের সরল সঠিক পথে হেদায়েত কর ' অর্থ মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরদের দিকে।

৫৯। সকল তাফসীরকার এ বিষয়ে একমত যে, এই আয়াতটি আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন তিনি রুকুরত অবস্থায় সদকা দান করেন। নাসায়ী তাঁর সহীহ নাসায়ীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সূরা মায়েদার এ আয়াতটি আলী ইবনে আবি তালিবের শানে নাযিল হয়েছে।

৬০। ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর 'আস- সাওয়ায়েক ' গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, "সাবেত বানানী বলেছেন : আয়াতে اهتدی অর্থ মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইতের বেলায়েত ও অভিভাবকত্বের মাধ্যমে হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া। ” ইবনে হাজার ইমাম বাকির (আ.) হতেও উপরোক্ত অর্থের তাফসীর বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইমাম বাকির (আ.) হতে যারা তাঁদের বেলায়েতের মাধ্যমে হেদায়েত পেয়েছে কেবল তারাই যে মুক্তি পাবে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে ইমাম বাকির (আ.) হারিস ইবনে ইয়াহিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "হে হারিস! তুমি কি লক্ষ্য কর নি, মহান আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির তওবা, সৎ কর্ম ও ঈমানকে গ্রহণের জন্য আমাদের বেলায়েতকে স্বীকার ও আমাদের প্রকৃত পরিচয় জানাকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন, নতুবা সেসব কোন ফলদান করবে না। ” অতঃপর আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, "যদি কেউ তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে

কিন্তু আমাদের আহলে বাইতের অভিভাবকত্বের দিকে হেদায়েতপ্রাপ্ত না হয়, তবে এ কর্ম তার কোন প্রয়োজনই পূরণ করবে না। ”

৬১। এর জন্য তাফসীরে সাফী ও তাফসীরে আলী ইবনে ইবরাহীমে ইমাম বাকির (আ.), ইমাম সাদিক (আ.) ও ইমাম রেযা (আ.) হতে যে বর্ণনা এসেছে তার প্রতি লক্ষ্য করুন। তদুপরি আল্লামাহ্ বাহরাইনীর ‘গায়াতুল মারাম ’ গ্রন্থে আহলে সুন্নাহর হাদীসসমূহ হতে বর্ণনাটি এসেছে।

৬২। সূরা বাকারা : ২০৮। আল্লামাহ্ বাহরাইনী তাঁর ‘গায়াতুল মারাম ’ গ্রন্থে ২২৪ নং অধ্যায়ে ১২ নং হাদীসে বলেছেন, “এই আয়াত আলী (আ.) ও আহলে বাইতের অন্যান্য ইমামদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আলী (আ.) হতে কয়েকটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ”

৬৩। আল্লামাহ্ বাহরাইনী তাঁর ‘গায়াতুল মারাম ’ গ্রন্থের ৪৮ অধ্যায়ে আহলে সুন্নাহ্ সূত্রে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে ‘নাঈম ’ বলতে রাসূল (সা.), আলী (আ.) ও আহলে বাইতের বেলায়েতকে বুঝানো হয়েছে।

৬৪। সূরা মায়েদাহ্ : ৬৭। অনেক হাদীসশাস্ত্রবিদই এ হাদীসটি গাদীরে খুমে আলী (আ.) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে বলে মনে করেন। সূরা মায়েদাহর এ আয়াতের শানে নুযূলে আবু সাঈদ খুদরী হতে সা’লাবী ও ওয়াকেদী তাঁদের তাফসীরে দু’টি সূত্রে এবং হামূয়ানী শাফেয়ী তাঁর ফারায়েদুস সামতাইন গ্রন্থে অনেকগুলো সূত্রে আবু হুরাইরা (রা.) হতে ও আবু নাঈম তাঁর ‘নুযূলুল কোরআন ’ গ্রন্থে আবু রাফে, আ’মাশ ও আতিয়ার সূত্রে হাদীসটি এনেছেন। ‘গায়াতুল মারাম ’ ৯টি সূত্রে আহলে সুন্নাহর হাদীস গ্রন্থ হতে এবং আহলে বাইতের সূত্রে ৮টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৬৫। ‘গায়াতুল মারাম ’ গ্রন্থের ৩৯ ও ৪০ অধ্যায়ে রাসূল (সা.) হতে ৬টি নির্ভরযোগ্য হাদীস আহলে সুন্নাহ্ হতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬৬। সা’লাবী তাঁর তাফসীরে ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। আল্লামাহ্ মিসরী শাবলানজী তাঁর ‘নুরুল আবছার ’ গ্রন্থের ৭১ পৃষ্ঠায় হযরত আলী (আ.)- এর বাণী বর্ণনায় এ ঘটনাটি এনেছেন। ত প হালাবী তাঁর সীরাত গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে বিদায় হ র ঘটনা বর্ণনায় এবং হাকিম

নিশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক’ গ্রন্থে সূরা মা’আরিজের তাফসীরে ঘটনাটি এনেছেন। মুসতাদরাক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০২।

৬৭। আস-সাওয়ায়েক। দায়লামী আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, “তারা আলীর বেলায়েত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।” ওয়াহেদী উপরোক্ত আয়াতের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন, “আলী (আ.) ও আহলে বাইতের নেতৃত্বকে মানার বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে এবং আরো বলেছেন, “আল্লাহ্ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন মানুষকে এটি বোঝানোর জন্য যে, তিনি তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিদান হিসেবে তাঁর আহলে বাইতের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা পোষণ করা ছাড়া আর কিছু চান না এবং কিয়ামতে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে যে, রাসূল যেমনটি নির্দেশ দিয়েছেন তেমনটি তারা করেছে কিনা। যদি না করে থাকে তবে তার শাস্তি তাদের পেতে হবে। ইবনে হাজারের ‘আস-সাওয়ায়েক’ গ্রন্থের ১১ অধ্যায়ে এ আয়াতটিকে আহলে বাইতের শানে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬৮। এ বিষয়ে হাফিয আবু নাঈম তাঁর হুলইয়া গ্রন্থে এবং সা’লাবী, হাকিম নিশাবুরী ও বারকী তাঁদের তাফসীরসমূহে যা বলেছেন তাই যথেষ্ট। হুসাইনী ও অন্যান্যরাও আহলে সুন্নাহ্ হতে এটি বর্ণনা করেছেন। তাবারসী তাঁর ‘মাজমায়ুল বায়ান’-এ হযরত আলী (আ.) হতে এটি বর্ণনা করেছেন। বাহরাইনীর ‘গায়াতুল মারাম’ গ্রন্থে এসেছে- এ আয়াতের তেলাওয়াতে রোগমুক্তি ঘটে।

৬৯। সূরা আনফাল, আয়াত নং ৩৩ ও সূরা বাকারার ৩৭ নং আয়াতের তাফসীরে ইবনে মাগাযেলী শাফেয়ী ইবনে আব্বাসের সূত্রে রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, ঐ বাক্যগুলো যার মাধ্যমে আদমের তওবা গৃহীত হয় তা হলো আদম (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.), আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (আ.)-এর উসিলায় ক্ষমা চান।

৭০। ইবনে হাজারের ‘আস-সাওয়ায়েক’ গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে (আহলে বাইতের শানে ৭ম আয়াত) একাদশ অধ্যায়ে তিনি এ বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৭১। ইবনে হাজার আহলে বাইত সম্পর্কিত আয়াতের অন্যতম বলে উক্ত আয়াতকে উল্লেখ করেছেন এবং 'আস-সাওয়ায়েক' গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে তা আলোচনা করেছেন। ইবনে মাগাযেলী শাফেয়ী ইমাম বাকির (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "আমরা সেই ব্যক্তিবর্গ যাদের প্রতি হিংসা করা হয়েছে।" 'গায়াতুল মারাম' গ্রন্থের ৬০ ও ৬১ অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত ৩০টি নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

৭২। সিকাতুল ইসলাম কুলাইনী সহীহ্ সনদে ইমাম সাদিক (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "আমরা সেই ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ্ যাদের আনুগত্যকে মানুষের ওপর ফরয করেছেন, আমরাই জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ এবং আমাদের প্রতিই অন্যরা বিদ্বেষ পোষণ করে। আল্লাহ্ বলেছেন, "নাকি মানুষকে (নবী পরিবারকে) যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে সে কারণে তারা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।"

৭৩। সূরা আ'রাফ ৪৬। সা'লাবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, আ'রাফ সিরাত হতে উঁচু ও উত্থিত একটি স্থান যেখানে আলী, হামযাহ্, জা'ফর তাইয়্যার ও আব্বাস বসবেন এবং তাঁরা তাঁদের বন্ধুদের শ্বেত শুভ্র চেহারা এবং শত্রুদের কালিমাযুক্ত চেহারা দেখে সনাক্ত করবেন।

হাকিম নিশাবুরী তাঁর নিজস্ব সনদে আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, "আমরা পুনরুত্থান দিবসে বেহেশত ও দোযখের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকব, অতঃপর আমাদের যারা সাহায্য করেছে তাদের মুখমণ্ডল দেখে চিনবো ও বেহেশতে প্রবেশ করাবো এবং আমাদের শত্রুদেরও তাদের মুখাবয়ব দেখে চিনবো। অন্য একটি সূত্রে হযরত সালমান ফারসী হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, "হে আলী! তুমি ও তোমার সন্তানগণ আমার স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি যারা আ'রাফে অবস্থান করবে।"

উপরোক্ত হাদীসের সমর্থনকারী অপর একটি হাদীস যা 'দারে কুতনী' এবং 'আস-সাওয়ায়েক' গ্রন্থের ২য় পর্বের ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, উমর যখন খলীফা নির্বাচনের জন্য ৬ সদস্যের শুরা গঠন করলেন, আলী তাঁদের উদ্দেশ্যে যে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন সেখানে বলেছেন, "তোমাদের

মধ্যে আমি ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যাকে উদ্দেশ্য করে রাসূল (সা.) বলেছেন : তুমি কিয়ামতে বেহেশত ও দোযখের স্থান বণ্টনকারী? তারা বলল : আল্লাহর কসম না। ”

ইবনে হাজার বলেন এ কথার অর্থ ব্যাখ্যা করে ইমাম রেযা (আ.) বলেন, “নবী (সা.) আলী (আ.)- কে বলেছেন : তুমি বেহেশত ও দোযখের বণ্টনকারী। কিয়ামত দিবসে তুমি জাহান্নামকে উদ্দেশ্য করে বলবে : এটি আমার লোক এবং এটি তোমার। ” ইবনে হাজার ইবনে আমাক হতে বর্ণনা করেছেন, “হযরত আবু বকর আলীকে বলেন : নবী করিম (সা.) হতে শুনেছি কেউ সিরাতের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারবে না যতক্ষণ না আলী (আ.) তার অনুমতি দেয়। ”

৭৪। সূরা আহযাব : ২৩। ইবনে হাজার তাঁর ‘আস- সাওয়ায়েক ’ গ্রন্থের ৫ম পর্বের ৯ম অধ্যায়ে আলী (আ.)- এর শাহাদাতের আলোচনায় বলেছেন, “আলী (আ.)- কে একবার মিম্বারে এ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলো। জবাবে তিনি বললেন : হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। প্রকৃতই এই আয়াতটি আমার চাচা হামযাহ্, চাচাত ভাই উবাইদা ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, উবাইদা বদর যুে শহীদ হয়েছেন, হামযাহ্ উহুদে শহীদ হয়েছেন এবং আমি সেই রাসূলের উম্মতের সেই কঠোরতম হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তির প্রতিক্ষায় রয়েছি যে আমার শ্রুকে রঙ্গিন করবে। এ বিষয়টি আমার ভাই ও বন্ধু আবুল কাসেম ইবনে আবদুল্লাহ্ (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) অনুমোদন করেছেন। হাকিম নিশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক ’ গ্রন্থে এবং তাবারসী তাঁর ‘মাজমায়ুল বায়ান ’ - এ আমর ইবনে সাবেত ও আবু ইসহাকের সূত্রে আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, “এই আয়াত আমাদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমি এর জন্য প্রতীক্ষমাণ, এজন্য আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত নই। ”

৭৫। সূরা নূর : ৩৬ ও ৩৭। মুজাহিদ ও ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান তাঁদের তাফসীর গ্রন্থে সূরা জুমআর একাদশ আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস হতে নকল করেছেন, ‘যখন তারা ব্যবসায়ের সুযোগ দেখে, তোমাকে একা ফেলে রেখে যায় ’ আয়াতটির শানে নুযূল এরূপ, দাহিয়া কালবী জুমআর দিন সিরিয়া হতে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আনা খাদ্র- দ্রব্য নিয়ে ফিরে

এসেছিলেন এবং জিত পাথরের নিকট পৌঁছার পর ঢোল পিটিয়ে নিজের আগমনবার্তা ঘোষণা করলেন। সকলেই তাঁর ব্যবসায়ী কাফেলা দেখার জন্য রাসূলকে ফেলে চলে গেল। শুধু আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন, আবু যার, সালমান ও মিকদাদ রাসূলের সঙ্গে ছিলেন। রাসূল (সা.) বললেন : আল্লাহ এ মসজিদের দিকে লক্ষ্য করে এ ব্যক্তিদের দেখে মদীনার মানুষদের আজাব দান হতে বিরত হলেন। নতুবা যেরূপ লুত জাতির ওপর পাথর বর্ষিত হয়েছিল সেরূপ আজাব নাযিল হত। তখনই আল্লাহপাক মসজিদে বিদ্যমান ব্যক্তিবর্গের প্রশংসায় সূরা নূরের উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

৭৬। সা'লাবী তাঁর 'তাফসীরে কাবীর' - এ আনাস বিন মালিক এবং ইয়াযীদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা.) যখন এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন তখন আবু বকর উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ ঘর কি আলী ও ফাতেমার ঘর? রাসূল (সা.) বললেন : ঘরগুলোর মধ্যে ঐ ঘরটি সর্বোত্তম।"

৭৭। مثل نوره كمشكاة আয়াতটি সম্পর্কে ইবনে মাগাযেলী শাফেয়ী তাঁর মানাকিব গ্রন্থে আলী ইবনে জা'ফর হতে বর্ণনা করেছেন, "ইমাম কাযেম (আ.) -কে প্রশ্ন করলাম উপরোক্ত আয়াতে مشكاة (কুলঙ্গি), مصباح (প্রদীপ) ও زجاجة (কাঁচের পাত্র) বলতে কি বুঝানো হয়েছে? তিনি বলেন : মিশকাহ্ হলো ফাতিমা (আ.), মিসবাহ ইমাম হাসান ও হুসাইন (আ.) এবং যুজাজাহ্ বা কাঁচের পাত্র যা উ ল নক্ষত্র তাও ফাতিমা, কারণ বিশ্বের নারীদের মধ্যে তিনি প্র লিততম তারকা যা পবিত্র বৃক্ষ হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকে আলো গ্রহণ করেছে, পূর্বমুখীও নয় আবার পশ্চিমমুখীও নয় অর্থাৎ ইহুদীও নন বা নাসারাও নন। 'অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হবার নিকটবর্তী' এর অর্থ তাঁর অস্তিত্ব থেকেই জ্ঞান বিচ্ছুরিত হয়। জ্যোতির ওপর জ্যোতি অর্থাৎ এক ইমামের আগমনের পরেই অপর ইমামের আগমন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজের নূরের দিকে পথ দেখান অর্থাৎ তাঁরা হেদায়েত করবেন তাদের, যারা তাঁদের (আহলে বাইতের) বেলায়েত ও নেতৃত্বকে মেনে নেবে।

৭৮। সূরা ওয়াকেয়া : ১০। ইবনে হাজার আসকালানী ‘আস- সাওয়ায়েক ’ গ্রন্থে (২৯ পর্বের ৯ম অধ্যায়ে) এবং দায়লামী তাঁর হাদীসগ্রন্থে হযরত আয়েশা হতে এবং তাবরানী ও ইবনে মারদুইয়া ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, “রাসূল (সা.) বলেছেন : তিন ব্যক্তি অগ্রবর্তীদলের অন্তর্ভুক্ত। মূসার অগ্রবর্তী দলের প্রধান ইউশা ইবনে নূন, ঈসার অগ্রবর্তীদের প্রধান হলেন সাহেব ইয়াসিন এবং মুহাম্মদের উম্মতের অগ্রগামী ব্যক্তি হলো আলী ইবনে আবী তালিব। ” মুওয়াফফাক ইবনে আহমাদ এবং ইবনে মাগাযেলীও ইবনে আব্বাসের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৭৯। সূরা নিসা : ৬৯। ইবনে নাজ্জার ইবনে আব্বাসের সূত্রে রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, “সত্যপন্থীগণ (সত্যপন্থীদের নেতা) ৩ জন।

আলে ফিরআউনের মুমিন ব্যক্তি (হিযকিল), সাহেব ইয়াসিন (হাবীব নাজ্জার) এবং আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)। (আস- সাওয়ায়েক, ২য় পর্ব, ৯ম অধ্যায়, ৩০ নং হাদীস)। ‘আস- সাওয়ায়েক ’ গ্রন্থের একই অধ্যায়ের ৩১ নং হাদীসে এবং হাফিজ আবু নাঈম এবং ইবনে আসাকীর তাঁদের ইতিহাস গ্রন্থে ইবনে আবি লাইলী থেকে বর্ণনা করেছেন, “রাসূল (সা.) বলেছেন : তিন জন ব্যক্তি হলেন সত্যপন্থী- আলে ইয়াসিনের মুমিন ব্যক্তি (হাবীব নাজ্জার) যিনি বলেছিলেন : হে আমার জাতি! আল্লাহর প্রেরিত রাসূলদের অনুসরণ কর ও ফিরআউন বংশের মুমিন ব্যক্তি হিযকিল যিনি বলেছিলেন : তোমরা কি ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও যে বলে : আমার রব আল্লাহ্ এবং আলী ইবনে আবী তালিব তাঁদের হতে উত্তম সেই সিদ্দীকে আকবার ও ফারুকে আযম ” , যেমনটি নির্ভরযোগ্য ও মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

৮০। মুওয়াফফাক ইবনে আহমাদ, আবু বকর ইবনে মারদুইয়ার সূত্রে আলী হতে বর্ণনা করেছেন, “তিনি বলেছেন : মুসলিম উম্মাহ্ ৭৩ ফির্কায় বিভক্ত হবে, তাদের মধ্যে একটি দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামী হবে এবং উপরোক্ত আয়াত আমার এবং আমার অনুসারীদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে যারা মুক্তিপ্রাপ্ত দল। ”

৮১। সূরা হাশর : ২০।

শেখ তুসী তাঁর 'আমালী ' গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য সূত্রে আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন : তারাই বেহেশতী যারা আমার আনুগত্য করে ও আমার পর আলীর নেতৃত্বকে মেনে নেয় এবং তার আনুগত্য স্বীকার করে। রাসূলকে প্রশ্ন করা হলো জাহান্নামবাসী কারা? তিনি বললেন : যারা তার নেতৃত্বের প্রতি ক্ষুব্ধ, তার প্রতি দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ও তার সঙ্গে যু   করে। " মরহুম শেখ সাদুক (রহঃ)- ও আলী (আ.) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবুল মুওয়াইয়াদ ও মুওয়াফফাক ইবনে আহমাদ ও হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা.) বলেছেন : আমার প্রাণ যার মুষ্টাব   সেই প্রভুর শপথ, আলী ও তার অনুসারীরা কিয়ামতের দিন সফলকাম হবে। "

৮২। সোয়াদ : ২৮। এ আয়াতের তাফসীরের জন্য দেখুন তাফসীরে আলী ইবনে ইবরাহীম অথবা 'গায়াতুল মারাম ' (আল্লামাহ্ বাহরাইনী), ৮১ ও ৮৩ অধ্যায়।

৮৩। জাসিয়াহ্ : ২১। যখন বদর যু   হযরত হামযাহ্ (রা.), হযরত আলী (আ.) ও হযরত উবায়দা (হাশিমী বংশো ূতরা) উতবা, শায়বা ও ওয়ালিদ (উমাইয়্যা) এ তিনজনের বিরু   অস্ত্র হাতে যু   লিপ্ত হন তখন মহান আল্লাহ্ প্রথম তিনজনকে ঈমানদার ও সৎ কর্মশীল এবং পরবর্তী তিন ব্যক্তিকে দুষ্কর্মকারী বলে অভিহিত করে উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন বলে সহীহ হাদীসে এসেছে।

৮৪। সূরা বাইয়্যেনাহ্ : ৭। ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, "এই আয়াত আহলে বাইতের শানে নাযিল হয়েছে। " তিনি তাঁর 'আস- সাওয়ায়েক ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১১ অধ্যায়ে আহলে বাইতের ফজীলত বর্ণনাকালে এ হাদীসটি এনেছেন। 'ফুসূলুল মুহিম্মা ' গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ের ৩৯ পৃষ্ঠায় এ আয়াতের আলোচনায় আমরা সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছি। তা দেখুন।

৮৫। সূরা হ   : ১৯। বুখারী সূরা হ   র উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে ৩য় খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "আলী (রা.) বলেন : আমি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন আল্লাহপাকের সম্মুখে বিচারের প্রার্থী হয়ে উপস্থিত হব। " কাইস ইবনে ইবাদ বলেছেন, "এই আয়াত বদরের যু   আলী এবং তাঁর দুই সহযোগী হামযাহ্ ও উবাইদা এবং শাইবা ও তার দুই বন্ধু উতবা ও

ওয়ালিদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ” একই পৃষ্ঠায় হযরত আবু যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর শপথ করে বলতেন, “এই আয়াত আলী ও তাঁর দুই বন্ধু এবং উতবা ও তার দুই সহযোগী সম্পর্কে বদরের যু   নাযিল হয়েছে। ” (সহীহ বুখারী, প্রকাশক দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পাঠ, পৃষ্ঠা ১২৩)

৮৬। সিজদাহ্ : ১৮ ও ১৯। সন্দেহাতীতভাবে এ আয়াত আমীরুল মুমিনীন আলী ও ওয়ালিদ ইবনে উকবা ইবনে আবি মুয়ীত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মুফাসসির ও হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এটিকে সমর্থন করেছেন। আবুল হাসান আলী ইবনে আহমাদ ওয়াহেদী এ আয়াতের অর্থ ও শানে নুযূল বর্ণনা করে সাঈদ ইবনে যুবাইর হতে এবং তিনি ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, “ওয়ালিদ ইবনে উকবা হযরত আলীকে বলল : আমার তরবারী তোমার তরবারী হতে ধারালো, জিহ্বা তোমা হতে প্রশস্ত এবং সৈন্যবাহিনী অধিক শক্তিশালী। হযরত আলী তাকে বললেন : তুমি ফাসিক। ” তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ও আলী (আ.)- কে মুমিন ও ওয়ালিদকে ফাসিক বলে উল্লেখ করা হয়।

৮৭। তওবা : ১৯। এ আয়াতটি হযরত আলী, তাঁর চাচা আব্বাস এবং তালহা ইবনে শায়বা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একবার তালহা গর্ব করে বললেন, “আমি কাবার রক্ষণাবেক্ষণকারী, কাবার চাবি আমার হাতেই থাকে। ” হযরত আব্বাস বললেন, “আমি হাজীদের পানি পান করাই ও খেদমত করি, তাই আমি ে ষ্ঠ।” হযরত আলী বললেন, “আপনারা কি বলছেন, আমি আপনাদের সবার হতে ছয় মাস পূর্বে রাসূলের সঙ্গে নামায পড়েছি এবং তাঁর সঙ্গে জিহাদ করেছি। ” তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ওয়াহেদী এ আয়াতের অর্থ ও শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে হাসান বসরী, শাবী ও কুরতুবী হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ ইবনে সিরিন ও মুররাহ্ হামাদানী বর্ণনা করেছেন, “হযরত আলী তাঁর চাচা আব্বাসকে বললেন : কেন হিজরত করে রাসূলের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন না? আব্বাস বললেন : হিজরতের থেকে উত্তম কাজ কি আমি করছি না? আমি হাজীদের পানি পান করাই ও কাবা ঘরের মেরামতের কাজ করি। আমি কি হিজরত হতে উত্তম কাজ করছি না? তখন উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

৮৮। সূরা বাকারা : ২০৭। হাকিম নিশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক ’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৪র্থ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, “আলী (আ.) তাঁর জীবনকে রাসূলের জন্য বিকিয়ে দিয়েছেন (হিজরতের রাত্রিতে রাসূলের পোষাক পরিধান করে তাঁর বিছানায় শয়ন করে মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিলেন)। ” হাকিম, বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসের বিশু তার শর্ত অনুযায়ী এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন যদিও তাঁরা এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। যুহরী তাঁর তালখিসুল মুসতাদরাকে হাদীসটির সত্যতাকে স্বীকার করেছেন। হাকিম নিশাবুরী তাঁর মুসতাদরাকের ঐ পৃষ্ঠাতেই হযরত আলী ইবনুল হুসাইন (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, “সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের জীবনকে বিক্রি করেন তিনি আলী ইবনে আবি তালিব, কারণ তিনি রাসূলের বিছানায় শয়ন করেছিলেন। ” অতঃপর আলী (আ.) সম্পর্কে একটি কবিতা পাঠ করেন যার প্রথমে বলা হয়েছে-

وقيـــت بنفســـي خـــير مـــن وطـــئ الحصـــا و مـــن طـــاف بالبيـــت العتيـــق و بـــالحجر

নিজের জীবনের বিনিময়ে পৃথিবীর ওপর বিচরণকারী ৎ ষ্ঠ ব্যক্তি যিনি কাবাকে তাওয়াফ করেছেন ও হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করেছেন তাঁর জীবনকে রক্ষা করেছি।

৮৯। মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ হযরত ইবনে আব্বাস হতে ‘যারা তাদের সম্পদ হতে দান কর ‘ (সূরা বাকারা : ২৭৪) আয়াতটির ব্যাপারে বলেছেন, “এটি আলী ইবনে আবি তালিবের শানে নাযিল হয়েছে। কারণ আলীর নিকট চার দিরহাম ছিল যার একটিকে রাত্রিতে, অপরটি দিনে, তৃতীয়টি গোপনে এবং চতুর্থটি প্রকাশ্যে দান করেছিলেন। ” ওয়াহেদী তাঁর আসবাবুন নুযূল গ্রন্থে হাদীসটি ইবনে আব্বাস হতে এবং মুহাদ্দিস কালবী হতে কিছু বর্ধনসহ বর্ণনা করেছেন।

৯০। সূরা জুমার : ৩৩।

‘ যে সত্য নিয়ে আগমন করেছে ’ কথাটিতে রাসূলের প্রতি এবং ‘যে তাঁকে সত্য প্রতিপন্ন করেছে ’ বলতে ইমাম আলীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইমাম বাকির, ইমাম সাদিক, ইমাম মূসা এবং ইমাম রেযা (আ.) ছাড়াও ইবনে আব্বাস, মুহাম্মদ হানাফিয়া, আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসান, যাঈদ ইবনে আলী ইবনুল হুসাইন এবং ইমাম সাদিকের পুত্র আলীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) এ আয়াতের মাধ্যমে সব সময় নিজের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতেন। ইবনে মাগাযেলী শাফেয়ী তাঁর ‘মানাকিব ’ গ্রন্থে মুজাহিদ হতে নকল করেছেন ও বলেছেন, “ ‘যে সত্য নিয়ে এসেছে ’ বলতে মুহাম্মদ (সা.) এবং ‘যে তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে ’ বলতে আলীকে বুঝানো হয়েছে। ” ইবনে মারদুইয়া ও আবু নাঈমও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৯১। তুর : ২১। হাকিম নিশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক ’ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪৬৮ পৃষ্ঠায় সূরা তুরের তাফসীরে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন (الحقنا بهم ذريتهم) অর্থাৎ “তাদের বংশধরদের মধ্য হতে তাদের সন্তানদেরও তাদের সঙ্গে মিলিত করবো ” আয়াতটিতে বলা হয়েছে যদিও মুমিন ব্যক্তির সন্তানগণ আমলের ক্ষেত্রে তার থেকে কম হয় তদুপরি আল্লাহ্ তাদের আমলকে উন্নীত করে (তাদের মর্যাদাকে বৃি করে) তার সঙ্গে মিলিত করবেন।

৯২। ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর ‘আস- সাওয়ায়েক ’ গ্রন্থের ১১ অধ্যায়ে বলেছেন একদল মুফাসসির ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, ‘আলে ইয়াসিনের ওপর সালাম ’ অর্থ আলে মুহাম্মদের ওপর সালাম। কালবীও ত প বলেছেন বলে ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন। ফখরে রাজী বলেন, “আহলে বাইত পাঁচটি ক্ষেত্রে রাসূলের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছেন, এই পাঁচ আয়াত হলো- (১) السلام عليك يا أيّها النّبِيّ অর্থাৎ হে নবী! আপনার ওপর সালাম (২) سلام على آلياسين অর্থাৎ আলে ইয়াসিনের ওপর সালাম (৩) নামাযের তাশাহহুদ (৪) আল্লাহ্ যখন তাঁদের طاهر অর্থাৎ পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন ও বলেছেন و يطهّركم تطهيرًا এবং (৫) তাঁদেরকে যেখানে ভালবাসতে নির্দেশ দিয়েছেন ও সদকা তাঁদের জন্য হারাম করেছেন فاتبعوني يحببكم الله এবং (قل لا أسئلكم عليه أجرا إلّا المودّة في القربى)।

৯৩। আহযাব : ৫৬।

বুখারী তাঁর ‘তাফসীরুল কোরআন ’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে সূরা আহযাবের উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে এবং মুসলিম তাঁর নবীর ওপর দরূদের আলোচনায় (কিতাবুস্ সালাওয়াত ১ম খণ্ডে) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৯৪। আস- সাওয়ায়েক, অধ্যায় ১১, পৃষ্ঠা ৮৭।

৯৫। সা’লাবী তাঁর ‘তাফসীরে কাবীর ’ - এ এই আয়াতের তাফসীরে মহানবী (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, “তুবা বেহেশতী একটি বৃক্ষের নাম যা আমার বেহেশতী ঘরে রয়েছে, তার শাখাগুলো বেহেশতবাসীদের ঘরে ঘরে প্রসারিত। একজন প্রশ্ন করল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি বলেছিলেন বৃক্ষটি আলীর ঘরে। তখন রাসূল (সা.) বললেন : আলীর ঘর ও আমার ঘর কি ভিন্ন? বরং আমাদের ঘর একই। ”

৯৬। মরহুম কুলাইনী সহীহ সনদে সালিম ইবনে কায়িস হতে বর্ণনা করেছেন, ইমাম বাকির (আ.)- কে ثمّ اورثنا الكتاب আয়াতটি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন السّابق بالخيرات বলতে ইমাম

এবং مقتصد বলতে ইমামকে যে চিনেছে ও ظالم لنفسه বলতে যারা ইমামকে চিনে নি। একই অর্থবহ হাদীস ইমাম রেযা, ইমাম কাযেম এবং ইমাম সাদিক হতেও বর্ণিত হয়েছে। সাদুক এবং অন্যান্য শিয়া হাদীসবেত্তাগণও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে মারদুইয়া হযরত আলী (আ.) হতে একই অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এজন্য 'তানযিলুল আয়াত ' ও 'গায়াতুল মারাম ' গ্রন্থে লক্ষ্য করুন।

৯৭। ইবনে হাজার তাঁর 'আস- সাওয়ায়েক ' গ্রন্থের ৩য় পর্বের ৯ম অধ্যায়ে ৭৬ পৃষ্ঠায় এবং ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে ইবনে আব্বাস হতে এটি উ ৃ ত করেছেন।

৯৮। যুক্তিশাস্ত্রের যে দু'টি প্রস্তাব হতে ফলাফল পাওয়া যায় তাদেরকে প্রতিজ্ঞা বলা হয়।

৯৯। গ্রন্থটিতে যে সকল আয়াত আহলে বাইতের শানে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

১০০। সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহকে একত্রে সুনানে আরবাআহ্ বলা হয়।

১০১। মুখতাসারু জামেয়ি বায়ানিল ইলম ও ফাজলাহু- আল্লামাহ্ আহমাদ ইবনে উমর মাহমাছানী বৈরুতী।

১০২। علم جرح و تعديل

১০৩। ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ ' গ্রন্থের তাবেয়ীন অধ্যায়ে (১৬৫ পৃষ্ঠায়) এদের পরিচিতি দান করেছেন।

১০৪। ইবনে আদী বলেছেন, "হুসাইন ইবনে আলী সাকুনী কুফী, মুহাম্মদ ইবনে হাসান সাকুনী, সালিহ ইবনে আসওয়াদ আ'মাশ হতে এবং তিনি আতিয়া হতে আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারীকে জিজ্ঞেস করলাম : আপনাদের মধ্যে আলীর মর্যাদা কিরূপ? তিনি বললেন : তিনি ে ষ্ঠ মানুষ। "

যাহাবী এ হাদীসটি মিযান গ্রন্থে সালিহ্ ইবনে আসওয়াদের পরিচিতি পর্বে উল্লেখ করেছেন। যদিও সালিহ্ আহলে বাইত বিদ্বেষী তদুপরি সেখানে শুধু এটুকু বলেছেন যে, সম্ভবত তাঁর সময়ের ে ষ্ঠ মানুষ।

১০৫। 'আলী কত ভাল মানুষ ' যদিও আলীর প্রতি প্রশংসাবাণী তদুপরি এ কথাটি দ্বারা আলী (আ.)- এর মর্যাদা কোনক্রমেই বোঝানো হয় না এবং কথাটি এমন একজন ব্যক্তির মুখ হতে এসেছে যে ইমামের শত্রু। এক্ষেত্রে শারিকের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া আলী (আ.)- এর ব্যাপারে সাধারণের ধারণার কারণে। কেননা ইমাম আলীর ব্যাপারে তাঁর শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তির এ কথা 'আলী কত ভাল মানুষ ' এবং নিজের সম্পর্কে আল্লাহর কথা فقدرنا فنعم القادرون 'আমরা পরিমাণ নির্ধারণ করেছি, পরিমাণ নির্ধারণকারীরা কত উত্তম ' (সূরা মুরসালাত : ২৩) ও আলী সম্পর্কে نعم العبد انه اواب 'সে কত উত্তম মানুষ কারণ সে কঠিন তওবাকারী ' (সূরা সোয়াদ : ৩০) কথাটির মধ্যে কত পার্থক্য? কারণ এ কথার সাথে আল্লাহ্ 'নিশ্চয়ই সে তওবাকারী ' যোগ করেছেন উত্তম মানুষ হবার যুক্তি হিসেবে।

১০৬। তাবারীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং যাহাবী ইবাদ ইবনে ইয়াকুবের পরিচিতি পর্বে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন।

১০৭। তিনি হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে মুরতাদদের বিরু ও যু অংশ গ্রহণ করেছেন বলে ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর 'আস- সাওয়ায়েক ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১০৮। মিযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে রাশিদ হাজরী পরিচয় পর্বে যাহাবী বর্ণনা করেছেন, শা ' বীকে জিজ্ঞেস করা হলো, "আলীর বন্ধুদের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করেছো অথচ তাদের কেন গালি দাও?" তিনি বললেন, "কার নিকট?" বলা হলো, হারিস ও সা ' সাআহ্ হতে। তিনি জবাবে বললেন, "সা ' সাআহ্ তুখোড় বক্তা, তাঁর নিকট আমি শুধু বক্তব্য শিক্ষা করেছি ও হারিস অংকশাস্ত্রবিদ, তাঁর নিকট আমি হিসাব শিক্ষা লাভ করেছি। "

১০৯। আল কামিল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৩৭।

১১০। আল কামিল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯১।

১১১। যে সকল ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফ রয়েছে তাঁরা এ সকল হাদীসের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একমত ও তাঁদের সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে আগ্রহ সহকারে তা বর্ণনা করেছেন। শুধু আহলে বাইতের প্রতি কটুভাষী ও বিদ্বেষপোষণকারী নাসেবী ও খারেজীরা এ সকল হাদীস বিরোধী। সিহাহর লেখকগণ তাঁর হতে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তার একটি হলো আহমাদ ইবনে আযহার হতে, তিনি বলেছেন : যুহরী হতে শুনেছি ও তিনি উবায়দুল্লাহ্ হতে এবং উবায়দুল্লাহ্, ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) একদিন আলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন : যে সকল ব্যক্তি তোমাকে ভালবাসে তারা আমাকেও ভালবাসে এবং তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের নেতা আর যারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তারা মূলত আমার প্রতিও বিদ্বেষ পোষণ করে। তোমার শত্রু আল্লাহরই শত্রু ও তোমার প্রতি ভালবাসা পোষণকারী আল্লাহর প্রতিও ভালবাসা পোষণকারী। ধ্বংস সে ব্যক্তির যে তোমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে। "এ হাদীসটি হাকিম নিশাবুরী তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করে বলেছেন বুখারী ও মুসলিমের মতে হাদীসটি সহীহ।

আবদুর রাজ্জাক আরো বলেছেন তিনি মুয়াম্মার হতে ও তিনি ইবনে নাজী হতে এবং নাজী মুজাহিদ সূত্রে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "আমি ফাতিমাকে তাঁর পিতার নিকট বলতে শুনেছি : আমাকে একজন দরিদ্র ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিচ্ছেন? রাসূল (সা.) বললেন : তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও, মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দুই ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন যার প্রথমজন আমি ও দ্বিতীয়জন তোমার স্বামী।" এ হাদীসটি হাকিম নিশাবুরী তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২৯ পৃষ্ঠায় অবিচ্ছিন্ন সূত্রে সারিহ ইবনে ইউনুস, আবু হাফস, আ'মাশ, আবু সালিহ এবং তিনি আবু হুরাইরা হতে বর্ণনা করেছেন।

১১২। যেমন আহলে বাইতের শত্রু মুয়াবিয়া সম্পর্কে আবদুর রাজ্জাক ইবনে উয়াইনা হতে ও তিনি আলী ইবনে যাইদ ইবনে জাযআন এবং তিনি আবি নাছরাহ হতে আবু সাঈদ খুদরীর সূত্রে

অবিচ্ছিন্ন হাদীস নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, "যখন মুয়াবিয়াকে আমার মিম্বারে বক্তব্য দিতে দেখবে তখন তাকে হত্যা করবে।"

১১৩। 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থের আবদুর রাজ্জাক পরিচয় পর্ব।

১১৪। 'মিযানুল ই'তিদাল' আবদুর রাজ্জাক পরিচিতি পর্ব।

১১৫। মা'আরিফ, পৃষ্ঠা ১৭৭।

১১৬। মা'আরিফ, পৃষ্ঠা ২০৬।

১১৭। তাঁর সংকলিত হাদীস নকল করার অনুমতি প্রাপ্ত।

১১৮। অনেকে ভুল করে তাঁকে হাযেম বলেছেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত নাম খাযেম (خازم)।

১১৯। 'মুখতাসার' গ্রন্থে।

২২০। তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৫।

২২১। এটি 'হাযরামীর ফিতনা' বলে প্রচলিত।

২২২। ২২ পৃষ্ঠা।

২২৩। ১১৬ পৃষ্ঠা।

২২৪। 'শারহু নাহজুল বালাগাহ্ ইবনে আবিল হাদীদ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ২৬৩ পৃষ্ঠা (মিশর হতে প্রকাশিত, পুরাতন ছাপা)। কিন্তু 'নাকজুল উসমানিয়া' গ্রন্থটি একটি অনন্য গ্রন্থ যা যে কোন সত্যান্বেষী মানুষের জন্য নির্দেশক। এ বিষয়টি ইবনে আবিল হাদীদের 'শারহু নাহজুল বালাগাহ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ২৫৭ হতে ২৮১ পৃষ্ঠায় 'কাসিয়াহ্' নামক খুতবার শেষে বর্ণিত হয়েছে।

২২৫। 'সীরায়ে হালাবী' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৮১ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত অধ্যায়ে দেখুন। সুতরাং ইবনে তাইমিয়ার গোঁড়ামীপূর্ণ বক্তব্য কোনক্রমেই ইনসাফপূর্ণ নয়। এ হাদীসটি মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল তাঁর 'জারিদাতুস্ সিয়াসাত' সাময়িকীর ২য় ইস্যুর ৫ম পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে এনেছেন। (১৩50 হিজরীর ১২ জিলক্বদে প্রকাশিত সাময়িকীর ২৭৫১ নং সংযুক্তিতে) এছাড়া ৪র্থ ইস্যুর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ২৭৮৫ নং সংযুক্তিতে এ হাদীসটি তিনি সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, আবদুল্লাহ্

ইবনে আহমাদের যিয়াদাতে মুসনাদ, ইবনে হাজার হাইসামীর জামযূল ফাওয়ায়েদ, ইবনে কুতাইবার উয়ুনুল আখবার, আহমাদ ইবনে আবদে রাব্বিহর আকদুল ফারিদ, আমর ইবনে বাহার জাহেয বনি হাশিম হতে এবং আবু ইসহাক সা'লাবীর তাফসীরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ব্রিটিশ লেখক জর্জের গ্রন্থ যা আরবীতে 'মাকালাত ফিল ইসলাম ' নামে অনূদিত হয়েছে (হাশিম আরাবী নামক প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টান কর্তৃক অনূদিত) সেই গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে। (ষষ্ঠ প্রকাশ)

হাদীসটি এত প্রসি যে, বিভিন্ন বিদেশী গ্রন্থকারও তাঁদের বিভিন্ন ভাষায় (যেমন ফরাসী, ইংরেজী ও জার্মান) গ্রন্থে এনেছেন। টমাস কার্লাইল তাঁর গ্রন্থে এটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

২২৬। ৩৯২ পৃষ্ঠার ৬০০৮ নং হাদীসটি ইবনে জারীর হতে বর্ণিত হয়েছে, তা দেখুন। ৩৯৬ পৃষ্ঠার ৬০৪৫ নং হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ সূত্রে জিয়া মুকাদ্দাসীর আল মুখতারাহ হতে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি তাহাভী ও ইবনে জারীর সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। ৩৯৭ পৃষ্ঠার ৬০৫৬ নং হাদীস ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে মারদুইয়া, আবু নাঈম ও বাইহাকী তাঁর শো'বাল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ৪০১ পৃষ্ঠার ৬১০২ নং হাদীসটি ইবনে মারদুইয়া হতে এবং ৪০৮ পৃষ্ঠার ৬১৫৫ নং হাদীসটি আহমাদ ইবনে হাম্বলের মুসনাদ গ্রন্থ হতে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবিল হাদীদ প্রণীত নাহজুল বালাগাহর শারহ (ব্যাখ্যা) গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ২৫৫ পৃষ্ঠায় 'কাসিয়াহ্ ' নামক খুতবার শেষে এ হাদীসটি পূর্ণাঙ্গভাবে এনেছেন।

২২৭। যদি কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯৬ পৃষ্ঠায় ৬০৪৫ নং হাদীসটি দেখেন তাহলে তাতে দেখবেন ইবনে জারীর এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। তাছাড়া মুসনাদে আহমাদের ৫ম খণ্ডের ৪৪ পৃষ্ঠার পাদটিকায় ইবনে জারীর যে এটিকে বিশু বলেছেন তা পাবেন। আবু জা'ফর আসকাফী তাঁর 'নাকজুল উসমানিয়া ' য় হাদীসটিকে সন্দেহাতীতভাবে বিশু বলেছেন। (শারহে নাহজুল বালাগাহ্ ইবনে আবিল হাদীদ, ৩য় খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা, মিশর হতে প্রকাশিত)

২২৮। বুখারী ও মুসলিম তাঁদের সহীহতে তাঁর হাদীস দলিল উপস্থাপনে ব্যবহার করেছেন এবং দু'জনই শিয়া হতে তাঁর হাদীস বর্ণনার কথা বলেছেন। তাছাড়া বুখারীর মতে তিনি আবদুল

আযীয ইবনে আবি সালামাহ্ হতে ও মুসলিমের মতে তিনি যুহাইর ইবনে মুয়াবিয়া এবং হাম্মাদ ইবনে সালামাহ্ হতে হাদীস   বণ করেছেন। বুখারীর বর্ণনানুসারে মুহাম্মদ ইবনে হাতেম ইবনে বাজিঈ ও মুসলিমের বর্ণনানুসারে হারুন ইবনে আবদুল্লাহ্, নাকিদ, ইবনে আবি শাইবা এবং যুহাইর তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২২৯। মুসলিম তাঁর সহীহতে তাঁর হাদীস দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন যা আমরা ১৬ নং পত্রে উল্লেখ করেছি।

২৩০। বুখারী ও মুসলিম তাঁর হাদীস যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন, ১৬ নং পত্রে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

২৩১। বুখারী তাঁর হাদীস দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন, ১৬ নং পত্রে দেখুন।

২৩২। তাঁর নাম ইবাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর ইবনে আওয়াম কুরশী আমাদী। বুখারী ও মুসলিম তাঁর হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি হযরত আবু বকরের দুই কন্যা হযরত আয়েশা ও আসমা বিনতে আবু বকর হতে হাদীস শুনেছেন।

২৩৩। পৃষ্ঠা ২৫। বুখারী নিজেই বলেছেন, "অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে যা আমি বুখারীতে উল্লেখ করি নি।"

২৩৪। সূরা আহযাব : ৩৩।

২৩৫। সূরা আ'রাফ : ১৪২।

২৩৬। সূরা ত্বাহা : ২৯।

২৩৭। সূরা মায়েদাহ্ : ৬৭।

২৩৮। ছাব্বিশতম পত্রে এটি আমরা উল্লেখ করেছি।

২৩৯। আস- সাওয়ায়েক, পৃষ্ঠা ২৯।

২৪০। মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা, ফাজায়েলে আলী অধ্যায়।

২৪১। হাকিম তাঁর ‘মুসতাদরাক ’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১০ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, “বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মতে হাদীসটি সহীহ। ” যাহাবী ‘তালখিসে মুসতাদরাক ’ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২৪২। মাকাসিদের ৫ম মাকসাদের ১১ অধ্যায়ে ১০৭ পৃষ্ঠায় ১৪ নং আয়াতের আলোচনায়।

২৪৩। মানাকিবে আলী (আ.)।

২৪৪। ফাজায়েলে আলী ও তাবুকের যু ।

২৪৫। ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮।

২৪৬। ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৩।

২৪৭। ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮।

২৪৮। ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৯।

২৪৯। ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৩, ১৭৫, ১৮২ ও ১৮৫।

২৫০। মুসনাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩১।

২৫১। মুসনাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৯ ও ৪৩৮।

২৫২। ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২।

২৫৩। আস- সাওয়ায়েক, পৃষ্ঠা ১০৭, ৫ম মাকসাদ, ১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

২৫৪। যুক্ত- বিশেষায়ক হলো যে বাক্যে বিশেষায়ক ও বিশেষিত অংশ একই ে ণীভুক্ত হয়।

২৫৫। হযরত উম্মে সালিম, মালহান ইবনে খালিদ আনসারীর কন্যা। পিতা মালহান ও ভ্রাতা হারাম ইবনে মালহান রাসূলের সামনে শহীদ হন। তিনি রাসূল (সা.) হতে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ইবনে আব্বাস, যায়িদ ইবনে সাবিত, আবু সালামাহ্ ইবনে আবদুর রহমান ও তদীয় পুত্র আনাস ও অন্যান্যরা তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইসলামের দিকে আহবানকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অগ্রগামী দলের অন্তর্ভুক্ত। তিনি জাহেলীয়াতের যুগে মালিক ইবনে নাজরের স্ত্রী ছিলেন। আনাস ইবনে মালিক এ দম্পতিরই সন্তান। ইসলামের আগমনের পর তিনি তাঁর স্বামীকে ইসলামের দিকে আহবান করেন কিন্তু সে

ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে ও তাঁকে ত্যাগ করে সিরিয়া গমন করে এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। উম্মে সালিম তাঁর

সন্তান আনাসকে উপদেশ দিয়ে রাসূলের খেদমতে নিয়োজিত করেন। তখন তার বয়স ছিল দশ বছর। নবী (সা.) এই মাতার সম্মানে তাকে খাদেম হিসেবে গ্রহণ করেন। আরবের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি এ অজুহাতে তা প্রত্যাখ্যান করেন যে, আনাস প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিয়ে করবেন না । আনাস তাই সব সময়ে বলতেন, "আমার মাতাকে আল্লাহ্ উত্তম পুরস্কার দিন। কারণ তিনি আমাকে উত্তমরূপে মানুষ করেছেন।" আবু তালহা আনসারী এ নারীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন তিনি এ নারীকে বিয়ের প্রস্তাব করেন তখন তিনি বলেন, "যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করব।"

আবু তালহা তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং উম্মে সালিম তাঁর মোহরানা এ ইসলাম গ্রহণকেই ধরে নেন। আবু তালহার ঔরসে উম্মে সালিমের গর্ভে যে সন্তান হয় সে অকালেই মৃত্যুবরণ করে। তিনি সবাইকে বলেন তাঁর পুত্রের মৃত্যু সংবাদ যেন তাঁর পূর্বে কেউ তাঁর স্বামীকে না জানায়। আবু তালহা বাড়ীতে এসে পুত্রের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যেখানে সে আছে শান্তিতে আছে। আবু তালহা ভাবলেন পুত্র ঘুমিয়েছে। তাই তিনি যথারীতি খাদ্য গ্রহণ করে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে ঘুমাতে গেলেন। কারণ স্ত্রী সুসজ্জিত ও উৎফুল্ল ছিল এবং বোঝার উপায় ছিল না যে, পুত্র মৃত্যুবরণ করেছে। সকাল বেলা তিনি তাঁর স্বামীকে বু মত্তার সাথে পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। আবু তালহা রাসূলের কাছে এসে পুরো ঘটনা খুলে বললেন। রাসূল (সা.) বললেন, "এই রাত তোমাদের জন্য শুভ হোক।" উম্মে সালিম বলেন, "রাসূল (সা.) আমার জন্য দীর্ঘ দোয়া করলেন।" ঐ রাতের মিলনেই আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি তালহা তাঁর গর্ভে আসে যিনি বিশিষ্ট ফকীহ্ ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি তালহার পিতা। ইসহাকের অন্যান্য পুত্ররাও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

উম্মে সালিম রাসূলের সঙ্গে যু ও যোগদান করেছিলেন। উহুদের যু তিনি একটি তরবারী নিয়ে গিয়েছিলেন মুশরিকদের কেউ তাঁর নিকটবর্তী হলে তাকে হত্যা করার জন্য। তিনি এমন

এক মহিলা যিনি ইসলামের জন্য অনেক কষ্ট ও মুসিবত সহ্য করেছেন। আমি এরূপ অন্য কোন নারীর কথা জানি না যে, রাসূল তাঁর গৃহে উপহার নিয়ে যেতেন। তিনি রাসূলের মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন।

২৫৬। ইমাম নাসায়ী এ হাদীসটি তাঁর খাসায়েসুল 'আলাভীয়া' গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

২৫৭। হাকিম তাঁর 'আলকুনা' গ্রন্থে, শীরাযী তাঁর 'আল কাব' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাসান ইবনে বদর ও নাজ্জারও হাদীসটি নকল করেছেন। কানযুল উম্মাল গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯৫ পৃষ্ঠার ৬০২৯ এবং ৬০৩২ নং হাদীস হিসেবে এটি এসেছে।

২৫৮। ইবনে আবদুল বার তাঁর 'ইসতিয়াব' গ্রন্থে হযরত আলীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "রাসূল (সা.) মুহাজিরদের মধ্যে প্রথম ভ্রাতৃত্বের আকদ পাঠ করেন, অতঃপর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দেন এবং উভয় স্থানেই হযরত আলীকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার ভাই (أنت أخي في الدّنيا و الآخرة)। এ ঘটনার ইতিহাস, সীরাত ও হাদীস গ্রন্থসমূহে এসেছে। প্রথম ভ্রাতৃবন্ধনের ঘটনা হালাবীর সীরাত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৬ পৃষ্ঠায় ও দ্বিতীয় ভ্রাতৃবন্ধনের ঘটনাকে তিনি ঐ গ্রন্থেরই ১২০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। উভয় স্থানে লক্ষ্য করলে দেখবেন ঘটনার বর্ণনা অন্যদের ওপর আলীর শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করে। যাইনী দাহলান হালাবীর মত তাঁর সীরাত গ্রন্থে উভয় ভ্রাতৃবন্ধনের দিনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং দ্বিতীয় ভ্রাতৃবন্ধন যে হিজরতের ৫ম মাসে সংঘটিত হয়েছিল তা স্বীকার করেছেন।

নির্ভরযোগ্য কয়েকজন বর্ণনাকারী যেমন আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইবনে আসাকির ও মুত্তাকী আল হিন্দী তাঁদের গ্রন্থে হাদীসটি এনেছেন। মুত্তাকী হিন্দী তাঁর 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৪০ পৃষ্ঠার প্রথমে ও ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠায় আহমাদ ইবনে হাম্বলের 'মানাকিবে আলী' অধ্যায়ের সূত্রে যথাক্রমে ৯১৮ ও ৫৯১২ নং হাদীস হিসেবে এনেছেন।

২৫৯। এ হাদীসটি রাবীদের সত্যায়নকারী একদল হাদীসবেত্তা ইবনে আদী ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন। এসব সত্যায়নকারী হাদীসবেত্তার অন্যতম মুত্তাকী আল হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের ৫ম খণ্ডের ৪১ পৃষ্ঠার শুরুতে ৯১৯ নং হাদীস হিসেবে এটি এনেছেন। সেখানে দেখতে পারেন।

২৬০। সূরা হিজর : ৪৭।

২৬১। মুত্তাকী হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মাল এবং যাহাবী তাঁর মুনতাখাবে কানযুল উম্মালে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমাদের পঞ্চম খণ্ডের ৩১ নম্বর পৃষ্ঠার টীকায় হাদীসটি আমরা যেভাবে বর্ণনা করেছি সেভাবেই এসেছে। হাদীসটির এ অংশ 'আমার প্রতি অভিমান করেছ' কথাটি কতটা মোলায়েম, এতে কতটা উষ্ণতা, আবেগ ও পিতৃসুলভ ভালবাসা জড়িয়ে রয়েছে! যদি বলা হয় দ্বিতীয়বার কেন আলী এরূপ সন্দেহে পতিত হয়েছেন যদিও প্রথমবার রাসূল এমন করেছিলেন ও পরে আলীর নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছিল যে, রাসূল নিজের জন্যই এমনটি করেছেন। কেন তিনি দ্বিতীয়বারের ঘটনাটির সঙ্গে প্রথমবারের ঘটনাটিকে মিলেয়ে দেখলেন না? উত্তর হলো দ্বিতীয়বারকে প্রথমবারের সঙ্গে তুলনা করার মত অবস্থা ছিল না কারণ প্রথমবার শুধু মুহাজিরদের মধ্যে রাসূল ভ্রাতৃত্বের আকদ পাঠ করেন অথচ দ্বিতীয়বার মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের আকদ পড়েন। সেখানে প্রত্যেক মুহাজিরের সঙ্গে একজন আনসার ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত হয়। রাসূল ও আলী দু'জনই মুহাজির ছিলেন তাই আলী (আ.) সন্দেহে পতিত হন যে রাসূল (সা.) আর তাঁর ভাই থাকছেন না, বরং আনসার হতে তাঁর ভাই নির্বাচিত হবে। যেহেতু নবী (সা.) আলী (আ.) ও আনসারদের মধ্য হতে কাউকে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা দেন নি সেহেতু আলীর মধ্যে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাঁর জন্য এর চেয়ে উত্তম কিছু নির্ধারণ করেছিলেন এবং তা সেদিনের ধারার বিপরীতে তাঁর ও নবীর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

২৬২। ইয়ানাবিয়ুল মাওয়াদ্দাহ্ গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়ে আহলে বাইতের মর্যাদা বর্ণনায় হাদীসটি এসেছে।

২৬৩। ইয়ানাবিয়ুল মাওয়াদ্দাহ্, ১৭তম অধ্যায়।

২৬৪। ‘মুসতাদরাক ’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৬৫ ও ১৬৭ পৃষ্ঠায় হাকিম নিশাবুরী হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, “সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে হাদীসটি সহীহ এবং মুহাদ্দিসগণও সহীহ সূত্রে নবী হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ” আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদের প্রথম খণ্ডে হাদীসটি এনেছেন। ইবনে আবদুল বার ইমাম হাসান (আ.)- এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর ‘ইসতিয়াব ’ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যাহাবী তাঁর তালখিসুল মুসতাদরাক গ্রন্থে হাদীসটি সহীহ বলে স্বীকার করেছেন কিন্তু বাস্তব কর্মে এই উম্মতের হারুন শাব্বার ও শাব্বির হতে মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন। বাগাভী তাঁর মু’জাম গ্রন্থে এবং আবদুল গণী তাঁর আল ই’দ্বাহ গ্রন্থেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ‘সাওয়ায়েকুল মুহরাকাহ্ ’ গ্রন্থে হযরত সালমান ফারসী হতে ও ইবনে আসাকিরও তাঁর হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২৬৫। হাকিম নিশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক ’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৪ পৃষ্ঠায় দু’টি সূত্রে ইবনে উমর হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ও বলেছেন বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীস দুটি সহীহ। যাহাবী তাঁর ‘তালখিসুল মুসতাদরাক ’ গ্রন্থে হাদীসটি সহীহ ও বিশু   বলেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর ‘সাওয়ায়েকুল মুহরাকাহ্ ’ - এর ৭২ পৃষ্ঠায় (‘বাব ’ অধ্যায়ের সাত নম্বর হাদীস) তিরমিযীর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যাঁরাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাঁরাই নির্ভরযোগ্য সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন।

২৬৬। হাকিম নিশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক ’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠায়, ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর ‘সাওয়ায়েকুল মুহরাকাহ্ ’ তে এবং যে কেউ হযরত ফাতিমা (আ.)- এর বিবাহের ঘটনা বর্ণনা করেছেন তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যাহাবী তাঁর ‘তালখিস ’ গ্রন্থে হাদীসটিকে বিশু   বলেছেন।

২৬৭। শিরাজী তাঁর ‘আল কাব ’ গ্রন্থে, ইবনে নাজ্জার ইবনে উমর হতে এবং মুত্তাকী আল হিন্দী তাঁর ‘কানযুল উম্মাল ’ - এ এবং যাহাবী তাঁর ‘মুনতাখাবে কানযুল উম্মাল ’ - এর (যা মুসনাদে

আহমাদের ব্যাখ্যাকারী গ্রন্থ হিসেবে পাদটিকায় এসেছে) ৫ম খণ্ডের ৩৩ পৃষ্ঠার পাদটিকায় হাদীসটি এনেছেন।

২৬৮। ইবনে আবদুল বার তাঁর 'ইসতিয়াব' গ্রন্থে হযরত আলী (আ.)- এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে আব্বাস হতে হাদীসটি এনেছেন।

২৬৯। খাতীব বাগদাদী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুত্তাকী হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪০২ পৃষ্ঠায় ৬১০৫ নম্বর হাদীস হিসেবে এটি এনেছেন।

২৭০। হাকিম নিশাবুরী তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যাহাবীও তাঁর 'তালখিস' গ্রন্থে উপরোক্ত শর্তানুসারে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

২৭১। তাবরানী তাঁর 'কাবীর' গ্রন্থে ইবনে উমর সূত্রে এবং মুত্তাকী হিন্দী তাঁর 'কানযুল উম্মাল'ও যাহাবী তাঁর 'মুনতাখাবে কানযুল উম্মাল' - এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদের তাফসীরের পাদটিকায় যে মুনতাখাব এসেছে তার ৫ম খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

২৭২। ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের দ্বিতীয় অংশে এবং 'কানযুল উম্মাল' - এর ৪র্থ খণ্ডের ৫৫ পৃষ্ঠায় হাদীসটি রয়েছে।

২৭৩। তাবরানী তাঁর 'আওসাত' গ্রন্থে, খাতীব বাগদাদী তাঁর 'মুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক' গ্রন্থে ও মুত্তাকী হিন্দী তাঁর 'কানযুল উম্মাল' - এ হাদীসটি এনেছেন। মুসনাদে আহমাদের ৫ম খণ্ডের ৩৫ পৃষ্ঠায় টিকার মুনতাখাবে কানযুলে এবং ইবনে আসাকিরের সূত্রে ৪৬ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

২৭৪। সুনানের লেখকগণ তাঁদের মুসনাদসমূহে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম ফখরে রাযী তাঁর তাফসীরে কাবীর গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৮৯ পৃষ্ঠায় সূরা বাকারার ২০৭ নং আয়াতের তাফসীরে উপরোক্ত হাদীস সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

২৭৫। নাসায়ী তাঁর 'খাসায়েসুল আলাভিয়া' গ্রন্থে, হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১১২ পৃষ্ঠায় এবং ইবনে আবি শাইবাহ্ ও ইবনে আবি আছেম তাঁর 'আস- সুন্নাহ্', আবু নাঈম

তাঁর ‘আল মা’রেফা ’ , মুত্তাকী হিন্দী তাঁর ‘কানযুল উম্মাল ’ - এ, মুসনাদে আহমাদের টীকায় ‘মুন্তাখাবে কানযুল উম্মাল ’ - এর ৫ম খণ্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় হাদীসটি এনেছেন।

২৭৬। ‘মুসতাদরাক ’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২৬ পৃষ্ঠায় হাদীসটি দেখুন। যাহাবী মুসতাদরাকের তালখিসে হাদীসটি বর্ণনা করে একে সহীহ বলেছেন।

২৭৭। ইবনে আবদুল বার তাঁর ‘ইসতিয়াব ’ গ্রন্থে হযরত আলীর জীবনীতে ও প্রসি   লেখকদের অনেকেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২৭৮। ইবনে সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত ’ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১ম অংশের ১৫ পৃষ্ঠায় বদর যু র ঘটনায় হাদীসটি এনেছেন।

২৭৯। দারে কুতনী তাঁর ‘মাকাসিদ ’ - এর ৫ম মাকসাদে সূরা শুরার ২৩ নং আয়াতের (مودّة في القربى) তাফসীরে ও ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর সাওয়ায়েক গ্রন্থের ১১ অধ্যায়ের ১০৭ পৃষ্ঠায় হাদীসটি এনেছেন।

২৮০। হাদীসটি বেশ দীর্ঘ ও এতে আলী (আ.)- এর কিছু ে ষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যা ছাব্বিশতম পত্রে আমরা উল্লেখ করেছি।

২৮১। ‘মুসতাদরাক ’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২৫ পৃষ্ঠায় হাদীসটি এসেছে। ‘সাওয়ায়েক ’ গ্রন্থের ৩য় পর্বের ৯ম অধ্যায়ে ৭৬ পৃষ্ঠায় আবু ইয়ালী হতে এটি বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে ২য় খণ্ডের ২৬ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর হতে কাছাকাছি ও সদৃশ শব্দের ব্যবহারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া হযরত উমর ও অন্যান্য সূত্রেও তিনি হাদীসটি এনেছেন।

২৮২। যেমনটি ‘মুসতাদরাক ’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১১৭ পৃষ্ঠায় এসেছে। এ হাদীসটি সহীহ সুনান গ্রন্থসমূহে এসেছে। আহলে সুন্নাহর নির্ভরযোগ্য রাবীরা তা বর্ণনা করেছেন।

২৮৩। আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদের ৪র্থ খণ্ডের ৩৬৯ পৃষ্ঠায় এবং ‘কানযুল উম্মাল ’ ও মুনতাখাবে কানযুল উম্মাল ’ -এ হাদীসটি এসেছে। মুসনাদের ৫ম খণ্ডের ২৯ পৃষ্ঠার টীকায় মুনতাখাবে কানযুল উম্মালে দেখুন।

২৮৪। মুত্তাকী হিন্দী মুসনাদের উপরোক্ত টীকায় এটি বর্ণনা করেছেন।

২৮৫। তিরমিযী তাঁর সহীহতে ও মুত্তাকী হিন্দী তাঁর মুনতাখাবে যেভাবে এনেছেন তা এরূপ। ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর ‘সাওয়ায়েক ’ গ্রন্থের ২য় পর্বের ৯ম অধ্যায়ে ১৩ নম্বর হাদীসে বাযযারের সূত্রে সা’দ হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঐ গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করুন।

২৮৬। শাফেয়ী মাজহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্ ও খাতীব আলী ইবনে মুহাম্মদ (ইবনে মাগাজেলী বলে প্রসি) তাঁর মানাকিব গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে এই সকল সাহাবী হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। নির্ভরযোগ্য রাবী বালখী তাঁর ইয়ানাবিয়ুল মাওয়াদ্দাহ্ গ্রন্থের ১৭ অধ্যায়ে হাদীসটি এনেছেন।

২৮৭। ইমাম আবু ইসহাক সা’লাবী তাঁর ‘তাফসীরে কাবীর ’ গ্রন্থে সূরা মায়েদাহর ৫৫ নম্বর আয়াতের তাফসীরে হযরত আবু যর হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসবেত্তা বালখীও মুসনাদে আহমদের সূত্রে হাদীসটি নকল করেছেন।

২৮৮। ‘কানযুল উম্মাল ’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ৬১৫ নং হাদীস।

২৮৯। বহুসূত্র পরম্পরায় অকাট্যভাবে বর্ণিত যাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

২৯০। সুনান লেখকদের মধ্যে কয়েকজন যেমন নাসায়ী তাঁর ‘খাসায়েসুল আলাভীয়া ’ গ্রন্থে এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদের চতুর্থ খণ্ডের ৪৩৮ পৃষ্ঠার প্রথমে ইমরান হতে এবং হাকিম নিশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক ’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১১১ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যাহাবী তাঁর ‘ তালখিসে মুসতাদরাক ’ -এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, “মুসলিমের শর্তানুসারে হাদীসটি সহীহ। ” মুত্তাকী হিন্দী তাঁর ‘কানযুল উম্মাল ’ -এর ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪০০ পৃষ্ঠায় ইবনে আবি শাইবাহ্ ও ইবনে জারির হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটি সহীহ বলে স্বীকার করেছেন।

আসকালানী তাঁর ‘আল ইসাবাহ্’ গ্রন্থে আলীর জীবনীতে তিরমিযীর সূত্রে শক্তিশালী সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামাহ্ ইবনে আবিল হাদীদ মুতাযিলী তাঁর ‘শারহে নাহজুল বালাগাহ্’ র ২য় খণ্ডের ৪৫০ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, “আবু আবদুল্লাহ্ আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে একাধিকবার এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং আলীর ফাজায়েল অধ্যায়ে তা এনেছেন।”

২৯১। রাসূল (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় আলী (আ.)- এর ওপর কাউকেই নেতা নিযুক্ত করেন নি, বরং সকল অবস্থায় আলী নেতৃত্ব দিয়েছেন ও অন্যদের বিপরীতে পতাকা ধারণ করেছেন, এমন কি হযরত আবু বকর ও হযরত উমর উসামার নেতৃত্বে গঠিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং মুতার যু   রাসূল (সা.) নিজে নির্দেশ দিয়ে এ দু’জনকে তাঁর নেতৃত্বে যু   যেতে বলেন। রাসূল জাতুস্ সালাসিলের যু   আমর ইবনে আসের অধীনেও তাঁদের দু’জনকে প্রেরণ করেছিলেন। এ সম্পর্কিত ঘটনা হাকিম তাঁর ‘মুসতাদরাক’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন ও যাহাবী তাঁর তালখিসে মুসতাদরাকে এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু আলী (আ.) রাসূল (সা.)- এর নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে ওফাত পর্যন্ত রাসূল ব্যতীত অন্য কারো নেতৃত্বে যু   করেন নি।

২৯২। এ হাদীসটি আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৩৫৬ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরাইদাহ্ সূত্রে তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। একই খণ্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় তিনি সাঈদ ইবনে বুরাইদাহ্ হতে ইবনে আব্বাসের সূত্রে বুরাইদাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন, “আলীর সঙ্গে ইয়েমেনের যু   ছিলাম এবং এক বিষয়ে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাসূলকে বললাম। তা শুনে রাসূলুল্লাহর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং তিনি বললেন : হে বুরাইদাহ্! আমি কি মুমিনদের নিজেদের ওপর তাদের অপেক্ষা অধিক অধিকার রাখি না? আমি বললাম : অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তিনি বললেন : আমি যার মাওলা, আলী তার মাওলা।” হাকিম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১১০ পৃষ্ঠায় ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এটি বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসে রাসূল নিজের অভিভাবকত্বের বিষয়টি পূর্বে এনে বুঝাতে চেয়েছেন মাওলা অর্থ এখানে কোন বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার। অনুরূপ হাদীস ইমাম আহমাদ মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ৪৮৩ পৃষ্ঠায়

আমর ইবনে শাস হতে বর্ণনা করেছেন। আমর যিনি হুদায়বিয়ার সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি বলেন, "আলীর সঙ্গে ইয়েমেন গিয়েছিলাম। এই সফরে তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলাম এবং তা প্রকাশের জন্য মসজিদে নববীতে বর্ণনা করলাম যেন রাসূলের কানে পৌঁছে। একদিন সকালে সেখানে প্রবেশ করে দেখি রাসূল (সা.) একদল সাহাবীর সঙ্গে বসে রয়েছেন। আমি প্রবেশ করা মাত্র তিনি বিশেষ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন যতক্ষণ না আমি বসলাম। তিনি (সা.) বললেন : হে আমর! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আমি বললাম : এরূপ কাজ হতে আল্লাহর আ য় চাই। তিনি বললেন : যে আলীকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল।"

২৯৩। মুত্তাকী হিন্দী 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯৮ পৃষ্ঠা হতে তাঁর মুনতাখাবে কানযুলে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২৯৪। নবী (সা.) আলী হতে ে ষ্ঠ যেমনভাবে তিনি ইবরাহীম হতেও ে ষ্ঠ। যেহেতু তাঁর সৃষ্টি ইবরাহীম হতে, যাতে কেউ ইবরাহীম (আ.)- কে তাঁর অপেক্ষা ে ষ্ঠ না ভাবে এ কারণেই নবী (সা.) বিশেষভাবে তা বলেছেন।

২৯৫। ইবনে হাজার তাঁর 'সাওয়ায়েক' গ্রন্থের ১০৩ পৃষ্ঠায় মাকাসেদের ২য় মাকসাদে ১৪ নং আয়াতে (সাওয়ায়েক ১১ অধ্যায়) তাবরানী হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যদিও তিনি প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে 'আলী আমার পর তোমাদের ওপর অভিভাবক' অংশটুকু উ ৃত না করে বলেছেন, إلى آخر الحديث 'হাদীসের শেষ পর্যন্ত'।

২৯৬। হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ১৩৪ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং যাহাবী তাঁর 'তালখিস' গ্রন্থে হাদীসটির বিশু তার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। নাসায়ী তাঁর 'খাসায়েসুল আলাভীয়া' গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৩১ পৃষ্ঠায় হাদীসটি এনেছেন যা হুবহু আমরা ২৬ নং পত্রে উল্লেখ করেছি।

২৯৭। 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৬৯ পৃষ্ঠার ৬০৪৮ নং হাদীস।

২৯৮। 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ২৫৭৯ নং হাদীস।

২৯৯। কারণ ‘সে আমার পর তোমাদের অভিভাবক ’ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে এটিই যে, সে- ই আমার পরে তোমাদের অভিভাবক, অন্য কেউ নয়।

৩০০। সিরিয়ার অধিবাসীরা শিয়াদের মুতাওয়ালী বলে এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্, রাসূল (সা.) ও আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী।

৩০১। কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠা এবং মুসনাদের আহমাদের ৫ম খণ্ডের ৩৮ পৃষ্ঠার টীকায় মুনতাখাব অংশে দেখুন।

৩০২। ‘ওয়াফাইয়াতুল আ'য়ান ’ গ্রন্থে ইবনে খাল্লেকানের বর্ণনানুসারে তিনি ৩৩৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে খাল্লেকান বলেন, “তিনি তাঁর যুগে তাফসীরের ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এমন এক বিরাট তাফসীর রচনা করেছিলেন যা ছিল সকল তাফসীরের চেয়ে ে ষ্ঠ। অতঃপর ইবনে খাল্লেকান তাঁর প্রসঙ্গে আরো বলেছেন, “আবদুল গাফের ইবনে ইসমাঈল ফার্সী তাঁর ‘সিয়াক- ই নিশাবুর ’ গ্রন্থে তাঁর নাম উল্লেখ করে প্রশংসা করেছেন। ” এরপর তিনি বলেছেন, “তিনি বিশু ভাবে হাদীস বর্ণনা করেন এবং নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত“।

৩০৩। সূরা মায়েদাহ্ : ৫৪।

৩০৪। কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৩ পৃষ্ঠায় ২৫২৭ নং হাদীস;   সা'লাবী তাঁর ‘তাফসীরে কাবীর ’ গ্রন্থে হযরত আবু যর হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩০৫। বারুদী, ইবনে কানে, আবু নাঈম, বাযাযার এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ‘কানযুল উম্মাল ’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৭ পৃষ্ঠায় ২৬২৮ নং হাদীস হিসেবে এটি এসেছে।

৩০৬। কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা, ২৬৩০ নং হাদীস।

৩০৭। ইবনে আবিল হাদীদ প্রণীত ‘শারহে নাহজুল বালাগাহ্ ’ , ২য় খণ্ড, ৪৫০ পৃষ্ঠা, ১১ নং হাদীস। কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা, ১৬২৭ নং হাদীস।

৩০৮। আবু নাঈম তাঁর ‘হুলইয়াতুল আউলিয়া ’ গ্রন্থে আনাস হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবিল হাদীদের ‘শারহে নাহজুল বালাগাহ্ ’ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪৫০ পৃষ্ঠায় ৯ নং হাদীসটি লক্ষ্য করুন।

৩০৯। আবু নাঈম তাঁর ‘হুলইয়াতুল আউলিয়া ’ গ্রন্থে আবু বারজা আসলামী এবং আনাস হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবিল হাদীদের নাহজুল বালাগাহর ব্যাখ্যা গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪৪৯ পৃষ্ঠায় ৩য় হাদীস হিসেবে এটি এসেছে।

৩১০। তাবরানী তাঁর ‘কাবীর ’ গ্রন্থে হযরত সালমান ও আবু যর হতে এবং বায়হাকী তাঁর সুনান গ্রন্থে, ইবনে আদী তাঁর ‘কামিল ’ গ্রন্থে হুযাইফা হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায় ২৬০৮ নং হাদীস হিসেবে এটি এসেছে।

৩১১। তাবরানী তাঁর ‘কাবীর ’ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি কানযুল উম্মাল গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৭ পৃষ্ঠায় ২৬২৮ নং এবং ইবনে আবিল হাদীদের ‘শারহে নাহজুল বালাগাহ্ ’ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪৫০ পৃষ্ঠায় ১০ নং হাদীস হিসেবে এসেছে। লক্ষ্য করুন হাদীসটিতে কিরূপে আলীকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে বিচ্যুতি থেকে মুক্তি এবং তাঁর হতে দূরে থাকাকে বিপথগামিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটিতে এই নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, রাসূলকে যেরূপ ভালবাস আলীকেও সেরূপ ভালবাস ও সম্মান কর। এ নির্দেশ এ কারণেই যে, তিনি রাসূলের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত। তদুপরি রাসূল (সা.) এ নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ হতে উল্লেখ করে বিষয়টির গভীরতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এ বাক্যটির বিষয়ে চিন্তা করুন।

৩১২। তাবরানী তাঁর ‘কাবীর ’ গ্রন্থে এবং আল্লামাহ্ সুয়ূতী তাঁর ‘জামেয়ুস্ সাগীর ’ গ্রন্থে ১০৭ পৃষ্ঠায় ইবনে আব্বাস হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম নিশাবুরী তাঁর ‘মুসতাদরাক ’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে ২২৬ পৃষ্ঠায় ‘মানাকিবে আলী ’ অধ্যায়ে দু’টি সহীহ সনদে- একটি ইবনে আব্বাস হতে ও অপরটি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সপক্ষে সুস্পষ্ট দলিল উপস্থাপন করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সিদ্দীক মাগরেবী (কায়রোর অধিবাসী) এই হাদীসটি যে বিশু তা প্রমাণের জন্য ‘ফাতহুল মুলকিল আলী বি সিহহাতী বাবি মাদীনাতুল ইলমি আলী ’ নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গবেষকদের জন্য এ মূল্যবান গ্রন্থটি অধ্যয়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহলে তাঁরা বুঝতে পারবেন আলী বিদ্বেষীরা (নাসেবীরা) এ হাদীসটিকে আরবের প্রচলিত একটি প্রবাদ বলে প্রচারের যে অপচেষ্টা চালিয়েছে

তা কতটা অসার। এ হাদীসটির ওপর তাঁরা যে অযাচিত সমালোচনা করেছেন তা গলাবাজী ও অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া কিছু নয়। হাফিজ সালাহ্উদ্দীন আলায়ী তা স্বীকার করেছেন এবং যাহাবী হতে নাসেবীদের কথার অগ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ এনে বলেছেন, "তারা তাদের কথার সপক্ষে মিথ্যা দাবী ছাড়া কোন প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে।"

৩১৩। ইবনে জারির ও তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুত্তাকী হিন্দী তাঁর 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪০১ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, "ইবনে জারির বলেছেন : এই হাদীসটি আমাদের দৃষ্টিতে সহীহ সনদে বর্ণিত" এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতী 'জামেয়ুল জাওয়ামেহ্' ও 'জামেয়ুস সাগীর' গ্রন্থে তিরমিযী হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। জামেয়ুস্ সাগীর, ১ম খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৩১৪। কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠায় দাইলামীর সূত্রে আবু যর গিফারী (রা.) হতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৩১৫। কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা, দাইলামীর সূত্রে আনাস ইবনে মালিক হতে বর্ণিত।

৩১৬। সূরা নাহল : ৬৪।

৩১৭। ইবনে হাজার তাঁর 'সাওয়ায়েক' গ্রন্থের ১১ অধ্যায়ে ১০৬ পৃষ্ঠায় ৫ম মাকসাদের ১৪ নং আয়াতে এ হাদীসটি এনেছেন।

৩১৮। কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা, ২৫২৮ নং হাদীস।

৩১৯। ইবনে মাজাহ্ তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে 'ফাজায়েলে সাহাবা' অধ্যায়ে (৯২ পৃষ্ঠা) এবং তিরমিযী ও নাসায়ী তাঁদের সহীহ গ্রন্থে হাদীসটি এনেছেন। মুত্তাকী হিন্দী তাঁর 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৫৩ পৃষ্ঠায় ২৫৩১ নং হাদীস হিসেবে এটি এনেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে ১৬৪ নং পৃষ্ঠায় হাবশী ইবনে জুনাদাহ্ হতে কয়েকটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যার সবগুলোই সহীহ। তিনি হাদীসটি এই ধারাবাহিকতায় যে, ইয়াহিয়া ইবনে আদাম ইসরাঈল ইবনে ইউনুস হতে, তিনি তাঁর দাদা আবু ইসহাক সাবিয়ী হতে এবং তিনি হাবশী ইবনে জুনাদাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমের মতে এ হাদীসের সকল

রাবীই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত এবং তাঁরা দলিল- প্রমাণ উপস্থাপনে এদের বর্ণিত হাদীস ব্যবহার করতেন।

কেউ মুসনাদে আহমাদে হাদীসটি দেখলে লক্ষ্য করবেন হাদীসটি বিদায় হ বর্ণিত হয়েছে যার পর রাসূল (সা.) বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। আহমাদ তাঁর মুসনাদের প্রথম খণ্ডের ১৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করছেন ইতোপূর্বেও রাসূল অনুরূপ কথা বলেছেন। নবম হিজরীতে রাসূল (সা.) হযরত আবু বকরকে সূরা তওবার (বারাআত) ১০টি আয়াত প্রদান করে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে তা পাঠ করে শুনানোর নির্দেশ দেন। পরে হযরত আলীকে হযরত আবু বকরের পশ্চাতে প্রেরণ করে বলেন, "যেখানেই পাও আবু বকর হতে তা গ্রহণ করে নিজেই তা পাঠ কর।" আলী (আ.) জুহফাতে হযরত আবু বকরের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর নিকট হতে আয়াতগুলো গ্রহণ করেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন, "হযরত আবু বকর মদীনায় নবীর নিকট ফিরে এসে প্রশ্ন করলেন : আমার ব্যাপারে বিছু নাযিল হয়েছে কি? রাসূল (সা.) বললেন : না, তবে জিবরাঈল এসে আমাকে বলেছেন এ দায়িত্ব স্বয়ং আমি অথবা আমার হতে (নিজ হতে) কাউকে পালন করতে হবে।" আহমাদ তাঁর মুসনাদের ১ম খণ্ডের ১৫০ পৃষ্ঠায় হযরত আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন, "যখন রাসূল (সা.) আমাকে আহবান করে বললেন : তোমাকে অথবা আমাকে স্বয়ং এ আয়াতগুলো মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে পাঠ করতে হবে। আমি বললাম : যখন অবস্থা এরূপ তখন আমি যাব। নবী (সা.) বললেন : আল্লাহ্ তোমার জিহ্বাকে দৃঢ় এবং অন্তরকে হেদায়েত করুন।"

৩২০। আমর ইবনে শাশের বর্ণিত হাদীসটি ৩৩ নং পত্রের টীকায় আমরা উল্লেখ করেছি।

৩২১। মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৬ পৃষ্ঠায় 'কিতাবুল ঈমান ' অধ্যায়ে এবং ইবনে আবদুল বার তাঁর 'ইসতিয়াব ' গ্রন্থে আলী (আ.)- এর জীবনী পর্বে হাদীসটি কতিপয় সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। ৩৬ নং পত্রে বুরাইদাহর হাদীসে দেখুন।

৩২২। তিনি হাদীসটি আবুল আযহার হতে, তিনি আবদুর রাজ্জাক হতে, তিনি মুয়াম্মার হতে, তিনি যুহরী হতে, যুহরী উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রের সকল রাবীই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। এজন্যই হাকিম বলেছেন, "বুখারী ও মুসলিমের শর্তে এটি বিশু ।"

তিনি আরো বলেন, "আবুল আযহার সকল হাদীসবেত্তার সম্মিলিত মতে (এজমা) বিশ্বস্ত এবং যখন বিশ্বস্ত রাবী হতে কোন হাদীস বর্ণিত হয় তখন তাঁদের নিজস্ব মৌলনীতিতে তা সহীহ বলে পরিগণিত।" অতঃপর তিনি আবু আবদুল্লাহ্ কারাশী হতে বলেছেন, "যখন আবুল আযহার ইয়েমেনের সানআ হতে ফিরে এসে বাগদাদের অধিবাসীদের জন্য হাদীসটি বর্ণনা করেন তখন ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন বলেন : এটি সঠিক নয়। একদিন এক আলোচনা সভার শেষে ইবনে মুঈন বলেন : নিশাবুরের ঐ মিথ্যাবাদী কোথায় যে এ হাদীসটি আবদুর রাজ্জাক হতে বর্ণনা করেছে? আবুল আযহার দাঁড়িয়ে বলেন : আমি এখানে। ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন তাঁকে দাঁড়াতে দেখে হেসে তাঁকে নিকটে ডাকেন এবং বলেন : আবদুর রাজ্জাক এই হাদীসটি কিভাবে অন্য কাউকে না বলে শুধু তোমাকেই বললেন? আবুল আযহার বলেন : হে আবু যাকারিয়া! আমি যখন সানআয় পৌঁছি তখন আবদুর রাজ্জাক ছিলেন না। দূরবর্তী এক স্থানে গিয়েছিলেন, আমি অসুস্থাবস্থায় সেখানে উপস্থিত হই। আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি আমার নিকট খোরাসানের অবস্থা জানতে চান, আমি তা জানালে তিনি কিছু হাদীস আমার জন্য বর্ণনা করেন যা আমি লিপিব করি। আমি বিদায় চাইলে তিনি আমাকে বলেন : আমার স্কন্ধে তোমার একটি অধিকার আছে, আমি একটি হাদীস তোমাকে বলব যা অন্য কেউ আমার নিকট শুনে নি। আল্লাহর শপথ, অতঃপর এই হাদীসটি ঠিক যেভাবে আমি বলেছি তিনি তা আমার জন্য বর্ণনা করেন। ইয়াহিয়া ইবেন মুঈন তাঁকে সত্যায়ন করে ক্ষমা চান।

যাহাবী তাঁর 'তালখিসে মুসতাদরাক' গ্রন্থে এ সূত্রের সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলেছেন এবং বিশেষভাবে আবুল আযহারের বিশ্বস্ততার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, তদুপরি কোন যুক্তি উল্লেখ ছাড়াই হাদীসটির বিষয়ে সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আবদুর রাজ্জাক কেন অন্যদের হতে হাদীসটি গোপন করতেন? কারণ অত্যাচারী শাসকের ভয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করছি যখন মালিক ইবনে দুনিয়া সাঈদ ইবনে যুবায়েরের নিকট রাসূলের পতাকাধারী কে- এ বিষয়ে প্রশ্ন

করলেন তখন তিনি বিশেষ দৃষ্টিতে মালিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মনে হয় তুমি মুক্ত ও নিরাপদ, তাই এরূপ প্রশ্ন করছ।" মালিক অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে এসে তাঁর ভ্রাতা ফাররাকে তা বর্ণনা করলে ফাররা বলেন, "তিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ভয়ে ভীত ছিলেন, তাই বলার সাহস পান নি যে, আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) ছিলেন রাসূলের পতাকাধারী।

হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, "হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে অথচ বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেন নি।"

৩২৩। দশম পত্রে হাদীসটি উল্লিখিত হয়েছে।

৩২৪। এ হাদীসটিও দশ নম্বর পত্রে উল্লিখিত হয়েছে। দশম পত্রে এ হাদীসটি ও এর পূর্ববর্তী হাদীসটির ব্যাখ্যা দেখুন।

৩২৫। দশম পত্রে এ হাদীস ও এর পূর্ববর্তী হাদীসের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা এসেছে।

৩২৬। কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায় দাইলামীর সূত্রে হযরত আম্মার ও আবু আইউব আনসারী হতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৩২৭। কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা, ২৫৩৯ নং হাদীস।

৩২৮। হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২৯ নম্বর পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করে সহীহ বলেছেন। অন্যান্য সুনান লেখকগণও হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

৩২৯। কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৭ পৃষ্ঠায় ২৬৩১ নং হাদীস হিসেবে এটি এসেছে যা দাইলামী ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন।

৩৩০। ৩৪ নম্বর প্রত্রে দেখুন। উক্ত পত্রে এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হাদীসও যত্ন সহকারে লক্ষ্য করুন।

৩৩১। ইবনে হাজার তাঁর 'সাওয়ায়েক' গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়ে চল্লিশ হাদীসের আলোচনায় ১৩ নং হাদীস হিসেবে এটি এনেছেন।

৩৩২। কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা, ২৬৩২ নং হাদীস।

৩৩৩। কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠার বর্ণনামতে খাতীব বাগদাদী তাঁর 'আল মুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক' গ্রন্থে এবং তাবরানী তাঁর 'আল আওসাত' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩৪ নং পত্রে হাদীসটিকে আমরা বিশ্লেষণ করেছি যা গবেষকদের জন্য সহায়ক হবে বলে মনে করি।

৩৩৪। তাবরানী তাঁর 'আল কাবীর ' গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির আবিল হামরা হতে মারফু সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৮ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হয়েছে।

৩৩৫। ইবনে আবিল হাদীদ, বায়হাকী ও আহমাদ উভয় হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর 'শারহে নাহজুল বালাগাহ্ ' র ২য় খণ্ডের ৪৪৯ পৃষ্ঠায় এটি এনেছেন। ইমাম ফখরে রাজী তাঁর 'তাফসীরে কাবীর ' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৮৮ পৃষ্ঠায় মুবাহালার আয়াতের তাফসীরে শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকলের দৃষ্টিতে হাদীসটি অকাট্য বলেছেন। আহমাদ ইবনে সিদ্দীক হাসানী মাগরেবী তাঁর 'ফাতহুল মুলকিল আলী ফি সিহহাতে হাদীসে বাবি মাদীনাতে ইলমে আলী ' গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। আরেফকুল শিরোমণি মুহিউদ্দীন আরাবী হতে আরেফ শা'রানী তাঁর 'আল ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির ' গ্রন্থের ১৭২ পৃষ্ঠায় (৩২ নম্বর আলোচনায়) বলেছেন, "মুহিউদ্দীন বলেছেন : সকল নবীর সৎ গুণাবলী হযরত আলীর মধ্যে সমন্বিত হয়েছিল এবং তিনি সকল নবীর গোপনভেদ সমন্বয়কারী। "

৩৩৬। হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩৩৭। তাবরানী ও ইবনে মারদুইয়া ইবনে আব্বাস হতে এবং দাইলামী হযরত আয়েশা হতে হাদীসটি বর্ণনা করে একে মুস্তাফিয বলেছেন।

৩৩৮। আবু নাঈম ও ইবনে আসাকির আবু ইয়ালী হতে মারফু সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার তাঁর 'সাওয়ায়েক ' গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়ের ২য় পর্বে ৩০ ও ৩১ নম্বর হাদীস হিসেবে ইবনে নাজ্জারের সূত্রে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করে একে মারফু হাদীস বলেছেন।

৩৩৯। হাদীসটি হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৪৭ নম্বর পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। যাহাবী তাঁর 'তালখিস ' গ্রন্থেও হাদীসটির বিশু তার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

৩৪০। এ হাদীস ও এর পরের দু'টি হাদীস হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৪০ পৃষ্ঠায় ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন। যাহাবীও তাঁর 'তালখিস ' গ্রন্থে হাদীস দু'টি বর্ণনা করে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ বলেছেন।

৩৪১। হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২২ নম্বর পৃষ্ঠায় হাদীসটি এনে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ বলেছেন। যাহাবীও তা স্বীকার করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৩৩ ও ৮২ পৃষ্ঠায় হাদীসটি আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী তাঁর 'শুআবুল ঈমান ' গ্রন্থে, সাঈদ ইবনে মানসুর এবং আবু ইয়ালী তাঁদের সুনানে, আবু নাঈম 'হুলইয়াহ্ ' গ্রন্থে এবং মুত্তাকী হিন্দী তাঁর 'কানযুল উম্মাল ' এর ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় ২৫৮৫ নম্বর হাদীস হিসেবে এটি এনেছেন।

৩৪২। হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৩৯ পৃষ্ঠায় দু'টি সূত্রে এ হাদীস ও এর পরবর্তী হাদীস দু'টি বর্ণনা করেছেন।

৩৪৩। এটি ইবনে আসাকিরের বর্ণনা যা কানযুল উম্মাল গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় ২৫৮৮ নম্বর হাদীস হিসেবে এসেছে।

৩৪৪। দায়লামীর বর্ণনানুসারে হাদীসটি এভাবে এসেছে। কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

৩৪৫। কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তাবরানী তাঁর 'কাবীর ' গ্রন্থেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩৪৬। এ হাদীসটি হারেস ইবনে হাছিরা জাবের জো'ফী হতে এবং তিনি ইমাম বাকের (আ.) হতে তাঁর পিতার সূত্রে আখদ্বার আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন। আখদ্বার সম্পর্কে ইবনে সাকান বলেন, "তিনি সাহাবী হিসেবে প্রসি   নন এবং তাঁর হাদীসের সনদের বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। " আসকালানী তাঁর 'আল ইসাবাহ্ ' গ্রন্থে আখদ্বারের জীবনী আলোচনায় এটি বলেছেন। দারে কুতনী উপরোক্ত হাদীসটি তাঁর 'আল আফরাদ ' গ্রন্থে এনেছেন ও বলেছেন, "এ হাদীসের একমাত্র রাবী জাবের জো'ফী, তিনি রাফেযী। "

৩৪৭। আবু নাঈম তাঁর ‘হুলইয়াতুল আউলিয়া ’ গ্রন্থে মাআয ইবনে জাবাল হতে এ হাদীসটি এবং আবু সাঈদ খুদরী হতে পরবর্তী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুত্তাকী হিন্দী এ দু’টি হাদীস তাঁর ‘কানযুল উম্মাল ’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

৩৪৮। হাকিম তাঁর ‘মুসতাদরাক ’ গ্রন্থে এবং যাহাবী তাঁর ‘তালখিস ’ গ্রন্থে হাদীসটি এনেছেন।

৩৪৯। ইবনে আসাকির এবং সুনান লেখকদের কয়েকজন হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩৫০। ইবনে আসাকির হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩৫১। তাবরানী, ইবনে আবি হাতেমসহ কয়েকজন সুনান লেখক হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইবনে হাজার উপরোক্ত চারটি হাদীস তাঁর ‘সাওয়ায়েক ’ গ্রন্থের (৩য় পর্বের) ৯ম অধ্যায়ের ৭৬ পৃষ্ঠায় এনেছেন।

৩৫২। সুনান লেখকগণ ইবনে আইয়াশ হতে কথাটি বর্ণনা করেছেন। ‘সাওয়ায়েক ’ গ্রন্থে এ বিষয়ে দেখতে পারেন।

৩৫৩। সালাফী তাঁর ‘আত্ তুয়ুরীয়াত ’ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করছেন। ইবনে হাজারও তাঁর ‘সাওয়ায়েক ’ গ্রন্থে এটি এনেছেন।

৩৫৪। এ বাণীগুলো মুস্তাফিয সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং ‘সাওয়ায়েক ’ গ্রন্থের ২য় পর্বের ৯ম অধ্যায়ের ৭২ পৃষ্ঠায় ইবনে হাজার তা বর্ণনা করেছেন।

৩৫৫। বিশ, ছাব্বিশ, ছত্রিশ এবং চল্লিশতম পত্রে আমরা এটি উল্লেখ করেছি।

৩৫৬। হাকিম তাঁর ‘মুসতাদরাক ’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠায় এবং যাহাবী তাঁর ‘তালখিসে মুসতাদরাক ’ গ্রন্থের একই পৃষ্ঠায় হাদীসটির বিশু তার বিষয়টি উল্লেখ করে একে মুস্তাফিয হাদীস বলেছেন। অনুরূপ অষ্টম পত্রে উল্লিখিত ‘হাদীসে সাকালাইন ’ - এ আহলে বাইত হাউজে কাউসারে মিলিত হওয়া পর্যন্ত কোরআন হতে বিচ্ছিন্ন হবে না বলা হয়েছে এবং আলী আহলে বাইতের নেতা।

৩৫৭। খাতীব বাররা থেকে এবং দায়লামী ইবনে আব্বাস থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার সাওয়ায়েক গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠায় হাদীসটি এনেছেন। সাওয়ায়েক গ্রন্থের ৯ম বাব- এর ২য় অধ্যায়ের ৪০ হাদীসের ৩৫ নং হাদীসটি দেখুন।

৩৫৮। এ হাদীসটি কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪০৫ পৃষ্ঠার ৬১৩৩ নং হাদীস। আপনার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, মুবাহিলার আয়াতে হযরত আলী (আ.)- কে মহানবী (সা.)- এর নাফস অর্থাৎ সত্তা বলা হয়েছে। দ্রঃ ইমাম ফখরে রাযীর তাফসীরে কাবীরে মাফাতিহুল গাইব- এর ২য় খণ্ডের ৪৮৮ পৃষ্ঠা; স্মতর্ব্য যে, الكلمة الغراء (আল- কালিমাতুল গাররা) গ্রন্থে এ আয়াতটির আলোচনায় আমরা যা বলেছিলাম তা আপনি হারিয়ে ফেলবেন না।

৩৫৯। প্রথম খলীফা নির্বাচনের স্থান।

৩৬০। এটি হাদীসগুলোর উৎপত্তির সময়কাল নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করে, নয় কি?- অনুবাদক

৩৬১। আহলে সুন্নাহর প্রথম সারির ব্যক্তিত্বদের অনেকেই হাদীসটির বিশু তার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। এমন কি ইবনে হাজার তাঁর ‘সাওয়ায়েক ’ গ্রন্থের ৫ম পর্বের প্রথম অধ্যায়ের ২৫ পৃষ্ঠায় এগারতম সন্দেহের আলোচনায় তাবরানী ও অন্যান্যদের হতে হাদীসটি বর্ণনা করে হাদীসটি সহীহ হবার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

৩৬২। নিজের মৃত্যুর বিষয়ে সকলকে জানালেন এজন্য যে, তাঁর দীনের মিশন পরিচালনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ও খেলাফতের বিষয়টি সম্পর্কে সকলকে জানানোর সময় এসেছে। এর মাধ্যমে তিনি চেয়েছেন তাদের মানসিক ভিত্তিকে মজবুত করতে যাতে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মিশন পূর্ণতায় পৌঁছায়।

৩৬৩। ভ্রাতার খেলাফতের ঘোষণা সরাসরি দেয়ার পূর্বে বিষয়টি এভাবেই উপস্থাপনের উদ্দেশ্য মুনাফিক, হিংসুক ও বিদ্বেষ পোষণকারীদের মৌখিক আক্রমণ ও অপতৎপরতার প্রভাব কমিয়ে আনা।

ওয়াহেদী (يا ايّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك) আয়াতটির শানে নুযূল বা অবতীর্ণ হবার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন আয়াতটি আলী ইবনে আবি তালিব সম্পর্কে গাদীরে খুমে অবতীর্ণ হয়েছে।

৩৬৪। "তোমরাও দায়িত্বশীল ও দায়িত্বের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে" নবীর এ কথাটির উদ্দেশ্য বোধ হয় দাইলামী হতে বর্ণিত এ হাদীসটি যা ইবনে হাজার তাঁর 'সাওয়ায়েক' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন- ইবনে সাঈদ বলেন, "নবী করিম (সা.) বলেছেন : কোরআনের و قفوهم إنّهم مسئولون আয়াতটির তাফসীর হলো তাদেরকে দাঁড় করাও আলীর বেলায়েত ও আনুগত্যের বিষয়ে তাদের প্রশ্ন করা হবে। অনুরূপ ওয়াহেদীও বলেছেন তারা আলী ও আহলে বাইতের বেলায়েত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং 'তোমরা দায়িত্বশীল' রাসূলের একথা এক প্রকার ভীতি প্রদর্শন আলীর বেলায়েত ও খেলাফতের বিরোধীদের জন্য।

৩৬৫। এ খুতবাটি নিয়ে চিন্তা করুন। এই হাদীসটি যে চিন্তা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের দাবী রাখে তা কেউ আদায় করলে বুঝতে পারবে এ খুতবার উদ্দেশ্য আলীর বেলায়েতের বিষয়টি যে দীনের মৌল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত তা বোঝানো যেমনটি শিয়ারা বিশ্বাস করে। কারণ প্রথমে রাসূল (সা.) প্রশ্ন করেছেন, "তোমরা কি لا اله الاّ الله محمّد رّسول الله এ কালেমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর নি?" তারপর একে একে মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন এবং আলীর বেলায়েতের বিষয়টি এনেছেন। এতে বোঝা যায় ওগুলোর প্রতি বিশ্বাসের মত এর প্রতি বিশ্বাসও দীনের মৌল বিষয় হিসেবে পরিগণিত।

৩৬৬। নবী (সা.)- এর এ কথাটি و أنا أولى 'আমি অধিকতর নিকটবর্তী ' হতে বোঝা যায় নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে তিনি তাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ যেমন আমার ওপর নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকারী ও এ বিষয়ে অগ্রাধিকার রাখেন আমিও তোমাদের ওপর ত প অগ্রাধিকার রাখি এবং এ সূত্রে আলীও।

৩৬৭। তাবরানী, ইবনে জারির, হাকিম, তিরমিযী সকলেই যাইদ ইবনে আরকাম হতে হাদীসটি ঠিক এভাবেই এনেছেন। ইবনে হাজার ও অন্যান্যরা এভাবেই তাবরানী হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটি নির্ভুল ও সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। দেখুন 'সাওয়ায়েক ' , ২৫ পৃষ্ঠা।

৩৬৮। মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা।

৩৬৯। খাসায়েসুল আলাভীয়া, ২১ পৃষ্ঠা।

৩৭০। আবু তুফাইলের এ প্রশ্ন থেকে বুঝা যায় এ হাদীসটিতে যেভাবে সুস্পষ্টভাবে গাদীরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তাতে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন এ উম্মত হতে যারা আলীকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাই সন্দেহের বশবর্তী হয়েই তিনি বলেছেন, "আপনি কি নিজে এটি শুনেছেন?" যেন ঘটনাটি সকলের অপরিচিত। তাই যাইদ বলেন, "এমন কোন ব্যক্তি নেই যে সেখানে উপস্থিত ছিল অথচ তা দেখে নি বা শুনে নি। " কবি বলেছেন,

সেই দিন গাদীরে খুমের বৃক্ষগুলোর নীচে
খেলাফতকে বর্ণনা করেছেন নবী নিজে
যদি আনুগত্য করত সবাই সে কথার
সেদিনের মতই সুখের দিন হত সবার
আধিকার নষ্ট হবার এমন নমুনা আর দেখি নি
এরূপ মূল্যবান সম্পদের বিনিময়ে অস্থায়ী দুনিয়াকেই কিনে নি।

৩৭১। মুসনাদ, ২য় খণ্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা।

৩৭২। মুসনাদ, ৪র্থ খণ্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা।

৩৭৩। খাসায়েসুল আলাভিয়া, ৪ পৃষ্ঠা।

৩৭৪। কবিতাটি ফযল ওয়ালিদ ইবনে উকবা ইবনে আবি মুঈতের কথার জবাবে বলেছিলেন যা মুহাম্মদ মাহমুদ রাফেয়ী তাঁর ‘মুকাদ্দামাতে শারহে হাশিমিয়াহ্ ’ গ্রন্থের ৮ম পৃষ্ঠায় এনেছেন।

৩৭৫। শিয়াদের নিকট বিষয়টি নিশ্চিত যে, এ আয়াতটি গাদীরে খুমে আলী (আ.)- এর বেলায়েত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং হাদীসটি আহলে বাইতের ইমামদের হতে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। কিন্তু আহলে বাইত ব্যতীত অন্য সূত্রে, যেমন ইমাম ওয়াহেদী তাঁর ‘আসবাবুন নুযূল ’ গ্রন্থের ১৫০ পৃষ্ঠায় সূরা মায়েদার এই আয়াতের তাফসীরে দু’টি নির্ভরযোগ্য সূত্রে আতীয়াহ্ ও আবু সাঈদ খুদরী হতে বলেছেন এই আয়াতটি গাদীরে খুমে আলী ইবনে আবি তালিব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

হাফেজ আবু নাঈম তাঁর ‘নুযূলুল কোরআন ’ গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসীরে দু’টি সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন যার একটি আবু সাঈদ খুদরী ও অন্যটি আবু রাফে হতে।

ইমাম ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ হামুইয়ানি শাফেয়ী তাঁর ‘আল- ফাওয়ায়েদ ’ গ্রন্থে আবু হুরাইরা হতে কয়েকটি সূত্রে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু ইসহাক সা’লাবী তাঁর ‘কাবীর ’ গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতের অর্থে দু’টি নির্ভরযোগ্য সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। এ শানে নুযূলের পক্ষে দলিল হলো উপরোক্ত আয়াত নাযিল হবার পূর্বেই নামায কায়েম হয়েছিল, যাকাত ওয়াজিব হয়েছিল, রোযা ও হ ফরয বলে ঘোষিত হয়েছিল, এগুলোর বিধি- বিধানসমূহ ও সার্বিকভাবে সকল হারাম ও হালাল রাসূল (সা.) শরীয়ত প্রবক্তা হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন ও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর স্থলাভিষিক্তের বিষয়টি ব্যতীত কিছুই অবর্ণিত ছিল না যাতে করে মহান আল্লাহ্ এতটা তাগিদ ও গুরুত্ব দিয়ে তা প্রচারের নির্দেশ দিবেন এবং প্রচার না করাকে ত্রুটি হিসেবে বিবেচনা করে ভীতি প্রদর্শন করবেন। তাই খেলাফত ব্যতীত এমন কোন বিষয় ছিল না যে বিষয়টিতে নবী (সা.) মানুষের মধ্যে ইখতিলাফ ও বিভেদের ভয় পাচ্ছিলেন যে কারণে তা প্রচারে দ্বিধান্বিত ছিলেন এবং সেজন্যই আল্লাহ্ তাঁকে অভয় দিয়ে তা প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন ও বলেছেন তিনি তাঁকে রক্ষা করবেন।

৩৭৬। আহলে বাইতের ইমামদের হতে এ বিষয়ে সহীহ হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত যদিও বুখারী বলেছেন এ আয়াত আরাফাত দিবসে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ঘরের মানুষ ঘরের বিষয়ে অপর হতে অধিকতর জ্ঞাত।

৩৭৭। আহমাদ যাইনী দাহলান তাঁর 'আস-সিরাতুন নাবাভীয়া ' গ্রন্থে 'বিদায় হ ' অধ্যায়ে বলেন, "নবী (সা.) মদীনা হতে নব্বই হাজার লোক, কোন কোন বর্ণনা মতে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার লোকসহ যাত্রা করেন। " তিনি বলেন, "এর বাইরেও অনেকেই মক্কায় বা আরাফায় তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। " তাই গাদীরের হাদীসের সাক্ষী এক লক্ষেরও অধিক ব্যক্তি।

৩৭৮। আটচল্লিশ নম্বর পত্রের ১৫ নং হাদীস হিসেবে এটি এনেছি এবং তার টীকায় যে গ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে তা বর্ণনা করেছি। পুনরায় দেখুন।

৩৭৯। ইমাম আলী (আ.) তাঁকে প্রশ্ন করেন, "কেন তুমি রাসূলের অন্যান্য সাহাবীদের সঙ্গে যা দেখেছ সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে না?" তিনি বলেন, "হে আমীরুল মুমিনীন! আমার বয়স অনেক হয়েছে তাই ভুলে গিয়েছি। " আলী বললেন, "যদি মিথ্যা বলে থাক তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত করুন যাতে তোমার পাগড়ীও তা আবৃত করতে না পারে। " তখনও তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করেন নি তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। তিনি এরপর সব সময় বলতেন, "আল্লাহর নেক বান্দার অভিশাপে আক্রান্ত হয়েছি। " ইবনে কুতাইবা দাইনূরী হযরত আলীর বিশেষত্ব ও ফজীলত বর্ণনায় এ ঘটনাটি এনেছেন। ইবনে কুতাইবা তাঁর 'মা'আরিফ ' গ্রন্থে আনাস অভিশপ্ত হয়ে রোগাক্রান্ত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলও তাঁর 'মুসনাদ ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১১৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন সকলেই দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেও তিন ব্যক্তি তা করে নি। তারা আলীর অভিশাপে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

৩৮০। ইবনে আসির কামিল গ্রন্থে ৩৫২ হিজরীর ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "মুইযযুদ্দৌলা ঐ বছরের ১৮ জিলহজে বাগদাদ নগরীকে সুসজ্জিত ও সুশোভিত এবং মজলিস ও সভায় পুলিশ বাহিনীকে আতশবাজী করে আনন্দ প্রকাশ করার নির্দেশ দান করেছিলেন।

তিনি আরো নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, অন্যান্য ঈদের (উৎসবের) রাত্রিগুলোর ন্যায় ১৮ জিলহজ্জের রাতেও যেন বাজার খোলা থাকে। তিনি এ কাজগুলো ঈদে গাদীরে খুমের আনন্দ করার জন্য করেছিলেন। ঐদিন শানাই ও বাঁশি অনবরত বাজছিল যার ফলে উক্ত দিবস একটি উৎসব মুখর অবিস্মরণীয় দিবসে পরিণত হয়েছিল। তারিখে কামিলের ৮ম খণ্ডের ১৮১ পৃষ্ঠার হুবহু ভা   এটি। ৩৮১।

و يوم الدوح دوح غدير خم

খুমের জলাশয়ের বৃক্ষের পাশে সমবেত হবার দিবসে

أبان له الولاية لو أطيعا.

তিনি (রাসূল) তাঁর (আলীর) বেলায়েতের ঘোষণা দিলেন প্রকাশ্যে, হায় যদি তা মানা হত...

ويوم الغدير استوضح الحق اهله

গাদীর দিবসে সত্যপন্থী সত্যকে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেছে

بفيحاء ما فيها حجاب و لاستر

কোন প্রকার পর্দা ও অন্তরায় ব্যতিরেকেই যেন আলোকিতরূপে ॥

أقام رسول الله يدعوهم بها

রাসূল আহবান জানালেন যাত্রা বিরতি করে

ليقربهم عرف و ينآهم نكر

যেন তারা কল্যাণের নিকটবর্তী হয় ও অকল্যাণ হতে নিরাপদ থাকে ॥

يمد بضبعيه و يعلم أنّه

তাঁর (আলীর) হাত উঁচিয়ে করলেন ঘোষণা

وليّ و مولاكم فهل لكم خبر؟

সে তোমাদের মাওলা জেনেছ কি তা?

يروح و يغدو بالبيان لمعشر

তিনি (সা.) সকাল- সন্ধ্যায় সর্বদা সকলের কাছে এ সত্যটি ব্যাখ্যা করেছেন ব্যাপক পরিসরে

يروح بهم غمر و يغدوبهم غمر

কিন্তু মূর্খতা তাদের নিয়ে গেছে রসাতলে ॥

فكان له جهر بإثبات حقّه

তিনি (সা.) তাঁর (আলীর) অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছিলেন কঠোর ও দৃঢ়

وكان لهم في برم حقّه جهر

আর তারা (জবরদখলকারী) তাঁর অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ছিল কঠোর ॥

أثمّ جعلتم حظّه حدّمرهفٍ

অতঃপর সেদিন তোমরা কি তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে তাঁকে কর নি বঞ্চিত

من البيض يوماً حظّ صاحبه القبر

যেদিন তাঁর বন্ধু (রাসূল) হলেন কবরস্থ ॥

৩৮২। যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবী বাদ পড়েন নি অর্থাৎ সকল স্তরের সকল রাবীর নামই যথাস্থানে উল্লেখ রয়েছে।

৩৮৩। যে হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহর হাদীস বলেই সাব্যস্ত হয়েছে।

৩৮৪। ‘গায়াতুল মারাম ’ গ্রন্থের লেখক তাঁর গ্রন্থের ১৬ অধ্যায়ের ৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। ইবনে জারির তাঁর ‘আল বেলায়াত ’ গ্রন্থে ৯৫টি সূত্র হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে উকদাও ১০৫টি সূত্র উল্লেখ করে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সিদ্দীক মাগরেবী তাঁর ‘আল ফাতহুল মুলকুল আলী বি সিহহাতি হাদীসি বাবি মাদিনাতিল ইলমে আলী ’ গ্রন্থে বলেছেন, “যাহাবী ও ইবনে উকদা গাদীরের হাদীস নিয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ”

৩৮৫। ইবনে হাজার তাঁর ‘আস- সাওয়ায়েক গ্রন্থের ৫ম পাঠের ১ম অধ্যায়ে তা উল্লেখ করেছেন।

৩৮৬। মুসনাদে আহমাদ, ৫ম খণ্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা।

৩৮৭। সা'লাবী আহলে সুন্নাহর কয়েকজন মুহাদ্দিস ও রাবী যেমন আল্লামাহ্ শাবলানজী মিসরী হতে তাঁর 'নুরুল আবসার ' গ্রন্থে হযরত আলীর জীবনীতে হাদীসটি এনেছেন। পৃষ্ঠা ১১।

৩৮৮। হালাবী তাঁর 'সীরাহ্ ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ২১৪ পৃষ্ঠায় বিদায় হ র আলোচনায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩৮৯। ৩৬ নং পত্রে এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছি, মনোযোগসহ তা অধ্যয়ন করুন।

৩৯০। সূরা আল হাক্কাহ্ : ৪১- ৪৩।

৩৯১। দারে কুতনী হতে ইবনে হাজার তাঁর 'আস- সাওয়ায়েক ' গ্রন্থের পঞ্চম পর্বের ১ম অধ্যায়ের শেষে ২৬ পৃষ্ঠায় ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিসরাও অন্য সূত্র হতে এটি বর্ণনা করেছেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ ' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ২৮১ পৃষ্ঠায় বাররা ইবনে আযেব হতে হযরত উমরের উ ৃ তি দিয়ে হাদীসটি নকল করেছেন। এ বইয়ের ৫৪ নম্বর পত্রে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

৩৯২। 'সাওয়ায়েক ' গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় দারে কুতনীর সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে।

৩৯৩। 'সাওয়ায়েক ' গ্রন্থের ১১ পর্বের শেষাংশে এটি বর্ণিত হয়েছে। দারে কুতনীও এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

৩৯৪। চল্লিশ সংখ্যাকে এ কারণে মনোনীত করলাম যে, হযরত আলী, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর, আবু সাঈদ খুদরী, আবু দারদা, আবু হুরাইরা, আনাস ইবনে মালিক, মায়ায ইবনে জাবাল ও অনেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দীন সম্পর্কে চল্লিশটি হাদীস সংরক্ষণ করবে আল্লাহ্ তাকে কিয়ামতের দিন আলেম ও ফকীহদের সঙ্গে পুনরুত্থিত করবেন।" অন্যত্র বলেছেন, "আল্লাহ্ তাকে ফকীহ্ আলেম হিসেবে পুনরুত্থিত করবেন।" আবু দারদার বর্ণনায় এসেছে- আমি কিয়ামতের দিন তাকে শাফায়াত করবো, ইবনে মাসউদের বর্ণনায় এসেছে- তাকে বলা হবে বেহেশতের যে দ্বার দিয়ে ইচ্ছে হয় প্রবেশ কর, ইবনে উমর রাসূল (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, "সে শহীদদের সঙ্গে পুনরুত্থিত হবে এবং আলেমের খাতায়ও তার নাম লেখা হবে।"

আমরা আমাদের এই পত্রসহ অন্যান্য কিছু পত্রে রাসূলের নিুোক্ত হাদীস অনুযায়ী আমলের প্রত্যাশী। রাসূল বলেছেন, "আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করুন যে আমাদের বাণীসমূহ বণ করেছে, তা সংরক্ষণ করেছে এবং ঠিক যেমনটি শুনেছে তেমনই অন্যদের নিকট পৌঁছিয়েছে। উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের নিকট যেন তা পৌঁছে দেয়। "

৩৯৫। ১-১৬ পর্যন্ত হাদীসসমূহ 'ইকমালুদ্দীন ওয়া ইতমামুন নিয়ামাহ্' গ্রন্থের ১৪৯-১৬৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

৩৯৬। ইবনে আবিল হাদীদ তাঁর 'শারহে নাহজুল বালাগাহ্' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৫ পৃষ্ঠায় আহলে বাইত ও শিয়াদের ওপর আপতিত কষ্টের বিবরণ দিয়েছেন এবং ইমাম বাকির (আ.) হতে কিছু বক্তব্য তুলে ধরেছেন যা পাঠ করা আপনার জন্য লাভজনক হবে।

৩৯৭। এ হাদীসটি ও এর পর আরো দু'টি হাদীস আটচল্লিশ নং পত্রে যথাক্রমে ৯, ১০ ও ১১ নং হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছি। ঐখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন।

৩৯৮। বত্রিশ নম্বর পত্রে বর্ণিত হয়েছে।

৩৯৯। বিশ নম্বর পত্রে বর্ণিত হয়েছে।

৪০০। আটষট্টি নম্বর পত্রে দেখুন।

৪০১। হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২৬ পৃষ্ঠায় বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ সূত্রে আলী (আ.) হতে উপরোক্ত বর্ণনা করেছেন।

৪০২। হাদীসটি সাবিত ও মুস্তাফিয। যিয়া মুকাদ্দাসী তাঁর 'আল মুখতারা' এবং ইবনে জারির তাঁর 'তাহ্যীবুল আসার' গ্রন্থে হাদীসটি এনেছেন। মুত্তাকী হিন্দী তাঁর 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৬১৫৫ নম্বর হাদীস হিসেবে, নাসায়ী তাঁর 'খাসায়েসুল আলাভীয়া' গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় এবং ইবনে আবিল হাদীদ তাবারীর সূত্রে তাঁর শারহে নাহজুল বালাগাহর ৩য় খণ্ডের ২৫৫ পৃষ্ঠায় হযরত আলীর 'কাসিয়াহ্' নামক খুতবার আলোচনায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলের প্রথম খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠায়ও হাদীসটি কাছাকাছি শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

৪০৩। ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৫; কানযুল উম্মাল ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০০, ৬০৮৪ নম্বর হাদীস।

৪০৪। এ হাদীসটি যাহাবী তাঁর ‘মিযানুল ই’তিদাল ’ গ্রন্থে শারিকের পরিচিতি পর্বে এনে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন এবং বলেছেন, “মুহাম্মদ ইবনে হামিদ রাযী বিশ্বস্ত নয়। ” কিন্তু ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবুল কাসেম বাগাভী, ইবনে জারির তাবারী ও ইবনে মুঈনের মত বিশিষ্ট হাদীসবেত্তাগণ মুহাম্মদ ইবনে হামিদকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন ও তাঁর হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাহাবী ‘মিযানুল ই’তিদাল ’ গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে হামিদকে এ সকল ব্যক্তির দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত বলেছেন ও এ পর্যায়ের অনেককেই তাঁর ছাত্র বলেছেন। তাঁর একমাত্র অপরাধ রাফেযী হওয়া নতুবা তাঁকে অন্য কোন দোষে অভিযুক্ত করা যায় না।

৪০৫। এ হাদীসটি ঠিক এভাবেই ‘কানযুল উম্মাল ’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠার শেষে ২৫৭০ নম্বর হাদীস হিসেবে এসেছে। মুসনাদে আহমাদের ৫ম খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠার প্রান্তে মুদ্রিত মুনতাখাবে কানযুল উম্মালে হাদীসটি দেখতে পারেন।

৪০৬। এই হাদীসটি ঠিক এভাবেই ‘কানযুল উম্মাল ’ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৩১ পৃষ্ঠায় প্রান্ত লেখনিতে (হাশিয়ায়), কানযুল উম্মাল গ্রন্থের নির্বাচিত অংশেও হাদীসটি এসেছে।

৪০৭। এই হাদীসটি কানযুল উম্মাল গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠায় হযরত আলীর মর্যাদা বর্ণনায় ৫৯৯২ নং হাদীস হিসেবে উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে।

৪০৮। ইবনে আবি হাতেম আনাস ইবনে মালিক হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর ও উমর রাসূলের নিকট হযরত ফাতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসলেন। রাসূল (সা.) নেতিবাচক জবাব দিলে তাঁরা হযরত আলীকে বিষয়টি অবহিত করে বললেন, “আমাদের মনে হয় তুমি ফাতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব করলে তিনি গ্রহণ করবেন। ” বেশ কয়েকজন প্রসি আলেম ও হাদীসবেত্তা, যেমন ইবনে হাজার তাঁর ‘আস- সাওয়ায়েক ’ গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে ইবনে হাতেম হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ঐ স্থানেই অনুরূপ একটি হাদীস আহমাদ সূত্রে আনাস হতে বর্ণিত হয়েছে। ‘সাওয়ায়েক ’ গ্রন্থের ১১ অধ্যায়ে ১২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আবু দাউদ সিস্তানী হতে বর্ণনা করেছেন, সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর হযরত ফাতিমাকে বিয়ের

প্রস্তাব করলে তিনি রাজী না হলে হযরত উমর নিজের জন্য অনুরূপ প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। রাসূল (সা.) তাতেও সম্মতি দান না করলে তাঁরা রাসূলের অনুভূতি বুঝে হযরত আলীকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে আহবান করলেন।

ইবনে জারির বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী বর্ণনা করেছেন, "হযরত আবু বকর ও উমর হযরত ফাতিমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে রাসূল রাজী না হওয়ায় হযরত উমর আমাকে বলেন : হে আলী! তুমি এ প্রস্তাবের জন্য সর্বাধিক যোগ্য।" দুলাবী তাঁর 'আয যুররিয়াতুত ত্বাহিরাহ্' গ্রন্থে হাদীসটিকে বিশু বলেছেন। হাদীসটি 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯২ পৃষ্ঠায় ৬০০৭ নং হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

৪০৯। এই হাদীসটি আমাদের উল্লিখিত সনদে ঠিক এভাবেই কানযুল উম্মাল গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৫৩ পৃষ্ঠায় ২৫৪৩ নম্বর হাদীস হিসেবে এসেছে। মুত্তাকী হিন্দী এ হাদীসটি হাকিমের সূত্রে ইবনে আব্বাস ও আবু হুরাইরা হতে এবং তাবরানী ও খাতীব বাগদাদী সূত্রে শুধু ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন। মুনতাখাবে কানয ও খাতীবের 'মুত্তাফিক' হতে শুধু ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যা মুসনাদে আহমাদের ৫ম খণ্ডের ৩৯ পৃষ্ঠার প্রথম সারির প্রান্ত লেখনিতে এসেছে। ইবনে আবিল হাদীদ তাঁর শারহে নাহজুল বালাগাহর ২য় খণ্ডের ৪৫১ পৃষ্ঠায় মুসনাদে আহমাদ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪১০। এই হাদীসটি বুখারী তাঁর 'ওয়াসাইয়া' অধ্যায়ে ২য় খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় (নতুন সংকলনের ৪র্থ খণ্ডের ৩য় পৃষ্ঠায়) এবং 'নবীর অসুস্থতা ও মৃত্যু' অধ্যায়ে ৩য় খণ্ডের ৬৪ পৃষ্ঠায় ও মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৪ পৃষ্ঠায় (নতুন সংকলনের ৩য় খণ্ডের ১২৫৭ পৃষ্ঠায় 'তারকুল ওয়াসিয়া লিমান লাইসা লাহু শাইউন' অধ্যায়ে) বর্ণনা করেছেন।

৪১১। লক্ষ্য করুন বুখারী ও মুসলিম নিজেদের অজ্ঞাতসারেই উপরোক্ত হাদীসে রাসূল (সা.) কর্তৃক আলীর স্থলাভিষিক্তের বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। কারণ যাঁরা আলীর স্থলাভিষিক্তের বিষয়টি বর্ণনা করতেন তাঁরা হযরত আয়েশার আশেপাশেই ছিলেন, তাঁরা উম্মতের বাইরের কেউ ছিলেন না, বরং সাহাবী বা তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সাহসিকতার সঙ্গে এ বিষয়টির বর্ণনা উম্মুল

মুমিনীনের রাজনৈতিক চিন্তার পরিপন্থী হবার কারণে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে এরূপ জবাব দিতেন যা অযৌক্তিক। সুনানে নাসায়ীর ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৪১ পৃষ্ঠার (মিশরের আল আযহার হতে প্রকাশিত) প্রান্ত লেখনিতে ইমাম সানাদী বলেছেন, "এ কথাটি মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়তের বিষয়টির পরিপন্থী নয়। কারণ এ থেকে বোঝা যায় না যে, তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ওসিয়ত করার সুযোগ পান নি। এটি কি সম্ভব যে রাসূল (সা.) মৃত্যুর অনেক পূর্বেই নিজ ওফাতের সংবাদ দিয়েছেন অথচ অসুস্থতার সময়ও ওসিয়ত হতে বিরত থাকবেন..?"

গ্রন্থটির এ আলোচনা গভীরভাবে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করুন।

৪১২। হযরত আয়েশার কথা কখনো এভাবে এসেছে- 'আমার উদর ও চিবুকের মাঝে তিনি ইন্তেকাল করেছেন ' , কখনো 'আমার বুক ও গলার মাঝে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন ' - এ দু'টি বর্ণনা সহীহ বুখারীর 'তাঁর অসুস্থতা ও মৃত্যু ' নামক অধ্যায়ে এসেছে। কিন্তু 'রাসূল (সা.) শেষ কথা কি বলেন ' নামক অধ্যায়ে (পূর্বোক্ত অধ্যায়ের পরবর্তী অধ্যায়) বলা হয়েছে 'নবী (সা.)- এর মাথা আমার ঊরুর ওপর ছিল ' ।

৪১৩। ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪, ওসিয়তের অধ্যায়।

৪১৪। উভয় গ্রন্থের 'ওয়াসাইয়া ' অধ্যায়ে দেখুন।

৪১৫। এ হাদীস ও এর পরবর্তী হাদীসসমূহ সহীহ ও মুস্তাফিয সূত্রে বর্ণিত। উপরোক্ত হাদীসটি 'ইসতিয়াব ' গ্রন্থে হযরত খাদিজাহর জীবনী পর্বে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪১৬। বুখারী 'غيرةُ النّساء و وجدهن ' অধ্যায়ে 'নিকাহ্ ' পর্বের শেষে হাদীসটি এনেছেন।

৪১৭। এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ 'কালিমাতুল গাররা ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছি।

৪১৮। তিরমিযী উম্মুল মুমিনীন সাফিয়ার দাস কানানা হতে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবদুল বার তাঁর 'ইসতিয়াব ' গ্রন্থে হযরত সাফিয়ার জীবনী আলোচনায়, ইবনে হাজার তাঁর

‘ইসাবাহ্ ’ গ্রন্থে ও তাঁর পরিচিতি পর্বে, শেখ রশিদ রেযা তাঁর ‘আল মিনার ’ গ্রন্থের ১২তম খণ্ডের ৫৮৯ পৃষ্ঠায় এবং অন্যান্য বর্ণনাকারীরাও ঘটনাটি নকল করেছেন।

৪১৯। আহলে সুন্নাহর সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বুখারীতে ‘নবীর স্ত্রীদের ঘরে কি ঘটেছিল ’ নামক অধ্যায়ে ‘কিতাবে জিহাদ ’ পর্বে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৪২০। জঙ্গে জামালে আসগর ৩২ হিজরীর ২৫ রবিউস্ সানীতে হযরত আলীর বসরায় প্রবেশের পূর্বে সংঘটিত হয়। হযরত আয়েশা, তালহা ও যুবায়েরকে সাথে নিয়ে বসরায় হামলা করেন। তখন হযরত আলীর পক্ষে উসমান ইবনে হুনাইফ আনসারী বসরার প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। হযরত আলীর চল্লিশজন অনুসারী মসজিদের মধ্যে ও সত্তর জন অন্যত্র শহীদ হন। উসমান ইবনে হুনাইফ যিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন, তারা তাঁর চুল, ভ্রু ও দাড়ি- গোঁফ টেনে উপড়ে ফেলে, তাঁকে বন্দী ও প্রহার করে বসরা হতে বের করে দেয়। যদিও তারা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু উসমানের ভ্রাতা সাহল বিন হুনাইফ আনসারদের ভয়ে ভীত হয়ে তা করে নি। কারণ তাদের দ্বারা তাঁর খুনের প্রতিশোধ নেয়ার সম্ভাবনা ছিল। হাকিম ইবনে জাবালা তাঁর গোত্রের অনেককে নিয়ে তাদের বিরু যু লিপ্ত হন এবং আবদে কাইস ও বনি রাবিয়ার বেশ কিছু ব্যক্তিসহ শাহাদাত বরণ করেন। হাকিম তাঁর গোত্রের প্রধান এবং জ্ঞানী, আত্ম- মর্যাদা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। হাকিমের সাথে তাঁর ভ্রাতা রাআল ও পুত্র আশরাফও শহীদ হন এবং আয়েশার বাহিনীর হাতে বসরা বিজিত হয়। হযরত আলী এটি জানার পর বসরায় পৌঁছলে আয়েশা ও তাঁর বাহিনী আলীর বিরু ‘জঙ্গে জামালে আকবর ’ - এর প্রস্তুতি নেয়। এ দুই যু র ঘটনা ইবনে জারির, ইবনে আসির ও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

৪২১। বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক ও হাদীসবিদগণ এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। যেমন আবুল ফারাজ ইস্ফাহানী তাঁর ‘মাকাতিলুত তালেবীন ’ গ্রন্থে হযরত আলীর জীবনী আলোচনায় এটি বর্ণনা করেছেন।

৪২২। যেরূপ বুখারী তাঁর সহীহ হাদীসগ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায় ‘নবীর অসুস্থতা ও মৃত্যু ’ অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন।

৪২৩। ‘হযরত আয়েশা আলীকে পছন্দ করতেন না এবং কখনো ভালভাবে তাঁর স্মরণ করতেন না ’ ইবনে আব্বাসের এ কথাটি বুখারী আনেন নি যেমনটি তিনি অন্যান্য স্থানেও করেছেন। অবশ্য সুনান লেখকদের অনেকেই সহীহ্ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনে সা’দ তাঁর ‘তাবাকাত ’ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২য় অংশের ২৯ পৃষ্ঠায় আহমদ ইবনে হাজ্জাজ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক হতে এবং তিনি ইউনুস ও মুয়াম্মার হতে, তাঁরা যুহরী সূত্রে উবাইদুল্লাহ্ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ হতে ইবনে আব্বাসের এ কথাটি উ ৃত করেছেন। এ হাদীসের রিজালগণের সকলেই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত।

৪২৪। মুয়াম্মার কাতাদা হতে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী রাসূলের ইন্তেকালের পর তাঁর ঋণ পরিশোধ করেন যার পরিমাণ পাঁচ লক্ষ দিরহাম। কানযুল উম্মালের চতুর্থ খণ্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় ১১৭০ নম্বর হাদীসে এটি বর্ণিত হয়েছে।

৪২৫। বুখারীর ৩য় খণ্ডের ৩৭ পৃষ্ঠায় খায়বারের যু র অধ্যায়ের শেষে এ সম্পর্কিত হাদীস রয়েছে। মুসলিমও তাঁর قول النّبيّ لا نورّث ما تركناه فهو صدقة অধ্যায়ে ২য় খণ্ডের ৭২ পৃষ্ঠায় ‘কিতাবে জিহাদ ’ পর্বে এরূপ হাদীস এনেছেন।

৪২৬। বুখারীর ২য় খণ্ডের ১১৮ পৃষ্ঠায় ‘কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সেইর ’ পর্বের ‘জাওয়ায়েযুল ওয়াফাদ ’ অধ্যায় দেখুন।

৪২৭। যে কেউ তাঁদের ওপর আপতিত এ বিপদের বিবরণ জানতে চান মুসতাদরাকে হাকিমের চতুর্থ খণ্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায় এবং যাহাবীর তালখিসে মুসতাদরাকে হযরত মারিয়ার জীবনী অধ্যয়ন করতে পারেন।

৪২৮। যেমনটি বুখারী তাঁর ৩য় খণ্ডের ১৩৬ পৃষ্ঠায় সূরা তাহরীমের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। সেখানে হযরত উমর হতে কয়েকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে দু’জন নারী রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন তাঁর হলেন আয়েশা ও হাফসা। কয়েকটি দীর্ঘ হাদীস সেখানে রয়েছে যা পড়লে আপনি আশ্চর্যান্বিত হবেন।

৪২৯। হাকিম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ৩৭ পৃষ্ঠায় এবং ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের ১০৪ পৃষ্ঠায় হযরত আসমার জীবনী পর্বে হাদীসটি এনেছেন। ঘটনাটি বেশ প্রসি বলে ইসতিয়াব, আল ইসাবাহ্ এবং ইবনে জারীরও তাঁর গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

৪৩০। এ ঘটনাটি কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১১৫ অথবা ২৯৪ পৃষ্ঠায় এবং ইবনে সা ' দের তাবাকাত গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের শারাফ বিনতে খালীফার জীবনীতে এসেছে।

৪৩১। কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা, ১০২০ নং হাদীস। গাজ্জালী তাঁর ইহ্ইয়াউল উলূম গ্রন্থে 'আদাবুন নিকাহ্ ' অধ্যায়ে (২য় খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪৩২। গাজ্জালী প্রণীত ইহ্ইয়াউল উলূম, ২য় খণ্ড, ৩য় অধ্যায় ও 'মুকাশিফাতুল কুলুব ' , ২৩৮ পৃষ্ঠা।

৪৩৩। 'তাবাকাত ' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের দ্বিতীয়াংশের ৫১ পৃষ্ঠায় من قال توفّى رسولُ اللهِ وَ هوَ فِي حجر عليّ অধ্যায়ে হাদীসটি এসেছে যা কানযুল উম্মালের ৪র্থ খণ্ডের ৫৫ পৃষ্ঠার ১১০৭ নম্বর হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

৪৩৪। কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯২ পৃষ্ঠার ৬০০৯ নম্বর হাদীস।

৪৩৫। ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত ' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের দ্বিতীয়াংশের ৫১ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কানযুল উম্মালের ৪র্থ খণ্ডের ৫৫ পৃষ্ঠায় ১১০৬ নম্বর হাদীস।

৪৩৬। কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা ১১০৮ নম্বর হাদীস।

৪৩৭। প্রাগুক্ত।

৪৩৮। প্রাগুক্ত।

৪৩৯। নাহজুল বালাগাহ্, ১৯৭ নম্বর খুতবা।

৪৪০। নাহজুল বালাগাহ্, হিকমত ২০২।

৪৪১। হাকিম নিশাবুরী তাঁর 'মুসতাদরাক ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৩৯ পৃষ্ঠায় হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। যাহাবী তাঁর 'তালখিসে

মুসতাদরাক ’ গ্রন্থের হাদীসটির বিশু তার বিষয় স্বীকার করেছেন। ইবনে আবি শাইবা তাঁর সুনানে হাদীসটি এনেছেন এবং মুত্তাকী হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪০০ পৃষ্ঠায় ৯৬ নম্বর হাদীস হিসেবে এটিকে উল্লেখ করেছেন।

৪৪২। এ হাদীসটি আবু ইয়ালী কামিল ইবনে তালহা হতে, তিনি ইবনে লাহিয়া হতে, তিনি হাই ইবনে আবদে মাগফিরী হতে, তিনি আবু আবদুর রহমান হাবলী হতে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু নাঈম তাঁর ‘হুলইয়া ’ গ্রন্থে এবং আবু আহমাদ দারমী তাঁর নথিতে হাদীসটি এনেছেন যা কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তাবরানী তাঁর ‘কাবীর ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তায়েফের যু   নবী (সা.)- এর সাথে হযরত আলীর একান্ত সংলাপ দীর্ঘ হলে হযরত আবু বকর রাসূলকে কারণ জানতে চেয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, “আমি তার সাথে সংলাপ করি নি, বরং আল্লাহ্ তার সাথে গোপন সংলাপ করেছেন। ” হাদীসটি কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯৯ পৃষ্ঠায় ৬০৭৫ নম্বর হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। নবী (সা.) প্রায়ই আলীর সাথে একান্ত ও গোপন সংলাপে বসতেন। এ রকম এক একান্ত সংলাপের মুহূর্তে হযরত আয়েশা উপস্থিত হয়ে আলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “প্রতি নয় দিনের একদিন আমার জন্য ধার্য, সেদিনটিও তুমি ছাড়বে না?” রাসূল (সা.)- এর চেহারা এতে রক্তিম হয়ে উঠল এবং তিনি কঠোর দৃষ্টিতে আয়েশার দিকে তাকালেন। শারহে নাহজুল বালাগাহ্, ইবনে আবিল হাদীদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮।

৪৪৩। (إنْ تتوبا فقد صغت قلوبكما) - সূরা তাহরীম।

৪৪৪। (و إنْ تَظاهرا عليه فإن الله هُوَ مولاة و جبريل و صالح المؤمنين و الملائكة بعد ذلك ظهير)

আয়াতটি নবী (সা.)- এর বিরু   ষড়যন্ত্র করলে আয়েশা ও হাফসার মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। নবীর ওয়াসি বা স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধির বিরু তাঁর ভূমিকা নবীর ওসিয়ত অস্বীকার ও তাঁর বিরু   যু র মাধ্যমে প্রমাণিত।

৪৪৫। এ বিষয়ের প্রতি ইশারা করে আয়াতে বলা হয়েছে,

(عسى ربُّه إنْ طلّقكُنّ أنْ يبدله أزواجاً خيْراً منكنّ مسلماتٍ مؤمناتٍ)

৪৪৬। সূরা তাহরীমের এ আয়াত- (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ)

৪৪৭। সূরা তাহরীমের এ আয়াত- (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ)

৪৪৮। বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১২৫ পৃষ্ঠায় ما جاء في بيوت أزواج النّبيّ পর্বে كتاب الجهادو السير তে খুমসের আলোচনার পরবর্তী অধ্যায়ে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমের ২য় খণ্ডের ৫০৩ পৃষ্ঠায় হাদীসটি এভাবে এসেছে-

خرج رسول الله (ص) من بيت عايشة فقال رأس الكفر من ها هنا حيث يطلع قرن الشّيطان হযরত আয়েশার ঘর হতে বের হয়ে রাসূল (সা.) বললেন, "কুফরের শির এখানেই, এখান হতেই শয়তানের শিং উত্থিত হবে।"

৪৪৯। সহীহ বুখারীর ما يجوز من العمل في الصّلاة, ১ম খণ্ডের ১০৩ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৪৫০। হযরত আয়েশা হযরত উসমানের প্রায় কর্মকাণ্ডেরই সমলোচনা করতেন ও তাঁকে মন্দ ও উপনামে ডাকতেন ও বলতেন, ''এই বৃ   ইহুদীকে হত্যা কর, সে কাফির হয়ে গেছে।" সকল ঐতিহাসিক যাঁরা তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহ বণনা করেছেন তাঁরা এ ঘটনাসমূহ উল্লেখ করেছেন। যেমন ইবনে জারির ও ইবনে আসির তাঁদের ইতিহাস গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন। সমকালীন ঐতিহাসিকদের অনেকেই এর সমলোচনা করেছেন-

فمنك البداء و منك الغير

তোমা হতেই শুরু ও পরিবর্তন

و منك الرياح و منك المطر

তোমা হতেই বায়ূ ও বৃষ্টি

و أنت امرتِ بقتل الإمام

তুমিই ইমামকে হত্যার নির্দেশদাত্রী

و قلتِ لنا انه قد كفر

ও তাকে কাফির বলে ঘোষণাকারিণী।

সারকথা সকল বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষের মূলে ছিলেন তিনি।

৪৫১। (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ) এবং তোমরা তোমাদের নিজ গৃহে অবস্থান কর এবং আদি জাহেলিয়াত যুগে দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের ন্যায় স্বীয় সৌন্দর্য্য প্রদর্শন কর না।- (সূরা আহযাব : ৩৩)

৪৫২। হযরত আয়েশা জামালের যু র সময় যে উষ্ট্রে আরোহণ করেন তা ইয়ালী ইবনে উমাইয়্যা তাঁর জন্য এনেছিল। উষ্ট্রটি শক্তিশালী, ক্ষিপ্ত ও অসহিষ্ণু প্রকৃতির ছিল। যখন উষ্ট্রটি তাঁর সামনে আনা হলো তখন তিনি তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। কিন্তু যখন শুনলেন উষ্ট্রটির নাম 'আসকার ' তখন বললেন, "এটি ফিরিয়ে নাও কারণ রাসূল (সা.) এ নামের উষ্ট্রের পিঠে আরোহণ করতে আমাকে নিষেধ করেছেন। " কিন্তু যখন তারা উষ্ট্রটির বাহ্যিক চেহারার কিছু পরিবর্তন করে বলল যে, এটি ওর চেয়ে শক্তিশালী অন্য একটি উষ্ট্র তখন এ উষ্ট্রে আরোহণে তিনি রাজী হলেন। বেশকিছু ঐতিহাসিক, যেমন ইবনে আবিল হাদীদ তাঁর 'শারহে নাহজুল বালাগাহ্ ' র ২য় খণ্ডের ৮ পৃষ্ঠায় এটি বর্ণনা করেছেন।

৪৫৩। এ সম্পর্কিত হাদীস প্রসি (মাশহুর) সূত্রে বর্ণিত এবং নবী (সা.)- এর অন্যতম মুজিযা বলে স্বীকৃত। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৫২ ও ৯৭ পৃষ্ঠায় হযরত আয়েশা হতে সংক্ষিপ্ত আকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২০ পৃষ্ঠায়ও এটি বর্ণনা করেছেন। যাহাবী তাঁর 'তালখিস ' গ্রন্থে হাদীসটির সত্যতা স্বীকার করেছেন।

৪৫৪। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে আয়েশা হতে প্রতিষ্ঠিত সনদে এনেছেন। বুখারীর ১ম খণ্ডের 'কিতাবুল ঈদাইন ' অধ্যায়ের ১১৬ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিমের ১ম খণ্ডের ৩২৭ পৃষ্ঠায় ও মুসনাদে আহমাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৫৭ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৪৫৫। বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদের পূর্বোল্লিখিত আলোচনায় দেখুন।

৪৫৬। আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর ‘মুসনাদ ’ - এর ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায় হযরত আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন।

৪৫৭। আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন।

৪৫৮। মুত্তাকী হিন্দী তাঁর ‘কানযুল উম্মাল ’ - এর ৭ম খণ্ডের ১০১৭ নম্বর হাদীস হিসেবে এটি বর্ণনা করেছেন।

৪৫৯। রাসূলের ওফাতের পূর্বে আলীই যে তাঁকে এপাশ ওপাশ করাতেন ও তাঁর সেবায় নিয়োজিত থকতেন এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে। তাই রাসূলের ইন্তেকালের মুহূর্তে হযরত আয়েশা ও ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না- এ কথাটি সর্বৈব মিথ্যা। তাহলে তখন হযরত আলী, ফাতিমা, আব্বাস, সাফিয়া, রাসূলের অন্যান্য স্ত্রী ও বনি হাশিম কোথায় ছিলেন?

৪৬০। আবু বকর আহমাদ ইবনে আবদুল আযীয জাওহারী তাঁর ‘আস- সাকীফা ’ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবিল হাদীদও তাঁর ‘শারহে নাহাজুল বালাগাহ্ ’ র ১ম খণ্ডের ১৩২ পৃষ্ঠায় এটি বর্ণনা করেছেন।

৪৬১। সহীহ বুখারীর ৪র্থ খণ্ডের ১১৯ পৃষ্ঠার رجم الحبلى من الزنا اذا احصنت অধ্যায়ে দেখুন। ইবনে জারির তাবারী তাঁর ‘ইতিহাস ’ গ্রন্থে ১১ হিজরীর ঘটনা বর্ণনায় এবং ইবনে আবিল হাদীদ তাঁর ‘শারহে নাহজুল বালাগাহ্ ’ র ১ম খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায় এটি বর্ণনা করেছেন।

৪৬২। উক্ত ব্যক্তি ছিলেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম। তিনি বলেছিলেন, “আল্লাহর শপথ, যদি হযরত উমর মৃত্যুবরণ করেন তাহলে হযরত আলীর হাতে বাইয়াত করবো। কারণ হযরত আবু বকরের বাইয়াত আকস্মিকভাবে হয়েছিল। ” হযরত উমর এ কথা শোনার পর অত্যন্ত রাগান্বিত হন ও উপরোল্লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন।

৪৬৩। হাদীসটির অর্থ হলো মানুষের বাইয়াতের অধিকার পরামর্শ ও ঐকমত্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই যদি দুই ব্যক্তি স্বৈরাচারী পন্থায় সকলকে অগ্রাহ্য করে একে অপরের হাতে বাইয়াত করে জনসাধারণকে তার হাতে বাইয়াত করতে বাধ্য করে তাহলে তাদের সামাজিক

ঐক্য বিনষ্টের জন্য দায়ী করা যায়, নয় কি? সুতরাং জনসাধারণের উচিত হবে এ দু'জনের কারো হাতেই বাইয়াত না করে তৃতীয় কোন ব্যক্তির হাতে বাইয়াত করা ও তাদের প্রত্যাখ্যান করা। কারণ এদের যে কোন এক ব্যক্তির হাতে বাইয়াত করার অর্থ হলো সমাজের ব্যক্তিবর্গ ও তাদের মতামতকে মূল্যহীন মনে করে ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের অনুবর্তী হওয়া যার ফল তাদের নিহত হবার মাধ্যমে ভোগ করতে হবে।

আমার মতে হযরত উমর যে ন্যায়বিচারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন সর্বপ্রথম এ বিধান তাঁর ও তাঁর বন্ধুর ওপর প্রযোজ্য হওয়া উচিত। কারণ হযরত উমর তাঁর এ খুতবায় স্বীকার করেছেন হযরত আবু বকরের বাইয়াত কোন চিন্তা ও পরামর্শ ব্যতীত আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ্ এর অপকারিতা হতে সবাইকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং এরপর যদি কেউ অনুরূপ কোন ঘটনার জন্মদান করে তাহলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। উমরের এ কথাটি মশহুর (বহুল প্রচলিত) সূত্রে বর্ণিত। হাদীসবিদদের মধ্যে ইবনে আবিল হাদীদ তাঁর শারহে নাহজুল বালাগাহর ১ম খণ্ডের ১২৩ পৃষ্ঠায় এটি বর্ণনা করেছেন।

৪৬৪। নবীর আহলে বাইতের মর্যাদা ষষ্ঠ হতে দ্বাদশ পত্র পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে।

৪৬৫। সহীহ বুখারীর ৩য় খণ্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায় খাইবারের যু র আলোচনায় এবং সহীহ মুসলিমের ২য় খণ্ডের ৭২ পৃষ্ঠায় কিতাবুল জিহাদ ওয়াসসাইরে قول النّبيّ : لا نورّث ما تركناه فهو صدقة অধ্যায়ে হাদীসটি এসেছে।

৪৬৬। এ পঙ্ক্তিটি নাহাজুল বালাগায় রয়েছে। ইবনে আবিল হাদীদ তাঁর 'শারহে নাহাজুল বালাগাহ্' র ৪র্থ খণ্ডের ৩১৯ পৃষ্ঠায় এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন- "হযরত আলী আবু বকরের উদ্দেশ্যে এ কবিতা পাঠ করেন এ কারণে যে, আবু বকর সাকীফায় আনসারদের বিরু যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছিলেন, " আমরা নবীর নিকটাত্মীয় ও উত্তরাধিকারী বলে খেলাফতের হকদার। " আবার জনসাধারণের সামনে বলেন, "যেহেতু লোকেরা আমার হাতে বাইয়াত করেছে সেহেতু আমিই ন্যায়ত খলীফা। " তাই হযরত আলী (আ.) বলেছেন, "আপনি আনসারদের মোকাবিলায় বলেছেন যে, আপনি নবী (সা.)- এর সমগোত্রীয় ও আত্মীয় কিন্তু এক্ষেত্রে অন্যরা আপনার হতে

নবীর আত্মীয় হিসেবে অধিকতর নিকটে এবং আপনার হাতে জনগণের বাইয়াতের ক্ষেত্রে নবীর প্রথম সারির অনেক সাহাবীই বাইয়াতের সময় অনুপস্থিত ছিলেন। তাহলে এ বাইয়াত কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে?" শাইখ মুহাম্মদ আবদুহুও এ দু'টি পঙ্ক্তি তাঁর 'শারহে নাহজুল বালাগাহ্ ' য় উল্লেখ করে ইবনে আবিল হাদীদের অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৪৬৭। ইবনে কুতাইবা তাঁর 'আল ইমামাহ্ ওয়াস্ সিয়াসাহ্ ' গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠায় তা উল্লেখ করেছেন।

৪৬৮। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ হতে মুসলিম তাঁর 'সহীহ ' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১১৮ পৃষ্ঠায় এবং সিহাহ ও সুনান লেখকদের অনেকেই তাঁদের গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

৪৬৯। মুসলিম তাঁর 'সহীহ ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এটি বর্ণনা করে মুস্তাফিয বলেছেন।

৪৭০। মুসলিম ও অন্যান্যরা এ হাদীসটি তাঁদের গ্রন্থে এনেছেন।

৪৭১। মুসলিম তাঁর 'সহীহ ' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায় হাদীসটি এনেছেন এবং অন্যান্য সুনান লেখকগণও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪৭২। মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায় হাদীসটি এনেছেন। হাদীসটির فمن عرف برئ অংশের অর্থ হলো : যে কেউ তাদের অসৎ কর্ম সনাক্ত করতে পারবে সে প্রথমে হস্ত দ্বারা বাধা প্রদান করবে, তা সম্ভব না হলে জিহ্বা দ্বারা, তাও সম্ভব না হলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে।

৪৭৩। সা'দ ইবনে উবাদা (আবু সাবেত) বাইয়াতে আকাবার(*২৫) অন্যতম সদস্য। তিনি বদর যু ছাড়াও অন্যান্য যু রাসূলের সাথে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি খাযরাজ গোত্রের নেতা এবং আনসারদের মধ্যে একজন দানশীল ব্যক্তি বলে প্রসি ছিলেন। সাকীফায় তাঁর বক্তব্য বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে এসেছে, যেমন ইবনে কুতাইবার 'আল ইমামাহ্ ওয়াসসিয়াসাহ্ ' গ্রন্থে, ইবনে জারির তাবারীর 'তারিখ ' - এ, ইবনে আসিরের 'কামিল ' গ্রন্থে এবং আবু বকর আহমাদ ইবনে আবদুল আযীয জাওহারীর 'আসসাকীফা" গ্রন্থে।

৪৭৪। হাব্বাব ইবনে মুনযির আনসারদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ও একজন সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বদর, উহুদসহ অন্যান্য যু অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে একজন দানশীল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বিভিন্ন হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য লিপিব হয়েছে যার মধ্যে ইবনে কুতাইবার ‘আল- ইমামাহ্ ওয়াসসিয়াসাহ্ ’ , ইবনে জাবির তাবারীর ‘তারিখ ’ , ইবনে আসিরের ‘কামিল ’ এবং আবু বকর আহমাদ ইবনে আবদুল আযীয জাওহারীর ‘আসসাকিফা ’ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়।

৪৭৫। হযরত আলী (আ.) ও তাঁর গৃহে অবস্থানরতদের আগুন দিয়ে পোড়ানোর ভয় দেখানোর ঘটনাটি মুতাওয়াতির ও সহীহ সূত্রে বর্ণিত। ইবনে কুতাইবা তাঁর ‘‘আল ইমামাহ্ ওয়াসসিয়াসাহ্ ’ গ্রন্থের প্রথমে, তাবারী তাঁর ‘তারিখ ’ গ্রন্থের একাদশ হিজরীর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে আব্দি রাব্বিহ্ মালিকী তাঁর ‘আকদুল ফারিদ ’ গ্রন্থের ২য় খণ্ডে সাকীফার হাদীসে ও আবদুল আযীয জাওহারী তাঁর ‘আসসাকিফা ’ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবিল হাদীদ তাঁর ‘শারহে নাহজুল বালাগাহ্ ’ র ১ম খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। মাসউদী তাঁর ‘মরুজুয্যাহাব ’ গ্রন্থে উরওয়া ইবনে যুবাইর হতে বনি হাশিমের গৃহে আগুন দেয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেখানে উরওয়া বাইয়াত না করার অপরাধের কথা বলে তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইয়ের কাজকে (বনি হাশিমের গৃহে আগুন দেয়া) ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। শাহরেস্তানী তাঁর ‘মিলাল ওয়ান নিহাল ’ গ্রন্থের ‘নিজামিয়া ফিরকার ’ আলোচনায় এবং আবু মেখনাফ তাঁর এক লেখায় সাকীফার ঘটনা বর্ণনায় আমরা যা উল্লেখ করেছি তা বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কিত বর্ণনা এতটা প্রসি ও মুতাওয়াতির যে, বিভিন্ন কবি তাঁদের কবিতায় তা উল্লেখ করেছেন, যেমন হাফিয ইবরাহীম তাঁর ‘কাছিদাতুল উমারিয়া ’ য় বলেছেন,

قوله لعلي قالها عمر

“ কথাটি বলা হয়েছে আলীকে এবং বলেছে উমর

أكرم بسامعها أعظم بملقيها

এর ৫ াতাকেও কর সম্মান, সম্বোধনকারীকেও দাও মর্যাদা

حرقت دارك لا أبقي عليك بها

তোমার সে গৃহে অগ্নি সংযোগ করবো, কাউকেই ছাড়ব না

إن لم تبايع و بنت المصطفى فيها

যদি বাইয়াত না কর, সেক্ষেত্রে যদি মুস্তাফার কন্যাও সে হয়ে থাকে

ما كان غير أبي حفص بقائلها

আবু হাফসা (উমর) ব্যতীত আরবের ৎ ষ্ঠ বীর ও

أمام فارس عدنان و حاميها

তাঁর সাহায্যকারীদের সামনে অন্য কেউ তা বলতে পারত না। ”

ইমাম ও নেতার সাথে তাঁদের আচরণ এরূপই ছিল। আমাদের মতে সেই ইমামের মত ব্যতীত কোন ইজমাই হুজ্জাত বা দলিল হতে পারে না। তাই আপনার মতে কিরূপে এই ইজমা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে? যখন আমরা সম্পূর্ণ পরিস্থিতিকে এভাবে দেখছি।

৪৭৬। কারণ রাসূল (সা.)- কে তাঁরা দুনিয়ার বিষয় সম্পর্কে তাঁদের পর্যায়ের মত অবহিত বলেই বিশ্বাস করতেন।

৪৭৭। খলীফা আবু বকরের সময়ে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা প্রমাণ করে নিঃসন্দেহে আলী (আ.) খলীফা হলে এমনটি হত না।

৪৭৮। ইবনে আবিল হাদীদ তাঁর শারহে ‘নাহজুল বালাগাহ্ ’ র ৩য় খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায় এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আসির তাঁর ‘কামিল ’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ২৪ পৃষ্ঠায় হযরত উমরের জীবনী আলোচনায় এটি বর্ণনা করেছেন।

৪৭৯। সহীহ বুখারীর ৪র্থ খণ্ডের ৫ম পৃষ্ঠায় ‘কিতাবুল মারযা ’ অধ্যায়।

৪৮০। ‘মহানবী নিজ হতে কিছুই বলেন না যা বলেন তা আল্লাহর ওহী ব্যতীত কিছু নয় ’ - সূরা নাজম।

৪৮১। বুখারী, ১ম খণ্ডের কিতাবুল ইলম, পৃষ্ঠা ২২।

৪৮২। মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪।

৪৮৩। মুসনাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৫।

৪৮৪। ইবনে আবিল হাদীদ তাঁর ‘শারহে নাহজুল বালাগাহ্ ’ র ২য় খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠায় সেখান হতে বর্ণনা করেছেন।

৪৮৫। বুখারী, ২য় খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

৪৮৬। তৃতীয় যে বিষয়টি রাবী ভূলে গিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন তা ঐ সম্পর্কিত বিষয় যে সম্পর্কে রাসূল (সা.) লিখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যাতে তারা গোমরাহী হতে মুক্তি পায়। কিন্তু রাজনীতির ধারা তাদের ভুলে যেতে বাধ্য করেছে।

৪৮৭। মুসনাদ, ১ম খণ্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা।

৪৮৮। হাদীসটি বুখারী উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ সূত্রে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম ও অন্যান্যরা হাদীসটি নকল করেছেন।

৪৮৯। কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠার বর্ণনানুযায়ী।

৪৯০। শারহে নাহজুল বালাগাহ্- ইবনে আবিল হাদীদ, ৩য় খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা।

৪৯১। আল্লাহ্ সত্যানুসন্ধানে আপনাকে সাহায্য করুন। আপনি জানেন নবী (সা.) এ কথা বলেন নি যে, আমি তোমাদের ধর্মীয় বিধান বা আহকাম বর্ণনা করবো ফলে এর জবাবে বলা হয়েছে আল্লাহর কিতাব আমাদের জন্য যথেষ্ট। এমন কি যদি রাসূল (সা.) ধর্মীয় বিধানও লিখতে চাইতেন তবে নবী (সা.) হতে লিখিত দলিল হিসেবে তা পথভ্রষ্টতা হতে রক্ষার কারণ হত। সুতরাং কোন অবস্থায়ই লেখার উপকরণ না আনা সঠিক হত না। যদি এ লেখা অন্য সব কিছু বাদ দিলেও শুধু বিচ্যুতি হতে রক্ষার জন্য হত তদুপরি আল্লাহর কিতাবে সব কিছু রয়েছে মনে করে তা পরিত্যাগ করা উচিত হত না। কারণ আপনি জানেন উম্মত সুন্নাহর প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। কোরআন পূর্ণ ও সর্বজনীন হওয়া স   ও উম্মত সুন্নাহর প্রতি মুখাপেক্ষীহীন নয়। কারণ কোরআন হতে সঠিক সি ান্ত গ্রহণে সকলে সক্ষম নয়; যদি সক্ষম হত তবে রাসূলকে তা ব্যাখ্যা দানের জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিতেন না- (و أنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم) আমরা আপনার ওপর

কোরআন এজন্য অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি মানুষের জন্য তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে শুনাবেন যা তাদের প্রতি ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়েছে।

৪৯২। সূরা নূর : ৫৫

৪৯৩। হাদীসবেত্তা ও ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, হযরত আবু বকর ও উমর উসামার সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তাঁদের সকলেই তাঁদের গ্রন্থসমূহে এ বিষয়টি এনেছেন এবং এ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে কোন মতদ্বৈততা নেই। ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাতে, তাবারী ও ইবনে আসির তাঁদের ইতিহাস গ্রন্থ 'তারিখ' - এ, সীরায়ে হালাবী ও যাইনি দাহলানের 'সীরাত' গ্রন্থে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হালাবী তাঁর সীরাতের ৩য় খণ্ডে উসামার সেনাদলের আলোচনায় একটি সুন্দর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যখন আব্বাসীয় খলীফা মাহদী বসরায় প্রবেশ করেন তখন বু মত্তায় সেখানকার কিংবদন্তী যুবক আয়াস ইবনে মুয়াবিয়ার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। চারশ আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি এই যুবকের পেছনে পথ চলছিলেন। মাহদী বললেন, "এই লোকদের মধ্যে একজন বৃ   লোকও কি ছিল না যে এই যুবককে সামনে দিয়েছে?" অতঃপর তিনি ঐ যুবককে লক্ষ্য করে বললেন, "হে যুবক! তোমার বয়স কত?" সে বলল, "আমার বয়স উসামা ইবনে যাইদের সমান। নবী (সা.) তাঁকে এমন একদল সেনার প্রধান করেন যাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর ও উমরও ছিলেন।" মাহদী খুশী হয়ে বললেন, "আল্লাহ্ তোমাকে অভিনন্দিত করুন।" হালাবী বলেছেন যে, সে সময় তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর।

৪৯৪। হালাবী তাঁর সীরাত গ্রন্থে ও অন্যান্য হাদীসবেত্তাগণও তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, উমর প্রায়ই উসামাকে বলতেন, "নবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন এমন অবস্থায় যে, তুমি আমার নেতা (আমীর) ছিলে।"

৪৯৫। উবনা সিরিয়ার আসকালান ও রামাল্লার মাঝে অবস্থিত। যাইদ ইবনে হারেসা এবং জা'ফর ইবনে আবি তালিব (বেহেশতের দুই পাখার অধিকারী) উবনার নিকটবর্তী মুতায় শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

৪৯৬। সকল হাদীসবেত্তা ও সীরাত রচয়িতা যাঁরাই এ যু াভিযানের ঘটনা বর্ণনা করেছেন তাঁরা মহানবী (সা.) কর্তৃক উসামাকে সেনাপতির দায়িত্ব প্রদানের ব্যাপারে সাহাবীদের অসন্তোষ ও আপত্তি এবং মহানবী (সা.) যে ক্রু হয়ে তাদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করার জন্য (মসজিদে নববীতে) এসেছিলেন- এ ঘটনাটি আমরা যেভাবে বর্ণনা করেছি ঠিক সেভাবে এবং মহানবী যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা বর্ণনা করেছেন। ইবনে সা ' দের তাবাকাত, সীরায়ে হালাবী, যাইনী দাহলানের সীরাত ও অন্যান্য সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত উসামার যু াভিযান অধ্যয়ন করুন।

৪৯৭। হালাবী ও যাইনী দাহলান তাঁদের সীরাত গ্রন্থে, ইবনে জারীর তাবারী তাঁর 'তারিখ ' গ্রন্থে একাদশ হিজরীর ঘটনা বর্ণনায় এটি বর্ণনা করেছেন।

৪৯৮। 'মিলাল ওয়ান নিহাল ' শাহরেস্তানী, চতুর্থ উপক্রমণিকা।

৪৯৯। উসামা বাকি সেনাদল নিয়ে 'উবনা ' য় হামলা করেন। সেখানকার অধিবাসীদের ঘরে অগ্নিসংযোগ করেন ও খেজুর বৃক্ষসমূহ কর্তন করেন। অশ্বারোহীদের এ আক্রমণে তাদের অনেকেই নিহত ও অনেকেই বন্দী হয়। উসামা সেদিন তাঁর পিতার হত্যাকারীদের হত্যা করেন কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় একজন মুসলমানও নিহত হয় নি। উসামা সেদিন তাঁর পিতার অশ্বের ওপর আরোহণ করেছিলেন। তাঁর রণধ্বনি ছিল 'হে উম্মতের সাহায্যকারী ' । অশ্বারোহী যো াকে তিনি দু ' ভাগ ও পদাতিকদের এক ভাগ গণীমত দান করেন এবং নিজের জন্যও এক ভাগ রাখেন।

৫০০। প্রথম খলীফার নির্দেশে যাকাত অস্বীকারকারী নামাযীদের হত্যা করা হয়। নবীর মৃত্যুর পর খলীফা খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে তাদের বিরু প্রেরণ করেন।

৫০১। 'ফিরকা ' ও 'শিয়া ' একই অর্থে ব্যবহৃত হয় যার বাংলা হলো 'দল ' । এ হাদীসটিকে ব্যবহার করে সকলেই নিজেদেরকে একমাত্র নাজাতপ্রাপ্ত দল মনে করে।

৫০২। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায়, সাঈদ ইবনে মানসুর তাঁর সুনানে, ইবনে জারির তাঁর তাহ্যিবুল আসারে এবং মুত্তাকী হিন্দি তাঁর কানযুল উম্মালের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯৬ পৃষ্ঠায় হাদীসটি বর্ণনা করে একে সহীহ বলেছেন।

৫০৩। 'তাবাকাতে ইবনে সাদ' - এ হযরত উমরের জীবনী অধ্যয়ন করুন। খলীফা জো'দার ওপর কোন সাক্ষ্য ও প্রমাণ ব্যতীত 'হাদ্দ' - এর শাস্তি আরোপ করেন। একজন কবি তার কবিতায় তাঁকে অশ্লীল কাজে অভিযুক্ত করেছিল এ অজুহাতে তাঁকে শাস্তি প্রদান করা হয়।

৫০৪। যদি 'সাবিলুল মুমিনীন' গ্রন্থটি আপনার হাতে না পৌঁছায় তাহলে 'ফুসূলুল মুহিম্মা' গ্রন্থটি হাতছাড়া করবেন না কারণ এর কিছু উপকারিতা রয়েছে যা অন্য গ্রন্থে নেই। এ গ্রন্থে একটি অধ্যায়ে বিশেষভাবে ঐ সকল ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা করেছি যারা কোরআনকে নিজ মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করতেন। বইটির ৮ম অধ্যায়ের ১০৪-১৩০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

৫০৫। স্বয়ং হযরত আলী (আ.) মালিক আশতার ও মিশরের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে বলেছেন, "মহান আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা.)-কে নবুওয়াতসহ এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যে তিনি বিশ্ববাসীদের প্রতি ভীতি প্রদর্শক ও অন্যান্য সকল নবীর দীনের সাক্ষী ও সংরক্ষণকারী হবেন। অতঃপর তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন শেষে মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে মুসলমানরা বিভেদে লিপ্ত হলো। আল্লাহর শপথ, আমি কখনো চিন্তাই করি নি আরবরা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আহলে বাইত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম লোকেরা বাইয়াতের লক্ষ্যে দলে দলে অমুক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ধাবিত হলো। আমি বাইয়াত হতে বিরত রইলাম। অতঃপর দেখলাম একদল ইসলাম হতে বেরিয়ে গিয়ে রাসূলের দীনকে ধ্বংসের জন্য আহবান করছে। শঙ্কিত হলাম যদি ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য না করি তাহলে তা ইসলামের বিলুপ্তি ডেকে আনবে। তাই তোমাদের ওপর নেতৃত্ব হাতছাড়া হবার বিপদ অপেক্ষা একে অধিকতর অকল্যাণকর মনে করলাম। কারণ নেতৃত্ব কয়েকদিনের সম্পদ বৈ কিছু নয় যা মরিচিকা ও ত অপসৃয়মান মেঘের ন্যায়। এ কারণেই মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে গেলাম যাতে বাতিল পরাস্ত ও দীন স্থিরতা লাভ করে।" (নাহজুল বালাগাহ্, ৬২ নং পত্র)

৫০৬। হযরত আলীর সংক্ষিপ্ত বাণী- 'নাহজুল বালাগাহ্' শারহে ইবনে আবিল হাদীদ, চতুর্থ খণ্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা।

৫০৭। ৫৬ নং পত্র দ্রষ্টব্য।

৫০৮। বিশতম পত্র দ্রষ্টব্য।

৫০৯। নাহজুল বালাগাহ্, ৩ নং পত্র।

৫১০। নাহজুল বালাগাহ্, ২য় খণ্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, ১৬৭ নং খুতবা।

৫১১। নাহজুল বালাগাহ্, ১৬৭ নং খুতবা।

৫১২। নাহজুল বালাগাহ্, হযরত আলীর সংক্ষিপ্ত বাণী নং ২। সাইয়্যেদ রাযী ও আবদুহু এ বক্তব্যের যে পাদটীকা লিখেছেন তা লক্ষ্য করুন।

৫১৩। নাহজুল বালাগাহ্, ৩৬ নং পত্র।

৫১৪। নাহজুল বালাগাহ্, ২৬ নং পত্র।

৫১৫। নাহজুল বালাগাহ্, ২য় খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা, বাণী নং ১৫৭।

৫১৬। নাহজুল বালাগাহ্, ২য় খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা, বাণী নং ১৪০।

৫১৭। নাহজুল বালাগাহ্, ২য় খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা, খুতবা নং ১৪৬।

৫১৮। নাহজুল বালাগাহ্, ১ম খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা, ২য় খুতবার শেষাংশ।

৫১৯। নাহজুল বালাগাহ্, ১ম খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা, ৮৪ নং খুতবা।

৫২০। আবু বকর আহমাদ ইবনে আবদুল আযীয জাওহারী তাঁর ‘আসসাকিফা ’ ও ‘ফাদাক’ গ্রন্থে এই খুতবাটি মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া হতে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান মাহলাবী হতে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে হাম্মাদ ইবনে সুলাইমান হতে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসান ইবনে হাসান হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মাতা ফাতিমা বিনতে হুসাইন (পিতা হুসাইন ইবনে আলী সূত্রে) হযরত যাহরা (আ.) হতে খুতবাটি নকল করেছেন। ইমাম আবুল ফযল আহমাদ ইবনে আবু তাহির (মৃত্যু ২৮০ হিজরী) তাঁর ‘বালাগাতুন্ নিসা ’ গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় হারুন ইবনে মুসলিম ইবনে সা’দান হতে, তিনি হাসান ইবনে আলাওয়ান হতে, তিনি আতীয়া আউফী হতে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসান ইবনে হাসান হতে তাঁর মাতা ফাতিমা বিনতে হুসাইন সূত্রে দাদী ফাতিমা যাহরা (আ.) হতে খুতাবাটি বর্ণনা করেছেন। শিয়াসূত্রে খুতবাটি সুয়াইদ ইবনে

গাফলাত ইবনে আওসাজা জো'ফী হযরত ফাতিমা (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন। তাবারী তাঁর 'ইহিতজাজ' ও আল্লামাহ্ মাজলিসী তাঁর 'বিহারুল আনওয়ার' গ্রন্থে খুতবাটি এনেছেন। এছাড়াও কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনাটি এসেছে।

৫২১। সূরা আহযাব : ৩৩।

৫২২। এ ঘটনাটি ইবনে আসির তাঁর 'কামিল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ২৪ পৃষ্ঠায় ২৩ হিজরীর ঘটনা বর্ণনা পর্বে এটি এনেছেন। ইবনে আবিল হাদীদ শারহে নাহজুল বালাগাহর ৩য় খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায় উমরের জীবনী আলোচনায় এটি নকল করেছেন।

৫২৩। আবুল ফযল আহমাদ ইবনে আবু তাহির তাঁর 'তারিখে বাগদাদ' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস হতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবিল হাদীদ প্রণীত শারহে নাহজুল বালাগাহ্, ৩য় খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা।

৫২৪। শারহে নাহজুল বালাগাহ্- ইবনে আবিল হাদীদ, ৩য় খণ্ডের ১০৫ পৃষ্ঠা।

৫২৫। ইবনে হাজার তাঁর 'সাওয়ায়েক' গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় ৫ম মাকসাদে এই দুই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি একাদশ অধ্যায়ে 'আলমুয়াদ্দাহ্ ফিল কুরবা' অর্থাৎ ১৪ নং আয়াতের আলোচনায় এটি নকল করেছেন।

দারে কুতনী ইমাম হাসান (আ.)- এর সাথে খলীফা আবু বকরের বাক্য বিনিময় পর্বে এটি এনেছেন। ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' - এ উমরের জীবনী আলোচনায় ইমাম হুসাইনের সাথে তাঁর এ কথোপকথন উল্লেখ করেছেন।

৫২৬। সাঈদ ইবনে আস ঐ সকল ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত যাঁরা আবু বকরের খেলাফতকে মেনে নেন নি ও তিন মাস বাইয়াত হতে বিরত থাকেন। আহলে সুন্নাহর আলেমদের অনেকেই বিষয়টি স্বীকার করেছেন। ইবনে সা'দের 'তাবাকাত' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৭০ পৃষ্ঠায় খালিদের পরিচিত পর্বে এটি আলোচিত হয়েছে। সেখানে বর্ণিত হয়েছে- যখন আবু বকর সিরিয়ায় সেনাদল প্রেরণের উদ্দেশ্যে পতাকা বেঁধে সাঈদ বিন আসের নিকট প্রেরণ করেন তখন উমর আবু বকরকে বলেন, "সাঈদ খেলাফতের বিষয়ে যা বলেছে তা জানার পরও আপনি তাকে নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছেন?" উমরের

উপর্যুপরি দাবীর প্রেক্ষিতে খলীফা আবু বকর আবু আরাভী দূসীকে পতাকা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রেরণ করেন। সাঈদ তাকে পতাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, "তোমাদের হতে দায়িত্ব গ্রহণও যেমন আমাকে খুশী করে নি তেমনি তা ফিরিয়ে দিতেও আমার আফসোস নেই।" আবু বকর সাঈদের গৃহে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে তা নিয়ে উমরের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন। সিরিয়ায় সেনাদল প্রেরণের বিষয়টি যে সকল বর্ণনাকারী এনেছেন তাঁরা এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাই এটি মুস্তাফিয সূত্রে বর্ণিত।

৫২৭। হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৭২ পৃষ্ঠায় এটি বর্ণনা করেছেন।

৫২৮। শারহে নাহাজুল বালাগাহ্- ইবনে আবিল হাদীদ, ৩য় খণ্ডে ২৫৪ পৃষ্ঠায় খুতবাতুল কাসিয়ার শেষাংশ।

৫২৯। বুরাইদাহ্, আবু আইয়ুব আনসারী ও সালমান ফারসী বর্ণিত হাদীসগুলো ৬৭ নম্বর পত্রে উল্লেখ করেছি।

৫৩০। আবুল ফযল আহমাদ ইবনে আবু তাহির বাগদাদী তাঁর 'বালাগাতুন্ নিসা ' র ৪১ পৃষ্ঠায় শা'বী হতে এটি বর্ণনা করেছেন।

৫৩১। উপরোক্ত কবিতা, পঙ্ক্তি ও রণধ্বনিসমূহ ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে বিশেষত যে সকল গ্রন্থে জামাল ও সিফফিনের যু বিশেষভাবে এসেছে তাতে এগুলো উল্লিখিত হয়েছে। আল্লামাহ্ ইবনে আবিল হাদীদ তাঁর শারহে নাহজুল বালাগাহর ১ম খণ্ডের ৪৭- ৫০ পৃষ্ঠায় (মিশরে মুদ্রিত) আহলে বাইত সম্পর্কে হযরত আলীর নিম্নোক্ত উ ৃ তি

و لهم خصائص حق الولاية و فيهم الوصية و الوراثة (আর তাদেরই [আহলে বাইত] রয়েছে বেলায়েতের অধিকার সংক্রান্ত একান্ত বৈশিষ্ট্যাবলী ও তাদের মাঝেই রয়েছে মহানবীর প্রতিনিধিত্ব ও উত্তরাধিকার)- এর বর্ণনায় এনেছেন। তিনি বলেছেন, 'ওয়াসি ' শব্দটি যে সকল কবিতায় এসেছে তার সংখ্যা অনেক। আমরা আবু মিখনাফের ওয়াকিয়াতুল জামাল এবং নাসর ইবনে মুযাহিমের সিফফিন গ্রন্থ হতে তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করেছি। যদি আপনার বিরক্তির কারণ না ঘটতো তাহলে এর সবগুলোই এখানে বর্ণনা করতাম।

৫৩২। যুফার, খুযাইমা ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু সুফিয়ানের কবিতা আসকাফী তাঁর ‘নাকজুল উসমানিয়া ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবিল হাদীদ শারহে নাহজুল বালাগাহর ৩য় খণ্ডের ২৫৮ পৃষ্ঠায় ‘খুতবাতুল কাসিয়া ’ র শেষে এগুলো উল্লেখ করেছেন।

৫৩৩। যুবাইর ইবনে বাক্কার তাঁর ‘মুয়াফফাকিয়াহ্ ’ গ্রন্থে এবং ইবনে আবিল হাদীদ তাঁর নাহজুল বালাগাহর ৩য় খণ্ডের ১৩ পৃষ্ঠায় এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবদুল বার নোমানের জীবনী আলোচনায় কাসিদাটি এনেছেন কিন্তু কাকে লক্ষ্য করে তিনি এটি বলেছেন তা উল্লেখ করেন নি। হ্যাঁ, তাঁরা এরূপই করে থাকেন।

৫৩৪। ইবনে আসির তাঁর ‘কামিল ’ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৭৪ পৃষ্ঠায় হযরত উসমানের জীবনীর শেষে الا انّ خير الناس بعد ثلاثة... অর্থাৎ জেনে রাখ, তিনজনের (আবু বকর, উমর ও উসমান) পর সর্বে ষ্ঠ মানব... এভাবে লিখেছেন।

৫৩৫। যুবাইর ইবনে বাক্কার তাঁর ‘মুয়াফফাকিয়াহ্ ’ গ্রন্থে এবং ইবনে আবিল হাদীদ তাঁর শারহে নাহজুল বালাগাহর ২য় খণ্ডের ১৫ পৃষ্ঠায় এটি বর্ণনা করেছেন।

৫৩৬। শেখ মুহাম্মদ আলী হাশিশু হামাদী সাইদাভী তাঁর ‘আসারু যাওয়াতুস্ সাওয়ার ’ গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠায় গানেমাহ্ বিনতে আমেরের সঙ্গে মুয়াবিয়ার সংলাপে এটি এনেছেন।

৫৩৭। আবুল ফযল আহমাদ ইবনে আবু তাহির বাগদাদী তাঁর ‘বালাগাতুন্ নিসা ’ গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় উম্মে সিনানের জীবনীতে এটি বর্ণনা করেছেন। শেখ মুহাম্মদ আলী হাশিশু তাঁর ‘আসারু যাওয়াতুস্ সাওয়ার ’ গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় উম্মে সিনান হতে এটি নকল করেছেন।

৫৩৮। আল্লামাহ্ শেখ মুহাম্মদ মাহমুদ রাফেয়ী এ কবিতার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এখানে ‘ওয়াসি ’ বলতে আলী কারামুল্লাহ্ ওয়াজহাকে বুঝানো হয়েছে। নবী তাঁকে ওয়াসি মনোনীত করেছেন এজন্য তাঁকে ‘ওয়াসি ’ বলা হয়েছে। যেমন বুরাইদাহ্ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, “নবী (সা.) বলেছেন : لكلّ نبي وصي و انّ عليّاً وصيي و وارثي প্রত্যেক নবীরই স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি (ওয়াসি) ছিল এবং নিশ্চয়ই আলী আমার উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত ও মনোনীত প্রতিনিধি।”

তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, “নবী (সা.) বলেছেন : مَنْ كنت مولاه فعلي مولاه আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা।” বুখারী সা’দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা.) যখন তাবুকের দিকে যাত্রা করেন তখন আলী (আ.)- কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রেখে যান। আলী বলেন, “আপনি কি আমাকে নারী ও শিশুদের মাঝে রেখে যাচ্ছেন?” নবী বলেন, “তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক মূসার সঙ্গে হারূনের সম্পর্কের ন্যায় হোক? শুধু পার্থক্য এই যে, আমার পর কোন নবী নেই।” অতঃপর ইবনে কাইস বাকাইয়াত হতে বর্ণনা করেছেন,

نحن منّاَ النبي احمد و الصديق منا التقي الحلما

“নবী আহমাদ ও সিদ্দীক আমাদের হতে এবং পুণ্যবান ও ধৈর্যশীল ব্যক্তিও আমাদের হতে।

و علـــــــيّ و جعفـــــــر ذو الجنـــــــا حـــين هنـــاك الوصـــي والشـــهداء

আলী ও ডানাযুক্ত জাফর এখানে ওয়াসি এবং শহীদ।”

৫৩৯। তাঁর কবিতার প্রথম চরণ হলো اطبية حيث استنت الكثب العفر

৫৪০। ‘আল ইসাবাহ্’ গ্রন্থের প্রথমাংশে যুবাইর ইবনে হুবাব ইবনে মুনযার আনসারীর পরিচিতি পর্ব।

৫৪১। রিজাল ও হাদীসসূচীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে মুনতাহাল মাকাল, নাজ্জাশী এবং শেখ আবু আলীর ফেহরেসত, মির্যা মুহাম্মদের মানহাজুল মাকাল এবং অন্যান্য।

৫৪২। এ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ যেমন শেখ বাহাঈ ও আরো কতিপয় আলেম এ বিষয়টি স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন।

৫৪৩। ‘তাফসীরে মাজমায়ুল বায়ান’ গ্রন্থের সূরা শুরার قل لا أسئلكم عليه أجراً إلّا المودَّة في القربى আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি আবু হামযাহর তাফসীর হতে নকল করেছেন।

৫৪৪। শিয়া হাদীসবিদগণ আবু হামযাহর গ্রন্থসমূহকে তাঁর সূত্র হতেই বর্ণনা করেছেন যা রিজাল গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। বিশিষ্ট আলেম সদরুদ্দীন মুসাভী ‘রেসালাতুল হুকুক’ গ্রন্থটিকে

সংক্ষিপ্ত আকারে মুসলমান কিশোর ও তরুণদের মুখস্থ করার উপযোগী করে আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন।

৫৪৫। যেখানে শিয়াদের বিভিন্ন দলের বিশেষত বাকিরিয়া ও সাদিকীয়াদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৫৪৬। আলহামদুলিল্লাহ্, এ গ্রন্থের পাদটীকাও শেষ হয়েছে। যা গ্রন্থটির পূর্ণতা দান করেছে। এ পাদটীকাসমূহের উপকারিতা সকলেই স্বীকার করবেন। এ পাদটীকা ১৩৫৫ হিজরীর ১৫ রজবে গ্রন্থ প্রকাশের দিনই শেষ হয়েছে যা গ্রন্থ প্রণেতা স্বয়ং সংযোজিত করেছেন। এ গ্রন্থ প্রণেতা ইসলাম ও শিয়া মাজহাবের এক ক্ষুদ্র খেদমতকারী আবদুল হুসাইন ইবনে শারিফ ইউসুফ ইবনে শারিফ জাওয়াদ ইবনে শারিফ ইসমাঈল ইবনে শারিফ মুহাম্মদ ইবনে শারিফ মুহাম্মদ ইবনে শারিফ ইবরাহীম। উপনাম শারাফুদ্দীন ইবনে শারিফ যয়নুল আবেদীন ইবনে আলী নুরুদ্দীন ইবনে নুরুদ্দীন আলী ইবনে হুসাইন মুসাভী আমেলী। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি করুণা ও রহমতের আচরণ করুন। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর নবী (সা.) ও আহলে বাইতের প্রতি দরূদ ও সালাম।

সূচীপত্র

দL·N Ńঠ 13

ঞ্চ' ঞ্চ Ńঠ 15

তৃতীয় Ńঠ 16

Jl'ঞ‹ Ńঠ 18

ŃএN Ńঠ 24

Ōক্ম Ńঠ 25

ő N Ńঠ 31

ǵক্তN Ńঠ 32

নবম Ńঠ 41

দশম Ńঠ 42

এগারতম Ńঠ 48

বারতম Ńঠ 50

ź' 'nl' N Ńঠ 62

źJsেl' N Ńঠ 63

পনরতম Ńঠ 67

źŌdJl' N Ńঠ 68

সতেরতম Ńঠ 171

আঠারতম Ńঠ 174

উনিশতম Ńঠ 177

বিশতম Ńঠ 180

ī ঞŋl′ N Ńঠ 183

বাইশতম Ńঠ 184

ź′ hŋl′ N Ńঠ 186

JŒ ŋl′ N Ńঠ 188

পঁচিশতম Ńঠ 190

ĵ œŒ ŋl′ N Ńঠ 191

সাতাশতম Ńঠ 196

আটাশতম Ńঠ 197

ħł Œŋl′ N Ńঠ 201

Œŋl′ N Ńঠ 203

ī į Œŋl′ N Ńঠ 207

ŊŒŋl′ N Ńঠ 208

ź′ Œŋl′ N Ńঠ 213

źJsŒŋl′ N Ńঠ 214

ŃĞŒŋl′ N Ńঠ 222

ĵ Œŋl′ N Ńঠ 223

ōdঊEŋlʼ N Ńঠ 227
H ĹঊEŋlʼ N Ńঠ 228
ħɬ JঊEŋlʼ N Ńঠ 231
JঊEŋlʼ N Ńঠ 232
ī ʗ JঊEŋlʼ N Ńঠ 236
ঊESoঊEŋlʼ N Ńঠ 237
źʼ lʼ oঊEŋlʼ N Ńঠ 241
JSoঊEŋlʼ N Ńঠ 242
ŃGlʼ oঊEŋlʼ N Ńঠ 245
ǯ JঊEŋlʼ N Ńঠ 246
ōdʼ JঊEŋlʼ N Ńঠ 247
H ĹJঊEŋlʼ N Ńঠ 248
ħɬ Ńฺɱlʼ N Ńঠ 260
Ńฺɱlʼ N Ńঠ 262
ī ʗ ɑlʼ N Ńঠ 264
ŊɑSɑlʼ N Ńঠ 265
źʼ Ńɑlʼ N Ńঠ 267
JSɑlʼ N Ńঠ 268

Ńএ়জl′ N Ńঠ 273

ĵ গাজl′ N Ńঠ 274

ōď′ জl′ N Ńঠ 284

H Ĺজl′ N Ńঠ 286

উনষাটতম Ńঠ 293

ষাটতম Ńঠ. 294

ī į ŌঞHı′ N Ńঠ 298

ŊoŌঞHı′ N Ńঠ 299

ź′ ŌঞHı′ N Ńঠ 309

źJsŌঞHı′ N Ńঠ 310

ŃSŌঞHı′ N Ńঠ. 314

ź̋ ŌঞHı′ N Ńঠ 315

ōď′ ŌঞHı′ N Ńঠ 318

H ĹŌঞHı′ N Ńঠ 319

ħł ō়প′nl′ N Ńঠ. 324

ō়প′nl′ N Ńঠ 326

ī į গ′nl′ N Ńঠ 338

ŊoOগ′nl′ N Ńঠ 339

ŒESơ'nl' N Ńঠ 342
JƃƠ'nl' N Ńঠ 344
ŃŒơ'nl' N Ńঠ 351
ĝESơ'nl' N Ńঠ 353
ōơ' ơ'nl' N Ńঠ 361
H Ĺơ'nl' N Ńঠ 362
উনআশিতম Ńঠ 365
আশিতম Ńঠ 366
একাশিতম Ńঠ 370
বিরাশিতম Ńঠ 371
তিরাশিতম Ńঠ 377
চুরাশিতম Ńঠ 378
পঁচাশিতম Ńঠ 384
ছিয়াশিতম Ńঠ 385
সাতাশিতম Ńঠ 392
আটাশিতম Ńঠ 396
ħłł ন্থ hl' N Ńঠ 400
ł ন্থ hl' N Ńঠ 401

ī į ɗ ন্থ hl' N Ńঠ 406

QEnd ন্থ hl' N Ńঠ 409

ŒE'nd ন্থ hl' N Ńঠ 414

J'nd ন্থ hl' N Ńঠ 415

ŃŒd ন্থ hl' N Ńঠ 419

ĝESd ন্থ hl' N Ńঠ 420

ōd' d ন্থ hl' N Ńঠ 422

H Ĺd ন্থ hl' N Ńঠ 423

ŒE'nd ন্থ hl' N Ńঠ 425

একশতম Ńঠ 426

একশত একতম Ńঠ 431

একশত দুইতম Ńঠ 432

একশত তিনতম Ńঠ 436

একশত চারতম Ńঠ 437

একশত পাঁচতম Ńঠ 445

একশত ছয়তম Ńঠ 446

একশত সাততম Ńঠ 451

একশত আটতম Ńঠ 452

একশত নয়তম Ńঠ.................................470

একশত দশতম Ńঠ.................................471

একশত এগারতম Ńঠ...............................490

একশত বারতম Ńঠ................................491

দRSoK ł G Ņd ōNÓ.............................493

l′ L·ōŏ.......................................512